ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক

শ্রীপান্থ

সে এক অবিশ্বাস্য কাল। বিশাল ভারত তখন ইংরেজের করতলগত। আরও স্পষ্ট করে বললে বিদেশি প্রভুদের পদানত। তারই মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ এখানে-ওখানে গদিয়ান শ্বেতাঙ্গ-রাজা। সে রাজত্বে তাঁরাই সর্বেসর্বা। তাঁরা নিজেরাই তৈরি করেন নিজেদের টাকা। শুধু 'রাজা' নয়, অনেক শ্বেতাঙ্গ সেদিন আচারে-ব্যবহারে বিলাসব্যসনে আমাদের নবাবদের মতো। তাঁরা 'শ্বেতাঙ্গ নবাব'। তাঁরা হারেম পোষেন। ভারতীয় বাইজিরা অনেকে তাঁদের আপ্যায়নের জন্যই বুঝিবা—'রাজ'-নর্তকী। তাঁদের প্রিয় খাদ্য ভারতীয় 'কারি'। সেই মেলামেশার দিনগুলোতে রাজা-প্রজা, সাদা-কালো ভেদাভেদ যেন লুপ্ত। ফলে ভারতীয় বহুবর্ণ সংসারে যুক্ত হল নতুন এক সম্প্রদায়—অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান। শুধু তা-ই নয়, প্রবাসী ইংরেজ নারী স্বদেশের বিখ্যাত লেখকের কাছে যদি 'পীত-ব্রাহ্মণী', তবে প্রেম-পাগল শ্বেতাঙ্গ নিজেও নিজের কথায় 'শ্বেত-ব্রাহ্মণ'। আর এক সুদর্শনা তরুণী নিজেই সেদিন ভারতের প্রেমে পাগলিনী। 'কামদেবের এই আপন উদ্যানে' তাঁকে কবিতে পরিণত করেছে। তিনি যেন স্বয়ং রতি। বিদেশির সংসর্গে এদিকে ভারতের মনোরাজ্যও তোলপাড়। ইংরেজি শিক্ষা। স্টিম ইঞ্জিন। কলের জাহাজ। কলের গাড়ি। টরে টক্কা—টেলিগ্রাফ। নতুন আয়ুধ কুইনিন। এই নতুন দুনিয়ার নতুন নেশা, নতুন পেশা সাহেব-ধরা, কতভাবেই না আমাদের পূর্বপুরুষরা সেদিন ভজনা করেছেন সাহেবদের। ইংরেজি শিক্ষাই শেষ কথা নয়, কোনও কোনও মহলে চালু হয়ে গেল ইংরেজি পোশাক, ইংরেজি কেতা। কেউ কেউ স্বপ্ন দেখেন সাহেব হবার। 'এবার মলে সাহেব হব', রামপ্রসাদী সুরে তাঁদের গান।

সবই আজ ইতিহাস। সবই ঐতিহাসিক ঘটনা, কোনও কাহিনীই নয়, মনগড়া। তবু অনৈতিহাসিক। কেননা, ইতিহাসের মূল ধারার বাইরে, এ-সব ঘটনা প্রায়শ নজর এড়িয়ে গিয়েছে রাজ-ঐতিহাসিকদের। ইতিহাসের আনাচে-কানাচে পড়ে থাকা সেই সব ঘটনা কুড়িয়ে এনেই শ্রীপান্থের এই বিচিত্র বর্ণাঢ্য ঐতিহাসিক উপাখ্যান। তিনি প্রমাণ করেছেন, পাদটীকাও অবহেলাযোগ্য নয়, এমনকী কখনও কখনও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ও অনুসন্ধানযোগ্য।

ISBN 81-7756-233-9

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক

শ্রীপান্থ

আ
ন
আ ন ন্দ

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক

শ্রীপান্থ
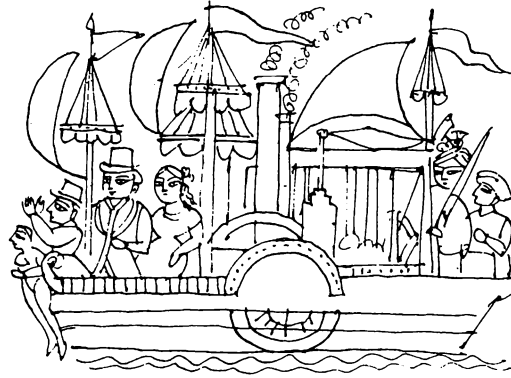
প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২
তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২

অলংকরণ কৃষ্ণেন্দু চাকী

ISBN 81-7756-233-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

OITIHASIK ANOITIHASIK
[History]
by
Sripantha

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

৩০০.০০

রমাকান্ত চক্রবর্তী
বিজিতকুমার দত্ত
সুহৃদবরেষু

সংকলন প্রসঙ্গে

এ বই প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস নয়। স্বভাবতই গবেষণা ও আলোচনাও নয় প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস-চর্চার অনুসারী। কি তথ্য নির্বাচন, কি আলোচনার ধারায়, এ বইয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন। সুতরাং, এখানে বিশেষ কোনও ইতিহাস-দর্শন খুঁজে পাওয়া শক্ত। এ বই আসলে ইতিহাসের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা আপাত-তুচ্ছ উপকরণ কুড়িয়ে নিয়ে তৈরি এমন এক ইতিকথা—উচ্চমার্গের গবেষকরা যা সাধারণত এড়িয়ে চলেন, এবং আলোচনার অযোগ্য বলে গণ্য করেন। আর সে-কারণেই সেই অবহেলিত এলাকায় সন্ধানী আলো হাতে আমার যত ঘোরাঘুরি। কেননা, আমার মনে হয় এইসব অবহেলিত উপাদানও সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্গত। এবং সে-ইতিহাস অবশ্যই শ্রবণযোগ্য। ফলে এ বই কার্যত ব্যক্তিগত ইতিহাস পাঠের আঁকিবুকিতে ভরা একটি খেরোর খাতা বিশেষ। লেখক সে-খাতাটি অন্য পড়ুয়াদের পড়ে শোনাবার তাগিদ অনুভব করছেন বলেই এভাবে বই হিসাবে ছাপিয়ে প্রকাশ করা। এখানে দুই মলাটের মধ্যে প্রায় এক ডজন দীর্ঘ রচনা রয়েছে। তার মধ্যে তিনটি সদ্য রচিত, ফলে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত। বাকি সব কয়টি রচনাই নানা সময়ে প্রকাশিত। প্রধানত শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। তবে পুরানো প্রতিটি রচনাই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত। বস্তুত, সেদিক থেকে বলতে গেলে সব রচনাই নতুন। পাতা উল্টালেই পাঠকের চোখে প্রথমেই নিশ্চয় ধরা পড়বে এ বইয়ের বিষয় বৈচিত্র। একটু মনঃসংযোগ করলেই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন-সূত্রটি। সব রচনারই পটভূমি ইংরেজের অধীন ভারত—যে ভারতে, ঘুরে বেড়ান ভাড়াটে সৈনিকের দল, এক সময় 'রাজা' হয়ে দিব্যি যাঁরা জাঁকিয়ে বসেন। সেই ভারতেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত বিদেশি ঔপনিবেশিক লুঠেরার ঝাঁক, আর তাঁদের ভারতীয় শাকরেদরা! সাহেবরা যদি দেশে ফিরে নবাবের চালে বাস করেন লুঠের ধনে, এদেশের সহযোগীরাও তেমনই অনেকে সেদিন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। এই সংসর্গের অন্য পরিণতিও ধরা পড়েছে কোনও কোনও রচনায়। যেমন অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ানদের কাহিনীতে, দেশি বিবির মতো দেশি বাইজি কিংবা দেশি খাদ্যে পরদেশিদের আসক্তিতে। অন্য দিকে বাঙালির সাহেব-ধরার জন্য অতি ব্যস্ততা। সাহেবি পোশাকে ময়ূর পুচ্ছধারী দাঁড়কাক সাজা, মরে সাহেব হয়ে জন্মাবার বাসনা, ইত্যাদি কত না লজ্জাকর প্রয়াস। এসব নিয়েই আমাদের এই 'রাজ'কাহিনী। শুধু রাজা নয়, রাজা-প্রজার জীবন সংকীর্তন। বাংলা ভাষায় এ ধরনের আলোচনা বড় একটা চোখে পড়ে না বলেই অন্য ধরনের এই কথকতা।

এইসব রচনা লিখতে বসে যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়েছি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করি প্রয়াত অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর নাম। সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কিত আমার রচনা মাত্রেরই তিনি ছিলেন আগ্রহী পাঠক। কখনও প্রকাশ্যে কলম ধরে, কখনও একান্ত আলোচনায় বার বার তিনি উৎসাহ জুগিয়েছেন নতুন নতুন অনালোকিত এলাকায় পা বাড়াতে। আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করি। স্মরণ করি প্রয়াত বন্ধু রাধাপ্রসাদ গুপ্তকেও। আজ মনে পড়ছে সেই দিনগুলোর কথা যখন আমরা শুধু প্রতিবেশী নই, সহমর্মী দুই ক্ষুধাতুর পাঠকও বটে। সেই সোনালি দিনগুলোতে পরস্পরের মধ্যে বই আর ভাবনার আদানপ্রদান ছিল নিয়মিত। এই সংকলনে আলোচিত বইপত্রের মধ্যে বেশ কিছু বই ছিল তাঁর ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত। আমার অধিকাংশ রচনারই, বলতে গেলে,

তিনি ছিলেন প্রথম পাঠক। তাঁর অনুপস্থিতি স্বভাবতই মনকে বিষণ্ণ করে তোলে। আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকেও স্মরণ করি। অন্য যাঁরা দুষ্প্রাপ্য বই হাতের সামনে এগিয়ে দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আনন্দবাজার পত্রিকার প্রধান গ্রন্থাগারিক, বইয়ের জহুরি শক্তিদাস রায় মশাইয়ের নাম। তিনি যে শুধু আমাকে নানা বিষয়ে অবহিত এবং শিক্ষিত করার নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা-ই নয়, এই বইয়ে ব্যবহৃত একটি দুষ্প্রাপ্য প্রশাসনিক দলিল তাঁরই সৌজন্যে পাওয়া। তাছাড়া, এই সংকলন উপলক্ষে আরও নানাভাবে আগাগোড়া সহযোগিতা করেছেন তিনি। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থরসিক অমিত রায় যথাপূর্ব এবারও চাহিদা মতো পুরানো বই জুগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব উৎসাহের সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য বিশিষ্ট লেখক ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক সুদেষ্ণা চক্রবর্তী এবং আমার নবীন সহকর্মী সেমন্তী ঘোষের। সুদেষ্ণা বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে লরেন্স হোপের বেশ কিছু কবিতা সংগ্রহ করে তুলে দিয়েছেন আমার হাতে। সেমন্তী এলিজা ড্রেপার সম্পর্কে একটি দুষ্প্রাপ্য বই আমার জন্য বয়ে এনেছেন দূর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দুটি উদ্যোগই, সানন্দে স্বীকার করি, আমার রচনার পক্ষে প্রমাণিত হয়েছে অতি হিতকারী।

পরিশেষে কিছু ঘরোয়া কথা। আমার আরও কিছু বইয়ের মতো এ বইয়েরও প্রয়োজক—গৃহকর্ত্রী মীরা সরকার। পারিবারিক গ্রন্থাগারসহ লেখাপড়ার পরিবেশ পরিস্থিতি দীর্ঘকাল ধরেই তিনি পালন করে চলেছেন। এই বইয়ের মাল-মশলার বিপুল নোট, খসড়া এবং প্রাথমিক মুদ্রণের কপি এতকাল ধরে তিনিই সঞ্চয় করে রেখেছিলেন বলে এমন একটি বহুবর্ণ সংকলন শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল। বস্তুত, দৈনন্দিন গবেষণা ও লেখালেখির একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। ফলে বইপত্র টানাটানি থেকে শুরু করে বিবিধ আয়োজন হাতের সামনে এগিয়ে দেওয়া, প্রয়োজনে বাইরে দৌড়াদৌড়ি করার ব্যাপারে সাহায্য করা ইত্যাদি সহযোগিতা করার মতো সহমর্মীর সন্ধান মিলেছে তাঁরই সৌজন্যে। প্রথম পর্বে ছিলেন স্বল্প শিক্ষিত, অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, অতি তৎপর বিহারের যুবক রাজকমল সিংহ। নানা কারণে শেষ পর্যন্ত যখন তাঁকে চলে যেতে হয়, তখন সৌভাগ্যবশত সহযোগী হিসাবে পাশে দাঁড়ান আর এক নবীন যুবক পুষ্পেন্দু দেবনাথ। তাঁর বুদ্ধি, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং পড়াশুনার দিকে আন্তরিক আগ্রহ, অস্বীকার করব না, আমার আলস্য কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারেও সে ছিল সক্রিয়। আশা রাখি, একদিন তাঁর গুণাবলী বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাবে।

প্রসঙ্গত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের বন্ধু ও কর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বইটিকে ত্রুটিহীন এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য তাঁদের উদ্যম ও যত্নে কখনও কোনও শৈথিল্য চোখে পড়েনি। সানন্দে স্বীকার করি, এই অভিজ্ঞতা সুলভ নয়। 'কলকাতা'-র মতো এই বইটিও যুগোপযোগী অলংকারে সাজিয়েছেন তরুণ শিল্পী কৃষ্ণেন্দু চাকী। তাঁর আঁকা ছবিতে ইতিহাস-চেতনার ছাপ স্পষ্ট। বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশার চেয়েও কিছু বেশিই পেয়েছি। তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

অক্টোবর, ২০০১ | শ্রীপান্থ

সূ চি

•

অনৈতিহাসিক রাজন্যবর্গের উপাখ্যান

একজন নয়—তিন জন। ছোটনাগপুরের বনভূমিতে, বাংলায় উপকূলে, নর্মদা-গোদাবরীর ডাইনে বাঁয়ে, দিল্লি-আগ্রার পথে পথে, গাঁয়ে গাঁয়ে উপকথার মতো আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কাহিনীগুলো—কান পেতে তা শুনলে, হয়তো সেই তিন তিরিশে পৌঁছবে,—তিরিশ তিন হাজারে পল্লবিত হয়ে উঠবে। সে পল্লবশীর্ষে অচেনা বুনো ফুলের মতো থেকে থেকে আশ্চর্য পুষ্প। তাদের অচেনা বর্ণ, অচেনা পরিচয়,—কিন্তু পরিচিত গন্ধ—প্রতি পাপড়িতে রাজকীয় সৌরভ।

ওঁরা কেউ ভারতীয় ছিলেন না। যে পুরুষটির মৃত্যুর পরে বিরাশিজন মানুষ সগর্বে তাঁর পুত্র বলে দাবি তুলেছিলেন তিনি রাজন্যবর্গ কণ্টকিত ভারত ইতিহাসের কোন বাদশাহ নন। যিনি দিল্লির বাদশাহ এবং কলকাতার কোম্পানি দুই রাজশক্তির ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে নিজেই নিজের টাকশাল বসিয়েছিলেন এবং যে শ্বেতাঙ্গ লর্ড বাহাদুরটি এক অঙ্গে জেমস-হেনরি তৈমুর-বাবর তথা দিল্লি-লক্ষ্ণৌ কোম্পানি-কাম্বের রক্ত ধারণ করেছিলেন—তাঁরাও প্রচলিত অর্থে ভারতীয় ছিলেন না। তাই বলে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ইংল্যান্ডের সামাজিক ইতিহাসে নাম যাঁদের 'নাবব' ওঁরা তাও ছিলেন না। প্রথম পরিচয় ওঁরা কেউ কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ—কোথাও কোনও 'নাবব' কখনও টাকশাল বসিয়ে নিজের টাকা নিজে বানিয়েছেন বলে জানা যায় না। এ দেশের জনতাই ছিল তাঁদের কাছে প্রবাদের 'প্যাগোডা ট্রি',—টাকার গাছ। তাছাড়া অক্টরলনির মতো কোনও কোনও 'নাবব' তের-পত্নীর হারেমও সাজিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সে নিছক দেশাচার অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অক্টরলনির ত্রয়োদশ-পত্নী যখন তেরটি হাতির পিঠে চড়ে দিল্লির পথে হাওয়া খেতে বের হতেন তখন নবাগত দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে যেত,—তাঁরা সহসা ঠাহর করে উঠতে পারতেন না এ চলমান হারেম কার, কোম্পানির রেসিডেন্ট সাহেবের না দিল্লির বাদশার? অক্টরলনির সমসাময়িক দিল্লির আর এক কমিশনার ফ্রেজার সাহেব ছিলেন এসব ঘরোয়া বিষয়ে আরও পাকা 'নাবব'। তৎকালীন এক ফরাসি ভ্রমণকারী লিখে গেছেন—দিল্লির আশপাশের গাঁ-গুলোতে যে জনতা, অর্ধেকই তার ফ্রেজারের কৃতিত্ব!' কিন্তু তবুও ফ্রেজার বা অক্টরলনি, বারওয়েল বা হিকি—তাঁরা কেউ এ কাহিনীর নায়ক নয়। কেননা, রাজলক্ষণ শুধু হারেমের আকার ধরে নির্ণীত হয় না,—পৌরুষ আরও কিছু কিছু পরিচয়-পত্রের দাবি তোলে।

তাই বলে যেসব ভাগ্যান্বেষী বিদেশি তলোয়ারের খেলা দেখিয়ে পেট চালাতেন, রাজায় রাজায় লড়াইয়ে যাঁরা কশ্চিৎ কখনও আপন পরিচয়ে চোখে পড়তেন—সঠিকভাবে বলতে গেলে ওঁরা ভারত ইতিহাসের বিখ্যাত সেই 'ফ্রি-ল্যান্সার' মাত্রই নন। তার চেয়ে একটু বেশি। কোমরে খোলা তলোয়ার নিয়ে অনেক বিদেশি এসেছেন এদেশে, ইংরেজ-ফরাসি আমেরিকান-জার্মান, স্প্যানিস-হাঙ্গেরিয়ান অনেক ভাগ্যান্বেষী। বেগম সমরুর ডাইনে বাঁয়ে ঠাঁই পেয়েছিলেন তিনজন। সিন্ধিয়ার দরবারে, মহীশূরে, হায়দ্রাবাদে, লাহোরে রণজিৎ সিংয়ের দরবারে ছিলেন আরও কয়জন। হায়দ্রাবাদ শহরের এক প্রান্তে সেন্ট জোসেফ গির্জার আশেপাশে যে গরিবের বস্তি—তার বাসিন্দাদের কাছে আজও সেই জায়গাটুকুর নাম—'তোপ-কি-সানচা।' ওরা জানে—এক সময় একটা ফাউন্ড্রি ছিল সেখানে, তোপ তৈরি হত তাতে। কিন্তু কে তা করতেন আর কার জন্যেই বা, সে খবর ওরা বলতে পারবে না! তার জন্যে এগিয়ে যেতে হবে আরও উত্তরে যেখানে সমতল হঠাৎ ঢেউ খেলেছে, একটা টিবি পাহাড়ের ভঙ্গি নিতে নিতে যেন থেমে গেছে। জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে এর নাম 'মইস রাম টেকেডি'। সঙ্গে সঙ্গে সব অর্থ স্পষ্ট হয়ে আসবে, মনে পড়বে বিখ্যাত একজন ফরাসি ভাগ্যান্বেষীর নাম,—ফ্রাঁসোয়া দ্য রেমন্দ (Francois de Raymond)। নিজাম নাম দিয়েছিলেন তাঁর—'মুসা রহিম'। মুসলমানরা বলতেন—'মুসা রহিম', হিন্দুরা 'মুসারাম'। প্রায় কুড়ি বছর একটানা হায়দ্রাবাদের সর্বেশ্বর ছিলেন তিনি। ফিরিঙ্গি বাগানের পরেই আজ যে গাঁ—সেখানে ছিল তাঁর প্রাসাদ,—আজ তা নেই, কিন্তু গাঁয়ের নাম এখনও 'মইসরাম'। কিন্তু তবুও 'মুসা-রহিম' এ কাহিনীর নায়ক হতে পারেন না। কেন না, জীবন ঘিরে তাঁর আজ রূপকথার রহস্য নেমে এলেও তিনি ছিলেন নিজাম বাহাদুরের কর্মচারী মাত্র।

একই কথা বিখ্যাত বেনোয়া দ্য বোয়াঁ (Benoit de Boigne) বা পেঁর (Perron) সম্পর্কে। তামাম হিন্দুস্থানে জীবন্ত বিভীষিকা ছিলেন—দ্য বোয়াঁ। তাঁর পায়ে পায়ে এক সময় লন্ডনের শেয়ার বাজার ওঠা-নামা করত, প্যারিসে স্পেকুলেটারদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন সিন্ধিয়ার কর্মচারী মাত্র। তিনি আইরিশ ব্রিগেডের সারিতে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যান্ডার্সদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, রাশিয়ানদের হয়ে তুর্কীদের সঙ্গে লড়েছেন, সেন্ট পিটাসবার্গে তিনি ছিলেন রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের প্রণয়ী,—মাদ্রাজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক আদালতে বিচার হয়েছিল অন্য এক সহযোদ্ধার পত্নীর সঙ্গে সখ্যতার অভিযোগে। তবুও এমন বর্ণাঢ্য নায়ক হয়েও এ কাহিনীতে দ্য বোয়াঁর কোনও অধিকার নেই, কেননা মাত্র এক দশকে চার লক্ষ পাউন্ড পকেটে নিয়ে তিনি যেখানে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসেছিলেন সে জায়গাটি কলকাতা বা আগ্রা নয়—প্যারিস। পেঁরও তাই করেছিলেন। সঙ্গে অজস্র সোনাদানা এবং মণিমোহরের সঙ্গে দুটি তাম্রবর্ণের পুত্রকন্যাও ছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্রি-ল্যান্সারদের কুলচূড়ামণি পেঁর যেখানে তার ভদ্রাসন নির্দিষ্ট করেছিলেন সেটি সুদূর ফরাসিদেশের অন্তঃপাতী ভেদঁর (Vendoine) শহরতলি। অথচ শৌর্য বীর্য অর্থকৌলিন্য সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন আদর্শ নায়ক। একদা ফ্রান্সের এক মফঃস্বল শহরের পথে পথে রুমাল ফিরি করতেন এই ফরাসি তরুণ। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে যেখানে তিনি পৌঁছেছিলেন তা শুধু তৎকালের পতনোন্মুখ মুঘলের বিকল্প ঘর সিন্ধিয়াদের প্রধান সেনাপতির আসনই নয়,—অর্থে ইজ্জতে তার চেয়েও বেশি কিছু। সিন্ধিয়ার প্রধান সেনাপতি হিসেবে মাসে মাইনে ছিল তাঁর পনের হাজার টাকা, তৎসহ খানাখরচা বাবদ মাসে মাসে আরও কয়েক হাজার টাকা। প্রতি মাসে বত্রিশ হাজার টাকা পেতেন পেঁর তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের জন্যে। এছাড়াও বার্ষিক তিরিশ লাখ টাকার 'জাইদাদ' ছিল তাঁর, —নিজের প্রাপ্য আদায়ের শতকরা পাঁচ ভাগ! তদুপরি দুই-দুইটি সুবার শাসন ক্ষমতা, উত্তর ভারতের জন্যে সিন্ধিয়ার হয়ে টাকা তৈরি—নিমক শুল্ক আদায় ইত্যাদি আরও কিছু কিছু স-রস কর্তব্য ছিল তাঁর। কিন্তু তবুও পেঁর আমাদের এই অনৈতিহাসিক রাজন্যবর্গের কেউ নন। কেননা,
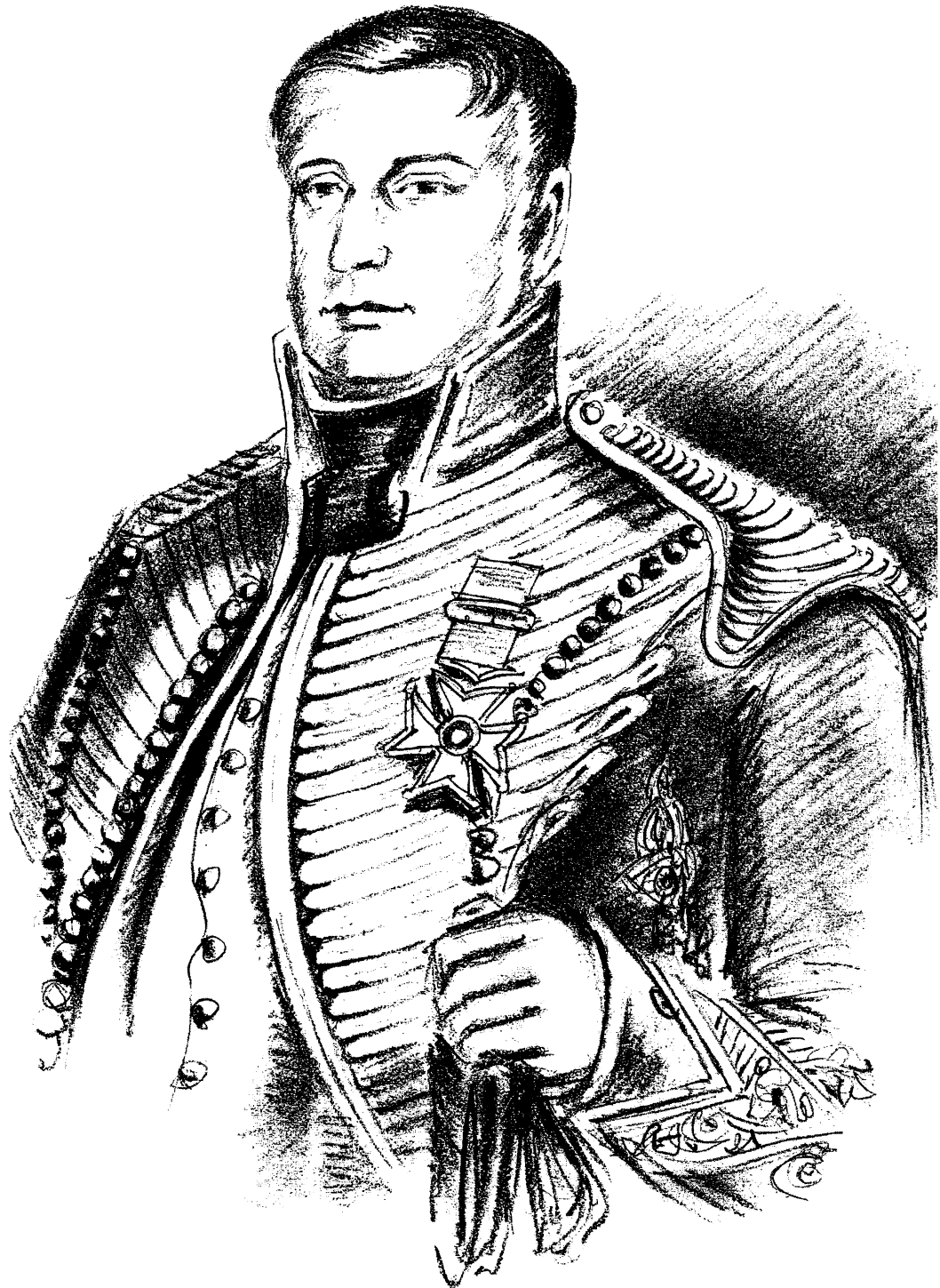
তিনি ভৃত্যের মর্যাদা অতিক্রম করতে পারেননি, এবং যেদিন ঘটনাচক্রে সেই স্বাধীনতা তাঁর অধিকারে এসেছিল, সেদিন তিনি পলাতক হিন্দুস্থানী,—এদেশের তিনি কেউ না।

সুখ্যাত কাংড়া চিত্রকলায় থেকে থেকে উঁকি দেয় নতুন রং—বর্ণাঢ্য চিত্র আরও রঙিন হয়ে ওঠে—পাহাড়ি নরনারীর জীবনছন্দে জীবন ঢেলে দিয়ে ভেসে বেড়ায়—অচেনা পোশাকে এক আগন্তুক। উৎসাহীরা পরিচয় উদ্ধার করেছেন—হ্যাট-কোটে এ হিন্দুস্থানী আর কেউ নয়, আইরিশ ভাগ্যান্বেষী ও'ব্রিয়েন। রাজা সংসারচাঁদের সংসারে সুজানপুর টিরার সেই স্বপ্নের মতো জীবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন ও'ব্রিয়েন। তিনি রাজার মতো বাস করতেন, সখীদল পরিবৃত হয়ে রাজার মতো হোলি খেলতেন,—একখানা চিঠি পাঠে সাতদিন সাতরাত্তির সময় নিতেন! যখন তিনি মারা যান, তখন হূণ রাজাদের নিয়মে তাঁর প্রিয় ঘোড়া দুটিকেও কবরস্থ করা হয়। টিরা সুজানপুরে পাহাড়িদের গাঁয়ের ধারে উপকথার দেশ কাংড়ার লাল মাটিতে আজও দাঁড়িয়ে আছে পাথরের দুটি ঘোড়া। ও'ব্রিয়েন আজও সেখানে লোকের মুখে মুখে বেঁচে আছেন। জর্জিয়ান পোশাকে এখনও যেন তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে এই পাহাড়ের দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু ও'ব্রিয়েন তবুও কাংড়ার রাজা নন, তিনি সুজানপুরের বিখ্যাত নরপতি সংসারচাঁদের সেনাপতি, বান্ধব—বয়স্য। কাছাকাছি কাংড়া দুর্গের লরেন্স, যিনি সংসারচাঁদের হারিয়ে যাওয়া কন্যা কানওয়ারকে পেছনের দরজায় ঘরে তুলে নিয়ে ভালবেসেছিলেন—তিনিও ছিলেন লাহোর দরবারের জনৈক সেনাপতি মাত্র। এলার্ড, জেমস সাহেব, ফিরিঙ্গি, 'জরুজ সাহেব' বা জর্জ হেসিং, উইলিয়াম লি ওরফে 'মোহম্মদ খাঁ'—এমনি আরও নানা রঙের অনেক ফুল ছিল রঞ্জিৎ সিংয়ের শখের বাগিচায়। কিন্তু অচেনা বনপুষ্পের চমকে চোখ টানলেও তাঁরা কেউ মন টানেন না,—এমন করে সৌরভে রাজকীয় হাওয়া ছড়ান না।

—'ই-স-কি-নার!'

এখনও যদি আমের আচারের সেই প্রকাণ্ড চিনেমাটির পাত্রটা বিলাসপুর, বন্দেলশর, হানসি বা আলিগড় জেলার কোনও গাঁয়ে ইংরেজি হরফের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন কোনও বুড়ো লড়িয়ের নাকের সামনে তুলে ধরা যায়—তবে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠবে তাঁর চোখ। যেন বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন—বানানটা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ ঢেউ খেলে যাবে তাঁর সর্বাঙ্গে, বৃদ্ধ জওয়ানের গলা ফিরে পাবেন, চেঁচিয়ে উঠবেন—'ইসকিনার!—হামারা সিকন্দর সাহিব।'

শ্বেত পাথরের গায়ে নয়, কোনও স্মৃতিমন্দিরের মিনারে নয়, ইতিহাসের কোনও অধ্যায়ের শীর্ষেও নয়,—আমের আচারের একটি পাত্রেই লেখা ছিল হানসির সিকেন্দরের নাম—'কর্নেল স্কিনার'। লন্ডনের যে কিউরিওর দোকানে সেটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, সম্ভবত ইতিহাসের অমূল্য সব টুকরোর কারবারি সেই দোকানির কাছে এই মৃৎপাত্রের রহস্যটা খুব স্পষ্ট ছিল না। তিনি জানতেন না—এই পাত্রটির আসল মালিকানা যাঁর—নাম তাঁর ঈশ্বরী—ঈশুরী খানুম!

কর্নেল জেমস স্কিনার নামে ঊনবিংশ শতকের অন্যতম দুর্ধর্ষ ইংরেজ লড়িয়ে যদি পাত্রটির স্বত্বাধিকারী হন, তবে স্বয়ং 'সিকেন্দর সাহেবের' মালিকানা ছিল ঈশুরী নামে সেই হিন্দুস্থানী কন্যাটির হাতে, যিনি ধীরে ধীরে এই পাত্রটি হাতে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতেন, ভ্রূভঙ্গে খানসামা খিদমদ্গারদের সাজান ব্যূহ ছারখার করে দিয়ে নিজের হাতে প্লেটে প্লেটে সিকেন্দরের অতি প্রিয় আমের চাটনি পরিবেশন করতেন। খাওয়ার টেবিলে স্কিনার ছিলেন পরিপূর্ণ মুঘল। জেনানাদের প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। কিন্তু ঈশুরী ছিলেন সব নিয়মের ব্যতিক্রম,—সিকেন্দর কোনওদিনই তাঁর কাছে 'বাদশা' হতে পারেননি।

অনেক পরি-ঈশ্বরী ছিলেন সিকেন্দরের চার প্রাসাদে। আলিগড়ের কাছে হানসিতে ছিল তাঁর দরবার তথা রাজধানী। মুঘল দরবারের অনুকরণে সেখানে দরবার বসত, স্কিনার তাঁর নিজ রাজ্য তথা

জায়গিরের প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগ শুনতেন,—ফরমান জারি করতেন, সে-সব ফরমানে যে সিলমোহরটি পড়ত, তাতে ফার্সি হরফে লেখা থাকত—'নাসিরউদ্দৌলা কর্নেল জেমস স্কিনার বাহাদুর গালিব জং!' শোনা যায় এই পদবীটা পেয়েছিলেন তিনি দিল্লির বাদশার মুখ থেকে।

তবে হানসিতে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে টেবিলে বসে খেয়েছেন—তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন মুঘল সম্রাট মেনে না নিলেও ক্ষতি ছিল না, স্কিনার সত্যিই বাদশা। নাচ-গান-খানাপিনা লেগেই আছে। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা আসছেন, হিন্দুরা আসছেন,—উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা আসছেন। গায়ে কাশ্মিরী শাল, মাথায় মুসলমানী টুপি—সিকেন্দর মজলিসে এসেছেন। প্রকান্ড হুকো থেকে দীর্ঘ সোনালি নল বেয়ে বেনারস থেকে আনা অম্বুরীর ধোঁয়া আসছে, হাওয়া গন্ধে ভরে উঠছে। দূরে এক কোণে বসে হিন্দুস্থানী শিল্পী দরবারি নিয়মে চিত্র কাটছে। সিকেন্দরের কোর্ট পেইন্টারও আছে।

কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি স্কিনারের একটি চিত্র-সংগ্রহ হাতে পেয়েছেন। তাতে একান্নটি চিত্রে স্কিনারের মজলিসের খবর। কারা সেখানে আসতেন, তামাক পোড়াতেন, স্বপ্নের মতো সঞ্চয় কুড়িয়ে ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরতেন—অনায়াসে তাঁদের চেনা যায়। কানপুরের বৃদ্ধ মৌলবী সালামতউল্লা, বাহাদুর মোকাম, রহিমবক্স; বরোদার রাজা কিষণচাঁদ, জয়পুরের মহারাজা ঈশ্বরী সিং, ফিরোজপুরের নবাব সামসুদ্দিন; হানসির মির্জা আজিম বেগ, দেওয়ান বাবুরাম; ওস্তাদ আমীরবক্স তম্বুরাবাদক...এবং আরও আরও কতজন!

ইউরোপিয়ানরাও আসতেন, কিন্তু ছবিতে তাঁরা নেই,—সিকেন্দরের কাছে তাঁর নিজের জগৎ ছিল পুরোপুরি ভারতীয়দের নিয়ে গড়া। বলতে গেলে ইংরেজি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু গড়গড় করে কথা বলতেন—হিন্দি, উর্দু এবং ফার্সিতে। অতি সম্প্রতি জানা গেছে, সিকেন্দর একখানা আত্মজীবনীও লিখে রেখে গেছেন। এবং সেটি লিখেছেন তিনি ফার্সি ভাষায়। ইংরেজি অনুবাদও একটি আছে অবশ্য কিন্তু সেটি তাঁর নিজের লেখা কিনা বলা শক্ত। কারও কারও অনুমান, সে ভাষ্যটি তাঁর পুত্রদের কারও লিখিত বয়ান।

সিকেন্দরের ভাষা ছিল ফার্সি। আত্মচরিত ছাড়াও তিনি বিস্তর লিখেছেন। ভারতের বিচিত্র জাতি, বিস্ময়কর প্রথাসমূহ সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর মনে। সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর চারপাশের মানুষকে কাছে ডাকতেন, কৌতূহলি বালকের মতো গালে হাত দিয়ে তাদের জীবনের খুঁটিনাটি শুনতেন—অবসরে সে সব তথ্য পুঁথিতে সাজাতেন। নাসতালিখ হরফে লেখা তাঁর চারশো বাষট্টি পাতার সেই প্রকান্ড পুঁথিটির নাম—'তাস্‌রি-উল-আখবাম' বা 'সংক্ষিপ্ত জনজীবন'। ভারতের নানা জাতির নানা শ্রেণীর মানুষের মেলা সেই বইয়ের মলাটের তলায়। আর একখানা বই ছিল তাঁর 'তাজখিরাত-উল-উমারা'—বা 'রাজন্যবর্গের বিবরণ'। ভারতের সমুদয় রাজার বংশ-বর্ণন থেকে শুরু করে তাঁদের রীতিনীতি, মান-মর্যাদা, শক্তি-সামর্থ্য সব ছিল তাতে। মায়, কোন রাজা কয় তোপের সালাম প্রত্যাশা করেন—তাও। বিদেশি হলেও এসব খবর তখন সিকেন্দরের কণ্ঠস্থ। একজন ফরাসি ভ্রমণকারী তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বলেছিলেন—আমি যদি ভারতের প্রধান সেনাপতি হতাম তবে সকলের আগে পরামর্শ করতে ছুটতাম হানসিতে, —সিকেন্দর সাহেবের কাছে!

সাহেবরাও আসতেন। তবে পরামর্শ নিতে যত তার চেয়ে বেশি শ্বেতবর্ণের বাদশাকে দেখতে। গায়ে রুপালি জরির কাজ করা নীল কোর্তা, ঘোড়ার পিঠে চড়ে সিকেন্দর বেরিয়ে পড়লেন। মুতরা, বিলাসপুর, কাবেরি—হানসির চারপাশ ঘিরে তার বিস্তীর্ণ রাজ্য, তিনশো ষাটটি গাঁয়ে অসংখ্য প্রজাবর্গ, —তখনকার দিনেই সেই খামারের দাম চৌত্রিশ লক্ষ টাকা। তারপর বিস্তীর্ণ জায়গির। সিকেন্দর সেখানে ঘুরে বেড়াতেন,—প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনতেন, বিচার করতেন, মীমাংসা দিতেন। বলতে গেলে প্রতিটি প্রজাকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন। সিকেন্দরের ঘোড়া

হানসির প্রাসাদ থেকে বের হওয়া মাত্র চারদিকে তাঁর আগমন বার্তা রটে যেত, নজরানা নিয়ে প্রজারা দলে দলে এসে তাঁর পথের ধারে দাঁড়াত। সিকেন্দর ঘোড়া থেকে নামতেন, গরিবের ঘরে হাতির পা পড়ত। ফেরার পথে ভোজ আর দানের হিড়িক পড়ত—রাজার সবচেয়ে কামনার ধন জয়ধ্বনি কানে নিয়ে মাসান্তে সিকেন্দর প্রাসাদে ফিরতেন।

হানসি ছাড়াও আরও তিনটি প্রাসাদ ছিল স্কিনারের। একটি ছিল তার বিলাসপুরে, একটি বুন্দেলশরে আর একটি দিল্লিতে,—ঠিক কাশ্মিরী গেটের উল্টো দিকে। এই চার মহলেই সিকেন্দরের এক জীবন। নাচ-গান-খানাপিনা-শিকার এবং অতিথি সংবর্ধনা। 'বাদশা'র বাকি সময়টুকু কি করে কাটত, সে জানে—ঈশ্বরী, সেই আমের চাটনির রহস্যময়ী।

চৌদ্দ-সুন্দরীর অন্তঃপুরে ঈশুরী ছাড়া আর কে বা কারা ছিল তা আজ আর জানবার উপায় নেই। সংখ্যাটা আরও বেশি ছিল কি কম, তাও বোঝবার পথ নেই। হিন্দুস্থান রাজাবাদশাদের দেশ—এর প্রতিযোগিতা শুধু রাজ্যের আয়তন নিয়েই নয়—অন্তঃপুরের আয়তনেও—এই তথ্যটাও জানতেন বলেই হয়তো সিকেন্দর আসল অঙ্কটা কখনও প্রকাশ করেননি,—বিরাশিজন উত্তরাধিকারী রেখে কৌতূহলিদের চিরকালের মতো ধাঁধায় ফেলে রেখে গেছেন।

এই রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে স্কিনারের দিল্লি প্রাসাদটির দিকে তাকালে। বিশেষ, মার্বেল পাথরের জেনানা মহলটি দেখলে। পরবর্তী কালে সেখানে অবশ্য হিন্দু কলেজ বসেছিল, এখন নাকি সরকারি অফিস। সুতরাং আজ আর তার দিকে তাকালে কারও সিকেন্দরের কথা মনে পড়বার কথা নয়। একালের দিল্লি বরং তার চেয়ে সহজে চেনে—সেন্ট জেমস চার্চ। স্কিনার-প্রতিষ্ঠিত এই গির্জাটি আজও সেদিনের মতোই সমান বিখ্যাত। কিন্তু সেদিনের মতো বোধ হয় সমান অর্থপূর্ণ নয়। যেমন নয়, তার প্রায় গায়ে গায়েই স্কিনারের প্রাচীন প্রাসাদের দেওয়ালের বাইরের মসজিদটি।

লর্ড অকল্যান্ডের বোন—ফেনি ইডেন, ভেবেছিলেন এটি চার্চ নয়, মসজিদ। মস্ত একখানা মুসলমানি ঢংয়ের মস্ত একখানা গম্বুজ ঘিরে গড়ে উঠেছে চার্চ—গির্জা। ফেনি লিখেছেন—"আমার ভাবতেও ভয় হচ্ছে, লিটলবিটস অব ইসলাম উড বি ক্রিপিং ইন! এটি যে সত্যি গির্জা তাই নিয়ে সেদিন রীতিমতো সংশয়। কেউ বলেন—এটি আদিতে ছিল মসজিদ। একদা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সিকেন্দর শপথ করেছিলেন, যদি তিনি বেঁচে ওঠেন তাহলে তিনি একটি মসজিদ গড়বেন। কেউ বলেন প্রতিজ্ঞাটি করেছিলেন তিনি বাবরের মতো পুত্র জোসেপের অসুখ উপলক্ষে। অন্যরা অন্য কথা বলেন। তাঁদের মতে স্কিনার যখন কাশ্মিরী গেটের বিপরীত দিকে এই জমিটা কেনেন তখন সেখানে একটি ভাঙা মসজিদ ছিল। সিকেন্দর তখন নয়া বাদশা হয়েছেন,—ধর্মেও তাঁর বাদশাহি বিশ্বাস উঁকি দিয়েছে। তিনি মসজিদ সারাই করবার হুকুম দিলেন। তাই নিয়ে হারেমে ঢেউ জাগল,—কক্ষে কক্ষে গুঞ্জন।

ঈশুরী মুসলমানের কন্যা ছিলেন। কিন্তু সকলে তা নয়। চতুর্দ্দশ পরির মধ্যে যে তিনজনের নাম পাওয়া গেছে তার একজন মানু—অন্তত হিন্দুর ঘরের মেয়ে ছিলেন। শোনা যায়, চার্নকের মতোই সিকেন্দর তাঁকে 'সতী'র চিতা থেকে কেড়ে এনেছিলেন,—ভালবেসেছিলেন। তিনি বেঁকে বসলেন। ঈশুরী, খোয়াজ বক্স এবং অন্যান্য মুসলিম হুরীদের দল এক দিকে; অন্য দিকে মানু এবং হিন্দুর ঘরের মেয়েরা,—ঘরের সামনেই মসজিদ হতে দেবে কেন তারা? সিকেন্দর বাদশা হলেও তখনও পুরো দিল্লিওয়ালা হননি। যুক্তিটা তাঁর মনে ধরল—তিনি নয়া হুকুম পাঠালেন, মসজিদের সঙ্গে একটি ছোটখাট হিন্দুমন্দিরও হোক! আদিতে তাই নাকি ছিল,—প্রাসাদের গায়েই ছিল অঙ্গাঙ্গী একটু মসজিদ এবং একটি মন্দির,—সিকেন্দরের আপন ঘরের প্রতীক।পরবর্তী কালে সাহেবদের আনাগোনার ফলে এবং বার্ধক্যবশত যখন আবার ঘরের কথা মনে পড়েছে—তখনই সিকেন্দরের হাতে উঠেছে বাইবেল, মনে পড়েছে যিশুর কথা। সেন্ট জেমস সেকালেরই ফল। মন্দির-মসজিদ

ঘিরেই তাই গড়ে উঠেছে সিকেন্দরের নব ধর্মমন্দির, তাঁর গির্জাঘর। সম্ভবত সে কারণেই তার অবয়বে এখনও যেন মসজিদের ছায়া,—মন্দিরের আদল।

যৌবনে ধর্ম বিশ্বাসে এই অস্থিরতার কারণেই সিকেন্দরের অন্দর আজও তাই এমন অস্পষ্ট। বিরাশিটি পুত্রকন্যার জনক তিনি কিন্তু তামাম ভারতের কোনও গির্জাঘরে কর্নেল জেমস স্কিনার নামক কোনও প্রটেস্টান্ট তরুণের কোনও বিয়ের খবর নেই, কোনও কাজী বা পুরোহিতও কোনওদিন সে কারণে হানসি বা বুন্দেলশর থেকে কোনও আহ্বান পেয়েছিলেন—এমন প্রমাণও নেই। সিকেন্দর সে পথের পথিক ছিলেন না। কি ঈশুরী, কি মানু—পরিচয়ে তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর—'সহচরী'—কম্পেনিয়ান। ফলে, চৌদ্দকে আজ চৌত্রিশে ঠেলে দিলেও বিবাদ-বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই! ঈশুরীর কবর আছে হানসিতে, মানুরও আছে, কেন না পরবর্তী কালে তিনিও নাকি মুসলমান হয়েছিলেন,—কিন্তু অন্যদের হিসেব দেবে কে?—হিসেব হবে কীভাবে?

তবে সংখ্যায় তাঁরা যত অসংখ্যই হোন না কেন একটা বিষয়ে সবাই নিশ্চিত যে, ঝানু সৈন্যাধ্যক্ষ সিকেন্দরের অন্তঃপুরে বিশৃঙ্খলার কোনও স্থান ছিল না। সামরিক কায়দায় সেখানে কোর্ট মার্শাল বসত কিনা, কিংবা মুঘলাই বিধানে হানসির দেওয়ালের আড়ালে তালভঙ্গের অপরাধে কোনও রূপসী জ্যান্ত কবরস্থ হয়েছিলেন কিনা, তা অবশ্য সঠিক বলা যাবে না। তবে এটা ঠিক, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হাইদর হিয়ার্সের মতো স্কিনার সাহেবের উদরে কোনও বিশ-পঁচিশের ছক ছিল না। হিয়ার্সে দক্ষিণের এক খানদানি নবাব-ঘরের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ নাকি বংশ নির্বিশেষে এদেশীয় মেয়েদের প্রতি তিনি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। ফলে দেখতে দেখতে বিরাট এক হারেম গড়ে ওঠে তাঁর...সেখানে নান জাতের, নানা বর্ণের, রকমারি মেজাজের রূপসীর কলকল্লোল, —সন্ধ্যার পরেই তাঁদের ঘরে ঘরে চাঞ্চল্য, কোথাও দীর্ঘশ্বাস, কোথাও উল্লাস। বিচক্ষণ হিয়ার্সে সেই নৈরাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে মনস্থ করলেন,—লোক ডাকিয়ে তিনি তাঁর উদরের চামড়ায় বিরাট এক উল্কি আঁকতে আদেশ দিলেন। সকলে বিস্ময়ে হতবাক। হিয়ার্সে ধীরে ধীরে জানালেন—উল্কিটা ক্রুশ, মেরি মা, কিংবা পরিদের চিত্রও হবে না,—তিনি হিন্দুস্থানী মেয়েদের প্রিয় খেলা একটি 'বিশ-পঁচিশে'র ছক চান। তাই হল। দুর্ধর্ষ লড়িয়ে বিখ্যাত ভাগ্যান্বেষী হিয়ার্সে নিজের চামড়ায় শান্তির চিরস্থায়ী ঘোষণাপত্র খোদাই করিয়ে অন্তঃপুরে ফিরলেন,—কক্ষে কক্ষে হাসি ফুটল, শ্বেতাঙ্গ-বাদশার বিলাসের খবর তুর্কী-মুঘলের দেশেও প্রবাদ হল। দিকে দিকে খবর রটল, হিয়ার্সে যখন ঘুমোন, তাঁর বেগমেরা তখন পালা করে তাঁর পেটের-ছকে বিশ-পঁচিশ খেলে, ওরা খিল খিল করে হাসে—'বাদশা' নাক ডাকিয়ে সুখে নিদ্রা যান।

সিকেন্দর এ ধরনের বিলাসী ছিলেন না। অন্তত জীবনের বিকেলের দিকে অন্দরে যে তিনি রীতিমতো কড়াকড়ি কানুন চালু করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তাঁর হারেমে—হিন্দু আর মুসলমানের পাশের ঘরে একটি খ্রিস্টান মেয়েও ছিলেন। নাম ছিল তাঁর সোফিয়া। সম্ভবত তিনি ছিলেন কোনও লাবণ্যময়ী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। একবার সোফিয়ার দুই বোন বেড়াতে এসেছে হানসিতে, বোনের কাছে। যথারীতি স্কিনার সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের। এবং সিকেন্দরের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অন্তঃপুরে থাকতে দেওয়া হল তাঁদের। তাঁরা সেখানেই থাকেন।

হয়তো মহলের অভিভাবিকা ঈশুরীই নিয়ে এসেছিল খবরটা। হঠাৎ একদিন সিকেন্দরের কানে এল তাঁর অন্তঃপুরে নিয়মভঙ্গ হয়েছে। চোরা পথে সেখানে জেমস আনাগোনা ধরেছে,—সোফিয়ার বোন দুটিকে নিয়ে সে খেলায় মত্ত হয়েছে। জেমস সিকেন্দরের নিজের পুত্র,—তা হোক—তৎক্ষণাৎ পিতার দরবারে তলব পড়ল তাঁর। সেই সঙ্গে মেয়ে দুটিরও।

জেমসের ভীতিবিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে সিকেন্দর বললেন—জেমস, তুমি রীতি ভঙ্গ করেছ।

জেমস মাথা নিচু করল।

—জেমস, তুমি অপরাধ স্বীকার করেছ দেখে আমি আনন্দিত। তবুও তুমি জেনে রাখ এ খেলা আমার জীবৎকালে চলবে না। তোমাকে এক্ষুনি বলতে হবে এই দুটি মেয়ের কোনটিকে তুমি চাও। যদি সে রাজি থাকে, তবে আমি তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করব,—তোমাকে সারা জীবনের জন্যে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে!

জেমস ধীরে ধীরে তার পছন্দের মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে মেয়েটির নাম ছিল—ফেনি বার্লো। সিকেন্দর বললেন,—তোমাদের আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরেই তোমাদের বিয়ে হবে! দ্বিতীয় মেয়েটিকে তিনি আদেশ দিলেন—তোমাকে এক্ষুনি প্রাসাদ ছাড়তে হবে।

তারপর ডাক পড়ল স্ত্রী সোফিয়ার। সিকেন্দর ভালবেসেই ঘরে এনেছিলেন তাঁকে। কিন্তু আজ তিনি বিচারকের আসনে বসেছেন এবং এদেশের বাদশাদের ন্যায়নীতির খবরও তিনি কিছু কিছু রাখেন। সুতরাং হানসির প্রাসাদে একটি নির্মম রায় শোনা গেল। শোনা গেল সিকেন্দর তাঁর বার্ধক্যের সর্বস্বপ্রায়—সোফিয়াকে প্রাসাদ ছাড়তে হুকুম দিয়েছেন। কেননা, তাঁর ধারণা—সোফিয়ার অগোচরে তাঁর বোনেদের নিয়ে কিছুতেই জেমসের অন্তঃপুর বিলাস সম্ভব হয়নি। যে নারী বিশ্বাসভঙ্গ করে নিজের স্বার্থে খিড়কির দরজা খোলা রাখতে পারে, সিকেন্দরের প্রাসাদে তাঁর বাস করবার কোনও অধিকার নেই। হানসিতেই সোফিয়াকে বাড়ি দেওয়া হল একটা—সেই সঙ্গে কিছু মাসোহারা,—কাঁদতে কাঁদতে তিনি তাই নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। জীবনে আর কোনওদিন সিকেন্দরের অন্তঃপুরে ফেরা হয়নি তাঁর! অথচ আশ্চর্য এই স্কিনারের এই অন্তঃপুরে খিড়কির দরজাই ছিল একমাত্র প্রবেশদ্বার। একটি মেয়েকেও বিয়ে করেননি তিনি।

ফলে জেমস কেন, বিরাশিজন এসে সারি দিয়ে দাঁড়ালেও আইনের চোখে কোনও পুত্র সন্তান ছিল না তাঁর। স্কিনার সেটা জানতেন। জানতেন বলেই পাঁচজনকে তিনি কাগজ-পত্রে নিজের উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে গেছেন। জেমস তাদের দ্বিতীয়। প্রথম—জোসেফ, দ্বিতীয়—জেমস, তৃতীয়—হারকিউলিস, চতুর্থ—অ্যালেক, পঞ্চম—আলেকজান্ডার। এ ছাড়াও কাগজে-পত্রে দুটি মেয়ের কথা আছে তাঁর। একজনের নাম এলিজাবেথ, আর একজনের নাম—লুইসা। বাবা তাঁদের দুজনকেই বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। উইলে আর তাই তাঁদের কথা ছিল না।

ছেলেদের মধ্যে বড় ছেলে জোসেফ ছিলেন সমসাময়িকদের মতে যথার্থ নবাবপুত্র। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি পোশাক, তেমনি চাল-চলন। ক্লারেট রংয়ের ট্রাউজার্স, পেটেন্ট লেদারের বুট, সবুজ কোট, সাদা নেকটাই, সোনার বোতাম—জোসেফ তখন দিল্লিতে রীতিমতো একজন 'সাহেব'। জনৈক ইংরেজ ললনা লিখছেন—কে বলবে এই ছেলেটি কখনও হিন্দুস্থানের বাইরে পা দেয়নি,—কথার ফাঁকে ফাঁকে হাতের সোনা বাঁধান মালাক্কা ছড়িটা দিয়ে অনবরতই সে বুটটায় টোকা দিচ্ছে!

দ্বিতীয় ছেলে জেমসের কথা আগেই বলা হয়েছে। বাবার শাসন যেমন সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছে সে, তেমনি বাবার স্নেহও পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। রাজধানী ছেড়ে অন্য কোনও দরবারে গেলে সিকেন্দর সঙ্গে নিতেন তাঁকেই। তৃতীয় পুত্র হারকিউলিসকে পুরো সাহেব করার বাসনায় সিকেন্দর পাঠিয়েছিলেন বিলেতে। সেখানেই তিনি বিয়ে করেন। ফিরে এসে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। চতুর্থ অ্যালেক বাদশাজাদার মতো ঘুরে বেড়াতেন। পঞ্চম আলেকজান্ডার ছিলেন সাক্ষাৎ নবাব,—দ্বিতীয় সিকেন্দর। নানা দিক থেকে তিনিই বাবার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আলেকজান্ডারের পোশাক ছিল মুসলমানী, সংসার—আধা হিন্দুস্থানী, আধা ইউরোপিয়ান। মেয়ে লিনার জন্যে তিনি একটা সোনার কাজ করা খাট গড়িয়েছিলেন, সেটা দোলনার মতো ঝুলান থাকত,—লিনা তাতে ঘুমাত,—দুজন সহচরী তা রাতভর দোলাত!

অন্যান্য বিষয়েও বিলাসী ছিলেন আলেকজান্ডার। বিশেষ পিতার মতোই জেনানাদের সম্পর্কে

আন্তরিক উৎসাহ ছিল তাঁর। শোনা যায়, প্রিন্স অব ওয়েলস দিল্লি আসার পর আলেকজান্ডার নেমন্তন্ন করেছিলেন তাঁকে! প্রিন্স আলেকজান্ডারকে একটি আংটি উপহার দিয়েছিলেন, দিয়ে বলেছিলেন—কার জন্যে নিশ্চয় তা বুঝতে পারছ, মেয়েটির প্রতি বিশ্বস্ত থেকো, সমাজ-সম্মত আচরণ করো!

আলেকজান্ডার তখন দিল্লিতে একটি বাইজি নিয়ে ঘর করছেন। দিল্লিরই কোনও নাচের আসরে মেয়েটি প্রথম চোখে পড়ে তাঁর। সেই রাত্তিরেই নাচ শেষে আলেকজান্ডার গোপনে তাঁকে তুলে নিয়ে আসেন নিজের ঘরে। প্রিন্স অব ওয়েলস হিন্দুস্থানি সন্ত ছিলেন না,—তবুও তিনি নাকি ব্যথিত হয়েছিলেন, আলেকজান্ডারকে বন্দিনীর সম্পর্কে সদয় হতে বলেছিলেন। আলেকজান্ডার হয়েও ছিলেন। বিয়ে না করলেও মেয়েটির নাম দিয়েছিলেন তিনি অ্যান, এবং আটটি সন্তান দিয়ে ভূষিত করেছিলেন তাকে!

বিরাশিজন এসে কান্নাকাটি জুড়লেও উইলে সিকেন্দার এই পাঁচ সন্তানকেই তাঁর সর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম শর্ত ছিল—ছেলেরা কেউ জমিজমা ভাগ করতে পারবে না—হিন্দুস্থানী গেরস্থদের যেমন থাকে, সম্পত্তি তেমনি অখণ্ডই থাকবে—পাঁচ ভাই মিলে ভোগ করবে। আলেকজান্ডার বাবার সেই পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনকালে পাতিয়ালা রাজ্যের মাপের সিকেন্দরের রাজত্ব অখণ্ডই ছিল,—দিল্লি, হানসি, বুন্দেলশর এবং বিলাসপুরে প্রাসাদ চারটিও আপন আপন জায়গায় স্থির ছিল। কিন্তু আলেকজান্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প শুরু হল। কোর্টে নোটিশ পড়ল। প্রথম সেখানে গিয়ে যিনি দাঁড়ালেন—জেমসের কন্যা—সেই সোফিয়ার বোন ফেনি বার্লোর মেয়ে! তাঁর শাবলের ঘায়ে হানসির প্রাচীন প্রাসাদে চিড় ধরল! চারদিকের গাঁ আর শহর থেকে দলে দলে বঞ্চিত 'উত্তরাধিকারীরা' এসে আদালতে ভিড় জমাল। দেখতে দেখতে বিস্তীর্ণ রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেল, প্রাসাদ বিবর্ণ হয়ে এল এবং একদা হানসির যে প্রাসাদে নাসির-উদ্দৌলা কর্নেল জেমস স্কিনার বাহাদুর গালিব জং দরবারে বসতেন,—যেখানে প্রতিদিন ভোরে বর্শা শীর্ষে নিজেদের পতাকা উড়িয়ে সিকেন্দরের ঘোড়সওয়ার বাহিনী তাদের অধিনায়ককে সালাম জানাত, যেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় অপ্সরীর হাট বসত, নূপুর নিক্কনে ভোর অবধি রাত্রি জেগে থাকত—দেখতে দেখতে সেই প্রাসাদ নিশাচর পাখির আস্তানায় পরিণত হল। হয়তো আশেপাশের গাঁয়ে এখনও সিকেন্দর বেঁচে আছেন—কোনও ভারতীয় চাষীর রক্তে, কোনও কারিগরের সবল হাতে,—কোনও দরিদ্র রমণীর দেহের বর্ণে। কিন্তু তারা নিজেরাও হয়তো আজ তা জানে না। সিকেন্দর তাঁদের কাছে কোনও এক শ্বেতাঙ্গ-বাদশার নামমাত্র। এমন বাদশা যিনি তাদের সঙ্গে মিশতেন, যিনি তাঁদের ঘরে বসতেন,—তাঁদের ভালবাসতেন। কটি ভাঙা বাড়ি, কিছু স্খলিত ইঁট কাঠ বরগা, একটি ভাঙা টমটম—কটি থাম—আর দাওয়ায় উপকথার মতো সেই অদেখা যুগের কিছু কাহিনী,—কটি ছড়া, কিছু গান, কটি রূপক তাদের কাছে সেই তো সিকেন্দর।

এছাড়া সিকেন্দর সাহেবের অবশেষ আর যা খুঁজে পাওয়া যায়—তা ভারতে এবং বিলেতে কটি সাধারণ মানুষ—একটি আমের আচারের পাত্র, আর একটি—চামচের কাহিনী।

যতদিন বেঁচেছিলেন, কি হানসি, কি দিল্লি, কি বিলাসপুর—স্কিনারের খাওয়ার টেবিলে প্রতিদিন একটি চামচ দেখা যেত। সোনার নয় রূপোর নয়—একটি পিতলের চামচ। ঈশুরীর হাতের আমের চাটনির মতো স্কিনারের টেবিলে এই চামচ ছিল অপরিহার্য। খেতে বসে যদি হাতের কাছে সিকেন্দর সেটি না পেতেন—তবে ভোজসভা সেদিন পণ্ড—অজ্ঞাত আক্রোশে বালকের মতো সব লন্ডভন্ড করে উঠে যেতেন জেনারেল। অতিথিরা ভেবে পেতেন না, সামান্য একটা পিতলের চামচ নিয়ে বৃদ্ধ বাদশার কেন এমন বায়না!

সেদিন সেই রহস্যভেদ সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ সে ইতিবৃত্ত সুজ্ঞাত, অনেকেরই জানা। যাঁরা অষ্টাদশ শতকের ভারতে বিখ্যাত ইংরেজ অভিযাত্রী সিকেন্দরকে চেনেন, তাঁরা জানেন—এই

চামচের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তাঁর বিচিত্র জীবন ইতিহাস।

দিল্লিতে তখন জরাগ্রস্ত মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিমপর্ব, দক্ষিণে সিন্ধিয়ার যৌবন,—কলকাতায় কোম্পানির কৈশোর। সে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদের কথা। কলকাতার পথে পথে তখন ঘুরে বেড়াত একটি ফিরিঙ্গি যুবক। এমন অসহায় ফিরিঙ্গি নেটিভেরা কম দেখেছে। কখনও কখনও সে তাদের কাছেও হাত পাতে। তাদের মোট বয়,—ফাই-ফরমাস খাটে। কথাবার্তায় যতখানি বোঝা যায় মনে হয়—তার কেউ নেই। পকেটে চার আনা পয়সা মাত্র সম্বল তার।

হঠাৎ একদিন নেটিভদের বাজার থেকে জনাকয় সাহেব এসে ধরে নিয়ে গেল ওকে। নেটিভেরা বুঝতেই পারেনা কী ব্যাপার। কেউ ভাবল চোর, কেউ ভাবল ডাকু, কেউ ভাবল পলাতক সেপাই। কিন্তু কেউ ভাবেনি এই ছেলেটিই একদিন 'বাদশা' হবে, তার নামে হাজার হাজার নেটিভের মুখে জয়ধ্বনি উঠবে।

জেমস নিজেও তা ভাবেনি। কেউ ভাবে না। সেই এলোমেলো যুগে কেউ নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে পারত না। বাবা পাঠিয়েছিলেন ওঁকে কলকাতায় একটা ছাপাখানায় শিক্ষানবীশ করে। কথা ছিল সাত বছর সে সেখানে কাজ শিখবে। কিন্তু তিন দিনও ডালহৌসি স্কোয়ারের সেই ছাপাখানা ধরে রাখতে পারল না ওকে। পকেটে চার আনা ছিল তাই নিয়ে জেমস ডালহৌসি স্কোয়ার ছেড়ে নেটিভপাড়ার দিকে পা বাড়াল। মনে মনে বাসনা, কিছু রোজগার হলেই খিদিরপুর চলে যাবে,—জলে ভাসবে নয়তো কিছুই যদি না হয়, তবে ডুবে মরবে।

কিন্তু তার আগেই সব গোলমাল হয়ে গেল। কে বা কারা এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল।

অবশেষে ওরা যেখানে এসে বগী গাড়িটা থামাল, জেমস অবাক হয়ে দেখল সেখানে দাঁড়িয়ে তার দিদি, —মার্গারেট! মার্গারেট ওর মেজদি। আরও দুই বোন ছিল তার, মেরি এবং জেন। দুজন ভাইও ছিল। ডেভিড এবং রবার্ট। ডেভিড নাবিক, রবার্ট এখনও বালক মাত্র। মার্গারেট কলকাতায় থাকেন তা তার জানা ছিল, ঠিকানাটাও অজানা ছিল না। কিন্তু কী করে দিদি বাজারের ভিড় থেকে ধরিয়ে আনল তাকে জেমস কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারল না।

স্নান সেরে নতুন পোশাকে খাবার টেবিলে বসে তা জানা গেল। দিদির বাড়ির খিদমদগারটি তাঁর বাপের বাড়ির। জেমসকে সে চেনে। আগের দিন মেমসাহেবের বাজার করতে গিয়ে—সেই খবর এনেছিল পলাতক জেমস-এর।

যাহোক ভগ্নীপতি এবার জেমস-এর দায়িত্ব নিলেন। তিনি ওকে নিজের আপিসে কপি করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। জেমস তখন মাতৃহীন অনাথ বালক। তার অভিভাবক—উইলিয়ম বার্ন নামে বাবার এক বন্ধু, তিনিই জেমস-এর ধর্ম-পিতা। বার্ন সৈন্যবাহিনীতে কাজ করেন, বেনারসে থাকেন। ভগ্নিপতি টেম্পলটন বালকের মতিগতি দেখে তাঁকেও খবর পাঠালেন।

এদিকে জেমস উকিলের কাগজ নকল করে,—আর মনে মনে পালাবার ফন্দি আঁটে। মতলব যখন প্রায় সিদ্ধান্তে এসে ঠেকেছে, এমন সময় বেনারস থেকে এসে পৌঁছলেন বার্ন। জেমসকে তিনি পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—সত্যি করে বল, তোমার মতলব কী, তুমি কী হতে চাও?

তৎক্ষণাৎ উত্তর হল—লড়িয়ে—এ সোলজার!

বেশ, তবে তাই হবে!

বার্ন ওকে তিনশো টাকা দিলেন। বললেন—তুমি কানপুরে চলে যাও। এখানে তোমার কিছু হবে না। তোমার বাবার কাছে যাও। গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি আসছি,—তারপর ব্যবস্থা একটা হবে নিশ্চয়ই।

—এখানে হবে না কেন?

কলকাতা কোম্পানির রাজধানী। জেমস তাই ভেবে উঠতে পারে না। এখানে কেন তার কোনও

সম্ভাবনা নেই। তার শরীর ভাল,—লেখাপড়ায়ও সে মন্দ ছিল না, তার উপর গভর্নর জেনারেল, ফোর্ট, এখানেই তো সব।

শুধু এখানে নয়, কানপুরেও হবে না। তরুণের কাছে অতঃপর সত্যটা স্পষ্টভাবেই বলতে মনস্থ করলেন বার্ন,—কারণ, তুমি বোধ হয় জান, তোমরা ফিরিঙ্গি,—হাফ-কাস্ট!

তরুণের চেতনায় যেন চাবুকের ঘা পড়ল। গভীর একটা কালো দাগ তার কলজেটাকে ঘিরে চিরকালের মতো একটা বৃত্ত এঁকে দিল। স্কিনার জানলেন—তিনি পুরো সাহেব নন, —কোম্পানির সিপাইদের জমকালো কোর্তাটা মুহূর্তে তার মন থেকে উধাও হয়ে গেল,—মনে পড়ল মায়ের কথা। কালো দাগটা যেন আবার সোনালি হয়ে উঠল।

সদ্য-আবিষ্কৃত আত্ম-জীবনীটিতে তিনি ফার্সিতে লিখছেন: আমার বাবা ছিলেন কোম্পানির কর্মচারি। আদি নিবাস ছিল তাঁর স্কটল্যান্ডে। আমার মা ছিলেন রাজপুতানী, বাজীপুরের জায়গিরদারের মেয়ে। চৈৎ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি কোম্পানির সিপাইদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। আমার বাবাও তখন সিপাই। তিনি তাঁর হাতেই পড়েছিলেন। বাবা অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁকে নিয়ে ঘর পেতেছিলেন। আমি, আমার দুই ভাই, তিন বোন, আমরা তাঁরই ছেলেমেয়ে।

স্কিনারের জন্ম তাঁর নিজের হিসেবে ১৭৭৮ সাল, এবং তাঁর মায়ের মৃত্যু ১৭৯০ সালে। তিনি লিখছেন: আমার মা স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি, তিনি স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী হয়েছিলেন। বাবা ঠিক করলেন—আমার বোনদের লেখাপড়া শেখাবেন, তিনি তাদের স্কুলে পাঠাবেন। শুনে মা আপত্তি জানালেন। রাজপুতানীর মেয়ে কখনও অন্দর ছেড়ে বাইরে যায় না—এই ছিল তাঁর বক্তব্য, তিনি বেঁচে থাকতে কিছুতেই সে অঘটন হতে পারে না। বাবা তবুও নাছোড়বান্দা। সুতরাং বাধ্য হয়েই অবশেষে মা আত্মহত্যা করলেন,—মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার আগে তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা মাতৃহীন ছেলেমেয়েরা কেউ অনাথ আশ্রমে, কেউ চ্যারিটি স্কুলে প্রেরিত হলাম।

সেই স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করেই স্কিনার কলকাতায় এসেছিলেন। এবার চললেন—কানপুরে, বাবার কাছে। কলকাতায় ঠাঁই না মিললেও যদি স্বপ্নটা পূর্ণ হয়, কোথাও সৈনিক হওয়া যায়!

কানপুরে বাবা হারকিউলিস স্কিনার তখনও একজন সামান্য সৈনিক। ১৭৭৩ সাল থেকে সৈন্যবাহিনীতে আছেন তিনি, কিন্তু বিশেষ কোনও পদোন্নতি হয়নি তাঁর। তখনও তিনি লেফটেন্যান্ট। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে বটে, কিন্তু এখনও তাঁর অভাবের সংসার। ছোট ছেলেকে মাসে মাসে তিরিশ টাকা পড়ার খরচ জোগানও তাঁর কাছে দায়। ছেলের বাসনা শুনে তাই তিনি সানন্দে মাথা নাড়লেন। কিন্তু কোথায় যাবে স্কিনার, কার বাহিনীতে? তিনি নিজে সৈনিক হয়েছেন ভাইয়ের জোরে। ভাই জেমস ৬ নং নেটিভ ইনফেন্ট্রিতে ক্যাপ্টেন ছিলেন, তাঁরই চেষ্টায় হারকিউলিস এদেশে এসেছেন, কোম্পানির ফৌজে চাকুরি পেয়েছেন। কিন্তু এখন দুয়ার বন্ধ। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কোনও পথ নেই সরকারি চাকুরি পাবার। অথচ, পিতা হয়ে তিনি কী করে অস্বীকার করবেন তাঁর পুত্র জেমস—হাফ-কাস্ট—ফিরিঙ্গি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। এক যদি জেমস এখন কোনও দিশি নবাব বা রাজার ফৌজে যোগ দেয়!

—আমি তাই দেব! জেমস নির্দ্বিধায় ঘোষণা করল। কলকাতায় সেই চাবুকের ঘা-টা তার কলজেয় বসে গেছে, মায়ের কথা মনে পড়ছে,—দরকার হয় এ-দেশের মারাঠা রাজপুতদের সঙ্গে মিশে সে কোম্পানির সঙ্গেও লড়বে,—প্রতিশোধ নেবে!

বাবা আপত্তি করতে পারলেন না। ছেলের হাতে তিনি তুলে দিলেন একটি ঘোড়া, কিছু অর্থ, আর নিজের একখানা তলোয়ার। ততদিনে বার্নও কলকাতা থেকে কানপুরে এসে মিলিত হয়েছেন। তিনি জেমসের পকেটে গুঁজে দিলেন, খামেভরা একটি চিঠি। জেমস সেই তলোয়ার কোমরে বেঁধে

লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। তারপর চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে কানপুর থেকে—কয়েল-এর দিকে ঘোড়া ছোটালেন। কেউ জানল না, যাওয়ার আগে পাগলা ছেলেটা মায়ের ঘর থেকে কী একটা অমূল্য বস্তু সঙ্গে নিয়ে ঘর ছাড়ল! ইতিহাসে শুধু আছে, আলিগড়ের অদূরে সিন্ধিয়ার দুর্ধর্ষ ফরাসি সেনাপতি বেনোয়া দ্য বোয়াঁর ছাউনিতে এসে স্কিনার মারাঠা বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই ক্রমে একদিন তিনি বিখ্যাত সিকেন্দর সাহেব হয়েছিলেন।

মাসে দেড়শো টাকার সামান্য সৈনিক থেকে হাজার হাজার প্রজার প্রভু—সিকেন্দর,—স্কিনারের উত্থানপথটা শুধু দীর্ঘ নয়, অত্যন্ত বন্ধুর, রক্তাক্ত। সে কাহিনী শুনতে হলে সেদিনের উত্তর এবং মধ্যভারতের প্রতিটি লড়াইয়ের মাঠে ঘুরে বেড়াতে হবে আমাদের। সংক্ষেপে বললেও সে অনেক কথা। তার চেয়ে এটুকু শুনে রাখা ভাল ১৮০৩ সাল পর্যন্ত দুর্ধর্ষ ফিরিঙ্গি, লড়িয়ে স্কিনার ছিলেন প্রথমে সিন্ধিয়ার সেনাপতি দ্য বোয়াঁ এবং পরে পেঁর-র অন্যতম অনুচর। সাকুল্যে আটবছর ছিলেন তিনি মারাঠা বাহিনীতে। সে সময়ে এমন কোনও যুদ্ধ হয়নি যাতে তাঁর প্রিয় বর্শাটি হাতে বেপরোয়া স্কিনারকে দেখা যায়নি। ১৮০৩ সালে ফরাসি সেনাপতি পেঁর মারাঠা বাহিনী থেকে সমুদয় ইংরেজদের ছাঁটাই করার পর স্কিনার তাঁর অনুচরদের নিয়ে যোগ দিলেন ব্রিটিশ বাহিনীতে। কোম্পানি তখন স্কিনারকে চিনেছে, তাঁর তলোয়ারের ধার তাদের চোখে পড়েছে। স্কিনার খাতায় নাম লেখাবার আগে জানালেন—তাঁর দুটি শর্ত আছে। কোম্পানি যদি তা মেনে নেয় তবেই তিনি যোগ দিতে রাজি,—নয়তো নয়। কী শর্ত? ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ জানতে চাইলেন। প্রথম শর্ত,—আমার সঙ্গে সঙ্গে যে সব হিন্দুস্থানী সেপাই মারাঠাবাহিনী ত্যাগ করেছে, তাদের কোম্পানির ফৌজে নিতে হবে, দ্বিতীয় শর্ত—কোনও অবস্থাতেই সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে বলা চলবে না আমাকে।

কোম্পোনি কর্তৃপক্ষ সবিস্ময়ে তরুণটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁরা ভাবতেও পারেননি, বিতাড়িত কোনও সৈনিক তাঁর পূর্বতন মনিবের প্রতি এমন বিশ্বস্ততা দেখাতে পারে! স্কিনার গ্রাম্য ভারতীয়ের মতো বলেছিলেন—ভুলে গেলে চলবে কেন বন্ধু,—আমার পেটে সিন্ধিয়ার নিমক!

কোম্পানির প্রধান সেনাপতি তখন জেনারেল লেক। তিনি নিজে যোদ্ধা ছিলেন, যোদ্ধার মুখের ভাষার অর্থ জানতেন। স্কিনারকে তিনি বুকে টেনে নিলেন। ভারতের সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে নতুন একটি বাহিনীর জন্ম হল। ঘোড়সওয়ারদের বেপরোয়া সেই বাহিনীর নাম—'ক্যাপ্টেন স্কিনার্স কোর অব ইররেগুলার ক্যাভেলরি।' তাদের প্রিয় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যে দু হাজার হিন্দুস্থানী যোদ্ধা মারাঠাবাহিনী ছেড়ে এসেছিল তারাই এ বাহিনীর সৈনিক,—স্কিনার অধিনায়ক, সেনাপতি।

নবীন উৎসাহে তরুণ সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের বাহিনী সাজাতে লেগে গেলেন। সৈন্যদের গায়ে এতকাল ছিল সিন্ধিয়ার সবুজ কোর্তা। সেটি বাতিল হয়ে গেল। তার জায়গায় এল ত্যাগের প্রতীক—হলুদ কোট। শৌর্যের প্রতীক লাল পাগড়ি। স্কিনারের অনুচরেরা এই নতুন যুদ্ধ সাজে সেজে তাদের অধিনায়কের সামনে এসে দাঁড়াল। এখন থেকে ইতিহাসে নতুন পরিচয় তাদের, তারা—'ইয়োলো বয়।'

'ইয়োলো বয়'দের পতাকায়ও স্কিনার নিজের স্বপ্ন এঁকে দিলেন। তার প্রতীক হিসেবে তিনি গ্রহণ করলেন নিজের বংশ-প্রতীক স্কিনারদের রক্তমাখা হাত। এই হাতটি উল্কি হয়েও তাঁর পেটে মুদ্রিত হল। উদ্দেশ্য: দেহ থেকে মুণ্ডুটা যদি কখনও কারও তলোয়ারের ঘায়ে ছিন্ন হয়ে যায়, তবুও অনুরাগীরা শবটা চিনবে, এ লড়িয়ে যে হারকিউলিস স্কিনারের ছেলে জেমস তা জানতে পারবে! পরবর্তী কালে বাহিনীর পতাকা হিসেবে স্কিনার গ্রহণ করেছিলেন সম্পূর্ণ এ দেশীয় প্রতীক। হলুদ কাপড়ের সেই নিশানে আড়াআড়ি দুটি তলোয়ারের নীচে লেখা ছিল—'হিম্মৎ মর্দ্দন মুদ্দৎ খোদা!'—'গড হেলপস দোজ হু হেলপ দেমসেলভস!'—ঈশ্বর কেবলমাত্র তাদেরই সহায়, যারা নিজেদের সহায়।

মনে মনে এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই স্কিনার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ১৮০৩ সাল থেকে '৩৩ সাল অবধি বিখ্যাত 'ইয়োলো বয়'দের তিনিই ছিলেন অধিনায়ক। কখনও দল তাঁর ভেঙে গেছে, কখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গৃহস্থবেশে স্কিনার ফিরে গেছেন লোকালয়ে। জমি কিনেছেন, কলকাতার এজেন্সি হৌসে টাকা খাটাবার চেষ্টা করেছেন, নীল ভুঁইয়া হয়েছেন—কিন্তু আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ডাক পড়েছে তাঁর। সরকার যখনই বিপাকে পড়েছেন তখনই খবর এসেছে—স্কিনার তৈয়ার!

মারাঠা যুদ্ধের পর ১৮০৬ সালে কর্নওয়ালিশ-এর নব-বিধানে স্কিনার বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন। কজন সৈন্যকে রেখে বাহিনীর আর সবাইকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল। স্কিনারের জন্যে ধার্য হয়েছিল কুড়ি হাজার টাকার জায়গির! কিন্তু ব্রিটিশ প্রজা বলে তাও শেষ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হল। পরিবর্তে ধার্য হল কর্নেলের প্রাপ্য পেন্সন,— মাত্র তিনশো টাকার মাসোহারা! নিশ্চয় স্কিনার সেদিন মনে মনে হেসেছিলেন। কারণ,—হানসিতে এবং আলিগড়ে ততদিনে তাঁর জায়গির ছোটখাটো একটা রাজ্যের আকার নিতে চলেছে,—গুটিকয় নীলের ফ্যাক্টরির মালিকানা হাতে এসেছে এবং কলকাতার হৌসে হৌসে দাদনি টাকার অঙ্ক প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।

রণজিৎ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনায় ১৮০৯ সালে আবার ডাক পড়ল স্কিনার এবং তাঁর 'ইয়োলো বয়'দের। পরবর্তী দশ বছরে স্কিনারই ছিলেন গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্তী এলাকায় ইংরেজের হাতে প্রধান হাতিয়ার। ১৮১৪ সালে তাঁর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল তিন হাজার। ইংরেজের হয়ে গোর্খাদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন স্কিনার, তারপর পিন্ডারীদের সঙ্গে। কর্নেল স্কিনার তখন রাজ্যে রাজ্যে ছাউনিতে ছাউনিতে রীতিমতো একটি নাম। তাঁর 'ইয়োলো বয়'রা যে কোনও শত্রু শিবিরে বিভীষিকা। সূচনায় যা ছিল 'ক্যাপ্টেন স্কিনার্স' কোর অব ইররেগুলার ক্যাভেলরি'— ততদিনে মুখে মুখে নাম হয়ে গেছে তার 'স্কিনার্স হর্স' এবং তার অধিনায়ক বিপুলদেহী তীক্ষ্ণধী স্কিনারের নাম হয়েছে—সিকেন্দর। ই-স-কিনার থেকে মুখে মুখে ...বিজয়ী 'সিকেন্দর'।

অনেক যুদ্ধ করেছেন স্কিনার। সম্মানও পেয়েছেন অনেক। প্রধান সেনাপতি লেক তাঁকে নিজের তলোয়ার উপহার দিয়েছেন, তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল-এর পদগৌরবে ভূষিত হয়েছেন, 'কম্পেনিয়ান অব দি অর্ডার অব দি বাথ' মনোনীত হয়েছেন,—তিনি গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের সঙ্গে তাঁর সহচর হিসেবে রণজিৎ সিংহের দরবার পরিদর্শন করেছেন, রাজস্থান ভ্রমণ করেছেন,— কলকাতার কোনও এক ছাপাখানার জনৈক পলাতক বালক মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে লেক মিন্টো হেস্টিংস ডালহৌসি বেন্টিঙ্ক ইত্যাদি বিখ্যাত নামগুলোর মুখে মুখে ঘুরেছেন; প্রিন্সেপ, মেটকাফ, আক্টরলনি, ম্যালকম, ফ্রেজার, এলফিনস্টোন—প্রভৃতির সঙ্গে সমান হয়ে বসে আড্ডা দিয়েছেন; তাঁর নামে আজও ভারতীয় বাহিনীর বিখ্যাত 'স্কিনার্স হর্স!' স্কিনার শুধু 'বাদশা' ছিলেন না,—সরকারি ইতিহাসে তাঁর পরিচয় প্রথমত সেনাপতি হিসেবেই।

ইংরেজের আশা পূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৯ সালে 'স্কীনার্স হর্স' আবার ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। স্কিনারকে বলা হয়েছিল—আপাতত যুদ্ধ ক্ষান্ত, তুমি বড়জোর তিন ভাগের এক ভাগ সৈন্য হাতে রাখতে পার। তিন বছর পরে আবার ছাঁটাইয়ের হুকুম জারি হল। লক্ষণ দেখে মনে হয়েছিল— স্কিনার্স হর্স-এর ইতিহাস হয়তো সেখানেই শেষ। কিন্তু অধিকৃত রাজ্যসমূহে আবার চাঞ্চল্য দেখা দিল, ফলে ১৮১২ সালে 'স্কিনার্স হর্স'-এর কথা উঠল। '৩১ সালে আবার। অবশ্য সেবার তাঁর বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ষাটজন। '৪২ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত স্থানীয় পুলিস বাহিনীর মতো ছোট্ট সেই বাহিনীটিরই অধিনায়ক ছিলেন—এককালের বিখ্যাত কর্নেল,—সিকেন্দর সাহেব! কিন্তু বাহিনীটি আয়তনে ছোট হলেও যে ঐতিহ্যে তা ছিল না, তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে স্কিনার্স হর্সের পরবর্তী ইতিহাস শুনলে।

স্কিনারের মৃত্যুর পরে আফগান যুদ্ধ উপলক্ষে নতুন করে আবার 'স্কিনার্স হর্স' প্রসঙ্গ উত্থিত হয়।

পুরনো বাহিনীটির নাম দেওয়া হয় 'বেঙ্গল ইররেগুলার ক্যাভেলরি'। ক্রমে নামের আগে থেকে সিকেন্দরের স্বাধীন জমানার প্রতীক 'ইররেগুলার' কথাটা বাদ দেওয়া হল এবং স্কিনার্স হর্স-এর দুটি রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত হল ১ নং বেঙ্গল ক্যাভেলরি এবং ৩ নং বেঙ্গল ক্যাভেলরি। পরবর্তী কালে আবার নাম বদল হল তাদের। তৎকালে ওদের নতুন নাম 'ডিউক অব ইয়র্কস ওন স্কিনার্স হর্স।' যতদূর জানি, আজ স্বাধীন, ইংরেজহীন ভারতেও বেঁচে আছে এই অশ্বারোহী বাহিনীটি এবং ডিউক অব ইয়র্ক বাতিল হয়ে গেলেও এখনও সেই বাহিনীর হিন্দুস্থানী জওয়ানদের মুখে মুখে বেঁচে আছেন সৈনিক সিকেন্দর। কেননা, সেই ঐতিহাসিক বাহিনীটির নাম আজ শুধুই—স্কিনার্স হর্স। ১৯৫৩ সালে সাড়ম্বরে ভারতে ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়ে গেছে তার। সে অনুষ্ঠানে হানসি থেকে জওয়ানদের হাতে এসেছিল একটি অপ্রত্যাশিত উপহার। সেটি ফার্সিতে লেখা সিকেন্দরের সেই বিখ্যাত 'আত্মকথা'।

শোনা যায়, ১৯১১ সালে স্কিনারের দৌহিত্র রবার্ট (Robert Hercules Skinner) দিল্লির দরবার উপলক্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন এটি। সে বাসনায় একটি যোগ্য আধার তৈরির জন্যে দিল্লির বিখ্যাত এক সোনাকারিগরের কাছে পাঠানো হয় পান্ডুলিপিটি। ওঁরা দরবারের আগে তা আর করে উঠতে পারেননি। ফলে পঞ্চম জর্জ আর তা হাতে পাননি। তাতে রবার্টের মন খারাপ হয়েছিল হয়তো, কিন্তু লাভ হয়েছে ভারতীয় ফৌজের, একশো পঞ্চাশ বছর পরে তারা বহুশ্রুত লড়িয়ে সিকেন্দরের আপন-কথাটি আজ হাতে পেয়েছে এবং বলতে গেলে প্রায় নিজেদেরই ভাষায়। অবশ্য শুধু বাহিনীর নাম আর এই সোনার জলে সাজ পরানো ফার্সি পুঁথিটিই নয়—সিকেন্দর আজ বেঁচে আছেন তাদের অধিনায়কের আচরণে, অবয়বে। শোনা যায়, ভারতীয় বাহিনী স্কিনার্স হর্স-এর পুরোভাগে আজ যে ভারতীয় তরুণটি, নাম তাঁর—লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাইকেল স্কিনার। এবং তিনি সিকেন্দরেরই—গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড সন! ইতিপূর্বে বংশের আরও একজন এ গৌরব পেয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘ ১১৯ বছর পরে (১৯৬০ সালে) আবার সিকেন্দরের আপন বাহিনীতে ফিরে এসেছেন—তাঁর আপন বংশের সন্তান!—সিকেন্দর কি তবুও ইতিহাস?

প্রায় দুশো বছর পরে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ভারতের কানে হয়তো আজ এই যোগাযোগটা নেহাৎ কাকতালীয় শোনাত, —অনেক ক্যাপ্টেন কর্নেলের মতো স্কিনারও আজ নিশ্চয় হারিয়ে যেতেন—কিন্তু হানসিতে, দিল্লিতে, আলিগড়ে, পাঞ্জাবে তবুও যে সিকেন্দর বেঁচে রয়েছেন তার পেছনে রয়েছে সেই আমের চাটনির ভান্ড, আর সেই ছোট হাতিয়ারটি—কানপুর ছেড়ে আসার দিনে রাজপুতানী মায়ের ঘর থেকে যা তিনি চোরের মতো পকেটে পুরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছিলেন। সেটি একটি চামচ। সোনার নয়, রুপোর নয়, সাধারণ একটি পিতলের চামচ। বাবার কাছে স্কিনার শুনেছিলেন—তিনি যখন কোলে তখন তাঁর মা, জনৈক সাধারণ সিপাইয়ের রাজপুতানী বৌ—এই চামচেই তাকে দুধ খাওয়াতেন। আত্মঘাতী মাকে ভালবেসেছিলেন স্কিনার; তাঁর যন্ত্রণাটা তিনি সেই তরুণ বয়সেই জানতেন,—চিরকালের মতো ঘর ছাড়ার সময়ে তাঁর স্মৃতি হিসেবে অতি সঙ্গোপনে তাই পিতলের চামচটা পকেটে পুরেছিলেন।

ঈশুরী আর তার আমের আচার ছিল পরবর্তী কালের বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ অভিযাত্রী স্কিনারের বাদশাহী প্রতীক। তিনি যে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন, এই আমের চাটনির ভাণ্ডটি বোধ হয় তারই একটুকরো প্রমাণ। স্কিনার কোম্পানির ফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে কোনও কোনও ভারতীয় শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেও—দিল্লি আগ্রার প্রজারা তাঁকে ভালবেসেছিল, কারণ যুদ্ধ রাজকীয় ব্যাপার—সাধারণ মানুষ জেনেছিল—হিন্দুস্থানকে ভাল না বাসলে সাহেব কখনও এমন করে তাদের ভালবাসতে পারত না; —এমন করে তাদের কাছে আসতে পারত না।

প্রভূত সম্মান এবং বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েও স্কিনার অর্থ অথবা তলোয়ারের বলে ঘরে

তোলা ঈশুরীকে এমন করে ভালবাসতে পেরেছিলেন, তাকে সাহেবি দরবারেও 'মাই ওল্ড লেডি' বলে পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁর এবং নাম না জানা হিন্দুস্থানী মেয়েদের সন্তানদের নিজের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি দিয়ে যেতে পেরেছিলেন—কারণ ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার পরও সিকেন্দর সেই চামচটি পকেটে রাখতেন।

হানসি, বুন্দেলশর অথবা দিল্লি ভোজের আয়োজনটা যেখানেই হোক না কেন,—স্কিনারের খাওয়ার টেবিলে সেই পেতলের চামচটা বরাবর অবশ্য ছিল। সোনা রুপোর ভিড়ে পেতল বলেই সেটি সকলের আগে চোখে পড়ত। সিকেন্দরের মায়ের কথা মনে পড়ত,—মনে পড়ত ছেলেদের মাসে তিরিশ টাকা দিতে গিয়ে বাবার কষ্টের কথা,—তাঁর আপন কুলের কথা, হিন্দুস্থানের গরিবের কথা। তিনি তাদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতেন, আশপাশের সমুদয় গ্রামের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন—অভিভাবক, 'পিতা'। মাঝে মাঝেই হানসিতে 'ইয়োলো বয়'দের ভোজসভা বসত। সেনানায়কের গাম্ভীর্য এবং পোশাক দুই-ই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সিকেন্দর নিজের হাতে তাদের পরিবেশন করতেন। বলতেন—লজ্জা কী, আমিও সিপাই, আমিও গরিবের বেটা,—খোদার কাছে আমারও পরিচয় খিদমদগার!

বার্ধক্যে সিকেন্দরের জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাত, বন্ধু ফ্রেজারের মৃত্যু। বিখ্যাত শিল্পী জেমস বেইলি ফ্রেজারের ভাই উইলিয়ম ফ্রেজার (১৭৮৪-১৮৩৫)। জেমসের আঁকা হিমালয় ও কলকাতার দৃশ্যাবলী প্রসিদ্ধ। স্কটল্যান্ডের এই পরিবারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘকালের। উইলিয়ামের একাধিক ভাই দেহরক্ষা করেছেন এদেশেরই মাটিতে। উইলিয়াম ছিলেন কোম্পানির কর্মচারী। সামরিক এবং অসামরিক দুই ধরনের দায়িত্বই পালন করছিলেন তিনি। জীবনযাত্রায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন প্রায় ভারতীয়। ভারতীয় বিবি নিয়ে ঘর করতেন তিনি। এদেশের শিল্পীদের দিয়ে স্থানীয় মানুষজনের অনেক ছবি আঁকিয়ে ছিলেন উইলিয়াম ফ্রেজার। সন্দেহ নেই, তিনিও হিন্দুস্থানকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিরোজপুরের নবাব সামসুদ্দিন খুন করেছিলেন ওঁকে। স্কিনার সামসুদ্দিনকে ক্ষমা করেননি। তাঁরই চেষ্টায় ধরা পড়েছিল খুনী। বিচারে যোগ্য সাজাও হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সামসুদ্দিনের প্রাণদণ্ডের পর নিজে প্রাণ ভয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ স্কিনার। প্রতিদিন রাত্রে নাকি হানসি প্রাসাদে তিনি ঘর বদলাতেন। কোথায় ঘুমোবেন—তাঁর অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যও সে খবর রাখত না। রাখলেও পরদিন ভোরে দেখা যেত—তা ভুল। স্কিনার মাঝ-রাত্তিরে আবার ঘর বদল করেছেন।

স্কিনার হিন্দুস্থানকে যে ভুল বুঝেছিলেন—তার প্রমাণ তাঁর মৃত্যু। ১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর রাত সাড়ে আটটায় হানসির প্রাসাদে কর্নেল জেমস স্কিনার, আকস্মিকভাবে ভারতের মাটিতে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তামাম হিন্দুস্থান জানে কোনও হিন্দুস্থানী আততায়ীর ক্রূর ছুরি নয়, কোনও হিন্দুস্থানী ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় নয়—সিকেন্দর মারা গিয়েছিলেন—পেটের ব্যামোয়, অত্যধিক রক্তপাতের ফলে। এবং সেদিন শুধু তাঁর হারেমই গলা ছেড়ে কাঁদেনি—পাতিয়ালার মাপের একটি বিস্তীর্ণ এলাকার নারীপুরুষ, শিশু সবাই চোখের জল ফেলেছিল। সিকেন্দর এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন তারা কেউ তা ভাবেনি।

মৃত্যুর পর হানসিতে কবরস্থ করা হয় তাঁকে। পরের মাসে ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে তাঁর বাসনা অনুযায়ী শবাধার স্থানান্তরিত করা হয় দিল্লিতে, সেন্ট জেমস চার্চে। চার্চের উঠোনে নয়, ভেতরে রাখবে আমাকে। সেখানে যাঁরা আসবেন আমি তাঁদের প্রত্যেকের পদাঘাত চাই।—'সো দ্যাট দে মে ট্রাম্পল অন দ্য চিফ অব সিনার্স!'

হানসি থেকে দিল্লির পথে একটু শোভাযাত্রা দেখা গিয়েছিল সেদিন। অভূতপূর্ব শোভাযাত্রা। আগে একটি কফিন, পিছনে গেরুয়া পোশাকে ঘোড়ার পিঠে হাজার সওয়ারের সারি, তার পিছনে হাজার হাজার প্রজা। দিল্লিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হাজারের সারি অযুতের সাগরে পরিণত হয়।

গোটা শহর যেন সেন্ট জেমস গির্জার অঙ্গনে এসে আছড়ে পড়ল। কোম্পানি তেষট্টি তোপে মৃতকে সম্মান জানাল, পথের মানুষ নয়নের জলে তর্পণ করল। সে দৃশ্য না দেখলে নাকি বোঝা যায় না। ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন—"নো এম্পেরর অব হিন্দুস্থান ওয়াজ এভার ব্রট ইনটু ডেলি ইন সাচ্ স্টেট অ্যাজ সিকেন্দর সাহিব!"

এ সাক্ষ্যটা হয়তো বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু সিকেন্দর যে হিন্দুস্থানের কাছে 'সাহেব'মাত্র ছিলেন না তার প্রমাণ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। গোটা দিল্লি সেদিন তছনছ হয়ে গিয়েছিল। ফিরিঙ্গির কোনও চিহ্নই বাদ ছিল না। কিন্তু সিকেন্দরের সমাধির সামনে এসে ওরা নাকি উদ্ধত হাত নিজেরাই গুটিয়ে নিয়েছিল। কে একজন শুধু মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—'ইয়ে সিকেন্দর সাহেব হ্যায়!' সঙ্গে সঙ্গে চোখের আগুন দপ করে নিভে গিয়েছিল। ওরা মাথা হেঁট করেছিল। সিপাহীরা সেলাম জানিয়ে তবে আগুন হাতে অন্য পথে পা বাড়িয়েছিলেন।

দিল্লির সেন্ট জেমস গির্জা এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে অনেক রাজত্বের কবর, অনেক রাজন্যের স্মৃতিভূমি ইন্দ্রপ্রস্থের পুরোনো মাটিতে; এখনও তেমনি নবযুগের হাতিয়ায় হাতে নিয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ছুটে বেড়ায় 'স্কিনার্স হর্স' নামে একটি অশ্বারোহী বাহিনী।—সমগ্র অর্থে রাজ্য না হলেও ভারতে আজও বেঁচে আছেন—'নাসিরউদ্দৌলা কর্নেল জেমস স্কিনার বাহাদুর গালিব জং'—হানসির সিকেন্দর। কিন্তু উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার বহরমপুরের ফিরিঙ্গি কবরখানা তছনছ করে ফেললেও কোনও নিশানা পাওয়া যাবে না জৌরুজ জং নামে সেই আইরিশ বাদশাটির যিনি সত্যি সত্যিই একদিন স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাজত্বের অধীশ্বর ছিলেন এবং স্কিনার হানসিতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসবার আগে যাঁর সিংহাসন বুকে ধারণ করে হানসি একদিন সত্যিই ছিল রাজধানী! ঠিক তেমনি যদি কেউ আজ খাসগঞ্জের বাদশা 'গার্ডনার-হর্স'-এর বিখ্যাত অধিনায়ক কর্নেল গার্ডনার নামে কাম্বের নবাব বাড়ির জামাতাটির সন্ধানে হিন্দুস্থানের পথে নামেন তবে কেউ সন্ধান দিতে পারবেন না তাঁর। আগ্রায় নিশ্চয় কেউ তাঁকে চিনবেন না, আগ্রা থেকে ষাট মাইল দূরে খাসগঞ্জে যেখানে একদিন তিনি হুঁকোর নল মুখে লাগিয়ে বাদশাহী ঢংয়ে নিজের জায়গিরের খবরাখবর করতেন—দিল্লির বাদশাহদের ঘরের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ চলতে পারে কিনা সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে দুদিন সময় নিতেন—সেখানেও কেউ যে আজ বড় একটা তাঁর খবর বলতে পারবেন, তেমন মনে হয় না। বড়জোর কেউ হয়তো আঙ্গুল তুলবে আরও দূরে, আরও ভেতরে মানোতা নামে একটি গাঁয়ের দিকে। সেখানে গেলে দেখা যাবে—একটি ভাঙা কুটিরের বারান্দায় আধভাঙ্গা একটি খাটিয়ায় বসে আছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর পরনে পাজামা, গায়ে ইংলিশ শার্ট! পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতেই বলবেন তিনি নাম তাঁর—অ্যালান লেজ গার্ডনার। ক্রমে আলাপ হলে জানা যাবে—তিনি একজন লর্ড, ইংলিশ ব্যারন। তবে উপাধিটা সরকারিভাবে এখনও তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। কেন না,—তার জন্য আগ্রা অবধি গেলেই চলবে না, বিলেত যেতে হবে,—তার টাকা কোথায়? এ খবর ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী কালের, বিশ শতকের ষাটের দশকের।

অথচ শুধু টাকা নয়, খাসগঞ্জের গার্ডনার সাহেবের সবই ছিল। অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম। শিরায় নীল রক্ত ধারণ করেই ভারতে নেমেছিলেন উইলিয়াম। উইলিয়াম লিনাউস গার্ডনার। বিখ্যাত লর্ড অ্যালেন গার্ডনার ছিলেন তাঁর খুড়ো কিংবা জ্যাঠা। উইলিয়াম লেখাপড়াও শিখেছিলেন। ভারতে আসার আগে প্যারিসে তিনি ছাত্র ছিলেন। ফলে, বেকারির বদলে তিনি ব্রিটিশ বাহিনীর ক্যাপ্টেনের কোট গায়েই এদেশের মাটিতে নেমেছিলেন। কিন্তু নামামাত্র হিন্দুস্থানের হাওয়া খানদানী ইংরেজের নীল রক্তে ক্রিয়া শুরু করে বসল। তরুণ গার্ডনার বাদশাহী স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। অর্ধেক হোক, সিকি হোক,—রাজত্ব এবং রাজকন্যার ধ্যান তাঁকে পেয়ে বসল। অচিরাৎ তিনি কোম্পানির বাহিনী ত্যাগ করলেন। তারপর যোগ দিলেন হোলকার বাহিনীতে। সেটা ১৭৯৮ সালের কথা।

দিন যায়। গার্ডনার স্বপ্ন দেখেন,—যুদ্ধ করেন, লড়াই শেষে বেঁচে আছেন জানা মাত্র আবার স্বপ্ন দেখেন। অবশেষে একদিন সত্যিই স্বপ্ন যেন পূর্ণ হতে চলল। কাম্বের নবাবের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এক সময় চোখ পড়ল সিংহাসনের পেছনে, দরবারের ওপরে অলিন্দের মতো ঝুলছে যে ঘরটি তার জানালার চিকের ওপর। গার্ডনারের জানা ছিল—দরবারে দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকান রীতি নয়,—বিশেষ ঝারোখায় চোখ দেওয়া নিতান্তই বেয়াদবী। কিন্তু তিনি আজ কাম্বের দরবারে ভিক্ষাপ্রার্থী বিদেশি নন,—শক্তিমান হোলকারের দূত। এখানে এসেছেন তিনি হোলকারেরই নির্দেশে। সুতরাং, গার্ডনার আবার কথা বলতে বলতে অমনোযোগী হয়ে গেলেন, আবার তাঁর চোখ পালিয়ে গেল চিকে। এবার শুধু হরিণের মতো চঞ্চল দুটি চোখ নয়,—যৌবনবতী আবছা একটি নারীদেহের খসড়াও যেন চোখে ঠেকল, যাঁর গড়নে পরিদের আদল।

পরদিন আবার প্রাসাদ, আবার সেই চোখ, সেই স্বপ্ন। তার পরদিন আবার। তৃতীয় দিন লর্ড বংশের সন্তান আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না;—তিনি প্রত্যক্ষই 'নাইট' হয়ে গেলেন। নবাবের কাছে সোজাসুজি প্রস্তাব দিয়ে বসলেন।

হোলকারের দূত, সমর্থ ইংরেজ জওয়ান, তদুপরি বিলেতের খানদানী বংশ। সুতরাং—কথা হল। কথা পাকাও হল। গার্ডনার আশ্বাস নিয়ে বের হতে হতে আবার ফিরে দাঁড়ালেন—মনে রাখবেন নবাব, ওই চোখ। আমাকে যদি অন্য কাউকে দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা করেন তবে সে বৃথাই চেষ্টা!

নবাব সে চেষ্টা করলেন না।

গার্ডনার লিখছেন : বিয়ের পর মুখচন্দ্রিকা। তার আগে কিছুই জানবার উপায় নেই। মনে মনে আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি। ঘোমটা তোলা হল। আর্শিতে তার মুখ। সে হাসল। আমি হাসলাম।

শুধু রাজকন্যা নয়, রাজ্যও এসেছিল একদিন গার্ডনারের ভাগ্যে। নবাবজাদী জহুর-উল-নিসাকে ঘরে আনার পর হোলকারের কাজ আর বেশি দিন করতে পারেননি তিনি। কেননা, হোলকার বদমেজাজী, তাঁর রাজত্বে বাস করে জহুর-উল-নিসার সম্মান রক্ষা সম্ভব ছিল না। একদিন দরবারের কাজে বাইরে গিয়েছেন গার্ডনার। সেদিন আর ফেরা হল না। দরবারের কাজেই রাতটা থেকে যেতে হল তাঁকে। পরদিন ফিরে আসা মাত্র হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন হোলকার—কী পেয়েছ তুমি সাহেব? আজও যদি না ফিরতে, তবে তোমার খানাত আমি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিতাম!' কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গ ছিল। খানাত মানে আস্তানার চারপাশের ক্যানভাসের বেড়াটি, তার ভেতরেই জহুর-উল-নিসা থাকেন। তাঁকে অপমান করা? অ্যাংলো-স্যাক্সন রক্ত দপ করে জ্বলে উঠল, কোমর থেকে এক ঝটকায় তলোয়ার হাতে তুলে নিলেন গার্ডনার,—সাবধান হোলকার! জেনানার মান রক্ষা করে কথা বলো! নয়তো, আজ তোমার এখানেই শেষ!' হোলকার গার্ডনারের এ মূর্তি কখনও দেখেননি। খুনীর মতে ধীর পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে তাঁরই ভৃত্য গার্ডনার। চোখে তাঁর আগুন। প্রাণভয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। পাত্রমিত্র সবাই হতবাক। তাঁরা সকলে মহারাজকে রক্ষার জন্যে তাঁর দিকে ধাওয়া করলেন। হঠাৎ গার্ডনারের জ্ঞান ফিরে এল যেন। তাঁর মনে হল কাজটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মনে পড়ল, হোলকার বদরাগী হলেও হিন্দুস্থানের অন্যতম শক্তিমান নৃপতি, তিনি তাঁর কর্মচারী মাত্র! এ অপরাধের শাস্তি তাঁর অনিবার্য। হোলকার বা তাঁর পারিষদবর্গদের কেউ সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই ভিড় ঠেলে বাইরের দিকে পা বাড়ালেন গার্ডনার। তারপর এক লাফে নিজের ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বসলেন। সেই যে গেলেন, গেলেনই। হোলকার কোনওদিন আর হাতে ফিরে পাননি ওঁকে।

কখনও তাপ্তীর তীরে রাজা অমরত রাওয়ের হাতে বন্দি থেকে কখনও ঘেসুড়ের বেশে বনে বনে ঘুরে ঘুরে, কখনও জয়পুরের দরবারে ফৌজী কাজ করে, কখনও বা ইংরেজের জন্যে ঘোড়সওয়ার বাহিনী সাজিয়ে—অবশেষে সেই পলাতক গার্ডনার যেদিন ঠিকানা নিয়েছেন তখন তিনি আগ্রা প্রদেশে বিখ্যাত সামন্ত। কাম্বের নবাবের হস্তক্ষেপে পলাতক ফিরিঙ্গির পরিবার-পরিজনকে জব্দ

করতে পারেননি হোলকার। জহুর-উল-নিসাকে যথাসময়ে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে আবার বেঁধে নিয়েছিলেন গার্ডনার। এখন তিনি খাসগঞ্জের ফিরিঙ্গি বাদশা গার্ডনারের ঘরে অন্যতম সংবাদ,—পুত্র-কন্যা নিয়ে তাঁর সুখী বেগমের জীবন। গার্ডনারকে পুরোপুরি হিন্দুস্থানী করে ফেলেছেন তিনি, কিন্তু নিজে হয়েছেন মুসলমানীর বেশে ইংরেজি-বিবি যেন—তাঁর চারপাশে আর কোনও সতীনের ঘর নেই। একাকী জহুর-উল-নিসাকে নিয়েই খাসগঞ্জের বাদশার হারেম!

এদিকে কিঞ্চিৎ টান থাকলেও অন্যদিকে পূর্ণ বাদশা ছিলেন গার্ডনার। হাতি-ঘোড়া, সেপাই-সামন্ত জায়গির-খামার—সবই ছিল তাঁর। খাটিয়ায় বসা বৃদ্ধ অ্যালান সাহেবকে দেখলে যে আজ পড়শিদের চোখে জল আসে সে শুধু বিলেতে গেলে তিনি একটা লর্ড হতে পারতেন এ-খবরটা তারা জানে বলেই নয়, অ্যালান সাহেব নিশ্চয় সেই দিনগুলোর খবরও কিছু কিছু শুনিয়েছেন তাদের। দিল্লির বাদশা স্বয়ং দ্বিতীয় আকবর শাহের পালকি বাঁধা তখন খাসগঞ্জের গার্ডনারের দুয়ারে।

দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল জহুর-উল-নিসার। বড় ছেলে জেমস বিয়ে করেছিল দিল্লিতে, আকবর শাহের বোনের মেয়েকে। গার্ডনার খুব জাঁকজমক করেছিলেন তার বিয়েতে। কেননা, রাজকন্যার সঙ্গে বাদশাহ গার্ডনারদের একটা জায়গিরও দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র অ্যালেন বিয়ে করেছিলেন দিল্লিরই আর এক নবাবজাদীকে। তাঁর স্ত্রী বিবি সাহেবা হিনজার দুটি মেয়ে ছিল সুজান আর হারমুজি। বুড়ো গার্ডনার মারা যাওয়ার পরের বছর ১৮৩৬ সালে হারমুজিকে বিয়ে করেন আবার একজন অ্যাংলো-স্যাক্সন। তিনি গার্ডনারের নিজের আদি বংশেরই জনৈক উইলিয়াম গার্ডনার। গার্ডনার যেমন ছিলেন প্রথম ব্যারন সাহেবের ভাইপো, ইনিও তাই। দ্বিতীয় ব্যারন তাঁর সাক্ষাৎ খুড়ো। সুতরাং, তৃতীয় পর্যায়ে ইংলন্ডেশ্বরের খেতাব নেমে এল আগ্রার খামারে, হারমুজি আর উইলিয়ামের ছেলে অ্যালেন হাইড গার্ডনারের ঘরে। যতদূর জানা যায় ১৮৭৯ সালে তিনিও দিল্লির এক শাহজাদীকে ঘরে এনেছিলেন এবং দু'বছর পরে তাঁরও একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু 'লর্ড' আর বসেনি এই বংশের নামের বাঁয়ে। উত্তরপ্রদেশের মানোতা গাঁয়ের বুড়ো অ্যালেন সাহেবের ভাগ্যকে তাই আর দোষ দিয়ে লাভ নেই; লন্ডন-কাম্বে-দিল্লি, বিলেত আর ভারতের, অনেক নীল এক সঙ্গে মিশেছিল বলেই হয়তো—অভিযাত্রী গার্ডনারের আদি ঔজ্জ্বল্য টিঁকিয়ে বেশিদিন রাখা যায়নি, কিংবা হয়তো বংশানুক্রমিক রংয়ের নেশায় সব কটা রংই একদিন জড়ো হয়েছিল খাসগঞ্জের এই ঘরে, ফলে ইতিহাসের পাতাগুলো আজ অনিবার্যভাবে—রং-চটা, ফর্সা ফর্সা;—হয়তো আবছা সাদাকালো এই দাগগুলোও একদিন মিলিয়ে যাবে—হয়তো এই ভাঙা খাটিয়াটাই সেই সোনালি দিনের শেষ খবর!

তবুও আজও একটা কিছু খবর হয়ে আছেন গার্ডনাররা,—অর্থহীন হলেও খবরের কাগজের পাতায় হয়তো আবার কোনওদিন উঁকি দেবে 'লর্ড' উপাধি সংগ্রহ বাসনায় কোনও গার্ডনারের গাঁয়ে গাঁয়ে চাঁদা তুলে বেড়াবার খবর, কিন্তু কোনওদিন কেউ দিনের আলোয় দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না—আমিই সেই 'জৌরুজ জং'-এর রক্তধারী। এই হানসির আমিই উত্তরাধিকারী। সাচ্চা রাজা, রাজার মতো রাজা 'জৌরুজ জং' সেটুকুও বলে যেতে পারেননি কাউকে।

'জৌরুজ জং' বা জঙ্গী জর্জের আসল নাম ছিল—জর্জ টমাস। তাঁর মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈনিক বোধ হয় হিন্দুস্থান দ্বিতীয় আর একজন দেখেনি। মাদ্রাজে জাহাজ ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের পায়ে ভর রেখে ভারতের মাটিতে লাফিয়ে নেমে এসেছিলেন এই যুবক। সেদিন কেউ তাঁকে চেনে না, কেউ তাঁর নাম জানে না! অথচ কুড়ি বছর পরে এই অজ্ঞাতনামা যুবকই ভারতময় বিখ্যাত শ্বেত-রাজা, জঙ্গী জর্জ।

কি করে জঙ্গী জর্জ এ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার ইতিহাস তাঁর নামের মধ্যেই বোধ হয়

অনেকখানি। সংক্ষেপে এক কথায় বলতে গেলে—সেই সৌভাগ্যের অন্য নাম তলোয়ার। দীর্ঘ কুড়ি বছর তলোয়ার হাতে ভারতময় এক বিস্ময়কর এবং বিচিত্র জীবন দেখিয়েছেন জর্জ টমাস। কিন্তু তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় খেলা এই "জৌরুজ জং" পদবী গ্রহণ।

মতলবটা মাথায় আসে তাঁর হরিয়ানা যুদ্ধের (১৭৯৭-৯৮) পরে, আকস্মিকভাবে। চারদিকে দুর্বল রাজত্ব, হিন্দুস্থান নিয়ত উত্থান পতনের দেশ। শিখদের হারিয়ে টমাস তাই মনে মনে ঠিক করে ফেললেন—আর ছুটোছুটি নয়, তিনিও "রাজা" হবেন,—এই বিজিত দেশের রাজা। বিধি যদি অপ্রসন্ন না হন তবে সমগ্র পাঞ্জাব একদিন অধিকার করবেন তিনি, তারপর সমগ্র হিন্দুস্থান। সিন্ধিয়া নয়, হোলকার নয়,—দিল্লির বাদশা, কলকাতার কোম্পানি নয়—ভারতের সুলতান হবে জাহাজ পলাতক সৈনিক জর্জ টমাস।

টমাস তক্ষুণি কাজে লেগে গেলেন। ঢাক পিটিয়ে চারদিকে জানিয়ে দিলেন—এখন থেকে পাঞ্জাবের এই হরিয়ানা এলাকার তিনিই রাজা, এখানে আর কারও কোনও অধিকার নেই! ইতিপূর্বে দুর্ধর্ষ লড়িয়েদের এই বসতভূমিতে কেউ কখনও রাজত্ব করতে পারেননি। কিন্তু "জৌরুজ জং" নিঃশঙ্ক চিত্ত। তিনি ইতিহাস শুনতে আসেননি, ইতিহাস সৃষ্টি করতে এসেছেন। তাঁর সৈন্যরা বিনা বাধায় তিন হাজার বর্গমাইল ঘুরে এল। জং ঘোষণা করলেন—আপাতত এই তাঁর রাজত্ব। তৎকালের হিসেবে সেই এলাকার রাজস্ব-প্রায় পনের লক্ষ টাকা। তা হোক আপাতত এতেই চলে যাবে। টমাস রাজধানী সাজাবার কাজে মন দিলেন।

রাজধানী হল, পরবর্তী কালে সিকেন্দরের প্রধান ঠিকানা হানসি। হানসি ভারত ইতিহাসের অন্যতম দুর্ধর্ষ দুর্গ। তারই পথে মসুলমানরা বার বার হানা দিয়েছে হিন্দুস্থানের কলজেয়,—দিল্লিতে। কিন্তু হানসি হার মানেনি কারও কাছে। টমাস যখন সেখানে এলেন তখন দুর্গ ইতিহাস মাত্র, একমাত্র বাসিন্দা সেখানে জনৈক ফকির আর দুটি সিংহ! অরণ্য আর নিঃসঙ্গতা। টমাস তাই চান, নতুন রাজা তিনি—সব নতুন করে গড়ে তুলতে চান।

গড়ে তুলেও ছিলেন। তাঁর পায়ের স্পর্শে হানসির দুর্গে আবার প্রাণ ফিরে এল। দেখতে দেখতে দশ ব্যাটেলিয়ান সৈনিকের আস্তানা হল সেখানে, তার উপর পাঁচশো অশ্বারোহী। তাছাড়া দুর্গের বাইরে জৌরুজ জং-এর রাজধানী যে শহর হানসি সেখানেও কমসে কম হাজার ছয়েক মানুষ। রকম দেখে মনে হল হানসি যেন এতদিনে মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে, পছন্দের রাজা তার তক্তে বসেছে।

টমাস আরও শক্ত হয়ে বসতে চাইলেন। তিনি নিজের টাকশাল বসালেন। সেখানে তার নামে টাকা তৈরি হয়,—সে টাকা শুধু তাঁর সেনাবাহিনীতে নয়, তিন হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত তাঁর রাজত্বের প্রতি ঘরে চলে। টমাস ফাউন্ড্রি বসালেন,—সেখানে তাঁর কামান তৈরি হয়। ছ'বছর আগে যেখানে বলতে গেলে কামানই ছিল না তাঁর, এখন সেখানে ষাটটি মস্ত কামান। সে কামান নিয়ে কখনও তিনি জয়পুর, কখনও উদয়পুর বিকানির পর্যন্ত ধাওয়া করছেন। কখনও শতদ্রু তীরে তাঁর সৈন্যরা ত্রাস ছড়িয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত টমাস সেখানেও শিখদের পরাজিত করেছিলেন। শতদ্রুর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত সমুদয় শিখ রাজ্য তাঁকে মেনে নিয়েছিলেন। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু তবুও সেই দুর্ধর্ষ লড়িয়ে শ্বেতাঙ্গ বাদশাহ জৌরুজ-জং-এর কোনও চিহ্ন নেই আজকের হরিয়ানায়। কেননা, টমাস এত করেও, এত পেয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর ফরমান ছ'বছরের মধ্যেই তামাদি হয়ে গিয়েছিল,—রাজধানী হানসিতে সপ্তম বর্ষেই তাঁর টাকা অচল হয়ে গিয়েছিল এবং বহরমপুরে কবরখানায় ক'বছরের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল তাঁর কবর! তাঁর রাজধানী হানসির খ্যাতির পেছনে আজ শুধুই সিকেন্দর।

সম্ভবত টমাসের এই ব্যর্থতার একমাত্র হেতু সিকেন্দর সেখানে "রাজা" না হয়েও ছিলেন রাজকীয়, টমাস ছিলেন রাজার পদবী নিয়েও জৌরুজ জং, মাঠের মানুষ। সৈন্যদের তিনি পেন্সন

দিতেন, আহতদের ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত—কিন্তু তবুও পেঁরর সৈন্যরা যেদিন তিরের ডগায় আত্মসমর্পণের লোভনীয় প্রস্তাব পাঠায় তাদের কাছে সেদিন প্রত্যুত্তরে তারা বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই তৈরি আছে বলে জানিয়েছিল। সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিজের অস্থিরতার জন্যেই ১৮০২ সালের ১ জানুয়ারি অত্যন্ত অগৌরবের মধ্যে অভিযাত্রী পেঁর-র হাতে রাজত্ব এবং দুর্গ ছেড়ে দিয়ে হানসি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল তাঁকে। সেদিন নিজের টাকশাল, নিজের লুঠের ভাণ্ডার এমনকী দুর্গের ভেতরে বিশাল হারেমটির দিকেও একবার পেছনে তাকিয়ে দেখবার সময় বা সুযোগ পাননি টমাস! বোঝা গিয়েছিল, সৈন্যরাই শুধু তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, তিনিও মনে মনে হিন্দুস্থানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তৈরি ছিলেন। নয়তো, এত যুদ্ধে যিনি বীর সৈনিক, আইরিশ তলোয়ারের ইজ্জৎ রক্ষার জন্যে যিনি একাকী ফরাসি পেঁর-র সৈন্যবাহিনীকে রণে আহ্বান জানাতে পেরেছিলেন—তিনি কি এতগুলো অসহায় নারী-শিশুকে শত্রু সৈন্যের হাতে তুলে দিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা পকেটে পুরে পরাজিতের মতো হানসি ছেড়ে পথে নামতে পারতেন? টমাসের আগেকার জীবন যদি সত্য হয়, তবে মদ খেয়ে খেয়ে বহরমপুরে নয়—আপন প্রজাদের মধ্যে, নিজ দুর্গের দরজায় তলোয়ার হাতে মৃত্যুই ছিল তাঁর স্বাভাবিক মরণ। উপাধি গ্রহণ করে, টাকা বানিয়ে—স্বাধীনতা ঘোষণা করে "রাজা" হওয়া সত্ত্বেও টমাস আজ তাই বিস্মৃত নায়ক। গার্ডনারদের খবর তবুও হয়তো কোনওদিন আবার উঁকি দিতে পারে কোনও উপলক্ষে, কোনও না কোনও সূত্র ধরে—কিন্তু জর্জ টমাস কোনওদিন ফিরবেন না আর। হয়তো তাঁর জানা ছিল না, শুধু নিজের নামে টাকা বানালেই হিন্দুস্থানে মানুষ মনে রাখে না কাউকে—তার বদলে অন্য পরিচয়ও চাই। "জৌরুজ জং" সে পরিচয়ে নিজের হাতেই আরও কালি বুলিয়ে গেছেন সেদিন যেদিন রাজ্যহীন পলাতক বারাণসীর ঘাটে ওয়েলেসলির শরণাপন্ন হয়ে জানিয়েছিলেন—তিনি স্বদেশে ফিরতে চান—আয়ারল্যান্ডে। টমাস সেখানে পৌঁছতে পারেননি, কলকাতার পথে গঞ্জামের বহরমপুরেই, ১৮০২ সালে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর শবাধার ঘিরে একটি হিন্দুস্থানীও কেঁদেছে বলে শোনা যায়নি আর! দেশ যার আয়ারল্যান্ড, বাদশাহী যার শুধু টাকশালে—তলোয়ার হাতে না থাকলে তার জন্যে কাঁদা কি কোনও হিন্দুস্থানীর দায়?

কিন্তু যদি কেউ কখনও উত্তরপ্রদেশের গঙ্গোত্রী এলাকায় পা দেন এবং হারসিল, ধারালী বা জংগলা গাঁয়ে যদি কোনও চাষীর দাওয়ায় দুদন্ড বসেন, তাহলে এমন এক আশ্চর্য "রাজার" কাহিনী শুনতে হবে আপনাকে, যার জন্যে এই প্রজাতন্ত্রের যুগে প্রজারা এখনও কাঁদে। কেউ একটা বিবর্ণ ছবি নিয়ে আসবে, কেউ আঁকা বাঁকা হাতে লেখা কোনও দানপত্র—কেউ দুঘর পরে পাহাড়িয়া পথের বাঁয়ে যে সুন্দর কাঠের বাড়িটা, একবার সেটি দেখে-যেতে অনুরোধ জানাবে। মস্ত রাজত্ব ছিল না তাঁর, রাজধানী ছিল না, ফরমান-সনদেরও বালাইও ছিল না—কিন্তু উইলসন তবুও "রাজা" ছিলেন। শুধু তেহরী গারওয়ালের প্রাচীন রাজারা কেন, ইংরেজবাহাদুর—আজকের "কালেক্টার সাহেব" কেউ তাঁর সমান নন—কেউ তাঁর সমান হতে পারেন না।

উপসংহারে ছোট সেই কাহিনীটা শোনা দরকার। কেননা, রাজায় রাজায় ছত্রখান এই দেশে—প্রজারা কেনই বা এত অধীশ্বর মেনে নিতেন, আর কেনই বা চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও দিনান্তেই তাঁরা অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে যেতেন—এ কাহিনীটুকু সম্ভবত তারই ইঙ্গিত। এ কাহিনীর নায়ক যিনি তিনিও জন্মসূত্রে আমাদের কেউ ছিলেন না। সিকেন্দরের মতো তাঁরও বংশ পরিচয় ছিল না।

সে অনেককাল আগের কথা।

গঙ্গোত্রীর কোনও বৃদ্ধই তার সঠিক তারিখ বলতে পারবে না,—ইতিহাসের পাতায়ও তার কোনও নিশানা পাওয়া যাবে না। একদিন হঠাৎ একজন অদ্ভুত দর্শন আগন্তুকের আবির্ভাব হয়েছিল এই গাঁয়ে, মুখবায়। মাথায় তাঁর কটা চুল,—গায়ে লাল রংয়ের কোর্তা, হাতে একটা বন্দুক। —গাঁয়ের অধিবাসীরা

মানুষটিকে দেখে সন্দেহে চোখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। সাহেব হাত থেকে বন্দুকটি মাটিতে নামিয়ে রেখে ভাঙা হিন্দিতে জবাব দিয়েছিলেন—ভয় নেই , ভাই সব, আমি মানুষ!

ওরা কথাটা বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করেই হাত ধরে এনে দাওয়ায় বসতে দিয়েছিল, খেতে দিয়েছিল,—ওদের সর্দার অভয় দিয়েছিল—পালিয়ে এসেছ, ভয় কী ?—যদি থাকতে চাও, এ গ্রাম চিরকাল তোমাকে রাখতে রাজি!

উইলসন সেই থেকেই থেকে গেলেন। ব্রিটিশ বাহিনীর পলাতক সৈনিক আর ছাউনিতে ফিরলেন না, এমনকী অনেকদিন পর্যন্ত সমতলে লোকালয়েও না। তিনি সেই পাহাড়িয়া গাঁয়েই থাকেন, বন্দুকে শিকার করেন,—গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে ঘর করেন। গঙ্গোত্রীর এই এলাকায় আজকের মতো তখনও মানুষের ভিড় কম,—বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তার যোগ ঘটে দৈবাৎ—কোনও তীর্থ-যাত্রীর দল যদি আসে তবেই। মানুষের চেয়ে তখন সেখানে অনেক বেশি বলবান—প্রকৃতি। চারদিক ঘিরে পাহাড় আর বন, বন ভরা ফল আর হরিণ,—গঙ্গোত্রীর এ অঞ্চলে এবাই স্বাভাবিক জীবন। উইলসন ক্রমে সে জীবনকে বদলাতে মনস্থ করলেন। শিকার করা হরিণের চামড়া নিয়ে একদিন তিনি সমতলের দিকে পা বাড়ালেন। লোকেরা ভাবল—সাহেব বুঝি তবে ফিরেই গেল!

কিন্তু কমাস পরে আবার উদিত হলেন উইলসন। এবার পকেট থেকে বের হল তার গাঁয়ে প্রায় অদেখা ধন—টাকা! তারপর থলি থেকে ক্রমে বের হল—আরও আশ্চর্য জিনিস—করাত, হাতুড়ি, ছেনি,—আরও রকমারি যন্ত্র। উইলসন জানালেন—শুধু হরিণের চামড়া নয়,—এবার আমাদের এই বনকেও কাজে লাগাতে হবে। ওরা তাজ্জব বনে গেল।—কাঠ তো আমরাও চিনি সাহেব, কিন্তু হাজার হাজার এই দেওদার গাছ ক'বছরে কাটবে তুমি, আর কেটে করবেই বা কি?

—হবে! হবে! উইলসন থলি থেকে এবার উপহারগুলো বের করলেন। গাঁয়ের প্রায় সকলের জন্যেই কিছু না কিছু নিয়ে এসেছেন তিনি। মোড়লের জন্যে, মোড়লের মেয়ের জন্যে, সমবয়সী তরুণ বন্ধুদের জন্যে, ছোটদের জন্যে। ওদের আনন্দ আর ধরে না। বুড়ো মোড়ল খুশি হয়ে বলে উঠল, আমি বলছি সাহেব,—তুমি রাজা হবে!

তা-ই হলেন। হারসিল, ধারালি, জংলা এবং গঙ্গোত্রীর আরও আরও গাঁয়ে উইলসন রাজা হলেন। তৎক্ষণাৎ নয়,—যেমন হওয়া উচিত—ক্রমে ক্রমে।

তাঁর নেতৃত্বে বন কাটা শুরু হল। গাঁয়ের জওয়ানেরা দেওদার কাটে, —গঙ্গোত্রীর জলে ভাসিয়ে দেয়। একশো গাছ কাটলে ষাটটাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যে চল্লিশখানা থাকে তাও কম নয়। উইলসন দেখতে দেখতে ধনী হয়ে উঠলেন। তিনি মুখবা গাঁয়ের পণ্ডিতদের থেকে জমি কিনলেন, গঙ্গার উত্তর তীরে বিরাট খামার গড়ে উঠল তাঁর। তিনি কাশ্মীর আর কুলু থেকে আপেলের চারা আনলেন,—নিজের খামারে বিরাট বাগিচা গড়ে উঠল তাঁর। তিনি হারসিলে মস্ত এক কাঠের বাড়ি গড়লেন, লোকের চোখে অতঃপর সেই বাড়িই প্রাসাদ হয়ে উঠল এবং ক'বছরের মধ্যে উইলসন, মুখবা গাঁয়ের উইলসন, "রাজা" হয়ে গেলেন। তাঁর অনেক অর্থ, বিরাট প্রাসাদ,—আশপাশের গ্রামভরা তাঁর প্রজা। আশ্চর্য এই যাঁর রাজত্বে উইলসনের এই নয়া জমানা চালু হয়েছে—সেই তেহরি গাড়ওয়ালের রাজা তখনও সে খবর রাখেন না, ইংরেজেরা অনেক দূরে—তাঁদের তো খবরাখবরের প্রশ্নই ওঠে না।

উইলসন শুধু "রাজা" হলেন না—সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল তিনি রাজার মতো রাজা। চার গাঁয়ে ছয় ছয়টি ঘরের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ করলেন,—কিন্তু হারসিলের কাঠের প্রাসাদকে হারেম করলেন না। যাঁর ঘরেরই মেয়ে নিয়েছেন তিনি তার বাড়িতেই গড়ে তুলেছেন তাঁর—দ্বিতীয় প্রাসাদ। পত্নীরা সেখানেই থাকবেন,—বঙ্গের সাবেকী কুলীনদের ঢঙে উইলসন পালা করে সেখানে বাস করতেন।

ক্রমে রাজধানী, হারসিল গাঁয়ের কাঠের প্রাসাদ রাজ্যের দরবারে পরিণত হল। প্রজারা আসে, "রাজা"র কাছে বিচার চায়। একদিন একটি মেয়েকে নিয়ে এল দু গাঁয়ের দুই মরদ। পেছনে পেছনে দল

বেঁধে দুই গাঁয়ের মানুষ। একদল বলছে এই মেয়েটিকে আমরা নিজেদের গাঁয়ে রাখব,—আমাদের গাঁয়ের ছেলের সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব। অন্যদল বলছে, না তা হবে না,—আমরা আমাদের গাঁয়ের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চাই। মেয়েটির চোখের দিকে তাকালেন রাজাবাহাদুর, আচ্ছা, তুমিই বল কার সঙ্গে যাবে?

—কারও ঘরে না।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বন্য পাহাড়িয়া মেয়ে।

—তবে?

—আমি তোর ঘরেই থাকব রাজা!

উইলসন বললেন—বেশ, তবে তাই হোক! বিচারসভা তক্ষুনি শেষ হয়ে গেল। প্রজারা খুশি হয়ে ঘরে ফিরে গেল। যেতে যেতে তারা সকলে একবাক্যে স্বীকার করল, হ্যাঁ,—রাজা বটে উইলসন।

এ মেয়ের বাপের বাড়ি হতে পারে না। নিয়মভঙ্গ করে উইলসন এবার মুখবায় প্রাসাদের সঙ্গেই একটা অন্দরমহল জুড়লেন,—রাজধানীতে সংসার পাতলেন। প্রজারা "ধন্য ধন্য" করে উঠল।

শুধু বিচার নয়, উইলসনের প্রাসাদে দিন রাত্তির দরবার। কোনও গাঁয়ে হয়তো ভালুক নেমেছে, এক্ষুনি বন্দুক হাতে সেখানে ছুটতে হবে,—কেউ হয়তো কী এক অজানা ব্যামোয় কাতরাচ্ছে, তাকে ওষুধ দিয়ে আরাম করতে হবে। উইলসন শুধু শাসক নন, তিনি রাজত্বের প্রহরী, তিনি বিচারক, চিকিৎসক। একমাত্র অভাব ছিল—নিজের টাকশালের! প্রজাদের মত নিয়ে উইলসন একদিন তাও চালু করে দিলেন। তাঁর নাম নিয়ে—গঙ্গোত্রীর পাঁচখানা গাঁয়ে মুখবার শ্বেতাঙ্গ রাজার টাকা চলতে শুরু করল। সেই সঙ্গে হিমালয়ের কোলে—নির্ঝঞ্ঝাট, শান্তিপূর্ণ একটি রাজত্বও।

বহির্জগতের অগোচরে প্রায় অর্ধশতক চলেছিল এই রাজত্ব। কেউ কোনও খবর রাখত না তার। কিন্তু একদিন উইলসনকে নিজেই সে খবর নিয়ে ছুটতে হল—তেহরি গাড়ওয়ালের রাজার কাছে। কেননা, তিরিশ বছরের তরুণ এখন পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ। কোনওদিন নিজ রাজত্বে কেউ সম্মান আর ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু দেয়নি তাঁকে, কিন্তু নাথু হয়তো সব গোলমাল করে দেবে,—সসম্মানে শান্তিতে মরতে দেবে না তাঁকে।

বিচার সভায় বসে রায় দিতে গিয়ে পাওয়া সেই মেয়েটি দুটি পুত্র সন্তান দিয়েছিল উইলসন সাহেবকে। একজনের নাম তাদের নাথু সাহেব, অন্যজনের নাম চার্লস সাহেব। চার্লস অনেকটা বাবার মতো। নম্র, শান্ত, ভদ্র। কিন্তু নাথু যেন—"কালা-পাহাড়।" সে হিন্দু প্রজাদের ওপর যা তা অত্যাচার করে বেড়ায়। কোনওদিন মন্দির ভাঙছে, কোনওদিন দেব প্রতিমা, কোনওদিন কোনও হিন্দু কন্যার সম্ভ্রম হানি করছে। প্রজারা চোখে জল নিয়ে উইলসনের কাছে ছুটে আসে। কিন্তু উইলসন এখন অক্ষম রাজা। তিনি বন্দুক ধরতে পারেন না। তাছাড়া চোখেও তত ভাল দেখেন না। অথচ এটা বোঝেন—এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না।

সুতরাং প্রজাবৎসল "রাজা" উইলসন একদিন রাজ্যত্যাগী হলেন। তিনি তেহরি গাড়ওয়ালের মহারাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মহারাজ কোনওদিন এ 'রাজার' কথা শোনেননি। সব শুনে তিনি মুগ্ধ। উইলসনকে সাদরে বসিয়ে তিনি বললেন—বল সাহেব, কী আমি করতে পারি!

—রাজার যা কর্তব্য! উইলসন এক বাক্যে বক্তব্য শেষ করলেন।—আমি তোমাকে আমার প্রাসাদ, আমার রাজত্ব, আমার প্রজাবর্গ সব দিয়ে গেলাম, এবার যা কর, সে তোমার কর্তব্য!

গাড়ওয়াল থেকে উইলসন নিঃশব্দে এবার সমতলের দিকে পা বাড়ালেন। কেউ আর কোনওদিন দেখতে পায়নি তাঁকে। উইলসন নামে কোনও সাহেব—কোনও গঞ্জ বা ক্যান্টনমেন্টে অসহায়ের মতো মারা গিয়েছেন কিনা সে খবরও পাওয়া যায়নি কোনওদিন। তেহরি গাড়ওয়ালের রাজা বাহাদুর মুখবা গাঁয়ে দখল নিতে গিয়ে শুনলেন—যাঁর জন্যে গৃহত্যাগী হয়েছেন এ গাঁয়ের রাজা, সেই নাথুকে আর শাসন

করার দরকার নেই, সে পাগল হয়ে গেছে। সাহেবের আর এক ছেলে চার্লস চলে গেছে মুসৌরির দিকে,— সে নাকি ব্যবসা করবে!

ক্রমে তারাও হারিয়ে গেল। আগ্রার এক উন্মাদ আশ্রমে নাথু শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। চার্লস-এর ব্যবসা "চার্লিভিল" নামে মুসৌরির হোটেলটিও একদিন একটি বাড়ির নামে এসে ঠেকল,—কিন্তু হারিয়ে যাওয়া "রাজা" উইলসন তবুও মুছে গেলেন না গঙ্গোত্রীর জলে।

সিকেন্দরের মতো, 'জৌরুজ জং'-এর মতো, গার্ডনারদের মতো—সোনার জলে ছাপান ব্রিটিশ রাজত্বের মোটামোটা ইতিহাস বইগুলোতে তাঁর কথাও নেই; থাকলেও ক্লাইভ-হেস্টিংস, লরেন্স-ডালহৌসির 'বাদশানামা'গুলোর পাতার নয়, তার থেকে বহু দূরে—কোনও ভ্রমণকারী, হয়তো বা কোনও রেভিন্যু অফিসারের ডেসপ্যাচে, ইতিহাস নয় যে বইগুলো তার পাতায়। অথচ আজও যদি কেউ উত্তরপ্রদেশের তহশিল গঙ্গোত্রীর সেই এলাকায় পা দেন—তবে মুখে মুখে শোনা যাবে মুখবায় মুকুটহীন রাজা উইলসনের কাহিনী। আগাগোড়া দেওদার কাঠে গড়া হারসিলের যে ডাকবাংলোটায় বসে এ কাহিনী শুনবেন আপনি, এক সময় শুনতে পাবেন—সেই বাংলোটাই ছিল "রাজা" সাহেবের প্রাসাদ,—উইলসনের রাজধানী। সরকারি-আপেলের যে ডালিটি তখন মাথা থেকে বারান্দায় নামাবে হারসিলের দেওয়ালী, শুনবেন,—এ আপেল আজ উত্তরপ্রদেশ সরকারের হলেও বাগানটা ছিল উইলসনেরই। উইলসনের নাম শুনেই সদ্য বাগান ফেরত মেয়েটি হঠাৎ চমকে উঠে নিজের বুকের দিকে তাকাবে—গলার-মালাটায় আলতোভাবে হাত বুলোবে। যদি নির্লজ্জের মতো তাকাতে পারেন সেদিকে, তবে দেখবেন,—ওর বুকে জ্বল জ্বল করছে কতকগুলো রুপোর চাকতি, তার প্রত্যেকটিতে উইলসনের ছবি! শুধু গহনা নয়, জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি প্রথমে লজ্জায় মাথা নিচু করবে, তারপর খিল খিল করে হেসে বলে উঠবে,—এ সাহেব দেওতা, তাঁর তসবিরে জাদু আছে,—ভুত পেত্নী দূরে থাকে,—ঠিকমতো মাহিনা মিলে!

এই রচনায় প্রাসঙ্গিক কিছু বই :

A Particular Account of the European Military Adventurers of Hindustan from 1784-1803, H. Compton, London, 1892.

Military Memoir of George Thomas, William Francklin, London, 1805.

Military Memoir of Colonel James Skinner, J. Baillie Fraser, London, 1851.

European Adventurers of Northern India, 1785-1849, C. Grey, London, 1921.

Soldiers of Fortune, Alexander Inns Shand, London, 1907.

Hindustan Under Freelances 1770-1820, H.G. Keene, London, 1907.

The History of Skinner's Horse, Major A. M. Daniels, London, 1925.

The Hearseys : Five Generations of an Anglo- Indian Family, Colonel High Pearse, London, 1905.

Benoit de Boigne, Sir Evan Cotton, Calcutta.

Sikander Sahib, Dennis Holman, London, 1961.

A Matter of Honour, Philip Mason, London, 1974.

The Passionate Guest, The Fraser Brothers is India, Mildred Archer and Toby Falk, London, 1989.

অনৈতিহাসিক 'নাবব' বর্গের কাহিনী

ছত্রিশ বছর এদিকে আছেন। জীবনে টাকা পয়সাও যে কম লুটেছেন এমন নয়। কিন্তু তবুও মৃত্যুর পর ওঁর উইল খুলে গোটা হুগলি তাজ্জব হয়ে গেল। নিকট অথবা দূর—কাউকে কিচ্ছু দিয়ে যাননি মানুষটি। শুধু পনের হাজার একশো টাকা রেখে গিয়েছেন খুশি খাঁর ভরণপোষণের জন্যে। খুশি খাঁ ওঁর কোনও প্রিয় খানসামা কিংবা মুনশি নয়,—নেহাতৎই একটি চতুষ্পদ। খুশি খাঁ ওঁর প্রিয় ঘোড়াটির নাম। কী করে তার খাবার তৈরি করতে হবে, কখন এবং কীভাবে তা পরিবেশন করতে হবে, আগাগোড়া উইল সে-সব খুঁটিনাটিতেই বোঝাই। তার বাইরে সেখানে অন্য কোনও দান অথবা ধ্যানের কথা নেই।—কী বলা যায় ওঁকে?—'নাবব?' সমসাময়িকরা মাথা ঝেঁকেছিলেন,—হুগলির জন হোম আসলে একটি আস্ত পাগল!

'নাবব' অন্য কাহিনী। শুধু সিংহাসনে বসলেই যেমন কেউ সত্যিকারের রাজা হয় না, তেমনি শুধু দান-খয়রাতেও কেউ 'নাবব' হয় না। এমনকী সিন্ধুকের সর্বস্ব আস্তাবলের কোনও ঘোড়ার নামে লিখে দিয়ে গেলেও না। কখনও দান, কখনও পরকীয়া ধ্যান, কখনও প্রবল বিলাসিতা, কখনও বা শহরের এক কোণে ওয়াচ-টাওয়ার বা রাজকীয় পাগলাগারদের ছেঁড়াকাঁথা—'নাবব' কার্যত অনেকটা আমাদের বহু চেনা নবাবেরই মতো। সেই উদ্দামতা, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, এবং অবশেষে সেই অসহায়তা! 'নাবব' নবাবেরই মতো এক বিচিত্র অস্তিত্ব।

যথা: শ্রীমান বব পট। শুধু শ্রীমান নয়,—পট পাত্র হিসেবে যথেষ্ট ধীমানও ছিলেন। তিনি বিলেতের রীতিমতো এক খানদানি ঘরের সন্তান। পিতৃপুরুষ তাঁর জাহাজের কারবারি ছিলেন। ফলে পটকে আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজে উঠতে হয়নি। কলকাতায় তিনি বেকার অবস্থাতেও একজন যথার্থ 'আগন্তুক' বলে গণ্য হয়েছিলেন। বিশেষত কানাঘুষায় সবাই জেনে ফেলেছিলেন—ওঁর পকেটে যে সুপারিশপত্রটি রয়েছে তাতে সই দিয়েছেন আর কেউ নন, তৎকালীন ইংল্যান্ডের মাননীয় লর্ড চ্যান্সেলার থার্লো স্বয়ং! স্বভাবতই পট অনেকদিন বেকার ছিলেন না। কোনও 'নাবব'ই তা থাকেন না, স্বেচ্ছায় কখনও কখনও ওঁরা গদিত্যাগ করেন মাত্র। নাবব পটও তাই করতেন। নিজের হেড অ্যাসিস্টেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি চাকরি খুইয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকে হিন্দুস্থান-প্রবাসী যে কোনও প্রকৃত সাহেবের কাছে সেটা হয়তো তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যার পক্ষে প্ররোচনা হিসেবে যথেষ্ট, কিন্তু পট 'নাবব'। তিনি জানেন—এদেশের নবাবেরা সাধারণত তাঁদের অধস্তন উজির নাজির

ইত্যাদির সক্রিয় উদ্যমের কাছেই সিংহাসন খুইয়ে থাকে। সুতরাং, আশু বেকারত্বের দুশ্চিন্তা যাতে তাঁর ধারকাছ না ঘেঁষতে পারে সেই চেষ্টায় নাবব-পট তৎক্ষণাৎ একটি রূপসী মেয়েকে যথোপযুক্ত জাঁকজমক সহকারে তাঁর ঘরে তুলে নিয়ে এলেন। মেয়েটি তৎকালের কলকাতার অন্যতম এলিজিবল-কুমারী সুখ্যাতা মিস-ক্রুটেনডেন। পটের ঘরে তিনিই প্রথম হুরি নন,—তাঁর আগে ছিলেন এমিলি ওয়ারেন নামে আর একজন তরুণী। এমনকী মহিলারা নাকি পর্যন্ত স্বীকার করতেন মেয়েটি সুন্দরী। স্যার জ্যেসুয়া রেলোল্ড নানা সাজে, নানা ভঙ্গিমায় অনেক ছবি এঁকেছিলেন তাঁর। কোনও কোনও ক্যানভাসে সে-পটের বিবি এখনও বেঁচে রয়েছেন। বব পট অষ্টাদশ শতকের লন্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে বড় ঘরের এক দুরন্ত ফুর্তিবাজ যুবকের নাম। আরও অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গেই প্রেম হয়েছিল তাঁর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মসমর্পণ করেন রূপসী এমিলি ওয়ারেনের কাছে। জাহাজে অবিবাহিত মেয়ের সঙ্গে আসার নিয়ম ছিল না। এমিলি পটের সঙ্গে ভারত-অভিযানে বের হয়েছিলেন পুরুষ সেজে। মাদ্রাজ থেকে কলকাতার পথে অসহ্য গরম আর ঘামাচির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য দিনরাত ঠাণ্ডা জল আর দুধ খেতে খেতে একদিন এমন ঠাণ্ডাই হয়ে গেলেন যে, বেচারা পট শেষ পর্যন্ত কুলপিতে পৌঁছে দেখলেন এমিলির দেহ নিথর। শোকে তিনি পাথর হয়ে গেলেন। মৃত সঙ্গিনীকে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছে তিনি ঘটা করে তাঁকে সমাধিস্থ করলেন। ইতালিয়ান স্থপতি তিরেত্তাকে দিয়ে প্রায় তিন হাজার পাউন্ড খরচ করে সমাধি-মন্দির তৈরি করালেন। এমিলির প্রতি তাঁর কর্তব্য এখানেই শেষ করলেন না পট। এই তিরেত্তা সাহেবকে দিয়েই তিনি কুলপিতে স্থাপন করলেন এমিলির এক স্মারক-স্তম্ভ। তাতেও খরচ হয়েছিল আরও হাজার পাউন্ড। জনমানবহীন এলাকায় সেই স্মারককে সেকালের কলকাতায় আগন্তুকেরা নাম দিয়েছিলেন "পটস ফোলি!" (Pott's Folly)।

এসব ১৮৮২ সালের কথা। বলা বাহুল্য, কলকাতার জল হাওয়ায় পটের হৃদয়ের ক্ষত শুকোতে বিশেষ সময় লাগেনি। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের সময় পট শুধু রাজ্যহীন নন,—কার্যত কপর্দকহীন। মৃত্যুদিন পর্যন্ত কোনও চাকরি ছিল না তাঁর। তা হলেও পট কোনও বিলাস-প্রস্তাবে কোনওদিন বারেক পেছনে অথবা সামনে তাকিয়েছিলেন—এমন কোনও সংবাদ নেই! কেননা, পট 'নাবব' এবং মুর্শিদাবাদে কোম্পানির রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি জেনেছিলেন—সাচ্চা নাববের জীবনে বর্তমান ছাড়া কোনও কাল নেই। আগে দু'জন, পেছনে দশজন ঘোড়সওয়ার সাজিয়ে ফিটন হাঁকিয়ে শহর থেকে আফজলবাগে রেসিডেন্সি প্রাসাদে ফিরতে ফিরতে রেসিডিন্ট সাহেব যখন পথের ধারে বসে থাকা ব্রাহ্মণ ভিখারিটিকে লক্ষ্য করে একটি আস্ত টাকা ছুঁড়ে দিতেন—তখন ধন্যবাদের বদলে লোকটি চিৎকার করে কী বলত কৌতূহলী পটের কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না। অনেক দিন তিনি লাগাম টেনে গাড়ি থামিয়েছেন। দোভাষী লাগিয়ে কথাগুলোর মর্মোদ্ধার করেছেন। দোভাষী অনুবাদ করতে গিয়ে মনে মনে শিউরে উঠেছে। জিভ কেটে, মাথা চুলকে, নানারকম ভণিতা করে সে বলতে চেয়েছে—হুজুর, লোকটি আপনাকে নবাব বলেছে! সে যা বলছে তার মর্ম: ওরে বিলিতি বাঁদর!...ওরে নবাব রে! এত বড় আস্পর্ধা তোর যাবার সময় ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে একটা ময়লা টাকা ছুঁড়ে দিচ্ছিস!...আরে বিলিতি বাঁদর, আমাকে টাকার গরম দেখাচ্ছিস!...ইত্যাদি। রেসিডেন্ট তবুও যথারীতি টাকাটি ছুঁড়ে যেতেন। কেননা, বব-পট মেজাজে যথার্থই 'নাবব' ছিলেন!

মুর্শিদাবাদে রেসিডেন্টের চাকরিটা পট যেভাবে জোগাড় করেছিলেন—সেও একই 'নবাবি'র কাহিনী,—যেন ছোটমাপের কোনও এক মীরজাফর ছোট কোনও সিংহাসনের বন্দোবস্ত খুঁজছেন। সে ১৭৮৩ সালের কথা । থার্লোর সুপারিশ বিফল হয়নি। কোম্পানির ডিরেক্টররা বব পটকে মুর্শিদাবাদে রেসিডেন্টের আসন দিতে সম্মত হয়েছেন। পদটা শুধু সম্মানের নয়, যথেষ্ট অর্থকরীও। 'প্যাগোডা-ট্রি' বা টাকার-গাছ সেখানে বারোমাস ফুলফল দিত । মাইনে নামক প্রধান কাণ্ডটি ছাড়া

সে বৃক্ষে রোজগারের শাখাপ্রশাখা অজস্র। প্রথম কোম্পানির তরফ থেকে নবাবকে যা-ই দেওয়া হোক না কেন, তা রেসিডেন্টের হাত হয়ে যায়, ফলে—সেখানে কিছু না কিছু লেগে থাকার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, রেসিডেন্সির মাধ্যম ছাড়া নবাবের এক বোতল সোডাপানি কেনবারও কোনও অধিকার নেই। তাঁর হয়ে রেসিডেন্টই প্রাসাদের সব সওদা করে থাকেন। সে পথেও বিলক্ষণ রোজগার। স্বভাবতই পট পদটির প্রতি যারপরনাই আসক্ত হয়ে উঠলেন। মুর্শিদাবাদে রেসিডেন্ট তখন স্যার জন ডয়লি। তাঁর সে বছরই অবসর গ্রহণের কথা। সে কথা ভেবেই কোম্পানি পটকে কাজটি দিতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু ছেলেটির উৎসাহ দেখে ডয়লি বেঁকে বসলেন। তিনি জানালেন, ইচ্ছে করলে অনায়াসে তিনি আরও দু'এক বছর কাজটা চালিয়ে নিতে পারবেন। বেগতিক পট—তাঁর কাছে প্রস্তাব দিল, মিছিমিছি কেন আর আপনি কষ্ট স্বীকার করবেন,—তার চেয়ে সেই ভাল নয় কি, চাকরিটাও ছেড়ে দিলেন অথচ আপনার কোনও লোকসান হল না!

ডয়লি জানতেন—পট এ প্রস্তাবই দেবে। কেননা তিনি যতদূর জেনেছেন, ছেলেটা প্রকৃতিতে 'নাবব'। তিনি রেসিডেন্টের আসনের দাম ঘোষণা করলেন—তিন লক্ষ সিক্কা টাকা! পকেটে খাস কোম্পানির অ্যাপয়েন্টমেন্ট, পট তবুও পিছপা হলেন না, তিনি তিন লক্ষ টাকার বিনিময়েই রেসিডেন্ট হলেন। ডয়লি বললেন—আমার ফার্নিচারগুলোও তোমাকে কিনতে হবে। তার দাম ধার্য হল—নব্বুই হাজার টাকা!—বেশ, তাই দেব। পট আসবাবগুলো সব কিনলেন, কিন্তু একটাও ব্যবহার করলেন না। নতুন করে নিজের পয়সায় তিনি রেসিডেন্সি সাজালেন। এমনকী বাড়িটা পর্যন্ত নতুন করে নিজের পছন্দমতো অদল বদল করে নিলেন! তার তবুও একটা অর্থ হয়, কেননা পদটা অর্থকর। কিন্তু তার কিছুদিন আগে বর্ধমানে পট যা করেছিলেন তা আরও বিস্ময়কর। মাত্র কিছুদিন থাকবেন জেনেও তিনি তাঁর সাময়িক আস্তানাটিকে পছন্দমতো করতে গিয়ে সজ্ঞানে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। তাই বলে কি পট উন্মাদ ছিলেন? অবশ্য নয়। তিনি 'নাবব' ছিলেন। মুর্শিদাবাদে তাঁর যেমন ষাটজন অশ্বারোহীর 'গার্ড' ছিল, তেমনি প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার টেবিলে তাঁর নিমন্ত্রিত থাকতেন কমপক্ষে তিরিশ জন! 'নাবব'-পট তখন বন্ধুদের 'ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে', কলকাতায় হিন্দুস্থানী তরুণী উপহার পাঠাচ্ছেন, দরকার হলে বন্ধুর ইজ্জৎ রক্ষার্থে পিস্তল হাতে ডুয়েলে অবতীর্ণ হচ্ছেন! তাঁর তুল্য 'নাবব' আমাদের নবাব-তরঙ্গিণীতেও বোধহয় রাশি রাশি নেই।

পট তবু ঘর সাজাতেন নিজের জন্যে। কিন্তু তস্য বান্ধব হিকি?

বব পটের বন্ধু ও বয়স্য অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকিও সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। তিনিও ছিলেন লণ্ডন সমাজে এক বেপরোয়া চরিত্র। বিচিত্র তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে আলফ্রেন্ড স্পেন্সারের সম্পাদনায় চারখণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিশাল স্মৃতিকথা অষ্টাদশ শতকের লন্ডন ও কলকাতার এক জীবন্ত সমাজ চিত্র। ওয়াকিবহালরা একবাক্যে বলেন এ বই ইংরেজি সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। হিকি ১৭৮২ সালে যখন কলকাতার উদ্দেশে দরিয়ায় ভাসেন তখন তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন ব্যারি শার্লট নামে এক সুন্দরী। হিকি বার বার তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেও তিনি তাতে সম্মত হননি। কিন্তু নিজেকে মিসেস হিকি বলে পরিচয় দিতে তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না। দুঃখের বিষয় কলকাতায় ওঁদের সুখের সংসার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পরের বছরই (১৭৮৩) অকালে চিরবিদায় নেন শার্লট। হিকির বয়স তখন তেত্রিশ। অতঃপর তাঁর জীবনে সান্ত্বনা ছিলেন ভারতের মেয়েরা।

১৭৯৬ সালের কথা । সেদিন যদি কেউ ডাচ গভর্নরের বাড়ি দেখবেন বলে কোনও জানুয়ারির সকালে চুঁচুড়ায় আসতেন, তা হলে তিনি দেখতে পেতেন লাট মহোদয়ের বাড়ির পাশেই পার্কের গা ঘেঁষে নদী থেকে মাত্র একশো গজ দূরে সুন্দর একটি বাংলো গড়ে উঠছে। আর্কিটেক্ট আর পশ্চিমী মিস্ত্রিরা এমন তাড়াতাড়িতে কাজ করে চলেছেন যেন দেশের এ কয় বিঘা জমিতে হঠাৎ আপৎকালীন অবস্থা বলবৎ হয়ে গেছে। তাঁরা সেদিন জানতেন না, সাহেব হঠাৎ কেন এই বাড়িটি নিয়ে এমন ব্যস্ত

হয়ে উঠেছিলেন। সেদিনের চুঁচুড়ার পথচারী-প্রতিবেশীদেরও তা জানবার কথা নয়। কিন্তু বিশ্ব আজ জানে—হিকির এই ব্যস্ততার একমাত্র কারণ যিনি তিনি—জমাদারনী। তাঁর ডাইরির ভাষায়—জামদানি। জমাদারনীর মনোরঞ্জনের বাসনায় হেস্টিংস-এর কলকাতার বিখ্যাত অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি ইতিপূর্বে অনেক নাববোচিত আচরণ করেছেন। কলকাতার গ্রীষ্ম থেকে একটি হিন্দুস্থানী রমণীর দেহচর্মের কোমলতাকে রক্ষা করার বেপরোয়া চেষ্টায় গরমের দিনে তিনি চৌরঙ্গি ছেড়ে গার্ডেনরিচ শহরতলিতে প্রাসাদ সাজিয়েছেন। তাতেও আশানুরূপ হাসি ফোটাতে না পেরে, তিনি স-বান্ধবী নৌকো নিয়ে গঙ্গায় প্রমোদভবনে বের হয়েছেন। ভাসতে ভাসতে চুঁচুড়ার উপকূলে এসে জমাদারনী স্মিত হাস্যে যেই না বলল, এই জায়গাটা মন্দ নয়, সাহেব অমনি ডাঙায় লাফিয়ে পড়লেন। চুঁচুড়াতে বাড়ি ভাড়া করা হল। বাড়ি বদল হল। হয়তো সেভাবেই আরও কিছুদিন চলে যেত। সাহেব শনিবারে শনিবারে চুঁচুড়ার কর্তব্য সেরে কলকাতার কৃত্যগুলো মেসের কেরানির কায়দায় কোনওমতে চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল—হয়তো তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। এমতাবস্থায় প্রকৃত 'নাবব' হিসেবে জমাদারনীর প্রতি কর্তব্য তাঁর সুস্পষ্ট। তিনি আর্কিটেক্টের কাছে তৎক্ষণাৎ প্ল্যান তলব করলেন। জানুয়ারিতে ভিত পড়ল, প্রাসাদ জুনে সমাপ্ত। চুঁচুড়ার সেই বাড়িটির এই ইতিহাস। সেদিন যে বাড়িটি দেখে চুঁচুড়ার লোকেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন সেটি আসলে জমাদারনীর বাড়ি!

নগদ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে বিদেশি 'নাবব' যে মেয়েটির জন্যে এমন করে ঘর সাজিয়েছিলেন, বলা নিষ্প্রয়োজন, তার সঙ্গে পরিচয়ও তাঁর 'নাববি' কায়দায়। হিকির নিজের ভাষায়: আমার আইরিশ অতিথি কার্টার লিভারের অসুখে পড়েন। তিনি স্থির করলেন, কলকাতায় আর না থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে যাবেন। কার্টার যখন আমার বাড়িতে থাকতেন তখন একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে তার কাছে আনাগোনা করত। মেয়েটি সুন্দরী। তা ছাড়া বেশ চালাকচতুর। কার্টার চলে যাবার পর আমি তাকে বললাম—আমার কাছে থাকবে? সে বেশ খুশি মনেই সম্মতি জানাল।

সেই মেয়েটিই হিকির স্বনামধন্য জামদানি বা জমাদারনী। সাহেব যখন চুঁচুড়ায় বান্ধবীকে নিয়ে নতুন ঘরে গৃহপ্রবেশ করছেন, তার মাস দুই আগে—জমাদারনী সহাস্যে তাঁর কানে কানে নিবেদন করেছে—অচিরেই তাঁর ঘরে একটা 'ছোটা উইলিয়াম সাহেব' আসছেন। কি বয়সে, কি বিত্তে—হিকি তখনও পড়ন্ত 'নাবব' নন, সুতরাং তাঁর পক্ষে পলায়নের কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর প্রিয় জামদানি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মায়ের সঙ্গে বিদায় নেয় সদ্যোজাত 'ছোটা উইলিয়াম'ও।

'নাবব' এবং সাচ্চা নাবব বলেই সম্ভবত হিকি তাঁর জমাদারনী এবং তার গর্ভের সন্তান 'ছোটা উইলিয়াম সাহেবের' অকাল মৃত্যুতে সরবে কেঁদেছেন এবং বিনা ভণিতায় তাঁর স্মৃতিকথায় কিরণবালা উপাখ্যানও বিবৃত করে যেতে পেরেছেন। জামদানির শোকে সান্ত্বনা হিসাবে তাঁর জীবনে আসেন নতুন হিন্দুস্তানী মেয়ে কিরণবালা।

বন্ধু পট মুর্শিদাবাদ থেকে 'ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য' তাকে যে উপহারটি পাঠিয়েছিলেন কিরণ তারই নাম। এই মেয়েটিও রূপবতী ছিল। বছরখানেক তাকে নিয়ে ঘর করার পর সাহেবকুঠিতে যথারীতি একটি 'ছোটা উইলিয়াম' সাহেবের আবির্ভাব ঘটল। হিকি তাতে যে খুব উদ্বিগ্ন বা অখুশি হয়েছিলেন এমন নয়। কিন্তু যখনই ছেলেটির ঘনকৃষ্ণ চুল এবং আবলুস প্রায় দেহবর্ণের কথা ভাবেন, তখনই তাঁর মনটা নাকি খারাপ হয়ে যেত। অবশেষে সেই রহস্য একদিন উদ্ঘাটিত হল। প্রভু অসময়ে বাড়ি ফিরে কাকের বাসায় কোকিল আবিষ্কার করলেন। সন্দেহ ভঞ্জন হল। 'ছোট উইলিয়ামের' প্রকৃত জনক হিজ হাইনেস খিদমৎগারজি এবং মাদাম তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বিতাড়িত হল। ইচ্ছে করলে অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় খানদানি নাবব উইলিয়াম হিকির পক্ষে দিল্লি-লাহোর,

মুর্শিদাবাদ-ঢাকার নবাবি ন্যায়ের পুনরাবৃত্তি মোটেই অসম্ভব কিছু ছিল না, কিন্তু 'নাবব' হিকি সে পথে গেলেন না। তিনি মহানুভব নাববের আচরণ করলেন—ওদের বিদায় দিয়ে দিলেন। স্মৃতিকথায় আরও বিস্ময়কর খবর: "পরে যখন শুনলাম, কিরণ খুব দুঃখে পড়েছে তখন তার জন্যে একটা মাসোহারার বরাদ্দ না করে পারলাম না।"

শুধু এই জমাদারনী আর কিরণ নয়,—'নাবব' হিকির একই কাহিনী কলকাতায় তাঁর প্রতিদিনের জীবনে। একা মানুষ,—কত বাড়ি বদল আর ফার্নিচার বদল করেছেন তার হিসেব নেই। সংসারে স্ত্রী শার্লট-এর মৃত্যুর পরে আপন বলতে কেউ ছিল না, কিন্তু ভৃত্য ছিল তেষট্টিজন। সেকালের মাপে এই ভৃত্যবহরও হয়তো বিস্ময়কর কিছু নয়। কেননা, ম্যাকবেরি লিখেছেন—স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের চারজনের সংসার দেখাশুনার জন্যে বেয়ারা খিদমৎগার ছিল একশো দশজন! হেস্টিংস যখন উত্তর ভারত পরিক্রমায় বের হয়েছিলেন, তখন তাঁর সহচর ছিল পাঁচশো মানুষ,—পরবর্তীকালে (১৮৩৯) লর্ড অকল্যান্ডের ভারতদর্শনের সঙ্গী ছিল বারো হাজার! তবে ওঁরা সরকারি মানুষ। অ্যাটর্নি হিকি তা নন। কিন্তু তা হলেও অন্তত ভৃত্য বিলাসিতায় তিনি যে যে-কোনও লাটবাহাদুরের চেয়ে বড় সাহেব ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও উপায় নেই। তাঁর ভৃত্য মনিবের পকেট থেকে নিয়মিত ভাবে মোহর সরায়,—কিন্তু তবুও তিনি তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন না। ওরা অত্যাচার করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে—নাবব তবুও নির্বিকার। শুধু নির্বিকার নন,—১৮০৮ সালে কলকাতা থেকে বিদায়দিনে তেষট্টি ভৃত্যের প্রত্যেককে তিন মাসের মাইনে বোনাস দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেই তেষট্টির পাঁচজন আবার তাঁর নিজের নয়,—গোলাপ আর টিপি নামে তাঁর দুই দাসীর! হিকির চূড়ান্ত জমাখরচে দেখা যাচ্ছে—গোলাপদাসীর জমি ও বাড়ি বাবদে দিচ্ছেন তিনি—তিন হাজার পাঁচশো চব্বিশ টাকা, টিপির জন্যে ওই খাতে খরচ তাঁর—দেড় হাজার টাকা! মাঝে মাঝে দেশে ফিরে গেলেও হিকি বলতে গেলে ১৭৮৩ সাল থেকে ১৮০৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা। সে-বছরের প্রথম দিকে দেশে ফেরার সময় তাঁর টাকা পয়সার যে হিসাব দিয়েছেন হিকি তাতে দেখা যায় যদৃচ্ছ দান খয়রাতির পর তাঁর হাতে থাকছে ৯২ হাজার টাকা। তা ছাড়া স্বদেশে তাঁর সঞ্চয় আছে ১৭০০ পাউন্ড। তিনি আশা করছেন তাতে তাঁর অবশিষ্ট জীবন স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। উল্লেখ্য কলকাতা থেকে মন্নু নামে যে ছোকরা ভৃত্যটিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্য তার মাকে দিয়েছিলেন পাঁচ শত টাকা। 'নাবব' হিকির দীর্ঘ স্মৃতিকথায় কিন্তু একজন 'নাবব'-এর কথাই আছে। তিনি উইলিয়াম হিকি নন, তাঁর পার্শ্বচর এই মন্নু। হিকি তার নাম দিয়েছিলেন 'নাবব।'

যদি বলেন—এ 'নাবব' সঠিক নাবব নয়, একজন বিলাসী 'বাবু' মাত্র, তা হলে সমসাময়িক 'নাবব'দের মধ্যে স্বনামধন্য 'নাবব' রিচার্ড বারওয়েল সাহেবের কাহিনীটাও একবার শোনা দরকার। বারওয়েল পদাধিকারে মস্ত মানুষ। তিনি গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ঘনিষ্ঠ বান্ধব এবং তাঁর কাউন্সিলের একজন মাননীয় সদস্য। তদুপরি তিনি একজন 'বক্সওয়ালা' তথা ব্যবসায়ীও বটেন। ঢাকায় তাঁর দু-দুটি নুনের আড়ত ছিল। সেগুলো আর্মেনিয়ানদের কাছে ইজারা দিয়ে তিনি বিস্তর পয়সা লুটেছিলেন। দৈনন্দিন জীবন তাঁর আর পাঁচজন প্রতিবেশী 'নাববের' মতোই ছিল। উইয়িলাম ম্যাকিনটসের বিবরণ অনুযায়ী কলকাতার সে 'নাববী' গৃহস্থালীর বিবরণ:

সকাল সাতটা নাগাদ দরোয়ান নাববাহাদুরের গেট খুলে দিল। নিমেষে বারান্দাটি সলিসিটার, রাইটার, সরকার, পিওন, হরকরা, চোপদার, হুঁকো-বরদার ইত্যাদিতে ভরে গেল। বেলা আটটায় হেড বেয়ারা এবং জমাদার প্রভুর শোয়ার ঘরে প্রবেশ করবে। একটি মহিলাকে তখন শয্যাত্যাগ করে একান্তে প্রাইভেট সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে দেখা যাবে,—অথবা বাড়ির অঙ্গন পরিত্যাগ করতে। নাবব বাহাদুর খাট থেকে মাটিতে পা রাখামাত্র অপেক্ষমান ভৃত্যবহর তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে পড়বে। তারা আনত মাথায় পিঠ বাঁকিয়ে প্রত্যেকে তিনবার করে তাঁকে সেলাম জানাবে। ওদের হাতের

একদিক তখন কপাল স্পর্শ করবে, উল্টো দিকটা থাকবে মেঝেতে। তিনি মাথা নেড়ে অথবা দৃষ্টিদানে তাদের উপস্থিতিকে স্বীকৃতি জানাবেন।...

'নাবব' এবার পোশাক পরলেন। অবশ্য সেজন্যে তাকে বিশেষ কিছু করতে হল না। ওরাই সব করে দিল। তিনি যেন কোনও মর্মরমূর্তি। 'ছোটাহাজিরা' বা প্রাতরাশের ঘরে টেবিলে চা এল। 'নাবব' সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি কখনও চায়ে চুমুক দিচ্ছেন, কখনও হুঁকোর নল মুখে তুলে নিচ্ছেন। হেয়ার ড্রেসার তাঁর কেশবিন্যাস করছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে 'নাবব' অভ্যাগতদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। তাঁদের মধ্যে সম্মানিত কেউ থাকলে, তিনি তাঁকে চেয়ারে বসতে বলছেন। এই অনুষ্ঠান বেলা দশটা পর্যন্ত চলবে। মহাশয় অতঃপর সদলবলে তাঁর পাল্কিটির দিকে এগিয়ে যাবেন। আগে পিছে আটজন থেকে বারোজন চোপদার হরকরা ইত্যাদি ছুটবে, তিনি দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যাবেন। বেলা দুটোয় তাঁর মধ্যাহ্নভোজনের সময়। তখন টেবিলে গ্লাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুঁকো হাতে হুঁকোবরদারের দল আসরে ঢুকবে। মহিলারা উপস্থিত থাকলেও কোনও বাধা নেই। অতিথিদের হাতে হাতে নল তুলে দিয়ে তারা সার বেঁধে পেছনে দাঁড়াবে,—আগুন যাতে মুহূর্তের জন্য নিবে না যায় সেদিকে নজর রাখবে।...

ভোজসভা শেষ হবে বেলা চারটায়। 'নাবব' অতঃপর শুধু শার্টটা গায়ে রেখে বাদবাকি সব পোশাক খুলে ফেলবেন। এবার তিনি আবার শয্যা নেবেন। সাতটা কিংবা আটটা অবধি তাঁর বিশ্রাম চলবে। ঘুম থেকে ওঠামাত্র আবার সকালের সেই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি শুরু হবে, দেহে তাঁর আর একপ্রস্থ পোশাক উঠবে। সান্ধ্য চায়ের পর তিনি একটি মনোরম কোট পরবেন এবং ভদ্রমহিলাদের সন্দর্শনার্থে বের হবেন। রাত্রি দশটায় সাপার। দশটার কিছু আগে তিনি আবার ঘরে ফিরে আসবেন। এবারকার ভোজের আসর শেষ হবে রাত বারোটা কিংবা একটায়। অতিথিরা চলে যাওয়ার পরে আমাদের নায়ক তাঁর শোবার ঘর অভিমুখে যাত্রা করবেন। সেখানে একজন সহচরী অপেক্ষা করে আছেন।...ইত্যাদি।

পারসিভ্যাল স্পিয়ার তাঁর "দ্য নাববস" ("The Nababs") বইয়ে অষ্টাদশ শতকে ওয়ারিশহীন অবস্থায় দেহরক্ষা করেছেন এমন কয়েকজন সাহেব-মেমের রেখে যাওয়া অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে ১৭৫৫ সালে মৃত নিকোলাস ক্লেয়ামবণ্ট নামে একজন সম্ভ্রান্ত সাহেবের সম্পত্তির যে তালিকা রয়েছে তাতে দেখি রাশি রাশি দামি আসবাব রয়েছে। বেশ কিছু ঘড়ি, আয়না, লণ্ঠন, রকমারি পালকি, বিপুল সংখ্যক বাসনপত্র, চা, কফি, পান, তামাকের বিবিধ সরঞ্জাম, বিভিন্ন মদের বোতল, এবং কী নয়? সবই যেন অফুরন্ত বাক্সের পর বাক্স খুলে নথিবদ্ধ করা হয়েছে তাঁর সম্পত্তি। ঘরের পর ঢোকা হয়েছে গুদামে, গুদামও কিন্তু একটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি। হয়তো তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু মানতেই হবে বিলাসী ব্যবসায়ী এই সাহেব। তাঁকে 'নাবব'ও বলা চলে বটে। তবে এই সাহেব সম্পর্কে এটাও বলা দরকার যে, তিনি সুসংস্কৃত মানুষ ছিলেন। তাঁর ঘরে বেশ কিছু ভারী ভারী বইও ছিল। শুধু ইংরেজি নয়, ফরাসি বই ছিল চল্লিশটিরও বেশি, একখানার ভাষা আবার ডাচ।

ম্যাকিনটস এদেশে সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা সাধারণ সাহেবের হয়তো। তিনি তাঁদের 'নাবব' বলেননি।

তা হলেও বলা নিষ্প্রয়োজন এ রোজনামচা প্রকৃত 'নাবব' ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। 'নাবব' বারওয়েলের দৈনন্দিন জীবন এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কিছু হওয়ার কথা নয়। তবে সমস্ত কর্মসূচীতে তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগত স্পর্শ অবশ্যই ছিল। বারওয়েল জুয়া খেলতে ভালবাসতেন। একবার এক আসরেই ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁর কাছ থেকে কুড়ি হাজার পাউন্ড জিতেছিলেন। বারওয়েল আর এক আসরে হেরেছিলেন—চল্লিশ হাজার পাউন্ড! তা ছাড়া বারওয়েলের আর এক নেশা ছিল

ভোজসভা। ভোজসভা তথা খানাপিনা তখন 'নাববে'র নবাবিয়ানার অন্যতম অঙ্গ। প্রমাণ সাইজের 'নাবব' মানেই—তাঁর প্রাতরাশের টেবিলে থাকবে তিরিশজন, মধ্যাহ্নভোজে পঞ্চাশজন; রাত্রির খাওয়া হবে মধ্যরাতে এবং নাচ চলবে ভোরতক। বারওয়েল তার পরেও প্রতি পনেরোদিন অন্তর বিশিষ্ট বন্ধুদের নিয়ে টেভার্নে আসর বসাতেন। মাদাম গ্রান্ডের ঘরে মইসহ ফ্রান্সিস যেদিন ধরা পড়েন মিঃ গ্রান্ড সেদিন সে নেমন্তন্ন রক্ষা করতেই বাড়ি খালি রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু ভোজদাতা হিসেবে নয়, নাববি-কলকাতায় যে কোনও ভোজের আসরে 'নাবব' বারওয়েল ছিলেন অন্যতম আকর্ষণ। চার গজ দূর থেকে এক ফুঁয়ে তিনি যে কোনও মোমবাতি নিবিয়ে দিতে পারতেন। সেকালে ভোজের আসরে আর একটি 'নাববি' আচার ছিল 'পেল্টিং' বা রুটি মাংস ছোঁড়াছুঁড়ি। সেই কদর্য ক্রীড়ায় এমনকী বিবিসাহেবেরা পর্যন্ত মত্ত হতেন। তবে কারও মুখ বা মাথা লক্ষ্য করে মুরগির ঠ্যাং ছুঁড়ে মারার বদলে সুরসিকা এবং কোমলহৃদয়া মেয়েরা মিঠাই প্যাস্ট্রি ইত্যাদি মধুর লোষ্ট্রাদিই পছন্দ করতেন বেশি। কেননা, তৎকালে সেটাই ছিল রসবোধ এবং কালচারের লক্ষণ! বারওয়েল এব্যাপারেও বলতে গেলে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর হাতের টিপ কখনও বিফল হত না। তার চেয়েও বড় কথা, চোখের টিপেও নাবব বারওয়েল ছিলেন তেমনি,—অব্যর্থ! ক্লাইভ নিজে বলেছেন—'দি ওনলি কোয়ালিফিকেশন অব মিস্টার বারওয়েল আই নো অব ইজ দ্যাট হি ইজ এ গুড সিডিউসার অব ফ্রেন্ডস' ওয়াইভস!' সংক্ষেপে: বারওয়েল বন্ধুপত্নীদের সম্পর্কে অতিশয় সফল। সে-কাহিনী পরে।

ভোজসভা প্রসঙ্গে তৎকালের সাহেবদের মদ্যপানের কথাও একটু বলা দরকার। বিশেষত কলকাতার সাহেব-মেমরা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য সেদিন অতিশয় খ্যাত বা কুখ্যাত। ইংরেজদের অন্য আখড়াগুলোও কিন্তু এব্যাপারে মোটেই পিছিয়ে ছিল না। "মাদ্রাজ ডায়ালগস" ("Madras Dialogues") থেকে জন আর পিটার,—দুই সাধারণ ইংরেজের কথোপকথন একবার শোনা যাক। অবশ্য শুনতে হবে কিছুটা সংক্ষেপে! কারণ, আমাদের বারওয়েল-উপাখ্যান এখনও শেষ হয়নি। জন বলছেন—তোমার সেলার-এ কী ওয়াইন আছে পিটার? পিটারের উত্তর—চার বোতল বিয়ার আছে। ক্ল্যারেট আছে বারো বোতল। স্যাক নয় বোতল। আর মদিরা একশো বোতল। জন এবার জানতে চাইলেন,—কোথাকার ওয়াইন এসব। পিটার সবিনয়ে বললেন—চার জাতের ফরাসি ওয়াইন, কেপ অব গুড হোপ থেকে আনা নানা ধরনের ওয়াইন। হোয়াইট ওয়াইন, রেড ওয়াইন, রেনিস ওয়াইন, মোসেল ওয়াইন, মাস্কাডেল ওয়াইন, মালমেসি ওয়াইন, পার্শিয়া ওয়াইন...। এই যদি সাধারণ ইংরেজের ঘরে থাকে, তবে না জানি 'নাবব'দের সেলারে কী থাকত!

বস্তুত বারওয়েলের 'নাবব' হিসেবে খ্যাতির পেছনে সেটাও একটা কারণ। বিলাসিতা ইত্যাদি অন্য আমোদে হিকি হয়তো তাঁর খুব পেছনে ছিলেন না, কিন্তু বারওয়েল তাঁদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, সে তাঁর এই বিশেষ ক্রীড়াছন্দে। এখানে 'নাবব' বারওয়েল কখনও পশ্চিমের 'নাইট', কখনও নীচতা এবং ক্রূরতায় তিনি প্রাচ্যের কোনও হীন নবাব। যথা: শ্রীমতী সারা উপাখ্যান।

১৭৬৯ সালের কথা। কোম্পানির নৌবহরে তখন একজন নবীন সহকারী ক্যাপ্টেন ছিলেন। নাম তাঁর মিঃ হেনরি এফ টমসন। ভদ্রলোক ছুটিতে দেশে গিয়ে হঠাৎ একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেললেন। মেয়েটির নাম—সারা। সারা বোনার। কত লোকই তো ভালবাসে। কিন্তু টমসন উন্মাদ প্রেমিক। তিনি কিছুতেই সারাকে দেশে ফেলে রেখে আর ইন্ডিজে ফিরবেন না। অথচ ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। হাতে এমন সময় নেই যে দিনক্ষণ দেখেশুনে চার্চের কর্তব্যটা সেরে ফেলেন। উপায়ান্তরহীন টমসন অতএব অন্য পথ ধরলেন। কলকাতায় বন্ধুদের তিনি জরুরি চিঠি পাঠালেন—তোমরা শুনলে নিশ্চয় প্রীত হবে যে আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছি,—তিনি আমার পেছনে পরের জাহাজেই আসছেন।

আগের জাহাজে টমসন কলকাতায় এসে নামলেন। সে কী খাতির তাঁর! জাহাজঘাটায় সকলের আগে এগিয়ে এসে তাঁকে যিনি অভিনন্দন জানালেন তিনি স্বয়ং বারওয়েল। বারওয়েল সেখানেই থামলেন না। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে টমসনের পদোন্নতি ঘটালেন। এবং পরের জাহাজে সারা এসে পৌঁছন মাত্র ওঁদের বসবাসের জন্যে নিজের একখানা বাড়ি ছেড়ে দিলেন। বিখ্যাত মাদাম গ্রান্ডের বিয়ের সময়েও তিনি তাই করেছিলেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে 'নাববে'র সেটাই স্বভাব। এমনভাবে উঠে পড়ে লাগবেন তিনি কারও 'না' বলবার জো নেই। টমসনও পারলেন না। বিশেষ, বারওয়েল শুধু 'নাবব' নন, লাটবাহাদুরের দরবারেও তিনি একজন!

নতুন বাড়িতে টমসন আর সারা সংসার পাতলেন। বারওয়েল বন্ধু এবং বাড়িওয়ালা। মাঝেমধ্যে তিনি বন্ধুর ঘরে পদধূলি দেন। কে কেমন আছেন, খোঁজ খবর করেন। তাঁর আন্তরিকতায় টমসন মুগ্ধ।

দিন যায়। হঠাৎ শোনা গেল, টমসনকে বহরমপুর যেতে হবে। বারওয়েল তাঁর জন্যে সেখানে একটি মস্ত চাকুরির ব্যবস্থা করেছেন। পদটি ডেপুটি পে-মাস্টারের। মাইনে বছরে সাত হাজার টাকা। টমসন অর্থচিন্তায় দূর বিদেশে এসেছেন,—তিনি আপত্তি করতে পারলেন না। বারওয়েল আশ্বাস দিলেন—তুমি মিছেমিছি ভেবো না ভাই, আমি তো রয়েছি,—তোমার সংসারের দায়িত্ব আমার উপর রইল।

এদিকে সহসা এক অপ্রত্যাশিত ওলটপালট ব্যাপার ঘটে গেল। স্বয়ং বারওয়েলই বদলি হয়ে গেলেন বহরমপুরে! বহরমপুর থেকে মাইল কয়েক দূরে মতিঝিলে। তিনি অনুরোধ জানালেন, টমসনকেও আমার কাছে বদলি করা হোক। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক কর্তৃপক্ষ অসম্মত হলেন। সম্ভবত কলকাতার বিধাতারা তখন বারওয়েলের ওপর বাম। তাঁরা টমসনকে আবার কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

টমসন আবার সারার কাছে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তাঁর মনে হয় সারা যেন আর আগেকার মতো নেই। তাঁর কেমন উড়ো উড়ো ভাব। টমসন ভেবে পান না,—হঠাৎ কী হল মেয়েটার।—মাত্র কিছুকালের মধ্যেই এমন হয়ে যাবে কেন সারা?

ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে দেরি হল না। একদিন ডাক পিওন এসে সেলাম করে টমসনের হাতে চিঠি দিয়ে গেল একখানা। ওপরে ঠিকানা লেখা মিঃ কার্টারের। কার্টার প্রতিবেশী, ওঁদের পাশের বাড়িতে থাকেন। সে বাড়িটিও বারওয়েলের। কী মনে করে হঠাৎ নিজের অজান্তে চিঠিটা খুলে ফেললেন টমসন। সঙ্গে সঙ্গে সারার আচরণ তাঁর কাছে শরতের ভোরের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠল। বারওয়েল লিখছেন: স্যান্ডারসন চায় না তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখ, কেননা সে তার বয়স এবং অন্যান্য সদগুণগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার চায়।...সে যা হোক, আমি কী বলছি জান? আমি বলছি সারা, তুমি আমার ভালবাসা এবং তোমার দৈহিক সৌন্দর্য দুয়ের ওপরই ঘোরতর অবিচার করছ। আর্শিতে একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো তুমি, দেখবে তোমার সেই রূপ বর্তমান যা বার্ধক্যকেও উষ্ণ করে তুলতে সক্ষম;—ক্যান এ ইয়ংম্যান বি ইনডিফারেন্ট টু দেম? চিঠির শেষ কথা—সারা, আমি তোমাকে ভালবাসি, আই উইস, ইউ ওয়ার উইথ মি অ্যান্ড ইওর হাসব্যান্ড অ্যাট এ ডিস্‌ট্যান্স।

চিঠির পর চিঠি। বোঝা গেল তাঁর অনুপস্থিতিতে বন্ধুকৃত্য করে ফেলেছেন বারওয়েল। টমসন সারাকে ডাকলেন! তারপর বললেন—আর নয়, তোমাকে এবার দেশে যেতে হবে সারা। অনেক হয়েছে, আর লোক হাসানো ঠিক নয়।

সারা দেশে যাবেন। সব ঠিক। এমন সময় মফঃস্বল থেকে বারওয়েল এসে হাজির। তাঁর আরও পদোন্নতি হয়ে গেছে। এখন থেকে তিনি কলকাতাতেই থাকবেন। সুতরাং, সারা দেশে যাবেন কোন দুঃখে। তিনি বেঁকে বসলেন। টমসনকে তিনি স্পষ্টতই বলে দিলেন—তুমি এবার বিদেয় হলেই ভাল। আমি চাই না, তুমি আর এখানে থাক। ভেবে দেখ, যদি চলে যেতে সম্মত হও তবে কিছু টাকা পাবে,

অসম্মত হলে কিছুই পাবে না; মনে রাখবে শাস্ত্রীয়ভাবে আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি।

টমসনের বুঝতে বাকি রইল না, প্রস্তাবটা আসলে বারওয়েলের। তিনি অমত করতে ভরসা পেলেন না। বে-সরকারিভাবে একটা দলিল তৈরি হল। সাক্ষী থাকলেন স্বয়ং হেস্টিংস আর রবার্ট স্যান্ডারসন। স্থির হল, সারার দুটি সন্তানের খোরপোষবাবদ বারওয়েল পাঁচ হাজার পাউন্ড দেবেন, আর ডিভোর্স তথা 'বিচ্ছেদের' খরচা বাবদে দেবেন—তিনশো পাউন্ড। সে দলিল হাতে নিয়ে জলের সাহেব আবার জলে ফিরে গেলেন, তিনি আবার নৌবাহিনীর জাহাজে চাপলেন। বিবাগীকে নিয়ে জাহাজ চলেছে এবার আরও পুবে, চিনদেশের দিকে। সে জাহাজ কোনও বন্দরে পৌঁছতে না পৌঁছতে মাঝপথে হঠাৎ আবার বারওয়েলের জরুরি চিঠি: সত্বর কলকাতায় চলে এস। মনে রাখবে তোমার নিজের স্বার্থেই এখানে তোমার আসা দরকার।

বেচারা টমসন হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। এসে শুনলেন—সারাকে স্বদেশগামী একটা জাহাজে তুলে দিয়েছেন বারওয়েল। তাঁর ইচ্ছে টমসনও এবার ফিরে যান। কিন্তু দলিলের সেই টাকা? বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বারওয়েল বললেন—লন্ডনে আমার ভাই আছেন। তোমাকে একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। তাঁকে সেটা দেখাবে। টাকাটা তিনি তক্ষুনি তোমাকে দিয়ে দেবেন।

টমসনের জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বারওয়েল এসে হাজির।—এই কাগজটায় একটা সই করে দাও তো ভাই, নয়তো লন্ডনে হয়তো ওঁরা টাকাটা তোমাকে দিতে চাইবে না। টমসনের মন তখন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত। তিনি তাঁর ভাগ্যের কথা ভাবছেন। চাকরি গেল, সারা গেল,—নিজের দুটি সন্তান, হিন্দুস্থানে নিশ্চিত জীবনের প্রতিশ্রুতি সব গেল।—কী হবে আর সামান্য কিছু টাকার জন্যে ভেবে? তিনি চোখ বুঁজে বারওয়েলের হাতের কাগজটায় সই করে দিলেন।

লন্ডনে নেমে টমসন জানলেন—যে কাগজটায় তিনি সই করে এসেছেন সেটা আর একটা দলিল। আগের দলিলটাকে নাকচ করাতেই তার লিখিত হরফগুলোর তাৎপর্য! টমসন নির্বাক। বারওয়েল সম্পর্কে এবার আর তাঁর সিদ্ধান্তে দ্বিধা নেই,—লোকটি সত্যিই 'নাবব'। টমসন স্থির করলেন কুচক্রী এই 'নাববের' কীর্তিকাহিনী তিনি উদ্‌ঘাটন করবেন,—তাঁর জীবনের সুখ, শান্তি,—সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার বদলি হিসেবে 'নাবব' বারওয়েলকে তিনি অন্তত একবার তাঁর স্বরূপে উপস্থিত করবেন। টমসন কলম নিয়ে বসলেন। ফল: তৎকালের বিখ্যাত বিলিতি কেচ্ছা—'দি ইনট্রিগস অব এ নাবব' অথবা 'বেঙ্গল, দি ফিটেস্ট সয়েল ফর লাস্ট!' বইটি প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালে। টমসন লিখিত এই সারা-কাহিনী নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এবং কোম্পানিপাড়ায় সেদিন রীতিমতো চাঞ্চল্য।

এসব লীলা-খেলায় বুদ্ধিমতী মেয়েরা, বলা নিষ্প্রয়োজন, কেউ কেউ ভেসে যেতেন, কেউ কেউ আবার মাদাম গ্রান্ডের মতো সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে উঠতেন। পার্সিভ্যাল স্পিয়ার-এর মৃতের অস্থাবর সম্পত্তির উল্লিখিত সেই সংক্ষিপ্ত তালিকায় ১৭৭৫ সালে কলকাতায় প্রয়াত মিসেস অ্যানি নাওলন নামে এক মহিলার জিনিসপত্রের যে বিবরণ দেখছি, তা চমৎকপ্রদ। আসবাব, যানবাহন, রান্নাঘর কিংবা খাবার টেবিলের বাসনপত্রের বর্ণনা চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। আমরা ভদ্রমহিলার গহনার বাক্সটিই বরং একবার উঁকি দিয়ে দেখি। সেখানে ছিল হিরা পান্না থেকে শুরু করে রকমারি মূল্যবান পাথর ও ঝুটা পাথর বসানো ত্রিশ-বত্রিশটি আংটি, একটি মুক্তোর চার নরি হার, দামি পাথরের লকেটসহ মুক্তোর আরও একটি হার, সোনার ব্রেসলেট, জড়োয়া ব্রেসলেট, একটি ছয় নরি সোনার হার, একটি চার নরি, আর একটি দুই নরি সোনার হার। একটি সোনার জলের মালা, সোনার বোতাম ও অন্যান্য সোনার সাজে সাজানো চোলি। আর একটি জড়োয়া চোলি, মুক্তো বসানো তিন জোড়া, তিন মাপের তিনটি মুক্তোখচিত ব্রোচ। তিন জোড়া জড়োয়া কানের গয়না ইত্যাদি ইত্যাদি! মেমসাহেব যেন আমাদের কোনও বনেদি ধনী বাড়ির বউ! উল্লেখ্য এই ভদ্রমহিলার সম্পত্তির তালিকায় একজন নগদে কেনা বাঁদীও ছিলেন!

আবার বারওয়েল প্রসঙ্গে ফেরা যাক। সারা-উপাখ্যান লন্ডনে সাড়া ফেলে দিলেও সে তরঙ্গ কলকাতা স্পর্শ করতে পারল না। বারওয়েল তেমনি যথাপূর্ব 'নাবব' রয়ে গেলেন। বরং লক্ষণ দেখে মনে হয় প্রভাব এবং প্রতিপত্তি তাঁর ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে। সারা কলকাতায় থাকতে থাকতেই তিনি কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ক্লেভারিংয়ের মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। ক্লেভারিং তাঁর উত্তর হিসেবে পাণিপ্রার্থী 'নাববের' হাতে একটা পিস্তল তুলে দিয়েছিলেন। বারওয়েলকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে ১৭৭৫ সালের এপ্রিল মাসের কথা। বজবজের পথে ওঁরা দু'জনে ডুয়েল লড়েছিলেন। সে বছরই সেপ্টেম্বরে সারা বিদায় হল। বিরক্ত, ক্লান্ত 'নাবব' নতুন পুষ্পের সন্ধানে নবীন উদ্যম নিয়ে আবার আসরে নামলেন। এবার লক্ষ তাঁর সেকালের কলকাতার অন্যতম নায়িকা স্যান্ডারসন দুহিতা মিস স্যান্ডারসন। খ্যাতিতে তিনি তখন প্রায় রূপকথার নায়িকা। একবার কথাচ্ছলে মৃদু হেসে সখীদের তিনি বলেছিলেন—এবার আমার ডিজাইন মতো পোশাক পরে যে গভর্নমেন্ট হৌসের নাচের আসরে আসবে আমি তাঁর সঙ্গেই নাচব। নাচের দিন দেখা গেল—কমসে কম ষোলোজন তরুণ এক পোশাকে হাজির হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের অঙ্গেই মিস স্যান্ডারসনের সেই পছন্দের পোশাক। নায়িকার মতোই আচরণ করেছিলেন সেদিন মিস স্যান্ডারসন,—পর্যায়ক্রমে তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে একবার করে নেচেছিলেন। নাচের শেষে ওঁরা সার বেঁধে তাঁর পালকি ধরে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন সেদিন। ভক্তবৃন্দ পরিবৃত এ হেন স্যান্ডারসনও শেষ পর্যন্ত কিন্তু মালা দিয়েছিলেন বারওয়েলেরই গলায়! কেননা, বারওয়েল কখনও কখনও হীন এবং কুটিল চরিত্রের মানুষ হলেও তিনি 'নাবব'।

মিস স্যান্ডারসন যে হিসেবে ভুল করেননি, তার প্রমাণও বারওয়েল রেখে গেছেন। সাউথ পার্ক স্ট্রিটের পুরানো কবরখানায় পা দিলে আজও যে পিরামিডটি বিশালতা এবং গাম্ভীর্যে সকলের আগে কাছে টানে সেটি 'নাবব' বারওয়েলেরই কীর্তি। বিয়ের পর মাত্র দু'বছর বেঁচেছিলেন এলিজাবেথ জেন। গর্বিত ফারাওয়ের ভঙ্গিতে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাইলেন—'নাবব' বারওয়েল। তিনি পিরামিডের হুকুম দিলেন। সে স্মৃতিসৌধ আজও বর্তমান। সে যেন এখনও দর্শকদের বলে—বারওয়েল 'নাবব' ছিলেন,—'নাবব!'

'নাবব!'

শুধু বব পট আর উইলিয়াম হিকি নন, শুধু বারওয়েল আর ক্লাইভ-ওয়েলেসলি নন,—কলকাতায় তখন রাশি রাশি 'নাবব।' বিলাসিতায় তাঁরা কেউ সিরাজদ্দৌলা-আসফউদ্দৌলা, ক্রূরতায় মীরজাফর-মীরণ। কিন্তু আশ্চর্য এই, তবুও ওঁরা কেউ আমাদের ইতিহাসে 'নাবব' নন। তার প্রথম কারণ অবশ্য—ওরা বিদেশের মানুষ, নাববির লোভে আগন্তুক। সে 'নাববি' করায়ত্ত হওয়ার পরেও এদেশের চোখে ওঁরা নবাব হতে পারলেন না, কারণ আরও কিছু কিছু বস্তুর মতো নাববি ব্যাপারটা আমাদের একান্ত আপন, ঘরের রহস্য। কারও মন সহসা যদি তা হাত ছাড়া করতে রাজি না হয় তবে বোধ হয় তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না! ওঁরা তাই আমাদের কাছে 'লাটবাহাদুর', 'বড়াসাহেব', 'হুজুর' ইত্যাদি হয়েই রয়ে গেলেন,—এত করেও হিন্দুস্থান ইতিকথায় নবাব বলে কোনও পরিচয় আদায় করতে পারলেন না। সে খেদ তাঁদের পূরণ করে দিল—শ্বেতাঙ্গ নবাবের স্বদেশ অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ড। আপন সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁরা চমকে উঠলেন,—যাঁরা আমাদের ঘর ছেড়ে বিদেশ যাত্রা করেছিল—ওঁরা নিশ্চয় আমাদের সেই বালকদল নয়, নিশ্চয় ওঁরা আর কেউ—'নাবব!'

'নাবব' মানে? অক্সফোর্ড ডিক্সনারি লিখছে: আদিতে এই শব্দটি 'নবাব'-এর বিকৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হত। নবাব মানে—এক শ্রেণীর মুসলমান রাজকর্মচারী যাঁরা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদেশে

প্রদেশে অথবা জেলাগুলোতে সহকারী গভর্নর হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু সম্প্রসারিত অর্থে এখন 'নাবব' মানে—খুব ধনশালী ব্যক্তি বিশেষত যিনি ভারতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করে দেশে ফিরে এসেছেন; অথবা বিত্তশালী এবং বিলাসী ব্যক্তি। 'হবসন জবসন' বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অভিধান অনুযায়ী—শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় অষ্টাদশ শতকে; তখনই ক্লাইভের কার্য-কলাপের কাহিনীর সঙ্গে শব্দটি ইংল্যান্ডে চালু হয়। যে সব অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রভূত ধনসম্পদ নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ক্রমে তাঁদের সম্পর্কেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে।—ইত্যাদি।

সেদিক থেকে 'নাবব' সম্পূর্ণই বিলিতি ব্যাপার। তার সঙ্গে আমাদের যোগ যা তা অনেকটা গুরু-শিষ্যের মতো। কলকাতা তথা ভারতে এসেছিলেন বলেই ওঁরা যেমন দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেরেছিলেন, তেমনি এদেশে দিল্লি-লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ-চিৎপুর ছিল বলেই নবাবিয়ানাটা রপ্ত করতে পেরেছিলেন। এই স্থানগত এবং শিক্ষাগত যোগাযোগটা বাদ দিলে 'নাবব' সম্পূর্ণত শ্বেতদ্বীপের ঘরোয়া ব্যাপার। অনেকটা আমাদের বিলেত-ফেরতদের মতো। আমরা যেমন চোগাচাপকানে ওঁদের দেখে হঠাৎ সেদিন আঁৎকে উঠেছিলাম,—অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডও তাই করেছিল মাত্র। হোরেস ওয়ালপোল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন (১৭৬০) 'মোগল পিট এন্ড নাবব বুট!' স্যামুয়েল ফুট কলম নিয়ে ব্যঙ্গ নাটিকা লিখলেন (১৭৬৮)—'দ্য নাবব'।

লেখালেখি পলাশির পর থেকেই শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু 'নাবব' বলতে সত্যিই কী বলা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তারপরও পাঠকদের অবহিত করতে হত। একজন লেখক (জোসেফ প্রাইস) লিখছেন; কেন কিছু কিছু লোককে 'নাবব' বলা হচ্ছে তার কারণটা স্পষ্ট করা দরকার। কেননা, আর্ল অব চ্যাথামের ঠাকুর্দা যখন মাদ্রাজে গভর্নর ছিলেন তখন কোনও ইংরেজ কখনও এই শব্দটি শোনেনি,—ব্যবহার করা তো দূরের কথা!

অর্থাৎ,—বলা নিষ্প্রয়োজন, ফিরিঙ্গি বণিক তখনই 'নাবব' হয়েছেন যখন পকেটে তাঁর নবাবিয়ানার নজরানা জোগাবার ক্ষমতা এসেছে। অনিবার্যভাবেই সেটা পলাশির পরের ঘটনা। কেননা, বহু সই সুপারিশের পরে লেখা এবং অঙ্ক জানা সতের বছরের ইংরেজ বালক তখন যে রাইটার পরিচয়ে তাঁর জীবন শুরু করেন, তাঁর বার্ষিক মাহিনা পাঁচ পাউন্ড মাত্র। সিঁড়ির শেষ ধাপে সিনিয়ার মার্চেন্টের দুর্লভ পদ। তাঁর মাইনে বার্ষিক—চল্লিশ পাউন্ড! তাতে নবাবিয়ানা পরের কথা, সেদিনের কলকাতায় মেসের খরচও মেটে না। সুতরাং, 'নাবব' হওয়ার আগে বেশ কিছুদিন ওঁদের কাটাতে হল নবাবির মহড়া দিয়ে। তারপর পলাশি,—আলিবাবার চোখের সামনে নিমেষে রত্নগুহার দরজা খুলে গেল।

পলাশিতে সিরাজউদ্দৌলা গিয়ে মীরজাফর এলেন, পারিতোষিক হিসেবে কোম্পানির বড় এবং মেজো-সেজো কর্তাদের প্রত্যেকের হাতে বেশ কিছু এল। তারপর মীরজাফরের বদলে মীরকাশেম এবং অবশেষে মীরকাশেমের বদলে নিজামউদ্দৌলা—প্রতি ক্ষেত্রেই নতুন করে প্রাপ্তিযোগ ঘটল।

বলাবাহুল্য, রোজগারের অন্য পন্থাও ছিল। রাজা গজা গড়ার বিনিময়ে বিস্তর পুরস্কার মিলত, তেমনই নানা উপলক্ষে মূল্যবান সব 'উপহার', যা উৎকোচেরই নামান্তর। তা ছাড়া কোম্পানির ব্যবসা, অর্থাৎ কর্মচারী হিসাবে কেনাবেচার কাজেও নিজেদের সরকারকে দোহন করার সুযোগ ছিল। সুযোগ ছিল অন্যদের পাইয়ে-দেওয়ার ফিকিরে, ঠিকাদারি ইত্যাদি বিলি-বন্দোবস্ত উপলক্ষে কাড়ি কাড়ি টাকা কামাবার। সর্বোপরি ছিল—ব্যক্তিগত ব্যবসা। এবং সে-বাণিজ্য বেশ কিছুকাল চলেছে কর্তাদের চোখের সামনে প্রকাশ্যেই। সুতরাং সিন্দুক বোঝাই নগদ টাকা, কিংবা পকেট ভরা মণি-মুক্তা হিরার অভাব হবে কেন?

রাজা গড়ার কারিগরদের কার পকেটে সেদিন নজরানা হিসাবে কত এসেছিল তার একটা হিসাব পাওয়া যায় হাউস অব কমনস-এর একটি বিবরণ থেকে (১৭৭৩)। পরবর্তী দুই দফায় মসনদ বদল উপলক্ষেও কারও কারও ভাগ্যে নতুন করে শিকে ছিঁড়েছিল বটে। ১৭৫৭ সালে, অর্থাৎ পলাশির

পর পুরস্কৃত ভাগ্যমানরা ছিলেন: গভর্নর ড্রেক—৩১,৫০০ পাউন্ড, লর্ড ক্লাইভ—২,১১,৫০০ পাউন্ড, মিঃ ওয়াটস—১,১৭,০০০ পাউন্ড, মেজর কিলপ্যাট্রিক—৬০,৭৫০ পাউন্ড, মিঃ ম্যানিংহাম—২৭,০০০ পাউন্ড, মিঃ বিচার ২৭,০০০ পাউন্ড, মিঃ বোডাম—১১,৩৬৭ পাউন্ড, মিঃ ফ্রাঙ্কল্যান্ড—১১,৩৬৭ পাউন্ড, মিঃ ম্যাকেট—১১,৩৬৭ পাউন্ড, মিঃ অ্যামিয়েট—১১,৩৬৬ পাউন্ড, মিঃ পার্কেস—১১,৩৬৬ পাউন্ড, মিঃ ওয়ালশ—৫৬,২৫০ পাউন্ড, মিঃ স্ক্রাফটন—২২,৫০০ পাউন্ড, মিঃ লাসিংটন—৫৬২৫ পাউন্ড, মেজর গ্রান্ট—১১,২৫০ পাউন্ড। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইংরেজের বিজয় উপলক্ষে কলকাতার বিশেষ বিশেষ বাঙালিবাবুও "ক্ষতিপূরণের" নামে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল এমনকী গোবিন্দরাম মিত্রের রক্ষিতাদের জন্যও!

১৭৬০ সালে মীরজাফরকে সরিয়ে যখন মীরকাশেমকে পুতুল ধরে নিয়ে গদিতে বসানো হয় তখন আবার পরদেশি লুঠেরাদের কপাল খুলে যায়। সেবার গভর্নর ভ্যানসিটার্ট পেয়েছিলেন—৫৮,৩৩৩ পাউন্ড, মিঃ হলওয়েল—৩০,৯৩৭ পাউন্ড, মিঃ সুমনার—২৮,০০০ পাউন্ড, জেনারেল কাইলাউড—২২,৯১৬ পাউন্ড, মিঃ ম্যাকগুইরি—২২,৯১৬ পাউন্ড, মিঃ স্মিথ—১৫,৩৫৪ পাউন্ড, মিঃ ইয়র্ক—১৫,৩৫৪ পাউন্ড। ১৭৬৪-৬৫ সালে কঠোর কঠিন মীরকাশেমের বদলে নরম পুতুল নিজামউদ্দৌলাকে বসানো হয় তখন আবার পুতুলনাচের ওস্তাদদের ভাগ্য প্রসন্ন। মেজর মনরো পুরস্কার পেলেন—১৩,০০০ পাউন্ড, তাঁর অধীনস্থ সাহেবদের প্রসাদী হিসাবে পেলেন আরও ৩০০০ পাউন্ড। এখানেই শেষ নয়। পরের বছর (১৭৬৫) সালে গভর্নর স্পেনসার পান—২৩,৩৩৩ পাউন্ড,, মিঃ জনস্টোন—২৭,৬৫০ পাউন্ড, মিঃ মিডলটন—১৪,২৯১ পাউন্ড। মিঃ সিনিয়র—২০,১২৫ পাউন্ড, মিঃ লিবেস্টার—১৩,১২৫ পাউন্ড, মিঃ প্লিডেল—১১,৬৬৭ পাউন্ড, মিঃ বার্ডেট—১১,৬৬৭ পাউন্ড, মিঃ গ্রে—১১,৬৬৬ পাউন্ড, জেনারেল কার্নেক—৩২,৬৬৬ পাউন্ড, মিঃ জি জনস্টোন—৫,৮৩৩ পাউন্ড এবং সেই দাগি মুদ্রারাক্ষস লর্ড ক্লাইভ ৫৮,৩৩৩ পাউন্ড!

ডিগবি তাঁর "'প্রসপারাস' ব্রিটিশ ইন্ডিয়া" ('Prosperous' British India) বইতে লিখেছিলেন পলাশি এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভারত থেকে অন্তত ১০ কোটি পাউন্ড নগদ অর্থ পৌঁছেছে ব্রিটেনের ভাণ্ডারে। আর এক লেখক ব্রুকস অ্যাডমস ("The Law of Civilization and Decay") তাঁর বইয়ে মন্তব্য করেছিলেন—শিল্পবিপ্লব কার্যত শুরু হয় ১৭৬০ সালে ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও সোনা-রূপা এদেশে পৌঁছাবার পর। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো অধ্যাপক সি জে হ্যামিলটন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ওঁদের বক্তব্য। বস্তুত ভারতীয় ধনদৌলতের এই 'বহির্গমন'-তত্ত্ব, যাকে বলা হয় "ড্রেনেজ থিয়োরি" নিয়ে সেকালে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। বিতর্ক একালেও অব্যাহত। এখানে সেসব নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। জেমস হজম্যান তাঁর অসাধারণ গবেষণা, "দ্য নাববস ইন ইংল্যান্ড" বইয়ে এসব তত্ত্ব উল্লেখ করে এমন কিছু সংবাদ পেশ করেছেন যা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতকে এদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে সাহেবরা সাধারণত কোম্পানির হাতে তাঁদের সঞ্চয় তুলে দিতেন। দেশে ফিরে যাওয়ার পর সুদসমেত তা ফেরত পেতেন। এক সময় কোম্পানি গচ্ছিত টাকার সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেয়। তখন অনেকে টাকা পাঠাতে শুরু করেন ফরাসি এবং ওলন্দাজ কোম্পানির মারফত।

কেউ কেউ আবার এসব পন্থায় মোটে আস্থাবান ছিলেন না,—কে জানে, দেশে ফেরার পর টাকা ফেরত পাওয়া যাবে কিনা! উইলিয়াম হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় ক্যাপ্টেন বেন্টলি নামে একজন ফৌজির কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তিনি স্থির করলেন নিজের সঞ্চয় নিজের সঙ্গেই নিয়ে যাবেন। সুতরাং, আটটি শক্তপোক্ত কাঠের বাক্স বোঝাই করে রীতিমত ভাড়া দিয়ে তিনি জাহাজে উঠলেন।

১৭৮২ সালে ইংল্যান্ডে পৌঁছে মেজর জন স্কট ওয়ারেন হেস্টিংসকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

আমাদের ব্যবসায় হয়তো মন্দা দেখা দিয়েছে, কিন্তু আজকের মতো এমন বিপুল বৈভব বোধহয় এই রাজ্যে কখনও ছিল না। আমি ২০০ সোনার মোহর গলাতে দিয়েছিলাম একজনকে, তিনি জানালেন গত বারো বছর তিনি অন্তত দেড় টন সোনার মোহর এবং প্যাগোডা গলিয়ে "বার" তৈরি করে দিয়েছেন। তার মানে প্রতি বছর গড়ে দেশে মজুত হয়েছে ১৫০ হাজার পাউন্ড!

কেউ কেউ আবার হিরা নিয়ে আসতেন। আমদানি নাকি এমন বেড়ে যায় যে, ইউরোপের বাজারে হিরার দর কমে যায়। হেস্টিংস-গিন্নির গহনাপত্র নিয়ে সেদিন সে কী গুজব চারদিক! একটা নাচের আসরে এসেছিলেন তিনি নাকি হিরা আর মুক্তার এমন গহনা পরে যার দাম ৩০ হাজার পাউন্ড। স্বয়ং ইংলন্ডেশ্বরও নাকি পড়েছিলেন হিরার নেশায়। তাঁকে তৃপ্ত করেছিলেন ক্লাইভ এবং হেস্টিংস। নাববদের হিরার মধ্যে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করেছিল লর্ড পিগট-এর হিরা। সেটি ছিল কেউ বলেন ৪৭ ক্যারেট। কেউ বা ৮২ ক্যারেট। ১৮০০ সালে সেটি ২১ হাজার পাউন্ডের বদলে লটারিতে দেওয়া হয়। চার বছর পরে শোনা যায় সে হিরা ফরাসিরা কিনে নিয়েছেন সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের জন্য। শেষ পর্যন্ত পিগটের হিরা উঠে আসে মিশরের আলি পাশার হাতে। তিনি তার জন্য দাম দিয়েছিলেন ৩০ হাজার পাউন্ড। সেই হিরা মৃত্যুশয্যা থেকে পাশার নির্দেশে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়। চিরকালের মতো হারিয়ে যায় পিগট-এর হিরা!

পিট পার্লামেন্টে বলেছিলেন—পাঁচ বছর সাধুভাবে হিন্দুস্থানে কাজ করলে, কোম্পানির কর্মচারীরা বছরে বড়জোর দু'হাজার পাউন্ড বাঁচাতে পারেন! ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁর বোনকে লিখেছিলেন—অপেক্ষা কর, বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পাব,—আমি ভারত থেকে ফিরছি কিন্তু ধনী হয়ে ফিরছি না! কারও কারও ক্ষেত্রে এগুলো অবশ্য সত্য। এমন অনেক ভারত-ফেরতও দেখা গেছে, পকেটে যাঁদের এক ফার্দিংও নেই। কিন্তু তাঁরা নেহাতই স্বাভাবিক মানুষ মাত্র। 'নাবব' তাতে রাজি হবেন কেন? ১৭৬৯ সালে বাংলা দেশ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত হল। প্রত্যেক জেলায় একজন করে সুপারভাইজার নিযুক্ত হলেন। এই পদটিই ক'বছর পরে (১৭৭২) কালেক্টারে রূপান্তরিত হয়। ওঁরা প্রত্যেকে বে-আইনিভাবে রোজগার করতেন। কেউ জমি রাখতেন, কেউ অন্য কোনও ব্যবসা করতেন। জন বাথো নামে বর্ধমানে এক কালেক্টার ছিলেন। তিনি সেখানকার জনৈক জমিদার মহোদয়কে নুনের ব্যবসা পাইয়ে দিলেন। শর্ত: প্রথম দু' বছর তাঁকে বার্ষিক আটাশ হাজার পাউন্ড নজরানা দিতে হবে। দ্বিতীয় বছরের টাকার কিছু ভাগ পাটনার কাউন্সিল সদস্যরাও ভোগে পেয়েছিলেন!

কেউ কেউ অন্য পথ ধরলেন। মাদ্রাজের গভর্নর (১৭৬৩-৬৭) রবার্ট পাক সুদের কারবার করতেন। ঔপন্যাসিক থ্যাকারের ঠাকুর্দা উইলিয়াম থ্যাকারে শ্রীহট্টের কালেক্টার (১৭৭২) ছিলেন। তিনি বড় মানুষ হন কোম্পানিকে হাতি সাপ্লাই করে! ভারতে তখন এমনি শত শত 'হঠাৎ নাবব'। যতদিন তাঁরা এদেশে ছিলেন ততদিন তাঁদের পূর্ণ পরিচয় স্বদেশের মানুষের কাছে ততটা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু বিপর্যয় ঘটল স্বদেশের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র।

ফেরার পথে ক্লাইভের পকেটের অবস্থা কী ছিল আজ তা প্রবাদ। ভ্যানসিটার্ট ফিরেছিলেন পনেরো লক্ষ পাউন্ড নিয়ে, বারওয়েল—চার লক্ষ পাউন্ড নিয়ে, রামবোল্ড—ছয় লক্ষ পাউন্ড নিয়ে, মারসাক আশি হাজার পাউন্ড নিয়ে। ১৭৬২ সালে মাদ্রাজ থেকে কর্নেল জেমস রেনেল জানাচ্ছেন, এখানকার সরকারি কর্তা (চেয়ারম্যান) তিন লক্ষ পাউন্ড নিয়ে ঘরে ফিরছেন। এই জেমস রেনেল ভারতের প্রথম বিস্তারিত মানচিত্র তৈরির জন্য বিখ্যাত। ১৭৬৪ সালে সার্ভেয়ার জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি আশা প্রকাশ করেন অতঃপর অন্তত পাঁচ-ছয় হাজার পাউন্ড নিয়ে ঘরে ফিরব, ব্যবসায় হাত লাগাতে পারলে আরও বেশি। কিন্তু সেই সুখ-স্বপ্ন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ, দিন পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। তারই মধ্যে যাঁরা "টাকার গাছ" "প্যাগোডা-ট্রি" ঝাকিয়ে মোহর কুড়িয়ে নিয়ে

যেতে পেরেছেন তাঁরাই সত্যকারের হবু নাবব।

এতকাল বিলিতি সমাজ বিন্যাসে একটা মোটামুটি বাঁধাধরা ছক ছিল। ব্যবসা করতে যাঁরা দেশের বাইরে যেতেন, ফিরে এসে তাঁরা ব্যবসাতেই টাকা খাটাতেন। কিন্তু এবার যাঁরা ফিরছেন তাঁরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষের দল। তাঁরা না ব্যবসায়ী, না অভিজাত,—'মাশরুম জেন্টলম্যান' বা ব্যাঙের ছাতা মাত্র। ইংল্যান্ড হাসিমুখে তাঁদের বরণ করে নিতে প্রস্তুত নয়। কেননা, প্রচলিত সমাজে আপন নির্দিষ্ট আসনের বাইরে পা বাড়ানো তার কাছে সঙ্গত আচার নয়। অর্থও সেদিনের ইংল্যান্ডের কাছে ততখানিই দৃষ্টিকটু নয়, যতখানি বংশগত আভিজাত্যকে রক্ষা করার জন্য আবশ্যক। রাজা তৃতীয় জর্জ তাই একজন ছাড়া আর কাউকে লর্ড বানাতে রাজি হননি। 'আনজেন্টলি রিচ' বা 'অন্যপন্থায় অত্যধিক দৌলতের অধিকারী' হঠাৎ 'নাববরা' তাঁর চোখে মোটেই সম্মানের পাত্র নয়! সুতরাং, কলকাতায় যে 'নাবব' ছিলেন মহামহিম রাজচক্রবর্তী বিশেষ, স্বদেশে পা দেওয়া মাত্র তাঁদের পরিচয় হয়ে দাঁড়াল— 'দি প্লান্ডারার্স!' '—বান্ডিটস!' ইত্যাদি। এমনকী খোদ কোম্পানিরও নতুন করে নামকরণ হল। কখনও সে 'দ্যাট হরিবল্ সোসাইটি'! কখনও বা—'এ ব্রাদারহুড অব ঠগস!' হিকি লিখেছেন দ্বিতীয়বার তাঁর ভারত যাত্রার সময়ে জাহাজ ঘাটায় তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসে এক বন্ধু তাঁর হাতে একটি তলোয়ার তুলে দিয়ে বলেছিলেন—বুঝতে পারলে না, কেন দিচ্ছি? গিয়েই গোটা ছয় মানুষের গলা কেটে ফেলবে, তারপর পরের জাহাজেই 'নাবব' হয়ে ফিরে এস!

ক্রমে সমালোচনা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'নাবব'কে উপলক্ষ্য করে কাগজে কাগজে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা এবং চিঠি বের হতে লাগল। ফুট নাটকে তাঁদের বড়মানুষির মুখে বিদ্রূপের চাবুক হেনেছিলেন, কবিরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন।

'দ্য নাবব অব এশিয়াটিক প্লান্ডারার্স' নামে বিয়াল্লিশ পাতা জুড়ে এক কাব্য কাহিনী প্রকাশিত হল। তার একটি ছত্র—'দেয়ার ব্রেস্টস আর স্টোন, দেয়ার মাইন্ডস অ্যাজ হার্ড অ্যাজ স্টিল!" আর এক কবি লিখলেন (পাবলিক অ্যাডভারটাইজার, মে, ১৭৭৩):

> When the rich realms, where Alexander toiled,
> Shall by a pettifogger's son be spoiled;
> While London city oppress the Eastern glebe,
> And pedlars fill the thrones of Aurang-zebe! ইত্যাদি।

'পেটিফগারস সান', বলাবাহুল্য, ক্লাইভের প্রতি তির্যক দৃষ্টিনিক্ষেপ মাত্র । সমাজে তখন এই 'হঠাৎ নাববের' দল দেশের পক্ষে এক অপমানজনক অস্তিত্ব। সবাই তাঁরা—হয় 'দারোয়ান-তনয়', অথবা 'দাসীপুত্র'। শুধু তাই নয়—হৃদয়হীন এই পাষণ্ডের দল প্রত্যেকেই হাজার হাজার নেটিভের হত্যাকারী। হিন্দুস্থানে তাঁদের কেউ একশো নিরীহ মানুষ খুন করে এসেছেন,—কেউ বা পঞ্চাশ হাজার। এঁদের দিকে মুখ তুলে তাকানোও পাপ। ১৭৮৫ সালে হে মার্কেট থিয়েটারে 'দ্য মোগল টেল' নামে একটি হাসির নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। তার প্রতিপাদ্য বিষয়, জনৈক অভিযাত্রী ইংরেজের ভারতদর্শন। বেলুনে করে ভাসতে ভাসতে লোকটি এসে প্রবল প্রতাপ মুঘল বাদশার সামনে হাজির হল। বাদশাহ বললেন—দরিদ্র জেন্টুদের ওপর তোমার দেশবাসীরা এমন হৃদয়হীন ব্যবহার করেছে যে তার কাছে আমার অত্যাচার কিছুই নয়। বুঝলে হে ইলিংশম্যান, আমি তাই ঠিক করেছি এখন থেকে আমি কোমল, ন্যায়নিষ্ঠ এবং হৃদয়বান বাদশা হব! বাদশার সে কথা শুনে, দর্শকের সে কী হাসি!

ইংল্যান্ড 'নাবব'কে নিয়ে এমন হাসিতে মত্ত হয়েছিল নানা কারণে। তার মধ্যে প্রধান কারণ অবশ্যই ঈর্ষা। দেশে তখন চেস্টারফিল্ডের যুগ। 'স্যার', 'ম্যাডাম' ইত্যাদি ভদ্রজনের মুখে একমাত্র শোভনীয় সম্ভাষণ। সার্কাস ছাড়া সে যুগ অন্য কোনও আমোদ জানে না, কান্ট্রি-জেন্টলম্যান অথবা

ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণীর অস্তিত্ব ভাবতে পারে না। তাও এই দুই শ্রেণী মর্যাদায় সমান নয়। জোতদার ভূস্বামীর চোখে দ্বিতীয় শ্রেণী অনিবার্যভাবেই নিকৃষ্ট। 'নাবব' রাতারাতি সেই শ্রেণী বিন্যাসে তছনছ ঘটিয়ে বসলেন। তাঁরা তা না করলেও অবশ্য পুরানো প্রাসাদ একদিন ভেঙে পড়ত। কেননা, দিকে দিকে অভিযাত্রা শুরু হয়েছে,—রাজ্য সাম্রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। আফ্রিকা এবং ক্যারিবিয়ানের অজ্ঞাত কুলশীলরা সমাজে পরিচয় চাইছে। তবুও বিশেষ করে ভারত-ফেরত 'নাববের' দলই সেদিন আক্রমণের প্রধান লক্ষ হয়েছিলেন—কারণ তাঁরা প্রকাশ্যেই পুরানো ধারার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র এক জীবনরীতির সূচনা করতে মনস্থ করেছেন। সে রীতির প্রথম এবং শেষকথা—নবাবিয়ানা।

যেমন কলকাতায় কিংবা মুর্শিদাবাদে, ঠিক তেমনি স্বদেশে। 'নাবব' দেশে ফিরেও নবাবের মতো থাকেন। নবাবিয়ানা ছাড়া জীবনে তাঁর যেন আর কোনও ক্রিয়া নেই, কর্তব্য নেই। তিনি ব্যবসায়ে টাকা খাটাবার কথা ভাবতে পারেন না, অন্য কোনও জীবিকাও তাঁদের কাছে অসহ্য। দেশের মাটিতে নেমেই তাঁর প্রথম এবং প্রধান কাজ গ্রামাঞ্চলে লোক দেখানো একটি প্রাসাদের বন্দোবস্ত করা। তারপর যদি সম্ভব হয় একবার পার্লামেন্টে গিয়ে বসা। ১৭৬০ থেকে ১৭৮৪ সালের মধ্যে অন্তত্পক্ষে তিরিশ জন 'নাবব' পার্লামেন্টে সম্মানের আসনগুলো অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁরা এই দুরূহ কাজ সম্ভব করেছেন জনপ্রিয়তা নয়, অর্থ বলে। তৎকালে ব্রিটেনে পার্লামেন্টে আসন কেনা-বেচা চলত না এমন নয়, কিন্তু নাববরা সে খেলাকে পুরোপুরি নগ্ন করে দিয়েছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে অবশ্য ভারত-ফেরত রাজনীতিকরাও ছিলেন। কেউ লড়েছেন ক্লাইভের তরফে কেউ হেস্টিংস-এর। পার্লামেন্টকে নিজের অনুকূলে আনার জন্য সেটাও ছিল নবাবিয়ানার বাইরে অন্যতম লক্ষ। কোম্পানির শেয়ার কেনা, আর পার্লামেন্টের আসন দখল আসলে নাববের কাছে তখন এক অর্থে অস্তিত্বের লড়াই। তার জন্য অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিরও মুখোমুখি হতে হয়েছে কাউকে কাউকে। কোন কাজই বা পুরোপুরি বিঘ্নহীন। তবে বাড়িই ছিল তাঁদের প্রথম নেশা।

'নাবব' বারওয়েল দেশে ফেরেন ১৭৮০ সালে। হাজার পাউন্ড দিয়ে তিনি লর্ড হ্যালিফাক্সের বাড়ি এবং আশপাশের জমিটুকু কিনে সেখানে আস্তানা গাড়লেন। এই এস্টেটের বার্ষিক আয় দু হাজার পাউন্ড! তাতে হয়তো দিব্যি দিন চলে যেত, কিন্তু নাববের তখনও তেমনি কড়া মেজাজ। মালিক হয়েই তিনি আশপাশের গ্রামবাসীদের তাঁর জমির কোনও সুবিধা ভোগ করতে দিতে রাজি হলেন না। সেটা পুরনো মালিক কোনওদিন ভাবতেও পারেননি। সুতরাং, 'নাবব' অচিরেই প্রতিবেশীদের ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখলেই পাড়ার লোকেরা টিটকারি দিতেন, উপহাস করতেন। উপায়ান্তরহীন বারওয়েল অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু ততদিন অখ্যাতি যা হওয়ার হয়ে গেছে,—কলকাতার মতো সাসেক্সেও তিনি 'নাবব' বলেই নাম করে ফেলেছেন! লন্ডনে নিয়মিতভাবে আঠারো চেয়ারে টেবিল সাজিয়েও বারওয়েল সে অপবাদ কোনওদিন কাটাতে পারেননি,—তাঁর শেষ দিনগুলো নির্বাসিত ভারতীয় নাববদের মতোই একান্তে মনমরা অবস্থায় অতি দুঃখে কেটেছে।

জমি, আর জমি। সব 'নাববের' জমি চাই। কলকাতার লটারি টিকিটে পর্যন্ত তখন (১৭৯১) প্রথম পুরস্কার মিডলসেক্সে মনের মতো এস্টেট। দ্বিতীয় পুরস্কারও তাই, তবে এস্টেটটি এবার অপেক্ষাকৃত ছোট। সে লটারির টিকিটের দাম ছিল প্রতিখানা দুশো সিক্কাটাকা। তা হলেও সেবার টিকিট বিক্রি হয়েছিল তেরো হাজার পঁয়ত্রিশখানা। 'নাববের' নজরে তামাম দুনিয়ায় তখন এর চেয়ে আর বড় পুরস্কার নেই। বারওয়েল কিনলেন সাসেক্সের স্ট্যানস্টেডে, স্যার ফ্রান্সিস সাইকস বার্কসায়ারে, মেজর চার্লস মারসাক অক্সফোর্ডসায়রে, এবং অন্যরা যে যেখানে পারেন সেখানে। মাদ্রাজের গভর্নর রবার্ট পাক ডেভনশায়ারের বিখ্যাত হলড্যান হাউস কিনলেন। কেনার পর নাববি কায়দায় আবার তিনি তা ভেঙে গড়লেন। এবার বাড়িটি দেখলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় কোনও বাকিংহাম প্যালেস। রবার্ট তারই

আদলে তাঁর বাসস্থানটি তৈরি করিয়েছেন! আর এক 'নাবব' উইলিয়াম হর্নবি তেতাল্লিশ বছর ভারতে ছিলেন। তার মধ্যে তেরো বছর কেটেছে তার বোম্বাইয়ের গভর্নরের আসনে। ১৭৮৪ সালে দেশে ফিরে তিনি হ্যাম্পশায়ারের উপকূলে হুকহাউস নামে একটি বাড়ি তৈরি করলেন। সে বাড়ি হুবহু বোম্বাইয়ের গভর্নর হাউস! বোঝা যাচ্ছে,—'নাবব' তখনও তাঁর সাধের দোলনা ভারতের কথা ভুলতে পারেননি।

বাড়ি, সংলগ্ন বাগান, ইত্যাদি মিলিয়ে একদা অভিজাতদের ভদ্রাসনগুলো দখল করার জন্য নাববদের অর্থও খরচ করতে হয়েছে জলের মতো। বারওয়েল তাঁর পছন্দের বাড়িটি কিনেছিলেন ৯০ হাজার পাউন্ডে। এক সময় তার দাম উঠেছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার পাউন্ড। কিন্তু বারওয়েল পেয়ে গেলেন অনেক কম দামে। কারণ, দাম মিটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি হাতে হাতে,—নগদে।

লর্ড পিগট হাম্পশায়ারে যে বাড়িটি দখলে পেয়েছিলেন তার জন্য তাঁকে দিতে হয়েছিল ১ লক্ষ পাউন্ড। বাড়ি মানে শুধু অট্টালিকা নয়। বাগান এবং জমিও। নাববরা ইচ্ছা মতো বাড়ি ভাঙচুর করেছেন। নতুন করে গড়েছেন! নবাবিয়ানার যা রীতি।

শুধু বাড়ি তৈরি নয়, বাড়ির সাজসজ্জায়ও সেই ভারতে অতিবাহিত সুবর্ণ দিনের স্মৃতি মন্থন। স্যার রবার্ট বার্কার ভারতে সেনাপতি ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি বিখ্যাত শিল্পী টিলি কিটলকে ডেকে বিরাট বিরাট দুটি ছবি আঁকালেন। তার একটিতে দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার রবার্ট ফয়জাবাদে রোহিলাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করছেন। অন্যটির বিষয়বস্তু অযোধ্যায় নবাব কর্তৃক ব্রিটিশ বাহিনীর অভ্যর্থনা। ভূতপূর্ব সেনাপতির বিরাট প্রাসাদে পা দিলেই সকলের আগে চোখে পড়ত এই দুটি চিত্র। আর এক 'নাবব' উইলিয়াম ফ্রাঙ্কল্যান্ড ১৭৬০ সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে বাংলা থেকে তুর্কির বেশে বাগদাদ-জেরুসালেম হয়ে স্থলপথে দেশে পৌঁছেছিলেন। তিনিও বাড়ির দেওয়ালে তাঁর জীবনের সেই স্মরণীয় ঘটনাটির চিত্ররূপ ঝুলিয়েছিলেন।

শুধু কি পটে লেখা ছবি। ইংল্যান্ডে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এমন অনেক ঘর বাড়ি, গির্জা, স্মৃতিস্তম্ভ, কুয়ো, এমনকী ফায়ার-প্লেস পর্যন্ত যা ভারতের স্মারক। তার মধ্যে কিছু কিছু স্থাপত্য-ভাস্কর্য যদি কোম্পানি বা রাজ সরকারের উদ্যোগে গড়া, তবে অনেক স্মারকই মূলত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। একালে সে-সব নিয়ে রীতিমতো বইপত্রও লেখা হচ্ছে পশ্চিমে। যথা: রেমন্ড হেড-এর লেখা "দ্য ইন্ডিয়ান স্টাইল" ("The Indian Style")

শুধু এই পরোক্ষ স্মৃতিচারণ নয়,—দেশে ফেরার পরও 'নাবব' যে হিন্দুস্থানের মায়া কাটাতে পারছেন না, প্রতিবেশীরা ক্রমে তার পরিচয়ও পেলেন। কেউ কেউ সঙ্গে করে এদেশের ভৃত্য খানসামাদের বয়ে নিয়ে যেতেন। হিকি মুন্না নামে একটি কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি ওর নাম দিয়েছিলেন উইলিয়াম মিন্নাউ। কেউ কেউ সঙ্গে করে তাঁর ঘোড়া-কোচম্যান সমেত তাঁর অতি প্রিয় ছ'ঘোড়ার গাড়িটি পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। চৌরঙ্গির কায়দায় আগে পিছে হরকরা চোপদার সাজিয়ে 'নাবব' যখন সে গাড়িতে সান্ধ্যভ্রমণে বের হলেন—ইংল্যান্ড, অষ্টাদশ শতকের মৃতপ্রায় প্রাচীন ইংল্যান্ডের পক্ষে তখন আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। বাড়ি, এমনকী টাকা-পয়সার বাড়াবাড়িও তবু সহ্য হয়, কিন্তু এ নবাবি! ওঁরা প্রকাশ্যে নাববের নৈতিকতায় প্রশ্ন তুললেন। সকলে সমবাক্যে বললেন—ওরা ইংরেজের কেউ নয়, সমাজের তলানি মাত্র। বিখ্যাত নাবব স্যার টমাস রামবোল্ড সম্পর্কে বেনামে লেখা পদ্য প্রচারিত হল:

"When Macreth served in 'Athens' crew
He said to Rambold,' 'Black My shoe';
He humbly answered 'yea Bob'
But when returned from Indian's land

And grown too proud to brook command,
His stern reply was 'No-bob'!"

'নাবব' রামবোল্ড তখন পার্লামেন্টের সভ্য হয়েছেন! কাগজে কাগজে প্রতিদিন নাববের কুৎসা প্রচারিত হতে লাগল। কেউ লিখলেন: লজ্জার কথা, সেদিন জনৈক 'নাবব' এক ভদ্রসম্মেলনে হাজির হয়ে, যে অসৌজন্য দেখিয়েছেন তা লিখতেও লজ্জায় আমাদের মাথা নুইয়ে আসে। 'নাববে'র এমন দুঃসাহস তিনি তাঁর সঙ্গে করে সেখানে একজন মিস অমুককে নিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি আসলে একজন রূপোপজীবিনী! অন্য একজন লিখলেন: সাবধান, কোনও ভদ্রমহিলা যেন ভুলেও কখনও কোনও নাববের সঙ্গে না নাচেন। 'নাবব' তখন দাস-ব্যবসায়ী, ওয়েস্ট ইন্ডিজের খামার মালিকের চেয়েও ঘৃণ্য এক অসামাজিক জীব। তারা ভাল বাড়ি কেনে, ভাল খায়, যত খায় তার চেয়ে বেশি অপচয় করে, ছড়ায়। তারা ডুয়েল লড়ে, জুয়া খেলে,—মাত্রাহীন বিলাসে গা এলিয়ে দিয়ে ভদ্রসমাজকে ব্যঙ্গ করে। একজন স্পষ্টতই খবরের কাগজে খেদ করে চিঠি লিখলেন: দিনকাল যা পড়েছে দেখতে পাচ্ছি প্যাট্রিয়ট, নাবব আর সুগার প্ল্যান্টারদেরই যেন কাল পড়েছে। কান্ট্রি-জেন্টলম্যান নামে প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত নামটি হয়তো এরপর ওয়েস্টমিনিস্টারে কোনও গির্জায়ই হারিয়ে যাবে! আরও নানা গুজব। খবর বের হল কলকাতা-ফেরত জনাকয় 'নাবব' সুদূর বাংলাদেশে জনৈকা অসহায় বৃদ্ধার জন্য কুড়ি পাউন্ড সাহায্য দিচ্ছেন। ভদ্রমহিলাকে ওঁরা প্রবাসজীবনে চিনতেন। তাই শুনে চারিদিকে সে কী গুজব। একদল রটিয়ে দিল—দিনকয় আগে লন্ডনে একজন 'নাবব' নেমেছে। সঙ্গে করে চার লক্ষ পাউন্ড নিয়ে এসেছে। লন্ডনে তার এক বোন ছিল। মেয়েটি দুঃস্থা। 'নাবব' তার খোঁজ করেছিল বটে, কিন্তু বোনকে কী দিয়েছে জান?—মাত্র এক মোহর। অর্থাৎ, এই আমাদের 'নাবব'। ওঁরা নিজের বোনের খোঁজ রাখে না,—চাঁদা পাঠায় কলকাতায়।—হুঁ! ঈর্ষাকাতর বাড়িওয়ালা হিন্দুস্থান-ফেরত ভাড়াটের মেয়ের গায়ে একটু ভাল পোশাক দেখামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে ভাড়া বাড়িয়ে দিচ্ছেন তখন।

এই সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে, বলাবাহুল্য, 'নাবব' ক্রমে এক অসহায় জীবে পরিণত হলেন। কলকাতার কাগজগুলো তাঁদের যোগ্য আসনের জন্যে দরবার করতে লাগলেন। এখানে চিঠি ছাপা হতে লাগল—আমরা খবর পাচ্ছি, ইস্ট ইন্ডিয়ানরা নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে আছেন, কেউ তাঁদের খাতির করেন না। কলকাতা প্রবাসী কবি কেঁদে কেঁদে কবিতা লিখলেন—হাউ লং ব্রিটানিয়া!—ব্রিটেন, আর কতকাল তোমার কোলের সন্তানেরা ধূলায় গড়াগড়ি যাবে। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হল না। হিন্দুস্থানী টবের ফুল 'নাবব' ধীরে ধীরে তাঁর অবধারিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চললেন। ভারত-ফেরত মাত্রই অবশ্য ঝরে গেলেন না। কেননা, সকলে সমান 'নাবব' নন। বাংলার গভর্নর (১৭৭০—৭২) জন কর্টিয়ার আদর্শ 'নাবব' ছিলেন। তিনি কেন্টের এক কোণে নিরিবিলি জীবনযাপন করতেন। তিনি শেষদিন পর্যন্ত সকলের শ্রদ্ধা পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ 'সায়েন্টিফিক নাবব' বা বৈজ্ঞানিক 'নাবব' ছিলেন। তাঁরা নিজের ঘরে বসে নিজের পয়সায় বিজ্ঞান চর্চা করতেন। জন ওয়েলস নামে একজন ছিলেন। তিনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে চিঠিতে বিজ্ঞানালোচনা করতেন। আর একজন, ভূতপূর্ব মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল জন কল—শেষ পর্যন্ত রয়্যাল সোসাইটির সভ্য পর্যন্ত হয়েছিলেন! কিন্তু তাঁরা ভারত-ফেরত মাত্র, সাচ্চা 'নাবব' নন। সাচ্চা 'নাবব' সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তাঁরা লন্ডনে জেরুসালেম কফি হৌস বসিয়েছেন, দু'বেলা 'কারি এন্ড পিলাউ' মারেন, আগেপিছে নেটিভ ফুটম্যান সাজিয়ে মেদিনী কাঁপিয়ে বগি হাঁকান। তাঁরা মদিরা ছাড়া মদ চেনেন না, ডুয়েল ছাড়া তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা জানেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই 'কারি' এবং 'পিলাউ' 'নাববি' লন্ডনে এক রীতিমতো চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। 'নাবব' লন্ডনে বহু জিনিস আমদানি করেছিলেন। ভারতীয় কোচম্যান থেকে শুরু করে বাঘ,

সিংহ, বেড়াল—সব। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছিল নাকি এই 'কারি' আর 'পিলাউ'। 'নাববের টেবিলে তো বটেই, —কারি নিয়ে তখন রেস্টুরেন্টগুলোতেও রীতিমতো কাড়াকাড়ি। দ্রষ্টব্য: এই বইয়ের 'কারি-কাহিনী'। সবচেয়ে নামডাক তখন (১৭৭৩) হে মার্কেটের নোরিস স্ট্রিট কফি হাউসের কারির। সময়ে সেখানে পৌঁছনোর জন্যে লন্ডনের ছোকরাদের মধ্যে সে কী হুড়োহুড়ি। দ্বিতীয় বিখ্যাত কারি ২৩ নং পিকাডেলির সোর্লিস পারফিউমারি ওয়ারহাউসের। ১৭৮৪ সালে এক বিজ্ঞাপনে সে কারির গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে ওঁরা জানিয়েছিলেন—'It renders the stomach active in digestion—The Blood naturally free in circulation—The Mind vigorous, —and contributes most of any Food to an increase of Human Race!'

কারি ছাড়া নাববি-আমলের ইংল্যান্ডে আর একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ 'এশিয়াটিক টুথ পাউডার'। তার বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে: স্টিল কেপ্ট ইন সিক্রেট ইন ইন্ডিয়া ফ্রম ইউরোপিয়ানস!'—ভারতের গোপন রহস্য!—গোপন রহস্য!

পাতাবাহারে রঙের অভাব ছিল না। কিন্তু হায়, বেচারা 'নাবব' তবুও শেষরক্ষা করতে পারলেন না। হিন্দুস্থানের নাববদের মতোই ওঁরা ক্রমে বিবর্ণ হতে হতে অবশেষে ঝরে পড়লেন। নৈরাশ্যে কেউ আত্মহত্যা করলেন, কেউ পাগলাগারদে আস্তানা পেলেন, কেউ বা বেনফিল্ড অথবা রিচার্ড স্মিথ হলেন।

'নাবব' পল বেনফিল্ড ছিলেন একটু অন্যধরনের 'নাবব'। দেশে ফিরে তিনি ব্যাঙ্কার হয়েছিলেন। কিন্তু নাববের সেই স্বভাব যাবে কোথায়? ডারহামের জনৈকা মিস সুইনবার্নকে ঘরে আনতে গিয়ে পুরনো রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সাহেবের মনে পড়ে গেল তিনি 'নাবব'। সুতরাং কনের আংটি বাবদেই তিনহাজার পাউন্ড উড়ে গেল, আর তিন হাজার পাউন্ড গেল অন্য কী আর একটা গয়নায়। 'নাবব' তাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়ার লক্ষণ দেখালেন না। তিনি স্ত্রীর হাত ধরে বললেন—ভাবছ এ-ই আমার সব? মোটেই তা নয়। চার্চে দাঁড়িয়ে বলছি, এর পর থেকে হাতখরচা ছাড়াও আমার স্ত্রী হিসেবে তুমি বছর বছর পাঁচশো পাউন্ড করে পাবে! বলা নিষ্প্রয়োজন, মিসেস বেনফিল্ড জীবনে তা কোনওদিন পাননি। কেননা, পল বেনফিল্ড সম্পর্কে পরবর্তী খবর যা জানা যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়—তিনি প্যারিসে চরম দুরবস্থার মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন,—চাঁদা তুলে তাঁর শেষকৃত্যের যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

একই কাহিনী জেনারেল রিচার্ড স্মিথের। বিলিতি নাবব-নামায় তিনি 'নাবব অব নাববস'। তাঁকে নিয়েই স্যামুয়েট ফুটের বিখ্যাত নাটক 'দ্য নাবব'। স্মিথ সেখানে অবশ্য স্মিথ হিসেবেই নেই,—নাম তাঁর স্যার ম্যাথু মাইট। সংক্ষেপে তাঁর কাহিনীটি নিম্নরূপ।

রিচার্ড স্মিথ একজন নাবব। হিন্দুস্থানে তিনি বেঙ্গল আর্মির একজন জেনারেল ছিলেন। ১৭৬৯ সালে দেশে ফিরে স্মিথ বার্কসায়ারে একটি বাগান-বাড়ি কিনলেন। তৎসহ গুটিকয় রেসের ঘোড়া। বার্কসায়ারের চিলটার্ন লজ-এর মালিক নাবব স্মিথ বিখ্যাত জকি-ক্লাবেরও একজন সদস্য। ১৭৮০—৮১ সালে স্বদেশের রেসের মাঠে তিনি এক স্মরণীয় নাম। ঘোড়া ছাড়াও নাবব স্মিথের অন্য ব্যাধি ছিল। তিনি অন্যতর জুয়াতেও আসক্ত ছিলেন। শোনা যায়, এক আসরেই নাবব চার্লস জেমস-এর কাছে আঠারো লক্ষ পাউন্ড হেরেছিলেন। কিন্তু 'নাবব' স্মিথ তাতেও দমেননি। একদিন সেন্ট জেমস স্ট্রিটের এক হোটেলে গিয়ে তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য: ক্ষণিক বিশ্রাম করবেন। শোবার আগে বাটলারকে কাছে ডেকে নাববাহাদুর বললেন—দেখ, অন্তত হাজার তিনেক গিনি নিয়ে যদি কেউ খেলতে আসে তবেই আমাকে ডেকো,—নয়তো মিছেমিছি আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।

জাত-নাবব। স্বভাবতই ক্রমে পার্লামেন্টের দিকেও স্মিথের নজর পড়ল। বিশেষ করে স্মিথ যখন

বুঝতে পারলেন, সেখানকার ওই সম্মানের আসনগুলোও কাঞ্চনমূল্যের অতীত নয়, তখন তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। রিচার্ড স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেদিকে হাত বাড়ালেন। তিনি হাউস অব কমন্স-এ এলেন। শুধু তাই নয়, নিজে তো এলেনই চার হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে প্রিয় সাগরেদ মেজর স্কটের জন্যেও আর একখানা আসন জোগাড় করলেন। কিন্তু, ঘরে ইংরেজের সততা গঙ্গাতীরের 'সতী'দের মতো। বিশেষত আসামী যেখানে 'নাবব'। ওঁরা দুর্নীতির দায়ে স্মিথকে আসনহীন করে ফেললেন। এমনকী ছয়শো ছেষট্টি পাউন্ড জরিমানা পর্যন্ত হয়ে গেল তাঁর। তদুপরি ছ' মাসের কারাবাস! 'নাববের' নিগ্রহ সেখানেই শেষ হল না। পার্লামেন্টের 'দ্বাররক্ষীদের' পরেই পেছনে লাগল পাওনাদারেরা। 'নাবব' স্মিথ আজ এখানে, কাল সেখানে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। দেখতে দেখতে (১৭৯২) আরও অসংখ্য 'নাববের' মতো তিনিও হারিয়ে গেলেন। সম্ভবত তিনিই আমাদের দেশের মাটিতে জাত, মুর্শিদাবাদ-লক্ষ্মৌর জল হাওয়ায় লালিত বিচিত্র সেই অর্কিডটির শেষ পাপড়ি, নাম ছিল যার—লর্ড নয়, ব্যারন নয়, নাইট নয়,—'নাবব'।

তারপরেও অবশ্য শ্বেতদ্বীপে মাঝে মাঝে শোনা যেত, কোনও কোনও 'নাবব'-এর কাহিনী। কিন্তু তারা কেউ চৌরঙ্গি বা চুঁচুড়া-ফেরত ইংরেজ সন্তান নয়,—চতুষ্পদ ঘোড়ামাত্র। রেসের বইয়ে 'নাবব' তখন হয়তো বেপরোয়া কোনও ঘোড়ার নাম!

এই রচনায় ব্যবহৃত প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বইয়ের নাম:

Echoes From Old Calcutta, 4th Edition, H.E. Busteed, London, 1908.

Nabobs of Madras, H.H. Dodwell, London, 1926.

The Nabobs in England, 1760-1785, Jems M. Holzman, Newyork, 1926.

The Nabobs, Percival Spear, London, 1932.

The Nabob, Samuel Foote, London.

The Thackearys in India and Some Calcutta Graves, Sir W.W. Hunter, London, 1879.

Memoirs of William Hickey, (Ed.) Peter Quennell, London, 1960.

"Prosperous" British India, A Revelation from Optical Records, William Digby, London, 1901

The Empire of the Nabobs, H.L, Hutchinson, London, 1937.

Clive of India, Mark Bence-Jones, London, 1974.

Clive of India, Nirod C Choudhury, London, 1975.

East Indian Fortunes, P.J. Marshall, London, 1976.

The Honourable Company, A History of the East India Company, John Keay, London, 1991.

The Indian Style, Raymond Head, London, 1986.

Treasures from India, The Clive Collection at Power Castle, Mildred Archer, Christopher Rowell, Robert Skelton, London, 1987.
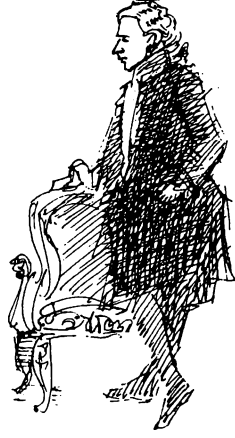
দুটি প্রেমের উপাখ্যান, গদ্যে ও পদ্যে

"আমি ব্রাহ্মণ! তুমি হবে আমার ব্রাহ্মণী।...দোহাই তোমার, কোনও ধনবান নবাবের হাতে নিজেকে তুলে দিও না তুমি। আমি নিজেই বিয়ে করতে চাই তোমাকে। আমার স্ত্রী বেশি দিন বাঁচবে না। এর-ই মধ্যে সে বিকিয়ে দিয়েছে তার সব ঐশ্বর্য। তোমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনও মেয়েকে আমি জানি না যে ভরে তুলতে পারে তার সেই শূন্য স্থান। সত্য বটে, আমি পঁচানব্বই এবং তুমি মাত্র পঁচিশ। ব্যবধানটা খুবই বেশি হয়ে গেল,—তাই না? কিন্তু ভয় পেও না তুমি। যৌবনের অভাবটা আমি পুষিয়ে নেব জানবে আমার বুদ্ধিতে, আমার নির্মল রহস্যালাপে। সুইফট কোনওদিন তাঁর স্টেলাকে এমন করে ভালবাসেনি। অথবা স্ক্যারন তাঁর মেনটেনকে কিংবা ওয়েলার তাঁর স্কারিনাকে; যেমন করে আমি ভালবাসব তোমাকে, হে আমার মনোনীতা! আমি তোমাকে ভালবাসব, আমি তোমার গান গাইব।"

পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট ভালবাসার চিঠি। এ চিঠিতে কোনও সাজানো কথা নেই, কোনও মিথ্যে নেই। যা আছে, তা বোধহয় সামান্য একটু হেঁয়ালি। তাও বাইরের লোকের কাছে। যাঁকে এ চিঠি লেখা হয়েছিল একদিন, তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল না এর একটি কথাও। তিনি জানতেন, কেন খাঁটি অ্যাংলোস্যাক্সন রক্তের মানুষটি এমন করে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলছেন আজ, আর কেনই বা তাঁর চুয়ান্ন বছরের বার্ধক্যকে ঠেলে দিতে চাইছেন অসহায় পঁচানব্বই-এ।

ব্যাপারটা হৃদয়গত। কিন্তু লোকে বলে—সেন্টিমেন্টাল। কারণ, দুনিয়ার লোকের কাছে এ চিঠির প্রথম ও প্রধান পরিচয় সাহিত্য হিসাবেই। বিশ্ববিখ্যাত 'দ্য সেন্টিমেন্টাল জার্নি' আর সব পরিচয় তাদের কাছে গৌণ। উদ্ধৃত বাক্যগুলো সে-বইয়ের একটি দীর্ঘতর উচ্ছ্বাসের অংশ। তা ছাড়া সবাই জানেন, 'সেন্টিমেন্টাল জার্নি'র লেখক অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের একজন বিখ্যাত কথাশিল্পী—তিনি লরেন্স স্টার্ন (১৭১৩-১৭৬৮)। সুতরাং, তাদের মতে এসব বাক্য আসলে হয়তো একধরনের সেন্টিমেন্টাল জার্নি। মনে মনে ফুল ফোটানোর গল্প। এগুলো লেখা হিসাবে যতখানি, ঘটনা হিসাবে ঠিক ততখানি নয়।

কিন্তু ব্রাহ্মণী বলেন—না, তা নয়। এ চিঠির কোথায়ও মিথ্যে নেই এক ফোঁটা। 'স্টার্নকে সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম আমি। নম্র ভদ্র উদার 'যুবক' স্টার্ন সত্যিই ছিলেন আমার বিশ্বাসের পাত্র। তাঁকে অবিশ্বাস করি এমন সাধ্য ছিল না আমার।'

কেন তেইশ বছরের একটি বিবাহিত মেয়ের মনে চুয়ান্ন বছরের এক বৃদ্ধকে অস্বীকার করার শক্তি

ছিল না সেদিন তা বুঝতে হলে ব্রাহ্মণীর পুরো কাহিনীটিই শুনতে হয় আমাদের।

'ব্রাহ্মণী' মানে এলিজা। এলিজা ড্রেপার। অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের বনেদি লেখক স্টার্ন মনে মনে ব্রাহ্মণ সেজেছিলেন সেদিন, কারণ—এলিজা জন্মেছিলেন ব্রাহ্মণদের দেশে, ভারতবর্ষে। কলকাতায় নয়, মালাবার উপকূলে, আঞ্জেনগোতে।

বাবা মে স্ক্লেটার ছিলেন কোম্পানির একজন রাইটার। ইংরেজদের স্থানীয় স্টোরে কাজ করতেন। এখানেই, মালাবারের নারকেল কুঞ্জ, এলোমেলো সমুদ্রের হাওয়া, আর কালো মানুষের ভিড়ে ১৭৪৪ সালের এক সকালে জন্ম নিল এলিজা।

আঞ্জেনগো ব্রাহ্মণের গাঁ। গাঁয়ের বামুন বউ দেখে বলল—মেয়েটা মেমসাহেবের মতো ফর্সা হল না যেন। স্টোরের আর আর সাহেবেরা বললেন—এলিজা যেন ইউরোপিয়ান নয়, ইউরেসিয়ান। গায়ের রং পাকা ইংরেজের নয়, ঈষৎ পীত। এলিজা যেন পীত ব্রাহ্মণকন্যা।

তবুও যেই দেখে সে-ই মায়া ছাড়তে পারে না মেয়েটার। কী যেন আছে ওর চোখে, ওর মুখের ডৌলে। জেমস ফরবেসের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল ওর। এলিজা তখনও কিশোরী। ফরবেস লিখেছেন: ওর পরিপূর্ণতা আমার কলমের ধার ধারে না। আঁরে রেনাল—ফরাসি দেশের লোক। প্যারিসে অনেক মেয়ে দেখেছেন তিনি। কিন্তু এলিজা দেখেছেন মাত্র একটিই। তিনি লিখে গেছেন—আঞ্জেনগো তুমি ধন্য, কারণ এলিজা তোমার কোলে জন্মেছে।

কেউ কেউ বলেন—বাচ্চা বয়সে একবার ওকে দেশে পাঠানো হয়েছিল লেখাপড়া শেখবার জন্যে। কেউ কেউ বলেন—তা সত্য নয়। এলিজা পুরোপুরিই হিন্দুস্থানের মেয়ে। ওর লেখাপড়া বলতে যা তা ওর কাকার বাড়িতেই। অর্থাৎ রাজমুণ্ডিতে। পরবর্তী গবেষণায় জানা গেছে অন্য বোনদের সঙ্গে এলিজা ছিলেন ইংল্যান্ডের এক বোর্ডিং-হাউসে, ঠাকুর্দার তত্ত্বাবধানে। ওরা এদেশে ফিরে আসে ১৭৫৭ সালে। এবং এবার আর আঞ্জেনগোতে নয়, খাস বোম্বাইয়ে। বাবা তখন সেখানে কোম্পানির কর্মচারী। এলিজা তখন চৌদ্দ বছরের কিশোরী। এমন সময় হঠাৎ একদিন তাঁর মুখোমুখি কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী ডানিয়েল ড্রেপার। ড্রেপার বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারি। সুতরাং, খ্যাতিমান লোক। স্টোর কিপার-এর মেয়েটাকে চোখে লেগে গেল তাঁর। তিনি এলিজার বাবার কাছে প্রস্তাব নিবেদন করলেন। যদিও ড্রেপার এলিজার চেয়ে বয়সে কুড়ি বছরের বড় তবুও 'না' বলতে পারলেন না মিঃ মে। ড্রেপারের মতো বড় মানুষকে তা বলা যায় না। তিনি মেয়ে সম্প্রদান করে দিলেন। এসব ঘটনা এলিজা স্বদেশ থেকে ফিরে আসার পর চার মাসের মধ্যেই। এলিজার বয়স তখন যদিও সবে চৌদ্দ, ড্রপারের তবে চৌত্রিশ।

লোকে বলল—বিয়েটা ভাল হল না। কেননা, ড্রেপার আর এলিজা দুই ধাতুর মানুষ। এলিজা তরুণী, স্পর্শকাতর। ড্রেপার আধবুড়ো এবং ভোঁতা প্রকৃতির। তাঁর খাটবার ক্ষমতা আছে যতখানি, বুদ্ধিবৃত্তি ঠিক ততখানি নয়। তা ছাড়া বোম্বাইয়ের লোকেরা বলে—স্বভাব চরিত্রও নাকি সুবিধের নয় লোকটার। এলিজা কী ভাবতেন তাঁকে আমরা জানি না। আমাদের সঙ্গে আবার যখন দেখা হয় তাঁর তখন তিনি জাহাজে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে এবং স্বামীকে নিয়ে দেশে যাচ্ছেন তিনি। বিয়ে ১৭৫৮ সালে। ছেলের জন্ম ১৭৫৯ সালে, মেয়ের—১৭৬১ সালে। ড্রেপারের ইচ্ছা ছেলেমেয়েদের তিনি বোর্ডিং হাউসে রেখে মানুষ করবেন। এলিজারও তা-ই বাসনা। সুখী দম্পতি সে-কারণেও আরও স্বদেশযাত্রী। সেটা ১৭৬৬ সালের কথা। জাহাজে সহযাত্রী জুটেছেন দু'জন। কমডোর জেমস আর তাঁর স্ত্রী। কমডোর খ্যাতিমান ব্যক্তি। দক্ষিণ ভারতের আতঙ্ক দস্যু আংগ্রিয়াকে পরাজিত করেছেন তিনি। কিন্তু তা হলেও তাঁর নিজের গর্ব তাঁর স্ত্রী। মিসেস জেমস যাকে বলে সত্যিই কালচারাল মহিলা। লন্ডনের সাহিত্যিক মহলে দেদার বন্ধুবান্ধব আছে তাঁর। তিনি নিয়মিত আড্ডা দেন তাঁদের সঙ্গে। দস্যুবিজয়ী বীর কমডোর সে গর্বে রীতিমতো গর্বিত।

এলিজার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল মিসেস জেমস-এর। নিবিড় বন্ধুত্ব। লন্ডনে নেমে বাড়িতে একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন মিসেস জেমস। অনেক নামজাদা সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হলেন তাতে। নেমন্তন্ন পেলেন নতুন বান্ধবী এলিজাও।

এখানেই স্টার্নের সঙ্গে দেখা হল এলিজার। শ্বেত ব্রাহ্মণের সঙ্গে পিত ব্রাহ্মণীর প্রথম দেখা। লরেন্স স্টার্নের বয়স তখন চুয়ান্ন, এলিজার তেইশ।

স্টার্ন বললেন—আমি তোমাকে ভালবাসি এলিজা। এলিজা উত্তর দিলেন না। স্টার্ন নিজের একখানা ছবি উপহার দিলেন তাঁকে। বললেন—'এলিজা, আমার ছবি।' এলিজাও নিজের ড্রয়ার খুলে বের করলেন একখানা ছবি। তারপর একসময় সেটি স্টার্নের হাতে তুলে দিয়ে বলেন—এই নাও আমার ছবি।' দু'জনেই ভালবাসলেন দু'জনকে। ড্রেপার সে খবর রাখে না। খবর রাখেন না মিসেস স্টার্নও। এলিজার টেবিলে বসে নিয়মিত হাজিরা দেন বৃদ্ধ স্টার্ন। মিসেস জেমসএর আড্ডায় স্টার্নকে নিয়মিত সঙ্গ দান করেন এলিজা। ক'দিনই বা! মাত্র কয়েক মাস, ১৭৬৭ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। তারই মধ্যে কত না কাণ্ড। এলিজাকে নিজের লেখা বইয়ের পুরো সেট উপহার দিয়েছেন স্টার্ন। বিশিষ্ট শিল্পীদের দিয়ে বিস্তর অর্থব্যয় করে এলিজার ছবি আঁকিয়েছেন। দু'জনে নিয়ম করে চিঠির আদানপ্রদান করেছেন। স্থির করেছেন দু'জনেই মনের কথা লিখে যাবেন নিজ নিজ জার্নালে। এলিজার লেখার টেবিলে তখন শোভা পাচ্ছে স্টার্নের প্রতিকৃতি। ছেলেমেয়ে বোর্ডিং স্কুলে। স্বামীও সরকারি ডাকে ছুটি ভুলে ফিরে গেছেন বোম্বাইয়ে। এলিজা তখন যাকে বলে—মুক্ত বিহঙ্গ। লঘু পাখায় উড়ে বেড়াচ্ছেন লন্ডনের লেখক-শিল্পীর সমাজে।

বোম্বাই থেকে ড্রেপারের ডাক এল, দেশে ফিরে এসো। এলিজা বিষণ্ণ। তিনি যেন ভারতে না ফিরতে হলে সুখী। বস্তুত, ভারতে ফেরার কথা ভাবতে ভাবতে নাকি তিনি একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শয্যার পাশে নিয়মিত হাজির স্টার্ন। তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ পর্যন্ত মানতে রাজি নন। তাঁর যুক্তি, চিকিৎসকের মতোই রোগীর কাছে জরুরি—বন্ধুর উপস্থিতি।

এলিজা বোম্বাই পৌঁছান ১৭৬৮ সালের এপ্রিলে। সে-বছরই প্রকাশিত হয়েছে লরেন্স স্টার্ন-এর বিখ্যাত বই—"দ্য সেন্টিমেন্টাল জার্নি।" তাতে এলিজার প্রশস্তি। সেখানেই থামেননি স্টার্ন। তাঁর নিজের মেয়ে লিডিয়ার কাছে লেখা এক চিঠিতেও দেখা যায় এলিজা-বন্দনায় তিনি মুখর। এলিজার নামে একটি "এলিজি"-ও লিখে ফেলেন স্টার্ন। তারপর শুরু হয় এলিজাকে চিঠি লেখা।

চিঠির পর চিঠি।

> 'এলিজা, তুমি চলে গেলে ! সত্যিই চলে গেলে? সত্যিই চলে গেছ তুমি?...কোচম্যানকে আমি বললাম—আমাকে আমার বন্ধুর বাড়ি নিয়ে চল। তোমার এবং আমার—দু'জনেরই বন্ধু মিসেস জেমস-এর বাড়ি। আমাকে দেখে দু' গাল বেয়ে জল নেমে এল তার। তোমার অভাবে আমি এমনই বিবর্ণ হয়ে গেছি, এমনি শুকিয়ে গেছি যে দেখে রীতিমতো কান্না পেল তাঁর। কোনোদিন কোনও মেয়ে এমন আন্তরিক সহানুভূতি বোধ হয় দেখায়নি কাউকে। তিনি বললেন—তুমি চলে যাও। যত অসুবিধাই হোক, যত টাকাই লাগুক তুমি ছুটে চলে যাও এলিজার কাছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—তাঁকে না পেলে তুমি বাঁচবে না স্টার্ন!'।

স্টার্ন ওরমের লেখা একখানা ভারতের ইতিহাস কিনলেন। ভারতবর্ষের মানচিত্রও সংগ্রহ করলেন একখানা। কোথায় এলিপো, কোথায় মাদ্রাজ, কোন্ দিকে বয় 'ট্রেড উইন্ড'? চিঠিতে যেন উন্মাদ হয়ে উঠলেন স্টার্ন—'I wish I was put into a ship for Bombay! সারা দুনিয়ার বদলে আমি শুধু তোমাকে চাই এলিজা। শুধু তোমাকে। আমি ব্রাহ্মণ, এলিজা, তুমি হবে আমার ব্রাহ্মণী।'

মনে মনে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন স্টার্ন। এলিজার স্বামী মারা গেছেন। মারা গেছেন তাঁর স্ত্রীও। তাঁরা দু'জনে,—তিনি আর এলিজা এখন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী । সুখের সংসার তাঁদের । সংসারে

অনন্ত শান্তি।

স্বপ্ন দেখতে দেখতেই একদিন সহসা অসুস্থ হলেন লরেন্স স্টার্ন ওল্ড বন্ড স্ট্রিটের একটা বাড়িতে। সেখান থেকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসা হল তাঁকে। কিন্তু আর সুস্থ হলেন না বৃদ্ধ লেখক। স্বপ্নের মধ্যেই এক সময় অনন্ত স্বপ্নলোকে চলে গেলেন তিনি। মৃত্যুশয্যায় যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন তাঁরা বলেন—শেষ মুহূর্তে স্টার্ন এমনভাবে হঠাৎ বুকের ওপর হাত দুটো তুলে ধরেছিলেন—যেন মস্ত একটা আঘাত ফেরাচ্ছেন তিনি। সেটা ১৭৬৮ সালের কথা। অর্থাৎ, বলতে গেলে এলিজা ভারতে ফিরতে না ফিরতেই স্টার্নের চিরবিদায়।

মিসেস জেমসএর চিঠিতে ব্রাহ্মণের শেষ খবর পেলেন এলিজা। ড্রেপাররা তখন বোম্বাই নয়, তেলিচেরিতে। স্বপ্নের দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে এখন রুক্ষ বাস্তব, কর্তব্য। এলিজা এখনও মিসেস ড্রেপার। তবুও ব্রাহ্মণের শেষ সাধটুকু সুদূর ভারতবর্ষ থেকে মেটাতে চাইলেন ব্রাহ্মণী।

ড্রেপার তখন তেলিচেরিতে কোম্পানির ফ্যাক্টরির সর্বময় কর্তা। এলিজার চিঠিপত্র থেকে মনে হয়, স্টার্নের স্মৃতি যেন অতি দ্রুত মুছে যাচ্ছে তাঁর মন থেকে—তিনি সুখী, সম্পন্ন এবং ব্যস্ত এক গৃহবধূ। বোম্বাই থেকে তেলিচেরিতে এসেছিলেন তিনি "তিরিশ জনের এক সংসার" নিয়ে। এখানে আয়োজন আরও বিশাল। এক চিঠিতে লিখেছেন—আমি এখন "রানি।" কখনও বা বলছেন আমি একই সঙ্গে "একজন সওদাগরের স্ত্রী, সৈনিক ও সরাইখানার কর্ত্রী।" রীতিমতো জীবন উপভোগ করছেন এলিজা তখন। লিখছেন, ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াই, সমুদ্রে স্নান করি, রাশি রাশি বই পড়ি, রিম রিম কাগজ লিখে নিষ্ট করি। তাঁর স্বপ্ন শুধু—"পিস অ্যান্ড প্যাগোডা,"—শান্তি আর টাকা। আরও কিছুকাল এখানে থাকলে, তিনি আশা করেন সে-স্বপ্ন পূর্ণ হবে, সম্পন্ন হয়ে দেশে ফিরতে পারবেন, "no further than being the ninety nitnth character in England, in the point of female excellence, wealth and two or three acres."

মরবার আগে স্টার্ন তাঁর মেয়ে লিডিয়াকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন এলিজার হাতে। অবশ্য চিঠিতে। অনেক চেষ্টায় গোপনে কিছু টাকা জোগাড় করলেন এলিজা। স্টার্নের বিধবা ও কন্যার জন্য তিনি বন্ধুদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। তারপর কর্নেল ক্যাম্বেল নামে একটি সৈনিকের হাতে সে টাকা পাঠালেন বিলাতে, লিডিয়ার কাছে। সঙ্গে এটাও জানালেন যে—যদি মত থাকে তবে ক্যাম্বেলকে বিয়ে করতে পারে লিডিয়া। ভারতে তাঁর বসবাসের জন্য একটি বাড়ি দিতেও সম্মত এলিজা।

কিন্তু মা মেয়ে দু'জনেই একযোগে প্রত্যাখ্যান করলেন সে প্রস্তাব। মিসেস স্টার্ন উল্টো ভয় দেখালেন—এলিজা যদি এখনও হাত বাড়ায় তাঁর পরিবারের দিকে তবে হাটে হাঁড়ি ভাঙবেন তিনি। স্টার্নের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্র সব ছাপিয়ে দেবেন দু' দেশে। এলিজা ভয় পেলেন। মিসেস জেমসকে সব জানিয়ে তিনি লিখলেন—'ভাগ্যিস, ড্রেপার এখন এখানে নেই! এমনিতেই এদিকে জানাজানি হয়ে গেছে যে আমার সঙ্গে নাকি লন্ডনের সাহিত্যিকদের বিস্তর খাতির। চিঠিপত্তরও আদানপ্রদান চলে।'

সবাই জানত বটে, কিন্তু ড্রেপার এতসব বুঝতেন না। তাঁর বোঝা দরকার ছিল না। যা তাঁর পাওয়া দরকার সবই তিনি পাচ্ছেন। দুর্ভাগ্যবশত তেলিচেরির সুখের রাজত্ব তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কর্তারা নির্দেশ দিলেন হেডঅফিসে ফিরে যেতে। তার মানে, ফের বোম্বাই? এলিজা বিষণ্ণ। বোম্বাই নয়, তার আগে ড্রেপার বদলি হলেন সুরাট। সুরাটেও দিব্যি ছিলেন এলিজা। সেখানকার ইংরেজসমাজে অচিরেই মধ্যমণি হয়ে ওঠেন তিনি। প্রত্যেক নতুন ঠিকানা থেকেই ইংল্যান্ডে আত্মীয় বন্ধুদের চিঠি লিখেছেন এলিজা। তার বেশ কিছু রয়ে গেছে এখনও মহাফেজখানায়। প্রতিটি চিঠিই পড়বার মতো। বুদ্ধিদীপ্ত, সাহিত্য সুষমামণ্ডিত। থেকে থেকে প্রাচীন এবং সমকালের বিশিষ্ট লেখকদের প্রাসঙ্গিক

উল্লেখ। বোঝা যায়, তাঁর পাঠাভ্যাস ছিল ব্যাপক। তা ছাড়া ভারতের সমকালের নানা ঐতিহাসিক ঘটনারও তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক। এখানকার মানুষজন, সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কেও বেশ কৌতূহল ছিল তাঁর। সব চেয়ে বড় কথা নিজের জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। স্টার্ন কেন তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন, এলিজার এইসব চিঠিপত্র তার ইঙ্গিতবহ।

সুরাটে তাঁর প্রতিদিনের জীবন বর্ণনা করতে বসে এলিজা লিখেছেন, তিনি সেখানে শিকার করেন। শেয়ালতো বটেই, হরিণ এমনকী চিতা পর্যন্ত। কিন্তু এখানেও থাকা হল না তাঁর। ড্রেপার এবার সরাসরি বদলি হলেন বোম্বাইয়ে। তিনি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছেন। কোম্পানির প্রধানের পরেই তাঁর স্থান, তিনি সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি। তবে, মেয়েদের মধ্যে মিসেস ড্রেপার-ই প্রথমা। বোম্বাইয়ে তখন সাকুল্যে সাঁইত্রিশজন মহিলা। তার মধ্যে তেত্রিশজন বিবাহিতা, পাঁচজন বিধবা,—আর একজন মাত্র কুমারী। সুতরাং কোম্পানির সুরসভায় এলিজাই তখন ইন্দ্রানী।

ওঁরা থাকতেন সমুদ্রের ধারে। মাজাগাঁওএর মেরিন হাউসে। বিরাট বাড়ি। বোম্বাইয়ের বেলভেডিয়ার। নতুন কোনও জাহাজ বন্দরে ভিড়লেই নাবিকেরা দল বেঁধে এসে হাজির হয় বেলভেডিয়ারে। ড্রেপার ভাবে—লোকেরা আসে তাঁর বাড়ি দেখতে। এলিজা জানেন—কেন এ কৌতূহল তাঁদের। ওরা স্টার্নের ব্রাহ্মণীকে দেখতে চায়। তবুও কোনওদিন তিনি মুখ ফুটে কিছু বলেন না ড্রেপারকে। কিন্তু একদিন বলতে হল।

বাড়ির পরিচারিকা মিসেস লিডস্‌-এর দিকে ড্রেপারের নজর যে একটু দুর্বল এলিজা সেটা লক্ষ করছিলেন অনেকদিন ধরেই।—কিন্তু এবার কি সত্যিই বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন না ড্রেপার? শোবার সময় লিডস্‌কে ঘরে ডেকে নেন ড্রেপার। '—আমার পরচুলটা খুলে একটা টুপি পরিয়ে দিয়ে যাও তো লিডস্‌। মিসেস লিডস্‌ যায়। কিন্তু আর যেন ফিরতে চায় না মেয়েটা। এলিজা একদিন আপত্তি করলেন। ড্রেপার সে আপত্তিতে কান দিলেন না। বয়স হয়েছে সত্য, কিন্তু তা হলেও তিনি এখন বড়সাহেব! সুতরাং শেষ পর্যন্ত একদিন নিষুতি রাতে বেলভেডিয়ার থেকে বেরিয়ে পড়লেন এলিজা। পরদিন তাঁর ঘরের দরজা খুলে ডানিয়েল ড্রেপার পেলেন কৈফিয়ত। এলিজা লিখে গেছে:

'I go, I know not whither, but I will never be a tax on you, Draper. The enclosed are the only bills that I know of, except six rupees to Doojee, the shoe-maker." আরও অনেক কথাই লিখেছিলেন এলিজা। লিখেছিলেন মণিমুক্তা, সিল্ক যা ছিল সবই যেমনটি ছিল তেমনটি রেখে গেলাম। শুধু নিয়ে গেলাম আবার মেয়ের ছবিটি।

চিঠি পড়ে ড্রেপার কী ভেবেছিলেন তিনিই জানেন। লোকে বলে, তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। চিন্তিত হলেও করবার কিছু ছিল না তাঁর। কারণ এলিজার জাহাজ ততক্ষণে বন্দর ছেড়ে গেছে। চিরকালের মতো ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেছেন—স্টার্ন ব্রাহ্মণী।

কমাডোর স্যার জন ক্লার্ক নামে একটি তরুণ নাবিকের সঙ্গে এলিজা অবশেষে দরিয়ায় ভাসলেন। জাহাজের নাম—"প্রুস্টে।" সেটা ১৭৭৩ সালের ১৪ জানুয়ারির কথা। জানালা দিয়ে দড়ি বেয়ে যিনি দুঃসাহসীর মতো নেমেছিলেন নীচে অপেক্ষমান নৌকোয়!

সবাই যা ভেবেছিলেন তা কিন্তু হল না। বোম্বাইয়ের সমাজ অবাক হয়ে শুনল এলিজা কমাডোরের বাহুলগ্ন হয়ে লন্ডনে পাড়ি দেননি। তিনি নেমে গেছেন পথে মসলিপত্তনে, সেখানে তাঁর মামা জন হোয়াইটহিলের আশ্রয়ে। তিনিও বড় মানুষ। ড্রেপার দশ সপ্তাহ পরে তাঁর স্ত্রী অপহরণের দায়ে অভিযোগ পেশ করলেন শেরিফের কাছে। ক'দিন পর ওঁরা জানালেন সমন ধরানো সম্ভব হয়নি। কারণ, জাহাজ চলে গেছে অনেক দূর। ড্রেপার অতঃপর চুপ করে গেলেন। তা ছাড়া উপায়ই বা কী আছে? একজন ইংরেজ মহিলা তাঁকে জানিয়েছেন ড্রেপার এলিজার বিরুদ্ধে কোনও আইনগত ব্যবস্থা নিলে তিনি আদালতে হাজির হয়ে জানাবেন তাঁর দুটি সন্তানের পিতা ড্রেপার। তার মানে শুধু

মিসেস লিডস্ নন, ড্রেপারের অন্য সহচরীও ছিল। যা হোক, মসলিপত্তনে শুধু নিরাপত্তা নয়, স্বচ্ছলতার মধ্যেই ছিলেন এলিজা। তিনি যেখানে বাস করেন সেখানেই জন্ম নেয় তাঁকে ঘিরে প্রবাদ। মসলিপত্তনেও দীর্ঘকাল বেঁচে ছিল একটি প্রাচীন গাছ। লোকেরা বলতেন—"এলিজা ট্রি।" কারণ, ঘুরে ফিরে এসে এগাছের তলায় নিয়মিত বিশ্রাম নিতেন এলিজা। তখন স্বপ্ন তাঁর একটাই, স্বদেশে ফিরে যাওয়া। অবশেষে পরের বছরের (১৭৭৪) শেষ দিকে এলিজা এসে পৌঁছালেন ইংল্যান্ডে,—তাঁর নিজের ও স্মৃতির 'ব্রাহ্মণের' দেশে।

ততদিনে হাওয়া যেন বদলে গেছে। সে-লন্ডন যেন দূর অতীতের শহর। স্টার্ন বেঁচে নেই। বন্ধু মিসেস জেমস কিছুটা শীতল। অন্যরাও নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন। কারও কারও ভাগ্যোন্নতি হয়েছে। এলিজাই শুধু ভগ্ন-হৃদয়, অর্থহীন। যে "শান্তি আর টাকার", "পিস অ্যান্ড প্যাগোডা"র স্বপ্নে বিভোর ছিলেন তিনি একদিন তার দুটিই অধরা থেকে গেছে তাঁর কাছে। তবু বিন্দুমাত্র দমলেন না তিনি। তাঁকে সাদরে গ্রহণ করার মতো আত্মীয় বন্ধুরও অভাব হল না। লজ্জা, সংকোচ, দ্বিধা, সব ঝেড়ে ফেলে তাঁদের সহায়তায় তিনি প্রকাশ করলেন— তাঁর কাছে লেখা স্টার্নের পত্রগুচ্ছ—"লেটারস ফ্রম ইওরিক টু এলিজা।" বইটি প্রকাশিত হয়—১৭৭৫ সালে। রীতিমতো হই-হই কাণ্ড। বাজার মাত করার জন্য পিঠে পিঠে বের হল আর একটি বই,—"এলিজাস লেটারস টু ইওরিক।" কিন্তু গবেষকরা বলেন সেটা নকল, বানানো চিঠির সংকলন। 'আসলে তা উইলিয়াম কোম্বে নামে একজন দুষ্টর অপকীর্তি।

তার পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। বই প্রকাশের তিন বছরের মধ্যে মারা গেলেন স্টার্নের 'ব্রাহ্মণী' এলিজা ড্রেপার। তাঁর একমাত্র পুত্র তত দিনে মৃত। মাত্র দশ বছর বেঁচে ছিল ছেলেটি। একমাত্র কন্যা তখনও জীবিত। যথাসময়ে যথাযোগ্য বরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের সন্তান-সন্ততিও ছিল বেশ কয়েকজন। ড্রেপার দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। বিত্তশালী হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন তিনি ১৭৮২ সালে। মারা যান—১৮০৫ সালে। ১ লক্ষ পাউন্ড উইল করে তিনি নানা জনের জন্য টাকা বরাদ্দ করে গিয়েছিলেন। প্রাপকদের তালিকায় তাঁর নাতি নাতনি, অর্থাৎ এলিজার কন্যার সন্তানরাও ছিলেন। বেচারা এলিজা কিছুই দেখে যেতে পারেননি। ১৭৭৮ সালের ৩ আগস্ট যখন তিনি দেহরক্ষা করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর।

আঁবে রেনেলের কথাই সত্য প্রমাণিত আজ। অষ্টাদশ শতকের সেই আঞ্জেনগো আজ আর খুঁজে যাওয়া যাবে না। রেনেল লিখেছিলেন এলিজার জন্মস্থান আর চেনাই যাবে না, সেখানে গড়ে উঠবে কোনও নতুন শহর। তবু যদি কখনও কোনও অ্যাঙ্গলো-স্যাকসন সেখানে পা দেন তিনি যেন ভুলে না যান এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই অসামান্য কন্যা নাম যাঁর—এলিজা। এলিজার কথা আজ সেখানে কারও মনে থাকার কথা নয়। অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে মসলিপত্তনের সেই বৃক্ষ, লোকে যাকে বলত—"এলিজা ট্রি।" নেই বোম্বাইয়ের সমুদ্রতটের সেই বেলভেডিয়ার প্রাসাদ, যেখানে ছিল ড্রেপার-দম্পতির ঠিকানা। সবই আজ বিস্মৃত অতীত। তবু এখনও বেঁচে আছেন এলিজা। লন্ডনে কাদের আশ্রয়ে তাঁর জীবনের শেষ কটা বছর কেটেছে তা সুস্পষ্টভাবে কারও জানা নেই। নানা সময়ে নানা ঠিকানায় বাস করেছেন তিনি, বলতে গেলে সবই ছিল অভিজাত পল্লীতে। কেউ কেউ বলেছেন, সম্ভবত মাতুল-পরিবার আশ্রয় দিয়েছিল তাঁকে, কেউ কেউ বলছেন—পিতৃকুলের কেউ হয়তো বা। এমনকী ড্রেপার পরিবারের কথাও শোনা গেছে। যদিও ড্রেপার ইংল্যান্ডে পৌঁছাবার বেশ কয়েক বছর আগেই চিরবিদায় নিয়েছেন এলিজা। তবে বাস্তবে দেখা যায় ভূতপূর্ব ফরাসি যাজক আঁবে রেনেল ছিলেন স্টার্নের মতোই এলিজার বিশেষ অনুরাগী। তাঁর দীর্ঘ স্মৃতিকথায় সে-অনুরাগের কথা গোপন রাখেননি তিনি। এলিজা বন্দনায় তিনি কখনও কখনও কবি যেন। প্রকাশ্যেই তিনি এলিজাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর বৃহৎ প্রাসাদে বাস করার জন্য।

এলিজা সবিনয়ে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তিনি যারা মারা যান ব্রিস্টলের কাছাকাছি ক্লিফটনে। ব্রিস্টলের চার্চ অঙ্গনে সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। সমাধির অলংকরণ করেন, তৎকালের বিখ্যাত ভাস্কর—বেকন। সেই সমাধি এখনও রয়েছে ব্রিস্টলে। হয়তো আজ আর কেউ তা খুঁজে বেড়ান না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। এলিজা এখনও বেঁচে আছেন শুধু অষ্টাদশ শতকের ইউরোপিয়ানদের নানা স্মৃতিকথায় নয়, ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায়ও। যতদিন সেখানে লরেন্স স্টার্নের নাম বেঁচে থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবেন তাঁর স্বপ্নসহচরী 'ব্রাহ্মণী' এলিজা। এই রোমান্টিক কাহিনীতে ভারতের ভূমিকা সামান্য হলেও সম্পূর্ণ তুচ্ছ নয়, কারণ এলিজার জন্ম এদেশেরই মাটিতে। এই ভারতের জল হাওয়ায় লালিত সেই দুঃখী কন্যা।

ছোট-গল্প করে বললে গল্পটা খুবই ছোট। কিন্তু যাঁর গল্প তিনি নিজে বলেছেন কবিতায়। একটি নয় তিনটি বইয়ে, অনেকগুলো গীতি কবিতায়। তার প্রধান স্বাদ অবশ্য কবিতা হিসাবেই। কিন্তু সে-রসটুকু ছাড়াও একটু নজর করলে তলানি হিসাবে যা পাওয়া যায় তা একটি নিটোল গল্প। ভালবাসার গল্প। কবিতায় ভালবাসার গল্প অনেক আছে। কিন্তু এ গল্পটা একটু ভিন্ন ধরনের।

গল্প ওরফে কবিতার কথায় যাওয়ার আগে কবির কথাই হোক। কবির নাম—লরেন্স হোপ। বাংলা 'কবি' শব্দটার মতো লরেন্স হোপ নামটারও স্বাভাবিক প্রবণতা পুরুষের দিকে। সুতরাং, বইখানা হাতে নিয়েই বাঘা বাঘা সমালোচকেরা একবাক্যে রায় দিলেন—ভদ্রলোক শক্তিশালী কবি।...অমুকের পর এমন কবি আর জন্মায়নি। যেমন ভাষার মাধুর্য, তেমনি আবেগ উদ্দামতা—তেমনি সুরের লালিত্য। বেঁচে থাকলে ইংরেজি সাহিত্যে এ-কবির স্থান নিশ্চিত।

প্রকাশকরা বিদ্বজ্জনদের প্রশংসাকে কাজে লাগালেন। কিন্তু কবি হাসলেন। কারণ, তিনি ভদ্রলোক নন, ভদ্রমহিলা। তা ছাড়া আরও একটু ভুল করেছেন ওঁরা। কবিতাগুলো ওঁরা পড়েছেন বটে, কিন্তু গল্পটা ধরতে পারেননি। তার জন্যে অবশ্য কবির মনে কোনও আক্ষেপ নেই। বরং তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কেননা, ওঁরা গল্পটা জেনে গেলে নিশ্চয় আর এমন প্রশংসা করতেন না তাঁকে। এমনকী প্রকাশকরাও ছাপতে সাহসী হতেন কিনা কে জানে। কারণ, যত মানবিকই হোক, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পক্ষে গল্পটা সত্যিই 'শকিং'।

অথচ, মুশকিল হল এই যে গল্পটা সত্য।

মেয়েটির নাম ছিল আদেলা ফ্লোরেন্স। বাবার নাম কর্নেল কোরি। বাবা কাজ করতেন ভারতে। 'সিন্ধ গেজেটিয়ার'-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। আদেলার জন্ম বিলেতে। ১৮৬৫ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে। লেখাপড়াও ওখানেই।

বাবার কাছে আদেলা যখন ভারতে এল—সে তখন কিশোরী। কর্নেল সাহেবের মেয়েটি যখন তরুণী তখন তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য হিসাবে শোনা গেল—সে বাবার কাজে কিছু কিছু সাহায্য করে। মানে, কিছু কিছু লেখে। কিন্তু সে কদাপি কবিতা নয়, গেজেটিয়ারি গদ্য।

তবে বলবার মতো তেমন কিছু না থাকলেও দেখবার মতো মেয়ে। রূপসী হয়তো নয়, কিন্তু অসাধারণ চেহারা। নরম 'পেঁপে গাছ'-এর মতো প্রাণচঞ্চল দীর্ঘ দেহ (...'I am slim, as this Papaya tree, with breasts out pointing as its fruits beneath this champa tree.) মাথা-ভর্তি সোনালি চুল, গভীর পুকুরের মতো স্বচ্ছ দুটি চোখ। পুষ্ট ঠোঁট।

এমনকী মেয়েরা পর্যন্ত বলে আদেলা অসাধারণ মেয়ে। সমসাময়িক একজন লেখিকা ফ্লোরা অ্যান স্টিল লিখেছেন—মেয়েটা খুবই ইন্টারেস্টিং। আমার মতোই কোনও রীতিনীতির ধার ধারে না। সত্যি বলতে কি ওর সেই চমকপ্রদ দেহটার পাশে বসে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিই বোধ করতে হল আমাকে। দিনে

দুপুরে একটা খোলা ভিক্টোরিয়া আর একখানা ছোট-গলা হাতকাটা সাটিনের গাউন পরে যদি কেউ বসে থাকে তবে ব্যাপারটা অস্বস্তিকর কিনা বলুন।

যা হোক, দেখতে দেখতে কুড়ি পেরিয়ে চব্বিশে পা দিলেন কর্নেল কোরির মেয়ে আদেলা। সুতরাং এবার বিয়ে দিতে হয় মেয়েটার। ভারতে তখন পাত্রী কম, পাত্র বেশি। সুতরাং মোটেও ভাবতে হল না বাবাকে। বাসনাটা প্রকাশ পাওয়ামাত্র বিয়ে হয়ে গেল আদেলার। সেটা ১৮৮৯ সালের কথা।

পাত্রটি সত্যিই যাকে বলে সুপাত্র। বড় চাকুরে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল। অনেকগুলো ভাষা জানেন। কাজ করেন বেঙ্গল আর্মিতে। নাম কর্নেল ম্যালকম হাসেলস নিকলসন। বয়স আটচল্লিশ। অর্থাৎ আদেলার দ্বিগুণ। দু'পক্ষের কেউই সেটা ধরলেন না। কারণ পাঁচের কোঠার বরেরাই তখন ভারতে তরুণ জামাই।

বিয়ের পর শুরু হল আদেলার সংসার। নিকলসন প্রবীণ হলেও হৃদয়হীন নন। তিনি আদেলাকে আদর করে নাম দিলেন—ভায়োলেট। ফুলের মতো তাজা মেয়ে। ফুলের নামেই ওকে মানায় ভাল।

স্বামীর যাযাবরী জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন আদেলা। আজ তিনি এখানে, কাল ওখানে। আজ এই ক্যান্টনমেন্ট-এ, দু'দিন বাদেই অন্যত্র। ঘুরতে ঘুরতে ১৮৯৪ সালে অবশেষে নিকলসন-দম্পতি এসে হাজির হলেন মাউ-এ। মাউ উজ্জয়িনী থেকে ৪২ মাইল দূরে ছোট্ট শহর। সেখানে ইংরেজ বাহিনীর একটি ছাউনিও আছে। নিকলসন এখন আরও বড় অফিসার। তিনি জেনারেল।

সেকালের যা রাজকীয় প্রথা, ইংরেজ সেনানায়কের সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন স্থানীয় রাজা। বড়া খানার আয়োজন হল রাজপ্রাসাদে। যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন নিকলসন। এই সম্মান এবং ভোজ দুই-ই সমান আকর্ষণীয় তাঁর কাছে। শুধু তাঁর কাছে কেন, যে কোনও ইংরেজের কাছে। রাজাদের দরাজ হাত। ভোজের সঙ্গে ভেটও পাওয়া যায়। এমনকী, এক নিমন্ত্রণে জুটে যেতে পারে তিন জীবনের সঞ্চয়।

কিন্তু নিকলসন মন্দভাগ্য। ভোজের শেষে তিনি যখন ঘরে ফিরলেন তখন একজন অন্তত জেনে গেলেন—তিনি আজ রিক্ত মানুষ। আর কেউ জানে না, হয়তো নিকলসনও না, কিন্তু আদেলা নিশ্চিত জানেন সচরাচর যা ঘটে না তাই ঘটে গেছে আজ। কিছু পেতে গিয়ে, রাজার দরবারে সব কিছু খুইয়ে এসেছেন নিকলসন।

সেই রাত্রেই কবিতা লিখতে বসলেন আদেলা। এগারো বছরের বিবাহিত জীবনে যা একদিনও চেষ্টা করেননি তিনি—সেই কবিতা আজ সহসা ছুটে এল তাঁর বুকে। স্বপ্নের মতো লিখে গেলেন আদেলা—

> "Upon the city ramparts, lit by the Sunset glim
> The blue-eyes that conquer, meet the darker eyes that dream
> The Dark-eyes so Eastern, and the blue eyes from the west
> The last alight with action, the first so full of rest.
>
> * * *
>
> Meet and fall and meet again, then linger, look and smile
> Time and distance all forgotten, for a while."... ...

দীর্ঘ কবিতা। অনেক কথা। নাম—নগরপ্রাচীরের ধারে। মর্মার্থ: অস্তমিত সূর্যের আভায় উদ্ভাসিত নগর-প্রাচীরের ধারে ওঁদের দেখা হল। দুই জোড়া চোখের সাক্ষাৎকার। এক জোড়া চোখ নীল, অন্য জোড়া কালো। নীল চোখ বিজয়ীর মতো ঘুরে বেড়ায়, কালো চোখ স্বপ্ন দেখে। নীল—পশ্চিমের, কালো—পূর্বদেশীয়। কালো চোখে অনেক রহস্য, যুগ-যুগান্তের ইতিহাসের যাদু তাতে। নীল চোখ

সদ্যজাত নবীন। আবার দুই চোখে দেখা। আবার, আবার। এবার একটু বিলম্বিত হল সেই সাক্ষাৎকার। দুজনেই হাসল একটু। তারপর—

"East and the West so blending, for a little space,
All the sunshine seems to centre, round that enchanted place!"

আকস্মিকভাবেই কালো চোখের ভালবাসায় পড়ে গেলেন আদেলা। একটি কবিতা শেষ হল বটে, কিন্তু কাহিনীর তখন মোটে শুরু।

ইংরেজ-কন্যা আদেলা যেন এখন কুমারী। যেন কোনও অ্যাংলোস্যাকসন কুমারকেই ভালবেসেছেন তিনি। সামাজিকতার সমস্ত নিয়মকে অগ্রাহ্য করে সহসা একটি ভারতীয় যুবককে নিয়ে ক্ষেপে গেলেন মিসেস নিকলসন। সুযোগ পেলেই দু'জনে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। কখনও জনবিরল পাহাড় এবং বন এলাকায়। কখনও মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি কানে আসে, অথচ কৌতূহলী চোখ তেড়ে আসে না এমন জায়গায়। ওঁরা কাছাকাছি বসেন। কথা বলেন, কথা শোনেন। স্বপ্নের মতো কেটে যায় এক একটা দিন। অধীর অপেক্ষায় পরের দিনটির জন্যে স্বপ্ন নিয়ে পড়ে থাকে একটির পর একটি রাত।

রাতে কবিতা লেখেন আদেলা।

"Nearer and nearer cometh the car
Where the golden goddess towers,
Sweeter and sweeter grows the air
From a thousand trampled flowers,
We two rest in the temple shade
Safe from the pilgrim's flood."... ...

দিনে দিনে ক্রমেই কাছাকাছি হলেন ওঁরা। পশ্চিমের কর্নেল-কন্যা আর আর পূর্বের রাজকুমার। উত্তর ভারতের রহস্যময় সন্ধ্যায় ক্রমেই যেন রহস্যময় হয়ে উঠল ওঁদের সম্পর্ক। বাধভাঙা নদীর মতো সব তুচ্ছ করে এগিয়ে চললেন আদেলা, জেনারেল নিকলসন-এর বিবাহিতা পত্নী।

দেখতে দেখতে কাহিনীর সঙ্গে তাল দিয়ে কবিতাও হল অনেকগুলো। মিসেস নিকলসন স্থির করলেন সেগুলো ছাপাবেন। তাঁর এই ভালবাসার কথা কি লোকেদের শোনাবার মতো কথা নয়? তারুণ্যের কাছে উৎসর্গীকৃত এই যৌবন—সেকি রাজা-প্রজা সম্পর্কের কারণেই না শোনাবার মতো গান?

১৯০১ সাল। বিলেত থেকে ছাপা হয়ে বের হল আদেলার প্রথম কবিতাগুচ্ছ। প্রকাশক—উইলিয়াম হেইনমান। বইয়ের নাম—'দি গার্ডেন অব কাম অ্যান্ড আদার লাভ লিরিকস ফ্রম ইন্ডিয়া'। ভারতীয় প্রেমের দেবতা কাম-এর নামে লেখা কবিতাবলী। কবির নাম—লরেন্স হোপ।

বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল লরেন্স হোপের নাম। কিন্তু কেউ একবার ভাবতেও পারলেন না—ভারতবাসী এই কবিটি নিকলসন গৃহিণী আদেলা। এবং যাঁকে নিয়ে তাঁর এই কামনা-উচ্ছ্বাস সে একটি ভারতীয় যুবক।

চার বছর পরে বের হল তাঁর দ্বিতীয় বই। নাম—'ইন্ডিয়ান লাভ।' এবার কানাঘুষায় কবির ছদ্মনামটা খসে পড়ল বটে, কিন্তু তাঁর নায়ক সেই রহস্যাবৃতই রয়ে গেলেন। তবে কারও কারও এটা বুঝতে আর অসুবিধা হল না যে, লোকটি যেই হোক, তিনি নিশ্চয় আদেলার বৃদ্ধ স্বামীটি নন। অন্তত, সমারসেট মম-এর তাই ধারণা। তাঁর নোট বইয়ে তিনি লিখেছেন: সবাই ভায়োলেট ফ্লোরেন্সকে নিয়ে গল্প করছে। সে একটি আবেগমথিত প্রেমের কবিতার বই লিখেছে। স্পষ্টতই বোঝা যায় কিছুতেই তার স্বামী এগুলোর উপলক্ষ নয়। তবুও কিছুতেই কেউ বিশ্বাস করবে না যে স্বামীর নাকের ডগায়

বসে কোনও মহিলার পক্ষে দিনের পর দিন এ ধরনের লেখালেখি সম্ভব।

(It makes them laugh to think that she'd carried on a long affair under his nose, and they'd have given anything to know what he felt when at last he read them.)

স্বামীর চোখের সামনে আদেলার মতো জীবন অসম্ভব?—কী ভাবতে পারেন নিকলসন পরপুরুষের উদ্দেশ্যে লেখা স্ত্রীর কবিতা পড়ে? মম একটি গল্প লিখে উত্তর দিলেন তার। যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন,—তাঁর 'কর্নেলস লেডি' গল্পটা আদেলার অবয়ব ধরেই লেখা।

উত্তরটা আদেলা নিজেও যে না দিয়েছেন তা নয়। নিকলসন তাঁকে ভালবাসতেন না এমন কথা তিনি কখনও বলেননি। একটি কবিতায় এ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তার যুক্তি অতি সহজ: আমার কাজিন আমাকে ভালবাসে, তার করুণাভরা চোখগুলো বলে সে সুখী। আমি তাকে বিয়ে করে তাকে সুখী করেছি—এবার তুমি আমাকে সুখী কর বন্ধু।

পাপ হবে?

"The sins of youth, are hardly sins.
So frank they are and free."

আদেলা বলেন—যৌবনের কাছে কোনও পাপই পাপ নয়। নৈতিকতা আমরা চাইব তখনই যখন গড়িয়ে আসবে আমাদের বয়স। ('Tis but when middle-age begins, we need morality)

অত্যন্ত স্পষ্ট কথা। অন্তরঙ্গ মানসিক সুর। ভারতীয় যুবককে ভালবেসে দূরের দেশ ভারতবর্ষকেও ভালবেসে ফেললেন আদেলা। 'ইন্ডিয়ান লাভ'-এর একটি কবিতায় তিনি বলছেন: এরাই আমার লোক, এই আমার দেশ। এই দেশের গোপন অন্তঃকরণের প্রতিটি স্পন্দন আমি শুনতে পাই। একমাত্র এই দেশের জীবনকেই আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পাই।...

"Savage and simple and sane and whole
Washed in the light of a clear fierce sun
Heart, my heart, thy journey is done."

সুতরাং আদেলা ডুবে গেলেন। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেললেন তিনি। নিকলসনের ষাট বছরের অক্ষম চোখের সামনে একটা বছর ঘুরে আসতে না আসতেই রীতিমতো জমে উঠল গল্পটা। আদেলা নিজেই ঘোষণা করলেন একদিন, তিনি অন্তঃসত্ত্বা।

বিয়ের এগারো বছর পরে প্রথমবারের মতো মা হলেন আদেলা। ১৯০০ সালে একটি ছেলে হল তাঁর। ঘটনার মধ্যে অসাধারণত্ব হয়তো কিছু নেই। কিন্তু আদেলা অসাধারণ মেয়ে; সমালোচকরা একটু নজর করলেই দিখতে পারতেন গোড়া থেকেই কবি লরেন্স হোপের এটা অন্যতম প্রার্থনা। তিনি স্পষ্ট লিখছেন—আহা, কি সুন্দরই না হত যদি আমাদের এই ফুলের মরসুম থেকে নতুন কোনও জীবন ফুল হয়ে ফুটে উঠত। লোকেরা হয়তো তার নাম দিত কলঙ্কের সন্তান। কিন্তু যাঁদের চোখ আছে তাঁরা নিশ্চয় একটা মিষ্টি নাম দিতেন ওকে। তাঁরা ওকে ডাকতেন—প্রেম-শিশু।...নিজের আইন কানুনে মানুষ অন্ধ। কিন্তু কেউ কেউ সত্যটুকু দেখতে পায়। যদি নিজের হাতে নিজের ভাগ্যকে লেখবার অধিকার পেতাম আমি, তা হলে, আমি জানি বর্ণহীন রুটিন বাঁধা জীবনের সন্তান হওয়ার চেয়ে এই উদ্দাম জীবনের ফসল হতে পারলেই আনন্দিত হতাম আমি।

"If my own hand had written my fate
I know I had rather been
Fruit of a wild and exquisite love
Than a child of dull routine."

অন্যত্র তাঁর প্রার্থনা আরও স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—আহা, যদি তোমার করুণা হত। যদি তুমি

চিরকালের জন্য তোমার পরিচয়কে আমার ওপর লিখে দিতে! ওগো, তুমি তাই দাও। আমার প্রথম সন্তান যেন তোমারই হয়। (...My first-born should be thine, then all my life will, and just keep the memory of thee...)

সেই প্রার্থনা পুরনের সংবাদও আছে লরেন্স হোপ-এর কবিতায়।

"Justly I worship thee! thou art divine
Creating thus thy life anew in mine."

অর্থাৎ তুমি মহান। কারণ তুমি নতুন করে নিজেকে সৃষ্টি করেছ আমার মধ্যে।

ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হল। পরের বছরই আদেলার নতুন বই। দেখতে দেখতে কেটে গেল মাউয়ের বছর কটা। এবার যা অনিবার্য তাই হল। গল্প দ্রুত এগিয়ে চলল উপসংহারের দিকে। সামরিক বিভাগের কর্মচারী নিকলসনকে এবার যেতে হবে মাদ্রাজ।

বিদায়-পূর্বে অনেক কাঁদলেন আদেলা। অনেক কবিতা লিখলেন। যা আস্বাদ করেছেন এই কটি বছরে তার বিবরণ। যা হাতে পেয়েও আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলেন না তাঁর কথা। খাতার পাতা ফুরিয়ে এল। মিলিটারি তাঁবুর সঙ্গে সে খাতা বাঁধা হয়ে গেল। বৃদ্ধ স্বামীর পিছনে পিছনে 'প্রেম-শিশু'কে কোলে নিয়ে জীবনের রুটিন রক্ষা করতে চললেন আদেলা। ১৯০৪ সাল। মাউকে বিদায় জানিয়ে নিকলসনরা মাদ্রাজে এসে পৌঁছলেন।

মাদ্রাজে পৌঁছেই বৃদ্ধ নিকলসন শয্যা নিলেন। একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করা হল তাঁকে। কিন্তু নিকলসনকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না।

মাউয়ের লেখা সেই স্বপ্নমণ্ডিত কবিতার খাতাটা বের করলেন আদেলা। বাছাই করে বই বাঁধলেন একটা। নাম দিলেন—'ইন্ডিয়ান লাভ'। উৎসর্গ-পত্রে লিখলেন ম্যালকম নিকলসনের উদ্দেশে দীর্ঘ কবিতা। তার মর্ম: তোমাকে নিয়ে আমি কখনও কবিতা লিখিনি। কারণ তুমি ছিলেন মহান। তোমার আমার সম্পর্ককে তাই আমি জনতার মুখে মুখে ফিরি হতে দিইনি।

শেষে লিখেছেন: আমি ভাগ্যহীন। পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনে তোমাকে কোনও আনন্দই দিতে পারিনি আমি। কারণ আমাদের যখন দেখা হল নানা বেদনায় তখন তুমি রিক্ত। সুতরাং আজ মিছেই আমার আক্ষেপ।...ইত্যাদি।

এই বইখানা নিয়ে লন্ডনের নানা মহলে নানা গবেষণার কথা আগেই বলেছি। এবার সহজেই ধরা পড়ে গেলেন আদেলা। মম ছাড়াও অনেকে জেনে গেলেন লরেন্স হোপ-এর আসল নাম।

কিন্তু হাতেনাতে ধরা গেল না তাঁকে। নিকলসন মারা যাওয়ার পর দুটো মাসও কাটল না। 'ইন্ডিয়ান লাভ' পড়া তখনও শেষ হয়নি পাঠকদের। কৌতূহলীরা তখনও আড্ডায় আড্ডায় আদেলা ফ্লোরেন্সকে নিয়ে নানা রঙিন গল্পে মত্ত। এমন সময় সহসা একদিন মাদ্রাজের খবর এসে পৌঁছাল লন্ডনে। ৪ অক্টোবর, ১৯০৪ সাল। গুণগ্রাহী পাঠকেরা শুনলেন তাঁদের প্রিয় কবি লরেন্স হোপ আর ইহলোকে নেই। তর্কটাকে আরও জটিল করে দিয়ে নিজের হাতে বিষ খেয়েছেন আদেলা। তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। কবিতা আগেই থেমে গিয়েছিল। এবার চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর মুখও। সাক্ষীর কাঠগড়ায় এখন থাকল শুধু—দুটি বই আর কতকগুলো কবিতা।

প্রেম। প্রেম। আর প্রেম। সুরেলা প্রেম। উদ্দাম প্রেম। প্রেমের স্বপ্ন। আদেলা যেন এক প্রেম উন্মাদিনী। "গার্ডেন অব কাম" কবিতায় দেখি প্রেমের অভিষেক। কবি লিখেছেন—

"But much is forgiven,
To Gods who have given,
If but for an hour the Rapture of youth,
You do not yet know it,

Changing your dreams to his Exquisite Truth" ইত্যাদি।

তাঁর সব কবিতাই প্রেমের কবিতা। নায়ক নায়িকা যাঁরাই হোন না কেন, কবি লরেন্স হোপ প্রেমের ভাষা ছাড়া যেন অন্য কোনও ভাষা জানেন না, বোঝেন না। "সঙ অব খানজাদা" নামে একটি ছোট্ট কবিতায় তিনি লিখেছেন,—

"As one may sip a Stranger's Bowl
You gave yourself but not your soul,
I wonder, now that time has passed,
Where you will come to rest at last.
You gave your beauty for an hour,
I held it gently as a flower.
You wished to leave me, told me so,
I kissed your feet and let you go..."

আর একটি কবিতায় দেখি বিচ্ছেদ-বেদনা। তারই মধ্যে পূর্ণতার আভাস। কবি লিখেছেন:

"A beautiful thing, alert, serene,
With passionate, dreaming, wistful eyes,
Dark and deep as mysterious skies,
Seen from a vessel at sea.
Alas you drifted away from me,
And time and space have rushed in between,
But they cannot undo the Thing-that-has-been,
Though it never again may be.
You were mine, from dusk until dawning light,
For the perfect whole of that bygone night
You belonged to me!
They say that Love is a light thing
A foolish thing and a slight thing
A ripe fruit, rotten at core,
They speak in this futile fashion
To me, who am wracked passion,
Tormented beyond compassion,
For ever and ever more."... ...

আর একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন,—

"I dream of the rose-like perfume that fills your hair,
Of times when my lips were free of your soft closed eyes,
While down in the tank the waters ripple and rise,
And the flying foxes silently cleave the air.
The present is subtly welded into the past,
My love of you with the purple Indian dusk,
With its clinging scent of Sandal incense and musk,

And withering jasmin flowers.
My eyes grow dim and senses fail at last,
While the lonely houres
Follow each other, silently, one by one,
Till the night is almost done.
Than weary and drunk with dreams, with my garment damp
And heavy with dew, I wander towards the camp..." ইত্যাদি।

প্রেম-কাতর কবি আরও প্রণয়-কাব্য রচনা করে চলেন তাঁর সুরেলা কলমে। তিনি লিখেছেন:

"Whether I love you? You do not ask,
Nor waste yourself on the thankless task.
I gave your kisses at least return,
What matter whether they freeze or burn.
I feel the strength of your fervent arms,
What matter whether it heals or harms.
You are wise, you take what the Gods have sent.
You ask no questions, but rest content.
So I am with you to take your kiss."...

মারণ-ব্যাধি ম্যালেরিয়া নিয়েও একটি দীর্ঘ কবিতা আছে তাঁর। দীর্ঘ কবিতা। ব্যাধির উপ্তি, প্রকাশ, বিস্তার এবং অবশেষে চূড়ান্ত আক্রমণ। সেই মৃত্যুর আহ্বানকে কবি গ্রহণ করেছেন প্রেমের জর্জর আলিঙ্গন হিসাবে। এক সময় বিকারের ঘোরে আক্রান্ত রোগী বলেছেন,—

"He (malaria) loves the haggard frame, the shattered mind,
Gloats with delight upon the glaring eyes,
Yet, in one thing His cruelty is Kind,
He sends thou lovely dreams before they dies.
Dreams that bestow on them their heart's desire,
Visions that find them mad, and leave them blurred
To sink, forgetful of the fever's fire,
Softly, as in a lover's arms, to rest."...

প্রেম। প্রেম আর প্রেম। এমনকী মৃত্যুতেও প্রেম। লরেন্স হোপের কবিতা আক্ষরিক অর্থেই যে পাগল-করা প্রেমের কবিতা ক্রমে একদিন তার প্রমাণও মিলে যায় হাতে হাতে। বেশ কিছুকাল পরের কথা। গত শতকের চতুর্থ দশকের কাহিনী। নাথান লিওপোল্ড নামে একজন মনোরোগী ডাঃ হিলে নামে এক মনস্তত্ত্ববিদের কাছে আসেন। ডাক্তার ভেবে পান না তাঁর ব্যাধির উৎস কোথায়। রোগীর বিশিষ্ট লক্ষণ, তিনি কথায় কথায় কবিতা আওড়ান। ডাঃ গ্লুয়েক নামে আরও একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করেন তাঁকে। রোগী তাঁর কাছেও এক নিঃশ্বাসে আউরে যান কবিতা। শুধুই কবিতা। চিকিৎসকরা তাঁর মুখস্ত করা কবিতা টুকে নেন। তারপর শুরু করেন অনুসন্ধান। সন্ধান করতে করতে জানা যায় কবিতাগুলো লিখেছিলেন লরেন্স হোপ নামে এক ছদ্মনামা কবি। তাঁর আসল নাম আদেলা ফ্লোরেন্স কোরি নিকলসন। এক সময় তাঁর কবিতা ব্রিটেনের ড্রয়িংরুমে আলোচিত ও পঠিত হত। হোপ ভারতের বাসিন্দা ছিলেন। সেখানেই ১৯৩৪ সালে তিনি কেড়ে নেন নিজের জীবন। রোগী নাথান লিওপোল্ডের জন্ম সেই ঘটনার দেড় মাস পরে। এ-তরুণ কি তবে জাতিস্মর? আসলে তাঁর

ব্যাধির নামও—প্রেম। উল্লেখ্য, আদেলার নিজের সন্তান, তাঁর প্রেম-পুষ্পও একদিন বিকশিত হয়েছিল। তাঁর তিরোভাবের বেশ কিছুকাল পর মায়ের কবিতার একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন পুত্র প্রেম, জে. নিকলসন।

যা হোক, কাব্য-চর্চা আপাতত এখানেই শেষ করা যায়। আবার আমরা বরং ফিরে যাই মূল কাহিনীতে।

কবিতার জবানবন্দিতে কি আদেলাকে অসামাজিকতার আদালতে দাঁড় করাতে পারত ভারতবাসীরা? দু'চারজন বাদ দিলে সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ একবাক্যে বলত—না, তা পার না। কেন না, আদেলা রাজকুলজাতা, আর তোমরা প্রজাকুল। আমরা পশ্চিমি, তোমরা পূর্বদেশীয়। আমাদের ঘরের মেয়ে হিদেনকে এমনভাবে ভালবাসতে পারে কখনও?

ইতিহাসে এর বিপরীত সাক্ষ্য ইংরেজরা অনেক রেখে গেছেন। থ্যাকারে তাঁর 'নিউ কামার'-এ জিজ্ঞেস করছেন:—'স্যর টমাস, আমার খুড়োর বিরুদ্ধে আপনার কি কিছু বলবার আছে? আমার কি ব্রাহ্মণ্যসূত্রে কোনও খুড়তুতো ভাইবোন আছে? আমাদের কি তার জন্যে লজ্জিত হওয়া উচিত?'

থ্যাকারের ব্যঙ্গের সুরটা খুব সরল। সেকালে সাদা-কালোর আত্মীয়তায় মোটেও লজ্জিত হতেন না ইংরেজরা। অন্তত ভারতীয় ইংরেজ সমাজে যাঁরা বড় তরফের মানুষ—তাঁদের অনেকেই যে তা হননি তার সাক্ষ্য বিস্তর। এখানে সেগুলো বলে লাভ নেই।

বলা যেতে পারে—এগুলো সবই পাত্রপক্ষের খবর। বিদেশ-বিভুঁয়ে যে কোনও জাতিই তা করে থাকে। কিন্তু তাই বলে ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে ভারতীয় যুবকের প্রেম? আজকাল তা আকছার হতে পারে। কিন্তু সেকালের ভারতে? সিপাহি বিদ্রোহের ক'বছরের মধ্যেই?—অসম্ভব।

ভালবাসার ধর্ম যাঁরা বোঝেন তাঁরা বলেন—সম্ভব। তবে অধিকাংশই বলেন—মনে মনে। কেননা, একটা জাতির ইজ্জত তার সঙ্গে জড়িত। এবং দুর্ভাগ্যবশত সেই জাতিটা স্ব-জাতি।

তবুও লরেন্স হোপ তথা আদেলাকে রহস্যে ঢেকে রাখলেও এমন ঘটনার ইতিহাসও আছে ভারতে। সেকালের ভারতেই। লক্ষ্মৌর নবাব নাসিরউদ্দিনের হারেমবাসিনী মকুদেরা আউলিয়া নামে মেয়েটি কি ওয়াল্টারদের ঘরের মেয়ে নয়? সে কি স্বেচ্ছায় বরণ করেনি নবাবের পতিত্ব? ইংরেজরা কৈফিয়ত দিয়েছিলেন—তা সত্য বটে, কিন্তু মেয়েটা আসলে ওয়াল্টার সাহেবের বিবাহিতা স্ত্রীর মেয়ে নয়! ফেনি পার্কসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আদেলার। তিনি লিখেছেন—অদ্ভুত মেয়েরে বাবা?—"...poor thing, I felt ashamed of the circumstances when I saw her with all the gusts of a regular Hindoostani." ('Wonderings of a Pilgrim' etc) রীতিমতো হিন্দুস্তানী হয়ে গেছে মেয়েটি। ফেনি লিখেছেন,—এই মেয়েটির মা নাকি পরে একজন ভারতীয় বানিয়াকে বিয়ে করেন। সুতরাং, আদেলার কাহিনী স্বপ্নেও অকল্পনীয়, এমন কথা জোর করে বলা যায় কেমন করে।

সৌভাগ্য, লরেন্স হোপ-এর নামে সে ধরনের কোনও বর্ণসংকর তকমা এঁটে দেওয়া হয়নি। যাঁরা সাধারণত তা করে থাকেন—আগাগোড়া তাঁরা মৌন। এদেশে ও ওদেশে আদেলার রহস্যময় প্রণয়কাহিনীকে নিয়ে বহু প্রকাশ্য আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তা নাকচ করে দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টার কথা শোনা যায়নি। অবজ্ঞাকেই ঢাল করে আগাগোড়া আত্মরক্ষা করে আসছেন সাবধানী প্রতিপক্ষ। কারণ তা ছাড়া তাঁদের উপায় নেই। এতগুলো কবিতাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনও কৈফিয়ত নেই। কিন্তু লরেন্স হোপ কৈফিয়ত রেখে গেছেন, তাঁর নিজের তথাকথিত অস্বাভাবিক আচরণের কৈফিয়ত।

প্রথম কৈফিয়ত তাঁর কবিতা। কবিতাই আদেলার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। কবি মাত্রেরই তাই। কারও কারও ক্ষেত্রে আগে পিছে দু'চারটি ছত্রে কিছু 'মিথ্যা' হয়তো থাকে, কিন্তু আদেলার কামনামথিত কবিতাগুলোতে তা নেই বলেই অধিকাংশের ধারণা। কারণ, আদেলা 'জাত-কবি'

ছিলেন না। কবি-কর্মের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়ও ছিল নগণ্য। মাউয়ের বনভূমিই চকিতে একদিন কবি করে তুলেছিল তাঁকে। সেই সোনালি জীবনের মেয়াদ ছিল মাত্র চার বছর। এই চার বছরের জন্যে কবি হয়েছিলেন তিনি। তারপর আবার নিঃস্তব্ধতা। আবার সেই ছক-বাঁধা জীবনের কাছে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ।

মাঝখানের সেই স্বল্পায়ু অধ্যায়টিরও কৈফিয়ত দিয়ে গেছেন মিসেস নিকলসন। আদেলা বলেন,—কৈফিয়ত আমার যৌবন—কৈফিয়ত তার যৌবন ("I only know that he pleaded youth, A beautiful golden plea").

সুতরাং এর পরও যদি কেউ সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে তর্ক করতে চান, তবে তিনি তা করতে পারেন। আমরা শুধু জানি, মাদ্রাজের সেন্ট মেরী সমাধিক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবেন কর্নেল কোরির মেয়ে আদেলা। জেনারেল নিকলসনের স্ত্রী ভায়োলেট। তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি। কারণ যৌবন তাঁর তুষ্ট।

'If fate should say, —Thy course is run
It would not make me sad;
All that I wished to do is done.'

প্রাসঙ্গিক কিছু বইপত্র:

English Beginning in Western India, H.D. Rowlinson, London, 1920.

Biography of Laurence Starne, Sir Walter Scott, (in English Novelist Library Series), London, 1821-24.

The Sentimental Journey, Laurence Starne, London, 1768.

Letters from Yorick to Eliza, Eliza Draper, London, 1775.

Sterne's Eliza, Some Account of her Life in India: with Letters written between 1757 and 1774, Arnold Wright and William Lutley Sclater, London, 1923.

British Social Life in India, 1608-1937, Dennis Kincaid, London, 1938.

A Book of Anecdotes, (Ed.) Danie George, London, 1958.

A Writer's Note Book not Somerset Maugham, New York, 1949.

Bygone India, D. Dwears, London, 1922.

The Garden of Kama, Laurence Hope, London, 1901.

The Stars of the Desert, Laurence Hope, London, 1903.

Indian Love, Laurence Hope, London, 1905.

Selected Poem's from the Indian Love-lyrics of Laurence Hope, (ed.) M.J. Nicolson, London, 1922.

'Coronet' (Monthly Journal), London, Sept, 1951.

অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান: এত কাছে, তবু কেন দূরে

সংশয় জেগেছিল মুখের দিকে তাকিয়েই। সাহেবদের মতো ধবধবে ফর্সা নয়, মুখের রঙ ঈষৎ তামাটে। মুখ খুলতেই সন্দেহ ভঞ্জন। পাক্কা সাহিব যে নন অতঃপর সেটা স্পষ্ট। ইতস্তত করে বললাম,—যদি কিছু মনে না করেন,—মনে হচ্ছে আপনি ইংরেজ নন।—আলবৎ নই, আমি ইন্ডিয়ান। উত্তর দিয়েছিলেন বুড়ো মানুষটি।

ইন্ডিয়ান? এবার আমার অবাক হওয়ার পালা কেন না, এই কথোপকথন চলছিল ব্রিটেনে, চলন্ত এক ট্রেনের কামরায়। অর্থাৎ সেই দেশে, যেখানে একাধিক ভারতীয় বংশোদ্ভবকে বলতে শুনেছি—আমি ব্রিটিশ।—ব্রিটিশ পাসপোর্ট হোল্ডার।—সাহেব রসিকতা করছেন না তো?

ম্লান হেসে আমার সহযাত্রী বললেন—কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো? সত্যই আমি ইন্ডিয়ান। হ্যাঁ, তোমরা যাঁদের বল—অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান।

আলাপের পর আমন্ত্রণ। আমি তখনকার মতো একই মহল্লায়, এক বন্ধুর বাড়িতে আছি। সুতরাং, কথা দিলাম সপ্তাহ শেষে তাঁর বাড়ি যাব। আমার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন—আসবে তো?

সুন্দর বাড়ি। পুরনো ধাঁচের বাড়ি বটে, কিন্তু সাজানো গোছানো। একটি নয়, ঘরে দুই দুইটি টেলিভিশন সেট। বৃদ্ধ বললেন—আমি বড় স্ক্রিন পছন্দ করি। ছোটটা ছেলেদের জন্য। বুঝতেই পারছ ওদের পছন্দের প্রোগ্রাম আর আমার পছন্দ একরকম নয়। আজকাল যাকে বলে—জেনারেশন গ্যাপ! ছেলেদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ হল। আলাপ হল তাঁর বান্ধবীর সঙ্গেও। আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। মেয়েটি খাঁটি ইংরেজ। বৃদ্ধ আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—এবার বুঝি জাত যায়!

খেতে বসে কথায় কথায় নানা কথা। খবরের কাগজে কাজ শিখতে এসেছি এ খবরটা তাঁর আগেই জানা হয়ে গেছে। বললেন—অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমাদের কাণ্ড দেখে, খবরের কাগজে ট্রেনিং নিতে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে বিলাতে ছুটে এসেছ! ফ্রি ইন্ডিয়ার এই হাল? তাজ্জব ব্যাপার বটে।—হ্যাঁ, দিন ছিল তখন, তোমার তখন জন্ম হয়নি, টাইমস অব ইন্ডিয়া এক একটা এডিটোরিয়াল লিখত, যেন কামানের গোলা। সাধে কি আর এডিটোরিয়ালকে বলে—লিডার। বলেই বহুকাল আগে লেখা কোনও এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে অনর্গল মুখস্থ বলে গেলেন কয়েকটি লাইন। তারপরে

কলকাতার ইংরজি দৈনিক থেকে স্মরণীয় কয়েকটি হেডলাইন। এসব প্রমাণ সহযোগে তিনি যা বললেন তার মর্ম: একালের ইংরেজরা, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের ইংরেজরা ইংরেজি লিখতে জানে না। আমেরিকানদের দেখাদেখি ওঁরা এখন যখন তখন যত্রতত্র স্ল্যাং ব্যবহার করেন। তৎকালের ইন্ডিয়ার কাগজগুলোর স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে এখানকার কাগজের কোনও তুলনাই হয় না। শুধু চালাকি দিয়ে লোক ঠকানো। বৃদ্ধ রীতিমতো উত্তেজিত। ইতিমধ্যে ছোট ছেলেটি নিঃশব্দে আমার পাশে এসে বসেছে। মাঝে মাঝে আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল—ডাডি, তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছে কেন? প্লিজ, শান্ত হও।

কিন্তু সেই সন্ধ্যায় বৃদ্ধকে শান্ত করা শক্ত। মনে হল বুঝিবা অপেক্ষায় থেকে থেকে এতদিন পরে মনের মতো শ্রোতা পেয়েছেন তিনি। সুতরাং, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে। কথায় কথায় এক সময় রেল প্রসঙ্গ। তিনি রেলে ছিলেন। তামাম ভারত ঘুরেছেন। প্রথমে ছিলেন বিলাসপুরে। তারপর জব্বলপুর, ঝাঁসি, বোম্বাই। তার সবচেয়ে বেশি দিন কেটেছে খড়্গপুরে। সেখান থেকেই এখানে, লন্ডনের এই শহরতলিতে। বললেন,—ছোঃ। এই ট্রেন নিয়ে এত গর্ব। ইংরেজ গর্ব করতে পারে বটে আন্ডারগ্রাউন্ড নিয়ে। কিন্তু সে তো কন্টিনেন্টেও আছে। রয়েছে এমনকী রাশিয়ায়ও। ওঁদের পক্ষেও সত্যকারের গর্ব হতে পারত ভারতীয় রেল। বিশাল দেশের বুকের উপর দিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে হাজার হাজার মাইল রেলপথ। ভাবতেও গর্বে বুক ফুলে ওঠে। বিশেষ করে যখন ভাবি এই রেলপথ তৈরি থেকে শুরু করে তা চালু রাখার বাহাদুরি অনেকাংশে দেখিয়েছে এই অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরাই। এবং ভেবে আনন্দ পাই সে-দলে আমিও ছিলাম একজন।—হায়রে, কোথায় ভারতীয় রেলওয়ে আর কোথায় ব্রিটিশ রেল! বৃদ্ধ আবার উত্তেজিত।—রানির স্পেশাল ট্রেনটি দেখেছ? তাকাতেও ইচ্ছা করবে না তোমার। হ্যাঁ, স্পেশাল ট্রেন, রয়্যাল ট্রেন কাকে বলে দেখিয়ে গেছেন হায়দ্রাবাদের নিজাম। সে গাড়ির খানসামাদের কামরাটিও রানির গাড়ির বৈঠকখানার থেকে ভাল!

খেতে বসে আরও নানা কথা। নিউ মার্কেট। মেট্রো সিনেমা। ডালহৌসি ক্লাব। শীতের ময়দানে পোলো। হকিতে ইন্ডিয়ার বাহাদুরি। আরও কত কথা। খাওয়া-দাওয়াও পুরোপুরি ইন্ডিয়ান। সাদা ভাত, ডাল, ভাজি। চিকেন কারি। ঝাল আমের চাটনি। পাপড়। বাড়ির কর্ত্রীও বসেছেন টেবিলে। বললেন, ভাববে না, তুমি কলকাতার লোক বলে এসব রান্না করছি। সাধারণত আমরা ইন্ডিয়ান কুকিংই পছন্দ করি। এখানে সবই পাওয়া যায়। এমনকী গরমমশলা পর্যন্ত। সত্যি বলতে কি, ওঁদের আন্তরিকতা দেখে আমি সেদিন রীতিমতো অভিভূত। উপহার বলতে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম একটি সিল্কের স্কার্ফ। ততদিনে আর বিশেষ কিছু সঙ্গে নেই আমার। বাক্সে তলানি হিসাবে তখন যৎসামান্য যা ছিল তার মধ্যে দার্জিলিং চায়ের ছোট্ট একটি কৌটো ছিল। মনে মনে লজ্জিত হলাম সেটি সঙ্গে নিয়ে এলে না জানি ওঁরা কত খুশি হতেন।

বিদায় মুহূর্তে সাহেব বললেন—আমি দুঃখিত, তোমাকে অনেক অবান্তর কথা শোনালাম। বললাম,—সে কী, মনে করার কী আছে। খুব ভাল লাগল আপনাদের বাড়ি এসে। আমার কাছে এই সন্ধ্যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার কথায় কান না দিয়ে তিনি বললেন—'কী করব বল? অনেক দিন পরে একজন দেশের লোক কাছে পেয়েছি, তাই নিজেকে সামলাতে পারলাম না।—আমার দুঃখ কেউ বোঝে না।—আমার মনে যে কী তোলপাড় চলে কেউ তা জানে না।—পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—না, না, আমি সুখী। কারণ, আমার ছেলে দুটি সুখী। আমার দুঃখ একটাই, আমি আমার দেশকে হারিয়েছি।—আই মিস ইন্ডিয়া!'

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অবিশ্বাস্য। কারণ, উল্টোটাই শুনে এসেছি চিরকাল। রিকেটস-ডিরোজিও

প্রভৃতি দেশপ্রেমিকদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও অবশিষ্ট ভারতীয়রা যুগ যুগান্ত ধরে শুনে এসেছেন—অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের কাছে ভারত কখনও স্বদেশ নয়, তাঁদের 'হোম' অদেখা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ। তা-ই নিয়ে কত না রঙ্গব্যঙ্গ।

—তুমি কোথাকার লোক হে? ফৌজে সদ্যনিযুক্ত অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রিটিশ অফিসার। তরুণ উত্তর দিল—আমাদের ঘর স্যার, লন্ডনে। পাক্কা সাহেব মনে মনে হাসলেন—লন্ডনের কোথায় বাছা?—নিয়ার দ্য রেলওয়ে স্টেশন স্যার! ছেলেটি জানে না, চিরকালের জন্য পাক্কা ব্রিটিশ অফিসারদের তহবিলে একটি মুখরোচক উপাখ্যান তুলে দিয়ে গেল সে।

এই গল্পটি আমরা শুনেছি একজন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানের মুখেই। তিনি মেলভিন ডি মেলো। তাঁর সূত্রে পাওয়া আর একটি কাহিনী। পাকা মেমসাহেব আধপাকাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মা বাবা কোথায় থাকেন ভাই? উল বুনতে বুনতেই উত্তর দিলেন দ্বিতীয়া,—ওঁরা কেন্টে থাকেন। কেন্ট শুনে এগিয়ে এলেন তৃতীয়,—আঃ, কী মনোরম সংবাদ!—কেন্টের কোথায় তোমাদের বাড়ি? তুমি শুনলে অবাক হবে, আমিও কেন্টেরই মেয়ে। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মেয়েটি এবার বোধহয় সত্যিই বিপাকে পড়লেন। কিন্তু সাহস হারালে চলবে কেন? উল বুনতে বুনতেই তিনি উত্তর দিলেন—আমরা ক্যান্টনমেন্টে থাকতাম।

এ-জাতীয় আরও অনেক গল্প ছড়িয়ে আছে নানা বইয়ের পাতায়। নানা জনের নানা অভিজ্ঞতা। তার কথা পরে। আগে সংক্ষেপে এই হতভাগ্য সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত শুনে নেওয়া দরকার।

ভারতীয়রা যেমন নানা রঙের, অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরাও তেমনই। একজন গবেষক বলেছেন—মানুষের যত রকমের গাত্রবর্ণ হতে পারে সব রকমই আছে ওঁদের মধ্যে। কাঠ-কয়লার মতো কালো থেকে গোলাপের মতো গোলাপি—সব। ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনিও সমর্থন করেন এই সিদ্ধান্ত। তিনি লিখেছেন—

> "It is not uncommon for an Anglo-Indian family, within its confines, to exhaust the gamut of the colour spectrum, one daughter being completely Nordic, fairer than the average Briton, another albescent, a third lime-coloured and a fourth a beautiful delicately framed brunette.''

গায়ের রঙের মতোই সমান বর্ণাঢ্য ওঁদের ইতিহাস। সে-কাহিনীর শুরু পঞ্চদশ শতকের শেষে, যেদিন ভাস্কো ডা গামার তরী এসে ভিড়েছিল কলকাতার উপকূলে। হয়তো বা তারও আগে। একজন সাহেব রহস্য করে লিখেছেন—

> "It is not impossible that king Asoka (of the Edict Pillars), the Constantine of Buddhism; was an Eurasian. I have not got the works of Arrian, or Mr. Leithridge's 'History of the World' at hand, but I have some recollection of Sandracottus, or one of Asoka's fathers or grandfathers, marrying a Miss Megasthenes, or Seleucus.''
>
> (Twentyone days in India, Sir Alibaba)

লেখকের বক্তব্য: গ্রিক মেগাস্থিনিসের মেয়ের সঙ্গে ভারতীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের বিয়ে হয়ে থাকলে সম্রাট অশোক কি ইউরেশিয়ান নন? তিনি অনায়াসে আরও বলতে পারতেন আলেকজান্ডারের অভিযানের পরে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গ্রিকদের যে রাজত্ব শুরু হয় তার ফসল কি শুধু গান্ধার শিল্প, ভারতীয় আর গ্রিকদের মিশ্র সন্তানরাও নন? শক হুন দল, পাঠান মোগলের মতো,—ওঁরাও কিন্তু এক দেহে লীন হয়েছেন সেদিন এই ভারতের মাটিতে।

অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের অতীত অতএব এক অর্থে যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও আগে। সেই ধূসর অতীতে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা বরং আধুনিক ঔপনিবেশিক আমলের কথাই বলি। পর্তুগিজদের পরে ডাচ। তারপর ফরাসি এবং ইংরেজ। প্রথম যেসব পশ্চিমী অভিযাত্রী এ দেশে পৌঁছেছিলেন—রাজত্ব তো বটেই, এমনকী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও তাঁদের ছিল না। বস্তুত সপ্তদশ শতকে ভারতের স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁদের উৎসাহ ছিল যৎসামান্য। আসল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য। যত দ্রুত সম্ভব রৌপ্যভারে অবনত-প্রায় টাকার গাছটি (প্যাগোডা-ট্রি) ঝাঁকিয়ে নেওয়া। তবু মেশামেশি এড়ানো গেল না। তাগিদ শারীরিক, তাগিদ বাণিজ্যিকও বটে। ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব কিম্বা আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক। দূর দেশের মানুষের ভাষা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি বুঝতে হলেও তাঁদের কাছাকাছি যাওয়া দরকার। সুতরাং কালো এবং তামাটে মায়াবিনীদের মায়ায় বাঁধা পড়লেন কেউ কেউ। সূচনা সেখানেই। ওঁরাই আধুনিককালে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের আদি জনক জননী।

সহজ, স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা, সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে যে অভিযাত্রীরা ভারতের বন্দরে বন্দরে নোঙর করছেন, সহযাত্রিণী হিসাবে তাঁদের সঙ্গে স্বদেশের মেয়েরা নেই। প্রথম দিকে পর্তুগিজরা তবু কিছু কিছু সঙ্গিনী পাঠাতেন। কিন্তু যত ঝামেলা, তত খরচা। সুতরাং, নির্দেশ এল, স্থানীয় মেয়েদেরই বিয়ে কর। তাতে উপরি পাওনা হবে খ্রিস্টান বংশধররা। মশলার সঙ্গে খ্রিস্টান সংগ্রহও ছিল সেদিন পশ্চিমী অভিযাত্রীদের ঘোষিত লক্ষ্য। আলবুকার্ক অতএব সানন্দে অসবর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতেন।

নতুন করে সংসার পাতবার জন্য সরকারি তহবিল থেকে অর্থ জোগাতেন। কেননা, গরজ বড় বালাই।

ইংরেজরাও সেই ঐতিহ্য বহন করে চলছিলেন। অন্তত প্রথম দিকে। তাঁরাও কিছু কিছু স্বদেশি মেয়েকে এ দেশে পাঠাতেন। বিশেষত, দেশে যাঁদের বর মিলত না, তাঁদের। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে তাও বন্ধ করে দিতে হল। কারণ, বাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে সৈন্য চাই, সৈন্যদের জন্য চাই উর্দি। কামিজের খরচ মেটাতে হলে কামিনী পাঠানো বন্ধ না-করে উপায় নেই। সুতরাং ১৬৮৭ সালে কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স খোলাখুলি নির্দেশ দিলেন দিশি-বিবি সংগ্রহ করে নাও। ওঁদের বক্তব্য:

> "The marriage of our soldiers to the native women of Fort St. George is a matter of such consequence to posterity that we will be content to encourage it with some expense, and have been thinking for the future to appoint a Pagoda to be paid to the mother of any child, that shall hereafter be born of any such marriage, upon the day the child is Christened, if you think this small encouragement will increase the number of such marriages" (April 8, 1687. From the Court of Director, to the President of Fort St. George, Madras.)

এক প্যাগোডার দাম তখন ৮ থেকে ৯ শিলিং।

আরও নানা ধারায় পুষ্ট হয়েছে এই হ্রদ। অনেক সাধ্যসাধনা করে ব্রিটেন থেকে যেসব মেয়ে এ দেশে আসতেন তাঁদের স্বপ্ন তখন উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে ঘর বাঁধা। বয়সের ব্যবধান ভুলে গিয়েও অনেকে হাতখানা এগিয়ে দিতেন তাঁদের দিকেই। ফলে বঞ্চিত বাদবাকি সাহেবরা গান ধরতেন,—"And that we are far from the lips we love,/ we make love to the lips that are near." সম্পন্ন এবং উচ্চ পদস্থরা সবাই সমান ভাগ্যবান ছিলেন এমন নয়। তাঁদের অনেককে স্বভাবতই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হত। "—Wish the absent loved ones were here!"—এই

খেদোক্তি তাঁদেরও মুখে মুখে। রবিবাসরীয় ভোজের আসরে পানপাত্র হাতে নিয়ে তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন,—"Our absent wives,—God bless them!" নিঃশব্দ চরণে তাঁরা এগিয়ে আসতেন এ পাড়ার দিকেই। কালো কিংবা বাদামি যা-ই হোক, আপত্তি নেই তাঁদের। তাছাড়া, সেদিন এ দেশে ছিলেন আরও একদল পশ্চিমী অভিযাত্রী, যাঁদের বলা হল—"ফ্রি ল্যান্সারস" (Free Lancers) বা ভাগ্যান্বেষী ভাড়াটে সৈনিক। দেশীয় রাজা মহারাজাদের দরবারে তাঁদের বিশেষ সমাদর। তাঁরা ওঁদের সৈন্যদের পশ্চিমী রণকৌশল শেখাতেন। কখনও কখনও বাহিনীর পুরোভাগে থেকে রণক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত নিজেরাও 'রাজা' কিংবা 'নবাব' হয়ে যেতেন। এইসব শ্বেতাঙ্গ 'রাজা'রা চাল চলনে ছিলেন ভারতীয় রাজা বাদশাদের মতো। দিশি বিবিতে বিন্দুমাত্র অরুচি ছিল না তাঁদের। তাঁরা কেউ কেউ হারেমও সাজাতেন। মেজাজেও তাঁরা হারেমের প্রভুদের মতো। বিখ্যাত স্কিনার সাহেবের ভাই মেজর রবার্ট স্কিনার তাঁর পত্নীবর্গের একজনের উপর সন্দিহান হয়ে দাসদাসী সমেত সব পত্নী অথবা বান্ধবীদের হত্যা করেন। দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর সাজানো সংসার তিনি ছাড়খার করে দেন। গৃহস্থালীর জিনিসপত্র সব বাহিনীর সৈন্যরা নামমাত্র দামে কিনে নেয়। তাঁদের দৃষ্টিতে মেজর স্কিনার একজন মরদের মতো মরদ। কেন না, ইজ্জতের প্রশ্নে এমন আপসহীন মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, শেষ পর্যন্ত সাহেব নিজেও আত্মঘাতী হন। তাঁর সৈন্যরা সাহেবের স্মৃতি ধরে রাখবার জন্যই নাকি কাড়াকাড়ি করে সংগ্রহ করেছিল নানা স্মারক। কারণ, এমন মর্যাদাবান মানুষের স্মৃতি ঘরে রাখা সংসারের পথে শুভ। আর এক শ্বেতাঙ্গ নবাব জেনারেল অ্যাভিটেবল নাকি তাঁর এ দেশীয় গৃহিণীর একমাত্র কন্যাকে দুর্গের মধ্যে খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীদের মতো বিশেষ পরিবেশে লালন করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও কারণে তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে ক্রুদ্ধ রাজা-বাদশার মতো ঘোষণা করেন,—প্রথম যার মুখ দেখব তার সঙ্গেই বিয়ে দেব তোমার! তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের পাচকের সঙ্গে। রূপকথার গল্প যেন। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, এসব গল্প নয়,—ঘটনা।

অনেকের ধারণা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান নিচু স্তরের ইংরেজ পুরুষ আর নিচু স্তরের ভারতীয় মেয়েদের সংমিশ্রণের ফলন। ('Outcaste Englishmen and outcaste Indian women') কিন্তু সে কথা মোটেই সত্য নয়। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে নানা সময়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করা হয়েছে। ১৮৯৮ সালে অ্যাডগার বার্স্টন মাদ্রাজ ও মালাবারের অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে জানিয়েছিলেন দুই জাতির মিশ্রণে যে সম্প্রদায় তাঁদের শারীরিক গঠনে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। ওঁদের কাঁধ চওড়া, বুক চওড়া, কপাল চওড়া, পশ্চাতদেশ ও হাত পুষ্ট। শুধু তাই নয়, ওঁদের দেহ রীতিমতো পেশী-সমৃদ্ধ। ('as the result of revivification of the stock by direct British intervention') কলকাতায় ১৯২২ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে বেশ কয়েকটি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষন প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল মাপজোক করে দেখা গেছে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যদি নিচু স্তরের ব্রিটিশ এবং ভারতীয়দের মিশ্রণ ঘটে থাকে, তবে উঁচুস্তরের মিশ্রণেরও প্রভাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, দুই জাতির মিশ্রণের মধ্যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রভাবই বেশি। (দ্রষ্টব্য: The Anglo-Indians, V. R. Gaikwad.)

অভিযাত্রী ইংরেজরা কিন্তু তৎকালে এই মিশ্রণ নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত ছিলেন না। কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইদানীং বন্দিত জোব চার্নকের কথাই ধরা যাক। বলা হয় তিনি সতীর চিতা থেকে উদ্ধার করে একটি হিন্দু রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। সেটা অবশ্যই গপ্প কথা। কিন্তু সমসাময়িক ইংরেজদের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট যে, চার্নক এ দেশের মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করতেন। তাঁর বংশধররা অতএব অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান বলে গণ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কেউ তা বলেননি। ওঁর মেয়েদের প্রত্যেকের বিয়ে হয়েছিল কোম্পানির সম্ভ্রান্ত ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে। তাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক রয়েছে। বিলাতের বিশিষ্ট লর্ড পরিবারের আদি পুরুষ কর্নেল উইলিয়াম লিনায়ুস গার্ডনার বিয়ে করেছিলেন কাম্বের নবাবের নাতনিকে। মেয়েটি আবার একই সঙ্গে ছিলেন দিল্লির বাদশার পালিতা কন্যা। কাম্বের নবাবের আর এক কন্যা, এই মেয়েটিরই অন্য বোনকে বিয়ে করেছিলেন আর এক বিখ্যাত অভিযাত্রী মেজর হাইদর ইয়ং হিয়ার্সে।

এখানেই শেষ নয়। কর্নেল কেনেডি নামে আর একজন বিখ্যাত সৈনিক বিয়ে করেছিলেন এক রাজপুত রাজকুমারীকে। তাঁদের কন্যার বিয়ে হয়েছিল স্যার আব্রাহাম রবার্টসের সঙ্গে। এই রবার্টস সাহেবই ফিল্ডমার্শাল আর্ল রবার্টসের পিতা। ফিল্ডমার্শাল রবার্টস ছিলেন এক সময় ভারতের ইংরেজ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক,—কমান্ডার-ইন-চিফ।

হায়দ্রাবাদের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল কার্কপেট্রিক বিয়ে করেছিলেন পরমাসুন্দরী এক ভারতীয় কন্যাকে। তাঁকে নিয়ে নাকি কার্লাইল পর্যন্ত কলম ধরেছিলেন!

যে নামগুলো উল্লেখ করা হল তাঁরা প্রত্যেকেই বিখ্যাত ব্যক্তি। গার্ডনার বিখ্যাত অশ্বারোহী বাহিনী 'গার্ডনারস্ হর্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান। স্কিনার ছিলেন 'স্কিনারস্ হর্স' নামে আর একটি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। 'শেখাবতী ব্রিগেড', পরবর্তীকালে যার নাম হয় '১৩ নম্বর রাজপুত ব্রিগেড', তার প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফ্রস্টারও একজন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। ঠিক তেমনই আলোয়ার-এর মহারাজার প্রধান সেনাপতি জেনারেল বেন্সলি ও সিন্ধিয়ার প্রধান সেনাপতি জাঁ বাপ্তিস্ত ফিলোজ (Jean Baptiste Filose) ছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান।

এবার একবার অসামরিক পরিস্থিতির দিকে তাকানো যাক। ১৭৯০ সালে বোম্বাইয়ের গভর্নর ছিলেন জর্জ ডিক। তিনি একজন মারাঠি রমণীকে নিয়ে সংসার করতেন। দিল্লিতে কোম্পানির স্বনামধন্য রেসিডেন্ট (১৮০৩-১৮২৫) স্যার ডেভিড অক্টরলনি (যাঁর নামে কলকাতার অক্টরলনি মনুমেন্ট), সংসার করতেন তেরোজন ভারতীয় নারীকে নিয়ে। এমনকী সর্বজনশ্রদ্ধেয় লর্ড টেনমাউথ (Lord Teignmouth) যিনি ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন এ দেশের গভর্নর জেনারেল তিনিও ছিলেন ভারতীয় কিংবা ইউরেশিয়ান মহিলার পৃষ্ঠপোষক। এ কালের একজন গবেষক মন্তব্য করেছিলেন, অনেক ইংরেজই তৎকালে হিন্দু অথবা ইউরেশিয়ান মেয়ে নিয়ে ঘর করেছেন। বস্তুত, তাঁর মতে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি দেখা যায় ভারতে ইংরেজদের শতকরা নব্বইজনই হিন্দু কিংবা ইউরেশিয়ান রমণী নিয়ে তুষ্ট। তিনি বলেন, মুশকিল এই, তৎকালের অনেক জীবনীতেই ব্যাপারটাকে ধোঁয়াটে করে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, মনে করা হয় তিনি বিয়ে করেছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মেয়েকে। ("In the biographies of the period the phrase 'is thought to have married an Anglo-Indian' occurs with maddening frequency.") তিনি মনে করেন দুপ্লে, ওয়ারেন হেস্টিংস, উইলিয়াম গ্রান্ট প্রমুখের স্ত্রী ছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রী বলতে, বলাই বাহুল্য, তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী মারি বুকাননের কথা বলেছেন। (বিয়ে ১৭৫৬ সালে)।

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়ে তোলার পরও কিন্তু পাক্কা সাহেবদের কাছে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা অস্পৃশ্য হয়ে যাননি। মেটকাফ (অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল ছিলেন ১৮৩৫-৩৬ সালে) রণজিৎ সিংহের দরবারে তাঁর মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন এক ভারতীয় কন্যার মধ্যে। সেই মিলনের পরিণতি তিনটি অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান তনয়!

অনেক খাঁটি ইংরেজের বিচারে ভারতীয় এবং অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের রূপ আর গুণের তুলনা হয় না। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একজন ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৩০ সালে বলেছিলেন যাঁরা কোনও না কোনও সময় ভারতীয় মেয়েদের সাহচর্য পেয়েছেন তাঁরা কখনও খাঁটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করবেন না। স্যার রিচার্ড বার্টন মনে হয় একবাক্যে মেনে নিতেন তাঁর কথা। ১৮৪২ সালের পর সাত বছর তিনি ছিলেন ভারতীয় বাহিনীতে। তার মধ্যে যে তিনজন নারীর ভালবাসা পেয়েছিলেন তিনি

তাঁরা কেউ ইংরেজ নন। এমনকী ১৮৫৮ সালে ভবিষ্যতের মান্য পুরুষ স্যার গার্নেট উলসলি পর্যন্ত তাঁর মায়ের কাছে লেখা এক চিঠিতে সত্য প্রকাশে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হননি। তিনি লিখেছিলেন এখানে আমি এমন এক 'পূর্বদেশীয় রাজকন্যার' সন্ধান পেয়েছি যে তারপর আর কোনও ইংরেজ 'কুক্কুরী'কে বিয়ে করার প্রশ্ন উঠে না। তবে যদি সে কোনও ধনাঢ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হয় তবে অবশ্য অন্য কথা। "he had no wish to be caught in European marriage by 'some bitch' unlcss she were an heiress." (দ্রষ্টব্য: Empire and Sexuality, the British Experience, Ronald Hyam).

একই সংবাদ আমাদের এই কলকাতায়। প্রদীপ সিংহ হাইকোর্টের দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে এমন কিছু কিছু তথ্য উদ্ধার করেছেন যা শোনার মতো। (দ্রষ্টব্য, Calcutta in Urban History, Pradip Sinha) হেনরি ভেরেলস্ট ছিলেন ১৭৬৭ থেকে ১৭৬৯ সাল পর্যন্ত বাংলার গভর্নর। ১৭৭৮ সালের একটি উইল থেকে জানা যায় সোফিয়া ইয়ানভেল নামে কলকাতায় তাঁর একজন ইউরেশিয়ান স্ত্রী অথবা বান্ধবী ছিলেন। তাঁদের কন্যা অ্যান তখন ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। সোফিয়া তাঁর কলকাতার সম্পত্তি অ্যানকে দিয়ে যাচ্ছেন। সম্পত্তির মধ্যে কলকাতায় জমি বাড়ি সবই ছিল।

১৭৭৮ সালে সম্পাদিত আর একটি উইলের স্বাক্ষরকারী কেন্টের আস নামক স্থানের বাসিন্দা জন বিন। তিনিও তাঁর সর্বস্ব দিয়ে যান একজন এদেশীয় মেয়ে ও তাঁর একমাত্র কন্যাকে। ১৮২২ সালে কলকাতার এলিজাবেথ রেবেইরা ওরফে বিবি ডায়না উইল করে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দিয়ে যান পালিতা কন্যা জোহানা আলমেইজ ওরফে জেন টমাস এবং হেলেন লুইসকে। তাঁর পোশাক, পুরানো শাল এবং কানের ঝুমকো তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন আর একটি মেয়ে বিবি সুসনাকে। সে বছরই (১৮২২) বিবি লুসি নামে আর একজন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে তাঁর বিষয় আসয় উইল করে দিয়ে যান চার্লস ফিলিপসকে। কে জানে, চার্লস ফিলিপস খাঁটি ইংরেজ ছিলেন কি না!

মেলামেশা অন্য সূত্রেও হয়েছে। একসময় কলকাতায় দুটি বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। একটিকে বলা হত 'ইউ-ও-এস', বা আপার অর্ফানেজ স্কুল, অন্যটিকে 'এল-ও-এস' বা লোয়ার অর্ফানেজ স্কুল। প্রথমটিতে পড়াশুনা করত প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েরা। তাদের মা পুরোপুরি ভারতীয় কিংবা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান, বাবা ইংরেজ বা ইউরোপিয়ান। দ্বিতীয়টিতে ঠাঁই পেত নন-কমিশনড অফিসার বা প্রাইভেট সৈনিকদের সন্তানরা। দীর্ঘকাল ধরে অনেক পাক্কা সাহেবই কনে সংগ্রহ করতেন এই স্কুল দুটি থেকে। সুতরাং, ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি যখন বলেন—তৎকালের ব্রিটিশ নাগরিকদের মতোই অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা এসেছেন মূলত একই সূত্র ধরে, তা সে নৈতিক অথবা অনৈতিক যা-ই হোক না কেন—("The Anglo-Indian Community has thus descended from the same stock, moral or immoral, as the British of those days."—তিনিও একালের ইউরোপীয় গবেষকদের মতোই মনে করেন দুশো বছর ধরে ইংরেজ আর অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে মেলামেশার ফলে ভারতে এমন কোনও খাঁটি ইউরোপিয়ান পরিবার খুঁজে পাওয়া শক্ত যাঁরা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান-কলঙ্ক থেকে মুক্ত ("few, if any European families in India really escaped a touch of Anglo-Indian tarbrash.") তাঁরও ধারণা, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, প্রাদেশিক গভর্নর, উচ্চপদস্থ জেনারেল থেকে শুরু করে অনেক ইংরেজের ধমনীতেই অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের রক্ত। কেউ কেউ অবশ্য সযত্নে চেষ্টা করতেন সেই সত্য গোপন করতে। রোনাল্ড হাইমও, আমরা দেখেছি, স্বীকার করেছেন কার বিবি কোন দেশি সে-সত্য নির্ধারণ করা শক্ত। বাস্তব জীবনেও পাক্কা সাহেব প্রায়শ চাইতেন যতক্ষণ পারা যায় সত্য এড়িয়ে চলতে। যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য কোনও অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান যখন ভি সি, ডি এস ও, এম সি কিংবা এম এম

পদবিতে সম্মানিত হতেন তখন তাঁদের পরিচয় দেওয়া হত 'ইন্ডিয়া-বর্ন অফিসার'! পুরস্কৃত হলে 'ব্রিটন' বলতেও আপত্তি ছিল না কর্তাদের। পুরস্কৃত হলে 'ব্রিটন', অন্য সময় অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। দ্বিতীয় শব্দটা যেন রীতিমতো কলঙ্কিত কোনও শব্দ।

দুর্ভাগ্যবশত অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান শব্দটি বুঝিবা শুধু খাঁটি ইউরোপিয়ান নয়, ভারতীয়দের কানেও অবাঞ্ছিত একটি কটু শব্দ। পর্তুগিজরা ভারতীয় মেয়েদের বিয়ে করতেন ধর্মান্তরিত করে। ফলে ক্ষুব্ধ ভারতীয়রা প্রথম থেকেই একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সামাজিক অবরোধের মুখে বর্ণসংকর তৎকালে সংকোচিত। তাঁদের পৃথিবীর আয়তন অতিশয় ছোট। সামনে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ পিতৃকূলের জীবিকা। হয় ব্যবসা-বাণিজ্য, না হয় ফৌজে নাম লেখানো। যাঁদের সামনে কোনও সম্মানজনক পথ নেই তাঁরা বোম্বাটে অথবা ডাকাত। এসব অবশ্য অষ্টাদশ শতকের কথা। সেদিনের 'ফিরিঙ্গির' দৌরাত্মের ছায়া বিস্তার লাভ করেছিল পরবর্তীকালেও। উনিশ শতকের প্রথম দিকেও কলকাতায় এমন দিশি ডাকাতের দল ধরা পড়ত যারা ডাকাতি করত ফিরিঙ্গির পোশাকে।

ক্রমে বিপর্যয় আরও তীব্র। বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ওঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি। অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন ছাড়াও পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি—অনেক সূত্রেই ইউরোপীয় রক্ত সঞ্চারিত হয়েছে এই সম্প্রদায়ে। সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে হু-হু করে। এমনিতেই ইংরেজদের মনে ওঁদের সম্পর্কে কিছুটা সংশয় ছিল। কারণ, এই সম্প্রদায়ের আদিতে রয়েছে পর্তুগিজরা। ফলে ধর্মে ওঁরা রোমান ক্যাথলিক। ক্যাথলিক বনাম প্রটেস্টান্ট—বিরোধ এবং রেষারেষির ছায়াপাত অতএব স্বাভাবিক। তবে দুর্ভাবনার সমূহ কারণ ছিল অন্য। ১৭৫০ সালে পৌঁছে দেখা গেল এ দেশে যত ইংরেজ তার চেয়ে বেশি অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। পাক্কা সাহেবদের মনে ভয়, কে জানে, হয়তো একদিন ওঁরাই দখল করে নেবে এই দেশ। ১৭৯১ সালে ক্যারিবিয়ানে শ্বেতাঙ্গ বিরোধী বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। সমৃদ্ধ ফরাসি উপনিবেশ সান্টো ডোমিনগোতে শ্বেতাঙ্গ ছিলেন ৩০ হাজার, 'মুলাতো' বা বর্ণসংকররা ৩০ হাজার, আর বাদবাকি ৫ লক্ষ ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ। পরবর্তী দশ বছরে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারান সেখানে। ১৮০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তৃতীয় বিশ্বের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ সাধারণতন্ত্র, ব্ল্যাক রিপাবলিক। ফরাসিরা সেখানকার 'মুলাতো'দের আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লড়াইয়ে মার্কিনীদের সাহায্য করার জন্য। ফিরে এসে তাঁরা ঘাড়ের জোয়াল নামিয়ে রাখলেন। হাইতির নায়ক ডেসালাইনস—পাদ্রি আর চিকিৎসকদের বাদ দিয়ে সব শ্বেতাঙ্গকে হত্যা কর! ভারতে ইংরেজের মনে স্বভাবতই দুর্ভাবনা। অষ্টাদশ শতকে অনেক অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান সাহেবদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এ দেশের মাটিতে লড়াই করেছেন। অস্ত্র ওঁদের কাছে অপরিচিত নয়। কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে সরাসরি বলেই ফেললেন মনের কথা, ওঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতেরই লোক। যদি কোনও দিন নেটিভদের সঙ্গে হাত মেলায় তো বিপদ। বিদ্রোহী ভারতীয়দের নেতৃত্ব করছেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান সেনাপতিরা, হাইতির পর এই দৃশ্যও নিশ্চয় অকল্পনীয় নয়!

সুতরাং, অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের ভাগ্যে অতঃপর যা জুটল তা হল অবহেলা, উদাসীনতা আর নিগ্রহ।

এই উপেক্ষার ইতিবৃত্ত দীর্ঘ এবং এককথায়—হৃদয়বিদারক। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের জীবনে অপেক্ষাকৃত 'সুদিন' ছিল ১৬০০ সাল থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপিয়ানদের মধ্যে জাতিপাঁতি নিয়ে বিশেষ দুর্ভাবনা ছিল না। তাঁরা ভারতীয়দের মতো পোশাক পরতেন, ভারতীয় খানাপিনা উপভোগ করতেন এবং আগেই বলা হয়েছে কেউ কেউ ভারতীয়-স্টাইলে 'জেনানা' পর্যন্ত সাজতেন। ফলে তাঁদের সন্তানসন্ততিরা অনেকে অনায়াসে মিশে যেতে পেরেছেন ইউরোপীয় সমাজে। কেউ কেউ অবশ্য ঠাঁই করে নিয়েছেন দিশি খ্রিস্টানদের ভিড়ে। কিন্তু দেখা গেল, বিধি অর্থাৎ প্রভুরা ক্রমে ক্রমে বাম। ১৭৮৬

সালের মার্চে ঘোষণা করা হল কলকাতার অরফ্যানেজ স্কুলের ছেলেমেয়েদের আর উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে পাঠানো যাবে না। ওঁরা লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরিবাকরি নিয়ে এ দেশে ফিরে আসতেন, সে পথে কাঁটা পড়ল। ১৭৯১ সালে নতুন হুকুম, অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের ফৌজে নেওয়া চলবে না। চার বছর পরে, ১৭৯৫ সালে নির্দেশ আরও স্পষ্ট, যাঁদের মাতৃকুল এবং পিতৃকূল দু'তরফই ইউরোপিয়ান নন, তাঁরা সেনাবাহিনীতে ড্রামবাদক, বংশীবাদক বা ওই ধরনের কাজ পেতে পারেন, ('fifers, drummers, bandsman, farricers etc.') কিন্তু সৈনিকের কাজ নয়।

অসামরিক চাকরিতেও তাঁদের অধিকার সংকুচিত হয়ে গেল। লন্ডন থেকে বোর্ড অব ডাইরেকটার্স জানালেন—আমাদের এখানে অনেক প্রার্থী, আগে কাজ পাবে তারা, পরে অন্য উমেদাররা। যেসব চাকুরি আগে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা পেতেন সেসব চলে গেল কোম্পানির কর্তাব্যক্তি কিংবা তাঁদের বন্ধু, সহচর কিংবা অনুগতদের ভাইপো ভাগ্নেদের দখলে।

ক্রমে আরও বিধিনিষেধের বেড়া রচিত হল অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের ঘিরে। হুকুম জারি হল—অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানকে শহরে থাকতে হবে। শহরের দশ মাইল চৌহদ্দির বাইরে কিছুতেই নয়। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান জমি কিনতে পারবেন না, যত্রতত্র বাস করতে পারবেন না। শেষোক্ত নির্দেশটি অবশ্য পরে তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। বেকার অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা শহরে গালে হাত দিয়ে ভাবছেন—অতঃপর কী। তাঁদের সামনে দুর্দিন।

এল মারাঠা-যুদ্ধ। মহীশূর-যুদ্ধ। আবার সেনাদলে ডাক পড়ল অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের। ওঁরা 'রক্তের আহ্বানে' সাড়া দিলেন। বিপদের দিনে ইংরেজের পাশে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু সে-সুদিন ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। কাজ ফুরিয়ে যাওয়ার পর আবার পুনর্মূষিক ভব। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনও চেষ্টা করেননি এমন নয়। সুবিচারের জন্য তাঁরা নিয়মিতভাবে আবেদন নিবেদন করেছেন। দরবার করেছেন। ১৮৩৩ সালে কোম্পানির সঙ্গে পুনর্নবীকরণ করার আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট স্থির করে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপ খতিয়ে দেখা হবে। সেই পর্যালোচনার সুযোগ নিতে ১৮২৯ সালে ভারতের অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের দাবিপত্র নিয়ে কলকাতা থেকে ব্রিটেন যাত্রা করেন তৎকালের বিখ্যাত অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান নেতা জন রিকেটস। রিকেটস ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। কলকাতায় একটি বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাছাড়া দায়িত্বশীল সরকারি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। কলকাতায় বোর্ড অব কাস্টমসে তিনি ছিলেন ডেপুটি রেজিস্ট্রার। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা তাঁর হাত দিয়ে লন্ডনে যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন তার রচয়িতাদের একজন ছিলেন হেনরি লুই ডিরোজিও। রিকেটস কলকাতায় ফিরে আসার পর টাউন হলে তাঁর সম্বর্ধনার জন্য যে বিরাট সভার আয়োজন করা হয় সেখানেও অন্যতম বক্তা ছিলেন ডিরোজিও। যা হোক, পার্লামেন্টের কমনস এবং লর্ডস দুই কক্ষের সিলেক্ট কমিটির সামনে হাজির হয়ে রিকেটস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। সেদিনের সেই সওয়াল-জবাব পর্যালোচনা করে একালের একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন তিনি পার্লামেন্টের সদস্যদের যেভাবে যুক্তিসহ উত্তর দিয়েছেন তা দেখবার মতো। ("answered their questions with an impressive command of detailed argument") (দ্রষ্টব্য: Race, sex and class under the Raj, Kenneth Ballhatchet.)

নির্লজ্জের মতো ইংরেজ জনপ্রতিনিধিরা রিকেটস্-এর সামনে পুরনো যুক্তিই আউড়েছেন সেদিন। যেমন, ভারতীয়রা কি তোমাদের ঘৃণা করে না? ঘটনা এই, 'ধর্মশীল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা' সব ইউরোপিয়ানদেরই ঘৃণা করেন। মুসলিম এবং হিন্দুদের নিম্নবর্ণের সঙ্গে তাঁরা কোনও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেন না। রিকেটস কিন্তু নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন—তিনি মনে করেন না ভারতীয়রা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের ঘৃণা করে। কেমন করে তিনি তা বলবেন? নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল

ডিরোজিও এবং অন্যান্য জনপ্রিয় অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের কথা। তা ছাড়া তাঁর স্কুলে অনেক বাঙালি ছাত্রও পড়ত। তিনি সৈন্যবাহিনীর কথাও উল্লেখ করলেন। হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য যেভাবে তাঁদের অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান সেনাপতিদের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও ভালবাসা দেখিয়েছে তারপর কেমন করে বলা যাবে ভারতীয়রা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের আদৌ পছন্দ করে না? সদস্যরা কেউ কেউ বলতে চাইলেন বৈষম্যের অভিযোগ ঠিক নয়, অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা যদি দুরবস্থায় পড়ে থাকেন তবে তার জন্য দায়ী তাঁদের আলস্য, উদ্যোগহীনতা এবং লঘুচিত্ততা। ইংরেজিশিক্ষিত নব্য বাঙালি বাবুদের বিরুদ্ধেও কি একই অভযোগ শুনিনি আমরা। আসলে কি অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান, কি বাঙালিবাবু, দুই দলই কিন্তু সাহেবদের তুলনায় এ দেশ সম্পর্কে বেশি অবহিত এবং অভিজ্ঞ। তবু তাঁদের ভাগ্যে সহসা সম্মানজনক সরকারি কাজ জোটে না। সেটা যদি বৈষম্যের ফল না হয় তবে কী?

জন রিকেটসের দৌত্য পুরোপুরি বিফলে যায়নি। ১৮৩৩ সালে কোম্পানির নতুন সনদে মেনে নেওয়া হয় জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনও ভারতীয়ের অধিকার রয়েছে সামরিক ও অসামরিক কাজে চাকুরি পাওয়ার। কিন্তু পরিস্থিতি যে বাস্তবে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত সেটা বোঝা গেল দুই দশক পরে, ১৮৫৩ সালে কোম্পানির সনদ নবীকরণ উপলক্ষে। আবার সেই এককথা—ভারতীয়রা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের পছন্দ করে না। কলকাতা থেকে সেবারও স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা। তাঁরা বললেন এখনও ঘোরতর বৈষম্য চলছে। ১৮৩৩ সালে ফার্সির বদলে আদালতের ভাষা হয়েছে ইংরেজি। তাতে কিছু অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান কেরানির কাজ পেয়েছেন বটে, কিন্তু উচ্চ পদে তাঁদের অধিকার নেই। যত স্বল্পবুদ্ধি এবং অনভিজ্ঞই হোননা কেন, সেসব সংরক্ষিত সাহেবদের জন্য। সেবার রিকেটস উপস্থিত ছিলেন না বটে, কিন্তু অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা সৌভাগ্যবশত একজন খাঁটি ইংরেজকে পেয়েছিলেন তাঁদের সমর্থক হিসাবে। তিনি মেকলের ভগ্নিপতি বিখ্যাত সিভিলিয়ান চার্লস ট্রেভেলিয়ান। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে পার্লামেন্টের সদস্যদের অশিষ্ট এবং অবজ্ঞাসূচক ভাষা প্রয়োগের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানান। আবার শোনা গেল সেই প্রাচীন কুসংস্কারের পুনরুক্তি, অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দুই দলের বদগুণগুলি। ট্রেভেলিয়ান বললেন—ঘটনা ঠিক তার উল্টো। আমি দেখি ওঁরা ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দুই জাতির সদগুণগুলির সমাহার। ('many of the good qualities of the English and of the natives of India, with the amiability and quickness and the tact of the natives of India, they unite a great deal of the energy and high moral qualities of Europeans.'') তিনি সরকারি কাজে নিযুক্ত কয়েকজন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান কর্মচারীর দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠল—সংখ্যা কি তাদের যথেষ্ট? ট্রেভেলিয়ান উত্তর দিয়েছিলেন—যথেষ্ট না হলে বুঝতে হবে আমরা তাদের যথেষ্ট সুযোগ দিইনি। আরও অনেক কথাই শোনা গিয়েছিল সেদিন। যথা: অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা কি ছেলেদের তুলনায় সুগঠিত নন?

ট্রেভেলিয়ান বলেছিলেন আমি মনে করি তাঁরা 'বিশ্বের সেরা স্ত্রী ও জননীদের' অন্তর্গত। ছেলেদের দেহের গঠন, শারীরিক দৌর্বল্য ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—ইউরেশিয়ানরা (অর্থাৎ অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা) দৈহিক উচ্চতা, শারীরিক গঠন এবং অন্যান্য লক্ষণে যদি নানা রকম বলে মনে হয়, তবে ইংরেজরাও কিন্তু তা-ই। আর 'শারীরিক শক্তি'? ভারতীয়দের তুলনায় তাঁরা দুর্বল কিনা? ওঁরা যদি ভারতীয় কৃষকের মতো শক্ত সমর্থ না হন, তবে অনেক ইংরেজও কিন্তু তা-ই!

কুসংস্কার তবু কাটে না। কোনও কোনও পাক্কা সাহেব অবশ্য তার ঊর্ধ্বে ছিলেন। লর্ড ডালহৌসি তাঁর এ-ডি-সি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন সার চার্লস মেটকাফের অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান স্ত্রীর পুত্র জেমস মেটকাফেকে। মাদ্রাজের গভর্নর হিসাবে ট্রেভেলিয়ানও সসম্মানে গ্রহণ করেছেন বিশিষ্ট অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ও ভারতীয়দের। তবু বৈষম্যই ছিল তৎকালে স্বাভাবিক নিয়ম। বালহ্যাচেট

সবিস্তারে আলোচনা করেছেন বৈষম্যের একাধিক দৃষ্টান্ত।

জোসিয়া ড্যাসউড গিলিস ছিলেন একজন তুখোড় ছাত্র। তিনি চিকিৎসক ছিলেন। মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ থেকে সসম্মানে পাশ করে ১৮৫৫ সালে উনত্রিশ বছর বয়সে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি ইংল্যান্ড যান। সেখানে তিনি এম আর সি পি এবং এম ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁর বিদ্যা এবং দক্ষতা দেখে রয়াল কলেজ অব সার্জনরা অভিভূত। তাঁরা কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন গিলিসকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন হিসাবে নিযুক্ত করা হোক। ওঁরা তা-ই করলেন। দেশে ফিরে গিলিস সরকারি কাজে যোগ দিলেন। দিব্যি চলছিল। কিন্তু কাল হল তাঁর স্ত্রীলোক বিশেষজ্ঞ হতে গিয়ে। গিলিস সে-বিদ্যায়ও যথাপূর্ব কৃতিত্ব দেখালেন বটে। কিন্তু কে জানত, নতুন বিদ্যা তাঁকে একদিন বিপাকে ফেলবে।

ডাঃ গিলিস যুক্ত ছিলেন মাদ্রাজ নেটিভ ইনফেন্ট্রির পঞ্চম রেজিমেন্টের সঙ্গে। তাঁর কর্মস্থল ছিল ওড়িশা। সেখানে তিনি সৈনিক ছাড়াও তাঁদের পরিবারের চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সুখ্যাতিও ছিল। কিন্তু বিপদ ঘটল মিসেস স্টোনহাউস নামে একজন ইংরেজ লেফটেন্যান্টের স্ত্রীর মৃত্যুকে ঘিরে। ভদ্রমহিলা সন্তানসম্ভবা ছিলেন। সন্তান প্রসব করে দুর্ভাগ্যবশত তিনি মারা যান। অভিযোগ উঠল এই মৃত্যুর জন্য দায়ী ডাঃ গিলিস। ডাইরেক্টার জেনারেল অব দ্য মেডিকেল সার্ভিস ডাঃ গিলিসকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করলেন। শুরু হল তদন্ত। তদন্ত উপলক্ষে অনেক আজগুবি অভিযোগই শোনা গেল। এমনকী উপরওয়ালা চিকিৎসকরাও যা খুশি তা-ই সাক্ষী দিতে লাগলেন। ডাঃ গিলিস কখনও চিকিৎসাশাস্ত্রের যুক্তি অনুযায়ী, কখনও ওঁদের অজ্ঞতার দিকে অঙ্গুলি তুলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিতে শুরু করলেন নানা মনগড়া অভিযোগের। কিন্তু একজন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ডাক্তারের হাতে একজন খাঁটি ইংরেজের স্ত্রী মারা গেছেন, কর্তারা এত সহজে ছাড়বেন কেন? শেষ পর্যন্ত ভুল চিকিৎসা প্রমাণ না করতে পেরে ওঁরা আসল কথাটা বলেই ফেললেন। ডাঃ গিলিস কোন সাহসে একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলার গায়ের চাদর সরিয়ে তাঁর পেট পরীক্ষা করলেন? কেন তিনি নার্সদের ওপর নির্ভর না করে প্রসবের পর নিজেই তাঁর শরীর পরিস্কারের দায়িত্ব নিলেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। রোগীর প্রতি উদাসীনতার অভিযোগ ছাড়াও, তাঁর নানা ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথাও শোনালেন কেউ কেউ। যেমন, তিনি প্রকাশ্যে নাক ঝাড়েন। একবার কোনও পিকনিকে নাকি দেখা গেছে তাঁর পকেটে রুমাল নেই। কমান্ডার-ইন-চিফ থেকে শুরু করে ডাইরেক্টর জেনারেল অব মেডিকেল সার্ভিসেস, ইনস্পেক্টার জেনারেল অব হসপিটাল প্রকারান্তরে সবাই সেদিন যা বলেছিলেন তার মর্ম: কোনও অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান চিকিৎসককে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদে নিযুক্ত করা ঠিক নয়। ইংরেজ সৈনিকদের পরিবার পরিজনের দায়িত্বও কিছুতেই তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। বিলাতের কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ ব্যাপারে নিরপেক্ষতার ভান করেছিলেন। তাঁরা নিয়োগ পদ্ধতির কী কী উন্নতিবিধান করা যায় তা নিয়ে নব নব চিন্তায় মগ্ন হন। এসব '৫৭-র মহাবিদ্রোহের পরের ঘটনা। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান চিকিৎসকরা সামরিকবাহিনীতে আঠারো বছর কাজ করার পরও অ্যাসিস্ট্যানট সার্জনই থেকে যান, সার্জন আর হতে পারেন না। ডাঃ গিলিসের অবশ্য চাকরি যায়নি। কারণ, তিনি খাস লন্ডন থেকে নিযুক্ত, তাঁর চাকরি ছিল পাকা। কর্তৃপক্ষকে তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে বদলি করেই খুশি থাকতে হয়। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে ১৮৬৫ সালে লম্বা ছুটি নিয়ে ডাঃ গিলিস বিলাত যাত্রা করেন। পথে জাহাজে তাঁর মৃত্যু। বৈষম্য তখনও কোন পর্যায়ে সেটা বোঝা যায় জর্জ ডির্ডস্ন্যাপ নামে আর একজন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ডাক্তারের প্রতি কর্তৃপক্ষের আচরণে। '৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌ হ্যাভলকের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কারও কোনও প্রশ্ন নেই। তবু বেচারির কিছুতেই আর পদোন্নতি হয় না। কর্তৃপক্ষ তাঁকে অ্যাসিস্ট্যানট সার্জনের পদ দিতেও নারাজ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১৮৬২ সালে যদিবা সে পদ

জুটল, মাইনে ২৫ টাকা কম। আবার দরবার। এবার মাসে প্রাপ্য মূল মাইনে ২৫ টাকা বাড়িয়ে ২৫০ টাকা করা হল। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত ভাতা হিসাবে মাসে আরও ১৫০ টাকা বরাদ্দ করা হল। বিলাত থেকে নির্দেশ এল ওঁর লেফটেন্যান্ট বা অ্যাসিস্ট্যানট সার্জন পদবিটি সাম্মানিক। তার জন্য বাড়তি ১৫০ টাকা তাঁর প্রাপ্য হতে পারে না।

লজ্জার কথা ঈশ্বরের সেবায়েত পাদ্রিরাও সেদিন হতভাগ্য অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের রীতিমতো ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে বিবেকের দংশন পর্যন্ত অনুভব করেন না। কেনেথ বালহ্যাচেট মিস মারি পিগট বনাম রেভারেন্ড উইলিয়াম হ্যাস্টির বিরোধের সুবিদিত কাহিনীটি নতুন করে শুনিয়েছেন। মারি পিগট ছিলেন কলকাতায় চার্চ অব স্কটল্যান্ডের অরফানেজ এবং জেনানা মিশনের পরিচালিকা। আর রেভারেন্ড হ্যাস্টি ছিলেন কলকাতায় জেনারেল অ্যাসেম্বলি অব দ্য চার্চেস অব স্কটল্যান্ডের পরিচালিত বিদ্যালয় জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনের কর্তা।

সেটা উনিশ শতকের সত্তরের দশকের কথা। মিস পিগট ছিলেন ভারতীয় খ্রিস্টান এবং ভারতীয়দের কাছে প্রিয়। তিনি সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারতেন। রেভারেন্ড হ্যাস্টি আবার ঠিক উল্টো। তিনি মাঝে মাঝেই এদেশীয়দের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তেন। একবার সেই বিতর্কে যোগ দেন মিস পিগটের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভারতীয় খ্রিস্টান কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে দেখা দেয় দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষের পরিমণ্ডল। রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মিস পিগটের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এমনকী প্রশ্ন তোলেন তাঁর নিজের বিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলসনের সঙ্গে মিস পিগটের অন্তরঙ্গতা নিয়েও। ব্যারাকপুরে এক পিকনিক পার্টিতে তিনি মিস পিগট এবং অধ্যাপক উইলসনকে গা ঘেঁষাঘেষি করে বসে হাস্যালাপ করতে দেখেছেন। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল অরফ্যানেজের জানালায় মিস পিগটের কোমর ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে। রেভারেন্ড হ্যাস্টি আরও রটাতে লাগলেন মিস পিগট গোপনে গোপনে একজন রোমান ক্যাথলিক ইত্যাদি ইত্যাদি।

রেভারেন্ড হ্যাস্টি মিস পিগটের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ বিলাতে চার্চের উপরওয়ালাদের কাছে পাঠালেন। মহিলার বিরুদ্ধে তাঁর আর একটি অভিযোগ ছিল তিনি 'অবৈধ, জারজ বর্ণসংকরদের সঙ্গে' মেলামেশা করতে ইতস্তত করেন না, তাঁদের সন্তানদের নিয়েই তাঁর অনাথ আশ্রম। অভিযোগের উত্তর দিতে স্বয়ং মিস পিগট ছুটেছিলেন এডিনবরা। সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর আর্জি ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠানটিকে রেভারেন্ড হ্যাস্টির কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করা হোক। কর্তৃপক্ষ বললেন—তুমি কলকাতায়ই বরং তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নাও। বাধ্য হয়েই মিস পিগট শেষ পর্যন্ত শরণ নিয়েছিলেন আদালতের। সেটা ১৮৩৩ সালের কথা। এ দেশে তখন কুখ্যাত ইলবার্ট বিল নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। তারই মধ্যে বর্ণদ্বেষী বিচারক নর্টনের এজলাসে উঠল রেভারেন্ড হ্যাস্টির বিরুদ্ধে মিস পিগটের মানহানির মামলা। রেভারেন্ড হ্যাস্টি অনেক চেষ্টা করলেন মিস পিগটকে চরিত্রহীন প্রমাণ করতে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তাঁর সাক্ষী প্রমাণ খুবই নড়বড়ে। বিচারপতি নরিসও চেষ্টা করলেন মিস পিগটকে শ্লথ চরিত্রের নারী হিসাবে প্রমাণ করতে। তাঁকে দু ঘণ্টা ধরে জেরা করা হল। ওই সময়ে বেচারাকে উত্তর দিতে হয়েছিল ৩৩৩টি আঁকাবাঁকা প্রশ্নের। তবু শেষ পর্যন্ত মিস পিগটের অপরাধ প্রমাণিত হল না। নরিস রেভারেন্ডকে নির্দেশ দিলেন মিস পিগটকে এক আনা ক্ষতিপূরণ দিতে। আরও বললেন মামলার খরচ বহন করতে হবে তাঁদের নিজেদেরই।

অনেক পর্যবেক্ষকেরই সেদিন মনে হয়েছিল মিস পিগট সুবিচার পাননি। ভারতীয়দের ধারণা, মিস পিগট সুবিচার পাননি। কারণ তিনি ভারতীয়দের সঙ্গে মেশামেশি করতেন। তাঁর চেষ্টা ছিল ইউরোপীয় আর ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে। যা হোক, সহানুভূতিশীলরা চাঁদা তুলে মিস পিগটকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তিনি হাইকোর্টের আপিল বিভাগের দ্বারস্থ হলেন। সেখানে

তিনি জয়ী হলেন। রেভারেন্ড হ্যাস্টিকে বলা হল তাঁকে তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে। তাছাড়া মামলার খরচও বহন করতে হবে তাঁকে। ইতিমধ্যে এডিনবরা থেকে চার্চের কর্তারা রেভারেন্ড হ্যাস্টিকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। বিপন্ন হ্যাস্টি দেশে ফিরে গেলেন। কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করার জন্য। যাওয়ার আগে তিনি কিন্তু মিস পিগটকে জরিমানার টাকা দিয়ে যাননি। এডিনবরার কর্তৃপক্ষ তাঁকে নির্দোষ বলে মেনে নিতে রাজি হলেন না। চার্চের তরফ থেকে কলকাতায় অনুসন্ধান করার জন্য তদন্তকারীদের পাঠালেন। রেভারেন্ড হ্যাস্টি নিজের স্বপক্ষে সওয়াল করার জন্য ফিরে এলেন কলকাতায়। এখানে জরিমানা অনাদায়ের দায়ে তাঁকে কয়েদ করা হয়। প্রায় এক মাস প্রেসিডেন্সি জেলে কাটাবার পর রেভারেন্ড ঘোষণা করলেন তিনি দেউলিয়া। কলকাতায় চার্চের তদন্তকারী দলও যাবতীয় অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলেন মিস পিগটকে। তাঁরা তাঁকে বছরে ৪০ পাউন্ড করে পেনসন মঞ্জুর করলেন। এসব ১৮৮৫সালের কথা। আধুনিক ঐতিহাসিকের কাছে ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছিল কারণ মিস পিগট ছিলেন শ্বেতাঙ্গিনী। তিনি কোনও অবৈধ সন্তান নন তা প্রমাণের জন্য আদালতে তাঁর মা বাবার বিয়ের সার্টিফিকেট পর্যন্ত পেশ করতে হয়েছিল। তাঁর মা তখনও ঢাকায় বেঁচে আছেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন ইউরেশিয়ান, অর্থাৎ অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। পাক্কা সাহেবরা আরও সে কারণেই হয়তো তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপনের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। বালহ্যাচেট লিখেছেন—হ্যাস্টি ছিলেন মিশনারি হলেও শাসক শ্বেতাঙ্গদের পরিমণ্ডলের অন্তর্গত। একজন ইংরেজ কিংবা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মহিলা মিশনারি তাঁর চোখের সামনে ভারতীয়দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আচরণ করবেন, তা কেমন করে সহ্য করা যায়। তাঁর বিচারে মূলত এটা যৌন ঈর্ষার প্রকাশ। ('Here was a classic occasion for the sexual jealousy to which men of dominant group are peculiarly liable.')

সুশিক্ষিত চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও ডাঃ গিলিস অবিচারের শিকার। কারণ, তিনি ছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। একজন সফল ও সক্রিয় মিশনারি হওয়া সত্ত্বেও মিস পিগট নিগৃহীত কারণ, তাঁর মা ছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। আশ্চর্য, শতকের পর শতক জুড়ে জাতিবিদ্বেষ, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, অনাদর, অবিচার এবং বৈষম্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও এই জনগোষ্ঠী ভারতের বিশাল জনারণ্যে হারিয়ে যায়নি। যে কোনও বিচারে ভারতের ইতিহাসে বিশিষ্ট তাঁদের ভূমিকা। ভারতের রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গণে উজ্জ্বল তাঁদের উপস্থিতি। সামান্য এক জনগোষ্ঠীর পক্ষে সেটা অবশ্যই এক বিরাট অর্জন। সেনাবাহিনীতে তাঁদের ঐতিহাসিক অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু মারাঠা-যুদ্ধ। মহিশূর-যুদ্ধ নয়, ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহেও অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান সৈনিকেরা ইংরেজের সহায়ক, তাঁদের কাছে বন্ধু-স্বরূপ। তার জন্য ওঁদের 'ভারত-বিরোধী' বলে ধরে নেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। বাংলার কথাই ধরা যাক। সেদিনের বাঙালি মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, বুদ্ধিজীবী এবং অধিকাংশ সাংবাদিকও কি ইংরেজের সমর্থক ছিলেন না। সুতরাং, ওসব নিয়ে আর এখানে প্রশ্ন তোলার কোনও অর্থ হয় না। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ইংরেজের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছেন ভারতীয় সৈন্যদের মতো। নানা বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ১৯১৬ সালে অন্তত আট হাজার অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ছিলেন ইংরেজবাহিনীতে। নানা রণাঙ্গনে সাহসিকতার সঙ্গে তাঁরা লড়াই করেছেন। বলা হয় ফ্রান্সের মাটিতে প্রথম যে প্লেনটি ভূপাতিত করেছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ওয়ার্নফোর্ড নামে বৈমানিক তিনি ছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। তাঁকে ভিক্টোরিয়া-ক্রসে সম্মানিত করা হয়েছিল। ১৯২০ সালে গঠিত হয়—'দ্য অক্সিলারি ফোর্স, ইন্ডিয়ান সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স।' প্রতিরক্ষার এই দ্বিতীয় ব্যূহটির অধিকাংশ সৈনিকই ছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। প্রথম মহাযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা। সমর্থ অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের শতকরা ৭৫ জনই সেদিন নাম লিখিয়েছিলেন ফৌজে। তিন থেকে চার

হাজার অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান তখন রয়াল এয়ারফোর্সে। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরাও সেদিন পিছিয়ে নেই। ভারতীয় নারী সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা অগ্রপথিক। 'মিলিটারি নার্সিং সার্ভিস' এবং 'অক্সিলারি নার্সিং সার্ভিস',—নার্স বাহিনীতে তাঁরাই সেদিন অগ্রগণ্য। তাছাড়া, 'উইমেনস অক্সিলারি কোর অব ইন্ডিয়া' সংক্ষেপে 'ওয়াকাই' বা সেনাদের সেবা ও মনোরঞ্জনের জন্য গড়া বাহিনীতে শতকরা আশি জনই ছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান তরুণী আর যুবতী। উল্লেখ করা প্রয়োজন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনেক ভারতীয় সৈনিক যেমন যোগ দিয়েছিলেন নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজে, তেমনই যোগ দিয়েছিলেন বেশ কিছু অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান লড়িয়েও। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা সগর্বে উল্লেখ করেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম। তিনি—সিরিল জন স্ট্র্যাচি। কমিশনড অফিসার স্ট্র্যাচি ব্রিটিশ বাহিনীর মায়া কাটিয়ে যোগ দেন আই এন এ-তে। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা সামরিক বাহিনীতে নিজেদের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছেন স্বাধীনতার পরে। স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনীতে অনেক উচ্চপদে তাঁরা সসম্মানে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এখনও করছেন। এই প্রসঙ্গে শোনার মতো ছোট্ট একটি তথ্য। ১৯৬৫ সালে ভারতের তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি সাহসিকতার জন্য যে ৬৩ জন সৈনিককে পুরস্কৃত করেন তার মধ্যে সাত জন ছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান।

ভারতে আধুনিকতা প্রসারেও অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের বিশেষ ভূমিকা। ১৮৫১ সালে এল টেলিগ্রাফ। 'টরে টক্কা'র তারে বাঁধা পড়ল বিশাল ভারত। মাকড়শার জালের মতো এই নিপুন বুনোট সম্ভব করতে ডালহৌসি এবং তাঁর সাম্রাজ্যের কারিগররা সেদিন বহুলাংশে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের উপর নির্ভরশীল। অবশিষ্ট ভারতীয়রা নন, এই তারের জারিজুরি জানতেন একমাত্র তাঁরাই। সাতান্নর মহাবিদ্রোহে এই তারের ভূমিকা আজ সকলের জানা। ১৮৫৩ সালে এল রেল। প্রথমে বোম্বাই থেকে খানা। দু' বছর পরে ১৯৫৫ সালে হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া। হাজার হাজার মাইল রেলপথ তৈরি থেকে শুরু করে রেল পরিচালনার নানা বিভাগে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা সেদিন সবচেয়ে ব্যস্ত। সবচেয়ে কর্মঠ কর্মীর দল। তাঁদের বাদ দিয়ে রেলের কথা যেন ভাবাই যায় না। কাস্টমস, ডাক বিভাগ, পুলিশ বাহিনীতেও তাঁদের উপস্থিতি ছিল সেদিন দর্শনীয়।

তবে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ইংরাজি শিক্ষা প্রসারে তাঁদের দীর্ঘকালব্যাপী উদ্যোগ। এ দেশে প্রথম ইউরোপীয় বিদ্যালয় মাদ্রাজে, ১৭২১ সালে। ক'বছরের মধ্যে কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে নতুন বিদ্যালয়। তারপর দেখতে দেখতে আরও। উনিশ শতকে বাঙালি ইংরেজিতে পাঠ নিয়েছেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের পরিচালিত স্কুলেই। একটি বিবরণে দেখছিলাম ১৯৩৪ সালে এ দেশে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান স্কুল ছিল ৩৬২টি। তার মধ্যে ২১টির সঙ্গে মিশনারিদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ৭৬টি ছিল রেলওয়ে স্কুল এবং ১০টি সরকারি 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান' স্কুল। এইসব স্কুলে পড়াশুনা করত ৫৫ হাজার ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে ৪৩ হাজারই ছিল অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। এখন স্বভাবতই স্কুল এবং পড়ুয়ার সংখ্যা দুই-ই বেড়ে গেছে। দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে পড়ছে 'ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুলে। 'আংরেজি হঠাও' জিগির তুলে যাঁরা এক সময় পাগড়ি মাথায় নাগরা পায়ে লাঠি হাতে গোটা দেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদের ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনিরাও এখন 'ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুলে পড়ার জন্য ব্যস্ত। এইসব স্কুলের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাত মিশনারিদের পরিচালিত স্কুলগুলি। স্বাধীনভাবে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা পরিচালনা করেন অনেক স্কুল। তাছাড়া, অধিকাংশ ইংরেজি স্কুলে তাঁরাই অন্যতম শিক্ষক সম্প্রদায়। এমনকী শহরে 'স্বদেশিদের' পরিচালিত নার্সারি কিন্ডারগার্টেনেও তাঁদের ছাড়া চলে না। ভারতে হিন্দির মতো ইংরেজিও যে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল তার পিছনে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কিছু কিছু কৃতিত্ব রয়েছে। আজ ইংরেজির প্রচার, প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠা যখন সর্বব্যাপ্ত,

ভারতীয় লেখকদের ইংরেজি রচনা যখন বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত, তখন শুধু লর্ড মেকলে নয়, ধন্যবাদ জানাতে হয় অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের। তাঁদের সৌজন্যেই 'পাক্কা ভারতীয়দের' সন্তানদের মুখে আজ—'মামি', 'ডাডি'!

অনেক কৃতী সন্তান জন্মেছেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের ঘরে। পুরানো আমলের খ্যাতিমানদের মধ্যে রয়েছেন—জাহাজ নির্মাতা জেমস কিড, যাঁর নামে খিদিরপুর। বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল কিড তাঁরই পূর্বপুরুষ। সেই তালিকায় অনায়াসে যোগ করা যায় কলকাতায় একদা বিখ্যাত ছাপাখানা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামপুর মিশনের দলছুট সদস্য উইলিয়াম হপকিং পিয়ার্স। অনেক সৃজনশীল মানুষ আবির্ভূত হয়েছেন এই সম্প্রদায়ে। জর্জ পেক ফার্সি ও উর্দুতে কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হায়দ্রাবাদের ডাঃ বেঞ্জামিন জনস্টনও ছিলেন ফার্সিতে জনপ্রিয় কবি। ভোপালের বালথাজার বুরবঁ নাম করেছিলেন উর্দুতে কবিতা লিখে। গোয়ালিয়রের ফিলোজ পরিবারের স্যার ফ্লোরেন্স ফিলোজ রচনা করতেন হিন্দি গান। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সবাই কি ভারতীয়দের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতেন? একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে 'হবসন জবসন' বা ওই ধরনের 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান শব্দের অভিধানে' অনেক মিশ্র শব্দই জুগিয়েছেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা। তাঁরাই ছিলেন কিন্তু নবাগত ইউরোপিয়ানদের কাছে বলতে গেলে একমাত্র দোভাষী। একই কথা বলা চলে 'রাজ' আমলে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ভারতীয় খাদ্যের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে। পাক্কা সাহেব-মেমদের অনেক আগে থেকে ভারতীয় মশলা এবং খাদ্যের স্বাদ তাঁরা ছিলেন সুপরিচিত। গোয়ার অনেক পাচক ছিলেন এ ব্যাপারে সাহেব মেমদের দীক্ষাগুরু। আজ বিদেশে যখন ভারতীয় 'কারি'র জয় জয়কার, তখন বেচারা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের কথা কারও মুখে শোনা যায় না।

শিল্প সংস্কৃতির অন্যান্য প্রাঙ্গণেও অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সাফল্য এই সম্প্রদায়ের আকারের তুলনায় খুবই উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত শিল্পী চার্লস পোট, যিনি উনিশ শতকের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি এঁকে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি একজন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। পরবর্তীকালের আর একজন বিখ্যাত অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান শিল্পী প্যারিসে শিক্ষিত ফ্যাঙ্ক ক্লিংগার স্কালান। তাঁর প্রয়াণ ১৯৫০ সালে। সঙ্গীতের জগতে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সবথেকে গৌরবময় অবদান বোধহয় ক্লিফ রিচার্ডস। লক্ষ্ণৌর ছেলে রিচার্ডের আগে নাম ছিল—হ্যারি ওয়েব। তাছাড়া টনি ব্রেন্ট (আদিতে দেওলালির রেজিনাল্ড ব্রিতান), এঞ্জেলার্ট হামপারডিঙ্ক (আদিতে মাদ্রাজের জেরাল্ড ডোরসি), ইডেন কেন, জন মেয়ারও সুখ্যাত। একসময় ভারতীয় টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্মী অ্যাডেলিনা ডিফোল্টস-কে তাঁর সুরেলা গলার জন্য বলা হত—'দ্য নাইটিঙ্গেল অব দ্য ইস্ট।' অনেক কিন্নর কণ্ঠ, কিন্নর কণ্ঠী জন্মেছেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মার্ল ওবেরনের কথা। বোম্বাইয়ে সাধারণ এক অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ঘরের সন্তান এস্টেল মার্ল ও'ব্রায়েন টমসন একসময় কলকাতায়ও ছিলেন। কাজ করতেন টেলিফোন বিভাগে। সেখান থেকে একদিন পাড়ি দেন দূর হলিউডে। দেখতে দেখতে সেখানকার তারকাখচিত আকাশে এই পূর্ব দেশের সুন্দরী যেন উজ্জ্বলতম তারকা। ভিভিয়ান লে, মার্লিন ডিয়েট্রিচের সঙ্গে পাল্লা দেন তিনি। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ তেত্রিশ বছর তিনি ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে। বাষট্টি বছর বয়সেও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন তিনি!

খেলাধুলায় অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের কৃতিত্বের কথা সুবিদিত। ঘোড়দৌড়, হকি, পোলো, ভলিবল, বাস্কেটবল, সাঁতার, সর্ব অঙ্গনে বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন ওঁরা। এমনকী বক্সিংয়েও। ১৯২৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় হকি টিমের এগারোজন খেলোয়াড়ের মধ্যে আটজনই ছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। আর, বিলিয়ার্ডে বিশ্বজয়ী (১৯৫৮-১৯৬৪) উইলসন জোন্সের নাম কার না

জানা?

তবে আধুনিক ভারতের চোখে সবচেয়ে খ্যাতিমান অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান যিনি তিনি—হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)।

ডিরোজিও কবি, সাংবাদিক, লেখক চিন্তানায়ক। মাত্র তেইশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। তাঁরই মধ্যে এই তরুণ যুগান্তরের নায়ক। হিন্দু কলেজের নবীন ছাত্রদের প্রিয় এই শিক্ষক দেখেছেন, ফুলের কুঁড়ির মতো ধীরে ধীরে খুলেছে তাঁর ভাবশিষ্যদের মন। সানন্দে তিনি বলে ওঠেন, আমার জীবন তবে বৃথা হয়নি। তা যে হয়নি তার প্রমাণ—সেদিনের যুক্তিবাদী, কুসংস্কারমুক্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুরাগী এক ঝাঁক ঝকঝকে বাঙালি তরুণ, ঊনিশ শতকের নবযুগের ইতিহাসে যাঁদের পরিচয়—'ইয়ংবেঙ্গল'। ডিরোজিওই ছিলেন তাঁদের মন্ত্রদাতা, পথ প্রদর্শক এবং হৃদয়ের অধীশ্বর। শুধু হিন্দু কলেজের ক্লাসঘর নয়, সমান সক্রিয় ছিলেন কলেজের বাইরেও। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সাময়িক পত্র 'পার্থেনন' এবং 'কিলডোস্কোপ', তাঁর নেতৃত্বে মুক্তবুদ্ধির চর্চা বিবিধ উদ্যোগে। আশ্বাসের কথা আধুনিক ভারত, বিশেষ করে পরবর্তীকালের বাঙালি চিন্তাবিদ, ভাবুক এবং সংস্কৃতিসচেতন লেখক শিল্পীরা ডিরোজিওকে ভুলে যাননি। তাঁর জীবন ও রচনা এখনও নিয়মিত অনুসন্ধান ও চর্চার বিষয়। তাঁকে ঘিরে নবীন প্রজন্মের তরুণদেরও ব্যাপক এবং গভীর আগ্রহ। তাঁকে নিয়ে লেখালেখির অন্ত নেই। এই সম্মান বোধহয় গত শতকের মাত্র মুষ্টিমেয় নায়ক এবং সমাজসংস্কারকের ভাগ্যেই জুটেছে। অনেকেরই হয়তো জানা নেই, ডিরোজিও শুধু অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন না, ভারতের জাতীয়তামন্ত্রের এক অর্থে তিনিই ছিলেন উদ্গাতা। তাঁর 'টু ইন্ডিয়া, মাই নেটিভ ল্যান্ড' কবিতাটিই বোধহয় স্বদেশের বন্দনায় উচ্চারিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ কবিতা। দেশপ্রেমের কবিতায় দুই একটি সংকলনে কবিতাটির অনুপস্থিতি দেখে স্বভাবতই অবাক হয়েছি। কিছুটা দুঃখিতও। কারণ, কবিতাটি বহুপঠিত। এমনকী তৎকালেও তার বাংলা অনুবাদ ছিল। যদিও একালে আধুনিক অনুবাদ রয়েছে, তবু ডিরোজিও প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত, পুরানো দিনের তর্জমাটি উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করি। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল আর একাল' রচনায় (১৮৭৪) দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ প্রকাশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।" বিশেষ করে সে-কারণেই এই রচনার পক্ষে এটি অবশ্য পাঠ্য।

"স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতিঃ মণ্ডলী
ভূষিতো ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্য পদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি!"

আপন কালে ডিরোজিওকে কেউ অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান বলতেন না! সাধারণভাবে বাঙালিরা ওঁদের বলতেন—'ফিরিঙ্গি'। সাহেবদের কাছে ওঁদের পরিচয় ছিল—'ইউরেশিয়ান'। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা কিন্তু অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান হয়েছেন বলতে গেলে একালে, মাত্র ১৯১১ সালে। তার আগে এই বর্ণাঢ্য সম্প্রদায়ের নানা নাম। যথা: 'হাফ-কাস্ট', 'হাফ-ব্রিড', 'মিকসড ব্লাড' 'কান্ট্রি বর্ন', 'এইট আনাস',—ইত্যাদি। এসব বলাই বাহুল্য, ঠিক নাম নয়,—বদনাম। পর্তুগিজ আমলে ওঁদের বলা হত—'ফিরিঙ্গি', 'লুসো-ইন্ডিয়ান', কিংবা 'মিস্‌টিক্‌স'। 'ফিরিঙ্গি' শব্দের আদিতে রয়েছে একটি তেলেগু শব্দ যার অর্থ—কামান। ওঁরা তখন অনেকেই গোলন্দাজ বলেই—'ফিরিঙ্গি'। 'মিস্‌টিকস' মানে মিশ্র, বর্ণ-সংকর। ডাচ আমলে ওঁদের নাম—'ওলান্দেজ' বা 'ওলান্দি'। কেরলে ওঁরা তৎকালে—'কালিকর', 'ছাত্তাকর'। ওঁরা ইউরেপিয়ানদের মতো পাতলুন পরেন, তা-ই 'ছাত্তাকর'! মাথায় টুপির জন্য মাদ্রাজে তখন ওঁদের বলা হত 'টোপাসি'। 'কান্ট্রিবর্ন' বাদ দিলে প্রথম যে সম্প্রদায়সূচক নামটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে—'ইন্দো-ব্রিটন'। তা থেকে একসময় 'ব্রিটাশিয়ান'ও চালু করার চেষ্টা চলছিল। তারপর এল আর একটি শব্দ—'ইউরেশিয়ান'। 'ইউরেশিয়ান' একমাত্র দীর্ঘজীবী হয়। তা চালু ছিল মোটামুটি ১৮২০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত। মাঝখানে কিছুদিন 'ইস্ট-ইন্ডিয়ান' চলেছিল। 'ইউরেশিয়ান' শব্দটি নাকি প্রথম চালু করেন মার্কিস অব হেস্টিংস। সেটা ঠিক নয়। যা হোক, 'ইউরেশিয়ান' ক্রমে অবজ্ঞাসূচক শব্দে পরিণত হয় দেখে ওঁরা দাবি তোলেন, অতঃপর আমাদের বিধিবদ্ধ পরিচয় হোক—'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান'। 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান' শব্দটি তখন খুবই চালু শব্দ। 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান' বলতে তখন কি এদেশে, কি বিদেশে সবাই জানতেন সেইসব ব্রিটিশ নাগরিক বা সাহেবদের কথা বলা হচ্ছে যাঁরা ভারতে নানা কাজে নিযুক্ত, কিংবা যাঁরা এদেশে বাস করছেন। ('Britons working or resident in India')। ১৮৯৭ সালে 'ইউরেশিয়ান'রা বিলাতে ভারত-সচিব বা 'সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া'র কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন তাঁদের 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান' পরিচয়টি মঞ্জুর করার জন্য। সরকার রাজি হলেন না। কিন্তু ডাঃ ওয়ালেস নামে একজন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান নেতা নিজেদের একটি সংঘ গড়ে নাম দিলেন—'ইম্পিরিয়াল অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। লর্ড কার্জনের কাছেও আবেদন জানিয়েছিলেন ওঁরা 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান' হিসাবে পরিচিতির জন্য। তিনিও সম্মত হননি। শেষ পর্যন্ত ওঁরা 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান' হলেন লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুগ্রহে, ১৯১১ সালে। সেটা করা হয়েছিল অবশ্য 'সেন্সাস'-এর সুবিধার্থে। আইনের চোখে তখনও ওঁরা বহন করে চলেছেন ১৮৭০ সালের সংজ্ঞা,—'স্ট্যাটুটারি নেটিভ অব ইন্ডিয়া'। তখন কেউ কেউ আবার নিজেদের পরিচয় দিতেন—'ইউরোপিয়ান ব্রিটিশ সাবজেক্টস।' ভারতের পূর্ণ নাগরিক হিসাবে ওঁরা স্বীকৃতি পান ১৯২৫ সালে। প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতে ওঁদের জন্য আসনের বন্দোবস্ত হয় আরও পরে। আর, 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান' হিসাবে নব পরিচিতি? শেষ পর্যন্ত সেটা মেলে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান' শুধু নানা জাতি ধর্ম ও ভাষাভাষীদের দেশে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃত নন, তাঁদের পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকারও স্বীকৃত। সংবিধানের ৩৬৬ (২) ধারায় বলা হয়েছে, 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান' তাঁরাই যাঁদের পিতা বা পিতৃপুরুষ ইউরোপীয় বংশোদ্ভব এবং যাঁরা ভারতে বসবাস করছেন, কিংবা যাঁদের পূর্বপুরুষ সাময়িকভাবে নয়, স্থায়ীভাবে এদেশেরই বাসিন্দা ছিলেন। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক, উদার বহুত্ববাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা সর্বান্তঃকরণে শুধু এই সম্প্রদায়ের মানুষকে আপনজন হিসাবেই গ্রহণ করেননি, তাঁদের ধর্মাচারের স্বাধীনতাই মেনে নেননি, মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার, তাঁদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকার সবই নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। সংবিধানে ২৯, ৩০ ধারা, বিশেষ করে ৩৩৭ ধারায় এসব রক্ষাকবচ স্বীকৃত। সংবিধান প্রণেতারা প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছেন ভারতের বহুবর্ণ মোজাইকে এই

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এক বর্ণাঢ্য অস্তিত্ব। স্বভাবতই সংসদ এবং রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে তাঁদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন ওঁরা। ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি সানন্দে স্বীকার করেছেন—সমগ্র এশিয়ায় ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভদের মধ্যে একমাত্র অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরাই ভারতে সংখ্যালঘু হিসাবে সম্মানিত ও স্বীকৃত। এ-ব্যাপারে ভারত অনন্য।

কিন্তু আইনি স্বীকৃতি এক কথা, আর সুখে শান্তিতে সসম্ভ্রমে বেঁচে থাকা আর এক কথা।—এদেশে কেমন আছেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা? একজন গবেষক ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা করে তাঁদের যে মানসিক চিত্র রচনা করেছেন, তা কৌতূহলোদ্দীপক। (দ্রষ্টব্য: 'The Anglo-Indians', V.R. Gaikward.)

—না, আমি কিছুতেই নিগারের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ব না।

—যে স্কুলে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা পড়ে, এবং শিক্ষকরাও যেখানে ভারতীয়, আমার ছেলে সেখানে পড়তে চায় না।

—যতদিন কংগ্রেস নিজেদের শাসনতন্ত্র আঁকড়ে থাকবে ততদিন ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।... কংগ্রেসই কি ভারত? কংগ্রেস কি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নমুনা?

—কমান্ডার-ইন-চিফ ভারতীয় সৈনিকদের সমান হারে আমাদের বেতন দেওয়ার কথা বলছেন। অর্থনৈতিক কারণেই আমরা তা মেনে নিতে পারি না।

—ভারতীয়দের উচিত নিজেদের মেয়েদের মর্যাদা বোঝা।

—হ্যাঁ, কংগ্রেসের ভেতর ভাল কিছু করারও প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে বটে।

—ভারতীয়রাই আজ আমাদের সারা জীবনের মিত্র।

—অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েদের ভারতকে আরও ভালবাসতে, এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ করতে শেখানো আমাদের কর্তব্য।

—আমরা ভারতীয়। আমাদের জীবনধারার পক্ষে এদেশই সবচেয়ে উপযুক্ত। ভারতেই রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ। (ইত্যাদি, ইত্যাদি)।

স্বাধীনতার আগে ভারত সম্পর্কে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছিল। ওই সময়ের মধ্যে (১৯২৬-৪৭) ইংরেজদের সম্পর্কেও তাঁদের মনোভঙ্গি অনেকটা পাল্টে যায়।

—সেই সব স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা পাঠাতে চাই-না, যেখানে শিক্ষার মধ্য দিয়ে 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান'দের মধ্যে হীনমন্যতার বীজ রোপন ও লালন করা হয়।

—স্নবারি কাকে বলে দেখতে যদি চাও তবে একবার ভারতে এসো। ব্রিটিশরা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের যে রকম ব্যবহার করে তেমনটি আর কোথাও দেখা যাবে না।

—ইউরোপিয়ানরা আজ আমাদের নিয়ে বিব্রত।...

—স্যার, আমরা যদি ইংল্যান্ডের সন্তান না হই তবে আমরা কারা?

—একমাত্র পতাকা যাকে আমরা সম্মান করি এবং চিরকাল তা করব সেটি হচ্ছে ইউনিয়ান জ্যাক। (ইত্যাদি, ইত্যাদি)।

আগে ছিল ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা, ক্রমে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বিশ্বাস। অন্যদিকে ইংরেজদের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার বদলে দেখা দেয় অভিমান ও ক্ষোভ। ওঁরা বুঝতে পারছিলেন পাক্কা সাহেবদের কাছে তাঁরা ত্যাজ্য।

প্রসঙ্গত অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে ভারতীয়দের মনোভঙ্গির কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাঙালি কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন—

"চুণাগরি অধিবাস খোলার আলয়
তাহাতেই কর্তারূপ আড়ম্বর হয় ৷৷

ছাড়েন বাঙ্গালী দেখি বিলাতের বুলি।
'লিছু যাও কেলাম্যান নেটিব বেঙালী'।"

ঊনিশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত অনেকের কাছেই 'ফিরিঙ্গি' ছিল গালি বিশেষ। 'মেটেফিরিঙ্গি', 'ট্যাস' অনেক নামেই ব্যঙ্গ করা হত। শিক্ষিতদের মধ্যে উদার এবং সহানুভূতিশীল মানুষও নিশ্চয় ছিলেন কিছু কিছু। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলতে গেলে অধিকাংশ বাঙালির কাছেই ছিলেন ঘৃণা না হোক, উপহাসের পাত্র। এব্যাপারে পাক্কা সাহেবদের সঙ্গে এদেশের অনেক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি যেন এক। সাহেবদের মধ্যে যেমন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, এদেশেও যে তার অভাব ছিল না তার প্রমাণ ভারতের সংবিধান। তবু কুসংস্কার যেন কাটতে চায় না। পাক্কা মাহেব, হামেশাই দেখি নিচু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন ওঁদের দিকে। কিপলিং থেকে বিভারলি নিকলস, জন মাস্টারর্স—দৃষ্টান্ত অনেক। ক্রস নামে এক সাহেবের রচনা থেকে কটি ছত্র:

—সে একজন ইউরেশিয়ান। এক ধরনের মিশ্র পদার্থ।

—মিশ্রণে ক্ষতি কী স্যার?

—ভাল মিশ্রণে ক্ষতি নেই। কিন্তু ইউরেশিয়ান খারাপ ধরনের মিশ্র বস্তু।

জনৈক ম্যাকমিলান লিখেছেন, "অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান সবচেয়ে অসুখী নিজের কালো চামড়ার জন্য। ইউরোপিয়ানদের মতো শ্বেত চর্মের জন্য সে সব কিছু ত্যাগ করতে পারে।"

'স্যার আলিবাবা' লিখেছেন, "অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের মতো বর্ণ সচেতন এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখা যায় না। টাকায় এক আনা পর্যন্ত ওঁরা চিনে নিতে পারেন। এমনকী আরও ছোট মুদ্রাও তাঁদের নজর এড়ায় না।"

অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে ভারতীয়দের কুসংস্কারের পিছনে এক কারণ অবশ্য ওঁদের জীবনাচার। অনেক ভারতীয় মনে করেন ওঁরা যেন অন্য কোনও ধরনের প্রাণী। ওঁদের ভাষা ইংরেজি, পোশাক ইউরোপিয়ান, খাদ্যাভাস, জীবনাচার—সবই পশ্চিমী ধরনের। ওঁরা ভারতীয়দের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। ওঁদের নজর সব সময় ইংরেজদের দিকে। তাঁদের খাতির পাওয়ার জন্যই ওঁরা সব সময় ব্যস্ত। দুঃখজনক ঘটনা হলেও সত্য এই যে, এই দূরত্ব রচনায় অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদেরও কিছু অবদান রয়েছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ওঁরা নিজেদের ভারতীয় বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন না। এমনকী ওঁদের কোনও কোনও নেতারাও ওঁদের সেরকম ভাবতেই উৎসাহিত করেছেন। গিডনির মতো নেতাও অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের 'ভারতীয়' বলতেন না, বলতেন—'সিটিজেনস অব ইন্ডিয়া', কিংবা 'স্ট্যাটুটারি নেটিভস অব ইন্ডিয়া।' ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি স্বীকার করছেন—অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের মানসলোক ছিল খণ্ডিত। দীর্ঘকাল তাঁরা ব্রিটেনের দিকে তাকিয়ে থাকতে শিখেছেন, ভারতের দিকে নয়। বলা বাহুল্য, তার জন্য দায়ী এই সম্প্রদায়ের শত শত বছরের ইতিহাস, শিক্ষা ব্যবস্থা, এবং সমূহ পরিবেশ পরিস্থিতি। সুতরাং, ভারতীয়দের সঙ্গে দূরত্বের জন্য এই হতভাগ্য সম্প্রদায়কে অপরাধী ধার্য করা সঙ্গত নয়। এ ব্যাপারে ভারতীয়দেরও কি কিছু দায়িত্ব ছিল না! ভারতীয়রা যদি তা পালন করতে না-পেরে থাকেন তবে তার পিছনে সক্রিয় ছিল কিন্তু সেই জাতিবিদ্বেষ। বর্ণভেদে খণ্ড-বিখণ্ড, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচারে অভ্যস্ত এই দেশে বর্ণ-সংকর, অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান কেমন করে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে গৃহীত হবেন? কোনও কোনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইংরেজ বলতেন ওঁদের "রক্ত কালো।" ওরা "জলের মতো আকার হীন।" শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতীয়দের কাছেও ওঁরা ছিলেন অবৈধ মিলনের অশুভ ফল। ওঁরা পতিত। ওঁরা অস্পৃশ্য। পশ্চিম এবং পুবের নৈতিকতার নিয়ামকরা সেদিন ভুলে গিয়েছিলেন—বিশুদ্ধ জাতি বলে কিছু নেই। পৃথিবীর সব দেশে, সব সম্প্রদায়ই রকমারি মিশ্রণের ফল। সুতরাং, শুধু অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের বর্ণ-সংকর বলা কেন? কেনই বা এই 'হাফ-কাস্ট' তকমা। মনে পড়ে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান লেখক সেড্রিক ডোভারের উক্তি— "There are no half-castes,

because there are no full-castes.”

কীভাবে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করা যায় তা নিয়ে তৎকালে অনেকেই ভেবেছেন। একজন পাদ্রি চেয়েছিলেন ওঁদের দেশান্তরী করতে। তাঁর নাকি পরিকল্পনা ছিল লাক্ষাদ্বীপ আর কোকোদ্বীপে ওঁদের নিয়ে উপনিবেশ গড়ে তোলার। অন্যদিকে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান নেতাদের স্বপ্ন ছিল দ্বিবিধ। এক, ভারতের নানা অঞ্চলে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের সুসংহত উপনিবেশ। দ্বিতীয়, ভারতেই কোথাও একটি অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান রাজ্য প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতার আগে ভারতে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল বাংলা, মাদ্রাজ, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশায়। দিল্লিতে ওঁরা কখনও বেশি সংখ্যায় বসবাস করেননি। পঞ্জাব ও রাজস্থানও ছিল তাঁদের পছন্দের বাইরে। নেতাদের মনে যখন নিজস্ব রাজ্য বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, ভারতের কোথাও কোথাও তখন রয়েছে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান উপনিবেশ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বাঙ্গালোরের কাছে হোয়াইট ফিল্ড, দেরাদুনের অদূরে ক্লিমেন্ট টাউন। তা ছাড়া এই রাজ্যের ঝাড়গ্রাম, আর বেঙ্গল নাগপুর রেল লাইনের ধারে সালুরে। তারই মধ্যে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের স্বপ্ন।

“Mccluskiegunge! Mccluskiegunge!
The years ahead are clear and bright
Some good hard work, a little fight
Mccluskiegunge! Our pride.”...

যাঁর নামে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ সেই ম্যাকক্লাস্কি ছিলেন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের একজন বিশিষ্ট নেতা। সাহসী, স্বপ্নদ্রষ্টা। ই টি ম্যাকক্লাস্কি (১৮৭২-১৯৩৫) জন্মে ছিলেন কলকাতায়। কলকাতা শহরে তৎকালে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি ছিলেন “দ্য অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ডোমিসাইল্ড ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন”-এর বাংলা শাখার সভাপতি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও তিনিই ছিলেন অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ানদের প্রতিনিধি। তাঁর স্বপ্ন ছিল অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য একটি ‘হোমল্যান্ড’, নিজেদের দেশ—আপন ‘মুলুক’। সেই ‘মুলুক’ হবে ‘অ্যান ইনডিপেনডেন্ট নেশান স্টেট অব দ্য অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান।’—স্বাধীন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান দেশ তাঁর স্বপ্ন।

১৯৩০ সালে বাঙ্গালোরের কাছে একজন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানের সফল খামার এবং বাগিচা দেখে ম্যাকক্লাস্কি অনুপ্রাণিত হলেন। একজন যদি এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন তবে অন্যরাই বা কেন সমবেত ভাবে সফল হবেন না? চাই যৌথ উদ্যোগ, কো-অপারেটিভ প্রকল্প। সেবছরই তিনি দিল্লিতে বড়লাট লর্ড আরউইনের কাছে তাঁর খসড়া পরিকল্পনা পেশ করলেন। পরের বছর আবার দিল্লিতে হানা দিলেন জমি ও অর্থের জন্য দরবার করতে। কিন্তু তাঁকে ফিরতে হয় শূন্য হাতে। বাধ্য হয়েই তিনি আত্মনির্ভরতার পথ ধরলেন। আমেরিকার নানা সফল কো-অপারেটিভ কলোনি তাঁকে উৎসাহিত করেছে। ম্যাকক্লাস্কি কো-অপারেটিভের কাজকর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বেলজিয়ামেও ছুটে গিয়েছিলেন। যা হোক, স্বাধীন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মুলুক প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ম্যাকক্লাস্কি ১৯৩৩ সালের মে মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন—“দ্য কলোনাইজেশন সোসাইটি অব ইন্ডিয়া।” হেড অফিস পার্ক স্ট্রিট। সোসাইটির তরফে একটি সাময়িকপত্রও প্রকাশ করতে শুরু করলেন তিনি।

নিজেদের মুলুকের জন্য জমির সন্ধানে ম্যাকক্লাস্কি বলতে গেলে গোটা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন সেদিন। মহারাষ্ট্রের পেন্ড্রা রোডে জমির সন্ধান পেলেন। কিন্তু সেখানে জলের সমস্যা। সুতরাং, চুক্তি করা হল না। দেরাদুনের কাছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বনবিভাগের কাছে জমি ছিল। কিন্তু তাঁরা দিতে রাজি হলেন না। দুটি দেশীয় রাজ্যের শাসকরা জমি দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে

তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। রাঁচি-হাজারিবাগ মালভূমিতে পালামৌ জেলায় জমির সন্ধান মিলেছিল। তাও নেওয়া গেল না। ভারতীয় কোম্পানি আইন অনুসারে ম্যাকক্লাস্কি অতঃপর কোম্পানি গড়লেন। সেটা ১৯৩৩ সালের মে মাসের কথা। শেষ পর্যন্ত জমি পাওয়া গেল ছোটনাগপুরের মহারাজার কাছ থেকে। সহজ শর্তে ১০ হাজার একর জমি। রাঁচির কাছে লাপ্রা রেল স্টেশনের অদূরে দশটি গ্রামে ছড়ানো জমি। আরও ৯ হাজার একরের প্রতিশ্রুতি ছিল। সুতরাং, ১৯৩৪ সালের নভেম্বরে যাত্রা শুরু। উপনিবেশের প্রথম বাসিন্দাদের দলে ছিলেন ১৬৩ জন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান। পরের বছর ডিসেম্বরে মাত্র তেষট্টি বছর বয়সে বিদায় নিলেন ম্যাকক্লাস্কি। সুতরাং, তাঁর স্বপ্নের মুলুকের পরিণতি তিনি আর দেখে যেতে পারলেন না।

ম্যাকক্লাস্কির পর অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্যার হেনরি গিডনি। জন রিকেটস এবং ই টি ম্যাকক্লাস্কির মতোই অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের একজন বিখ্যাত নেতা তিনি। হেনরি আলবার্ট জন গিডনির (১৮৭৩-১৯৪২) জন্ম মহারাষ্ট্রে। কলকাতার মেডিকেল কলেজের একজন তুখোড় ছাত্র ছিলেন তিনি। সাঁইত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি একজন ডি এইচ এইচ, এম আর সি পি, ডি ও। রয়াল সোসাইটির ফেলো গিডনি এক সময় ছিলেন অক্সফোর্ডে চক্ষু চিকিৎসা বিদ্যার লেকচারার। দেশে ফিরে তিনি সামরিক বাহিনীর মেডিকেল বিভাগে যোগ দেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর সে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীন চক্ষু চিকিৎসকের জীবন শুরু করেন। চিকিৎসক জীবনে তিনি ত্রিশ হাজার রোগীর চোখে অস্ত্রোপচার করেছেন। ইংরেজদের মধ্যে জাতিবিদ্বেষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। স্বভাবতই অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা তাঁর মধ্যে একজন সহযোদ্ধা খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি সহজেই নির্বাচিত "দ্য অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ডোমিসাইল্ড ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন"-এর প্রেসিডেন্ট। ভারত সরকার তাঁকে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন (১৯২১)। ১৮২৮-২৯ সালে সাইমন কমিশনের সামনে তিনি অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের নানা দাবি নিয়ে সওয়াল করেন। প্রতিটি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে (১৯৩০-৩২) তিনি অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে নিজেদের কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। গিডনি স্যার উপাধিতে ভূষিত হন ১৯৩১ সালে। ম্যাকক্লাস্কির উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনিও তাঁর নামে গড়ে ওঠা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের আপন 'মুলুক' ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের স্বপ্নকে সফল করার জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 'ছোট বিলাত'এর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। গিডনি মারা যান ১৯৪২ সালে। তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে ১৯৯২ সালে ভারত সরকার তাঁর প্রতিকৃতি সহ একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে সম্মান জানিয়েছেন এই অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান নেতাকে। গিডনির প্রয়াণের সময়ই ইঙ্গিত মিলছিল ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেন এই উপনিবেশ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি তা নিয়ে কিছুকাল আগে গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন একজন গবেষক। তিনি কুন্তলা লাহিড়ি দত্ত। তাঁর মতে এই স্বপ্ন ছিল মূলত 'ইউটোপিয়া' বা কল্পরাজ্যের ধ্যান। তত্ত্ব এবং সরেজমিনে তথ্য সন্ধান করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, নানা কারণে এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা ছিল অসম্ভব এক প্রকল্প। (দ্রষ্টব্য: In Search of a Homeland, Anglo-Indians and Mccluskiegunge, Kuntala Lahiri- Dutt)। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের নিয়তি অতএব শেষ পর্যন্ত সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকাই।

স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে এবং পরে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি (১৯০৫-১৯৯৩)। তিনিও একজন দ্রষ্টা। তবে অন্য অর্থে। তিনিই অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের ফিরিয়ে এনেছিলেন স্বপ্নলোক থেকে বাস্তবের মাটিতে। স্বাধীন ভারতের নেতৃবর্গের সহযোগিতায় তিনি অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য নানা অধিকারই শুধু বিধিবদ্ধ করতে সমর্থ হননি, নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন এই সম্প্রদায়ের ভাগ্য ভারতের সঙ্গেই বাঁধা। তাঁর কথা ছিল আমরা ভারতকে যত বেশি

ভালবাসতে পারব, ভারতের প্রতি যত বেশি আনুগত্য দেখাতে পারব ভারতের মানুষ তত বেশি আমাদের ভালবাসবেন। আমাদের অনুগত থাকবেন। উল্লেখ করা দরকার ১৯৩৪ সাল থেকে ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনিই ছিলেন "অল ইন্ডিয়া অ্যাঙ্গলো-অ্যাসোসিয়েশন"এর প্রেসিডেন্ট। জন্ম তাঁর মধ্যপ্রদেশে, লেখাপড়া নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। পেশায় তিনি ছিলেন একজন সফল আইনজীবী। কি কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে, কি সংসদে, তিনি ছিলেন একজন অতিশয় সজাগ ও সতর্ক রাজনীতিক। বক্তা হিসাবেও খ্যাতি ছিল তাঁর। তাঁর মৃত্যু ১৯৬৩ সালে। অ্যাঙ্গলো- ইন্ডিয়ানরা, তাঁদের প্রিয় নেতার স্মৃতি ধরে রেখেছেন কলাকাতায় তাঁর নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে।

শেষ পর্যন্ত ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনির চেষ্টাও পুরোপুরি সফল হয়নি। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানরা স্বাধীন ভারতের যেন এক দুঃখী সম্প্রদায়। সে-কাহিনী পরে। তার আগে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। কেননা, ভারতের নারী-সমাজে তাঁদের কিছু বিশিষ্ট অবদান রয়েছে।

এই সনাতন দেশে অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরাই আধুনিককালে নারীমুক্তির অগ্রদূত। তাঁরাই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন পর্দাপ্রথা ভাঙতে। তাঁরাই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন লেখাপড়া শিখতে। অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা থাকলেও নামমাত্র। মেয়েরাও বলতে গেলে সবাই সাক্ষর। আজ ভারতের অনেক ঘরের মেয়েরাই বারোয়ারি যানবাহন ব্যবহার করছেন, পুরুষদের পাশাপাশি অফিস কাছারি করছেন। নানা পেশায় জীবনের চরিতার্থতা খুঁজছেন।

প্রথম দিকে তাঁদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ ছিলেন কি না অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েরাই। শিক্ষকতা, নার্সিং, ধাত্রীবিদ্যা, টাইপিস্ট তথা অফিস সেক্রেটারি, টেলিফোন অপারেটার, বিউটিশিয়ান, বিমানবান্ধবী বলতে এক সময় ওঁরাই ছিলেন অগ্রগণ্য। খেলাধুলা, নাচগান বা অভিনয়ের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। মনে পড়ছে গ্লোরিয়া ব্যারি নামে সেই দুঃসাহসী বিমানবান্ধবীর কথা। যিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে বাঁচিয়েছিলেন 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' নামে বিমানের যাত্রীদের প্রাণ।

তবু পূর্ব পশ্চিমের দর্শকরা, কেন জানিনা, তাদের দিকে চিরকাল বাঁকাভাবে তাকিয়েছেন। ছদ্মনামা লেখক 'স্যার আলিবাবা'র কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের নিয়ে রঙ্গ করে তিনি লিখেছেন :

> "The Eurasian girl is often pretty and graceful; and if the solution of India in her vains be weak, there is an unconventionality and naiveté sometimes which undoubtedly has a charm; and which my dear friend, J. H—, of the 110th clodhoppers (Lord Cardwell's own clodhoppers) never could resist : `what though upon her lips there hung the accents of the tchi tchi tongue!"

সংক্ষেপে তার মর্ম : অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা সুন্দরী, এবং যদিও তাঁদের মুখের ভাষা চি চি, তবু অনেক পাক্কা সাহেবের কাছে তাঁদের আবেদন অপ্রতিরোধ্য।

শুধু একজন ইংরেজ লেখক নন, অনেকের কাছেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা যেন নিছক প্রমোদের উপকরণ। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে অবশ্য দুই শ্রেণীর নারী পুরুষের মধ্যে সত্যকারের ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা গেছে। দেখা গেছে নিবিড় পারিবারিক বন্ধন। কিন্তু পরবর্তী শতকে পরিস্থিতি যেন অন্যরকম। মনে পড়ে জন মাস্টারর্সের উপন্যাস 'ভবানী জংশনে'-এর কথা। তার নায়িকা ভিক্টোরিয়া জোনস একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইঞ্জিন চালকের কন্যা। সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর মেয়েটি পাক্কা সাহেবের প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে তাঁর সর্বস্ব খুইয়ে ছিলেন। 'ভবানী জংশনে' দেখি সবাই এই সুন্দরী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটির দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। ওপরওয়ালা রডনি স্যাভেজ তো বটেই এমনকী তাঁর ব্রিটিশ সহকারী মেকলেও তাঁকে পেতে চান। এদিকে আবার রয়েছেন আপন সম্প্রদায়ের প্রেমিক প্যাট্রিক টেলার। তিনি আবার গোপনে

ভিক্টোরিয়ার ছোটবোনের সঙ্গেও প্রেম করেন। এখানেই শেষ নয়। ভারতীয় তরুণ রণজিৎও তাঁকে ভালবাসেন। আমরা দেখি এই টানাপোড়েনে ভিক্টোরিয়াকে পেয়ে বসে বিচিত্র মানসিকতা। তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন ব্রিটিশ উপরওয়ালা রডনি স্যাভেজের কাছে। এবং স্যাভেজ কিছুদিন পরে তাঁকে মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন নিজের স্বতন্ত্র অবস্থানে। বাধ্য হয়েই বেচারা ভিক্টোরিয়াকে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় আবার ফিরে আসতে হয় আপন সম্প্রদায়ের কাছে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তরুণ টেলারই তাঁর শেষ ভরসা।

সম্প্রতিকালের আর একটি কাহিনী মার্চেন্ট ইসমাইলের "কটন মারি" তে দেখি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নারীর জন্য অপেক্ষা করে আছে বিয়োগান্ত পরিণতি। খাঁটি ইংরাজের কাছে তিনি পরিত্যক্ত। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় লরা রায়চৌধুরীর উপন্যাস "দ্য জাদু হাউস"। লরা একজন নবীন ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছেন। সে বই দেখার সুযোগ আমাদের মেলেনি। কিন্তু উপন্যাসটি পড়ে চমৎকৃত না হয়ে পারা যায় না। গবেষণা সূত্রে কলকাতা এবং খড়্গপুর তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বিবাহিত লরা শেষ পর্যন্ত প্রেমে পড়েন তাঁর বাঙালি সহায়ক তরুণ শুভ্রশীলের। শেষ পর্যন্ত বিয়ে। হ্যাঁ, বাস্তব জীবনেও। নতুন করে নিজের জীবনে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কাহিনী রচনা করেছেন লরা। তিনিও কি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নন?

অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাসে যেভাবে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নারী চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তাতে মনে হয় সব মেয়েই বুঝিবা ভিক্টোরিয়া জোনস। 'চি চি গার্ল'রা বুঝিবা সদাই আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। তাঁরা বুঝিবা শুধুই পাক্কা সাহেবদের উপভোগের জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার সাহেবরা ওঁদের 'চি চি গার্ল' বলতেন ওঁদের নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গির জন্য।

বলাই বাহুল্য, মাঝে মাঝে এই মেয়েরাও কিন্তু উপযুক্ত জবাব দিতেন অপমানের। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের নিজেদের ক্লাব ছিল। কলকাতায় ওঁদের সবচেয়ে পুরানো ক্লাব ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব। দ্বিতীয়, বিখ্যাত ডালহৌসি ক্লাব। তাছাড়া ছিল অসংখ্য রেলওয়ে ইনস্টিটিউট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেখানে নাচের আসরে অনেক সময় হানা দিত ব্রিটিশ সৈন্যরা, যাদের বলা হত 'টমি' কিংবা 'লাইমি' (Limeys)। তাদের সঙ্গে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তরুণদের মারামারি বলতে গেলে তৎকালে নিয়মিত ঘটনা। কলকাতার ক্লাব অবশ্য সেদিক থেকে খুবই শান্ত, সমাহিত। সেখানে প্রত্যাশিতভাবে সজ্জনদেরই সমাবেশ। কিন্তু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ঘিরে সেখানেও মাঝে মাঝে অশান্তি দেখা দিত। পাক্কা সাহেবরা সহসা সমপর্যায়ের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদেরও নিজেদের ক্লাবে গ্রহণ করতে চাইতেন না। তার উপর যদি কোনও সুশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবক কোনও খাঁটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করে থাকেন তবে তো কথাই নেই, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ওঁদের কাছে অবাঞ্ছিত। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মেয়েদের নাকি বিশেষ করে অপছন্দ করতেন ইংরেজ মেয়েরা। তাঁদের জানা ছিল ঔপনিবেশিক আমলের আদি পর্ব থেকে সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত পশ্চিমী অভিযাত্রীদের জীবনে কী তাঁদের ভূমিকা। সুতরাং নারী-পুরুষের মিশ্র ক্লাবগুলির দরজাও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের সামনে বন্ধ। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবতী কীভাবে জবাব দিয়েছিলেন সেই অপমানের সে-কাহিনী শুনিয়েছেন ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি। কলকাতার একজন সম্পন্ন ইংরেজ ব্যবসায়ী এই শহরেরই একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেছেন। সাহেবদের মিশ্র ক্লাব মেয়েটিকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। স্বামী অর্থবান ব্যক্তি। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন একবার মহিলার সঙ্গে তাঁরা কথাবার্তা বলবেন। যাকে বলে ইন্টারভিউ। মনে হয় ভদ্রমহিলার সভ্যতা সংস্কৃতি যাচাই করে দেখাই ছিল কর্তাদের মতলব। মেয়েটি কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত নন। অবশেষে স্বামীর অনুরোধে তিনি রাজি হলেন। মেয়েটি ছিলেন পরমাসুন্দরী।

কর্তারা তাঁর রূপ দেখে অভিভূত। তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে ক্লাবের মেম্বার করতে প্রস্তুত। মেয়েটি কিন্তু বেঁকে বসলেন। তাঁর দৃপ্ত উত্তর—আমার মুখ দেখেই এই, আমার পশ্চাদ্দেশ কিন্তু আরও ফর্সা! ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনির ভাষায়,—"The young wife, however declined the honour, adding as a parting shot that, apart from her face which was obviously as white as any of theirs, she could assure them her 'behind' was infinitely whiter."

খেদের কথা, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের সম্বন্ধে ইংরেজদের ধারণার সঙ্গে ভারতীয়দের ধারণার বিশেষ পার্থক্য নেই। ইংরেজদের সঙ্গে যেমন, ভারতীয়দের সঙ্গেও তেমনই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের নানা ব্যাপারে স্থূল সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজদের প্রিয় পানীয় হুইস্কি, কিংবা বিয়ার। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা নাকি বিয়ারের চেয়েও বেশি পছন্দ করেন রাম, চিনি আর দুধ মিশিয়ে তৈরি 'গ্রগ' (grog) নামক পানীয়। পাক্কা সাহেবরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে বলেন 'হাউ ডু ইউ ডু!' অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা বলেন 'প্লিজড টু মিট ইউ!' কাউকে বিদায় জানাতে ওঁরা 'বাই! বাই!' বলেন না, বলেন 'চিয়ার ইউ!' নয়তো—'চিন চিন!' রেল ইনস্টিটিউটগুলোকে ওঁরা সংক্ষেপে বলেন—'ইন্সটার!' তবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, অঞ্চলভেদে নিশ্চয়ই রীতিনীতি, আদবকায়দা এবং অন্যান্য বিষয়ে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকা খুবই সম্ভব।

ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গেও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের পার্থক্য রয়েছে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা সাধারণত শাড়ি পরেন না। তাঁদের প্রিয় পোশাক স্কার্ট এবং ব্লাউজ। ওঁরা ফুল খুবই পছন্দ করেন। বাড়িতে ফুল সাজিয়ে রাখেন, কিন্তু মাথায় কখনও গহনা হিসাবে ফুল ব্যবহার করেন না। বস্তুত, ওঁরা সাধারণত খোঁপা বা বিনুনিও বাঁধেন না। গহনা বলতে ওঁরা কেউ কেউ হয়তো দু-চারটি কাচের চুড়ি পরেন, কিন্তু অন্য গহনার ব্যবহার ওঁদের মধ্যে খুবই কম। ওঁরা গান-বাজনা ভালবাসেন। ভালবাসেন তেমন পরিবেশ পেলে পুরুষের সঙ্গে নাচতেও। পুরুষের সামনে বের হতেও ওঁদের কোনও দ্বিধা বা জড়তা নেই।

সুতরাং, ভারতীয়রা যদি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের দিকে বাঁকাভাবে তাকান তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবাক হতে হয় যখন দেখি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো বিদগ্ধ মানুষও কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। তাঁর বিচারেও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা যেন শুধু ইংরেজদের উপভোগের জন্য। কলকাতার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রমোদ কন্যাদের নিয়ে অনেক শব্দ ও বাক্য ব্যয় করেছেন তিনি। সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন তৎকালের পার্কসার্কাসের কড়েয়া অঞ্চলে তাঁদের গৃহসজ্জার। অবশ্য বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে যেটুকু দেখা যায়। বাঙালির চোখে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের রূপ বর্ণনা করতেও ভোলেননি তিনি। পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় ঈশ্বর গুপ্তের সেই বর্ণনা,—'বিবিজান' চ'লে যান লবেজান ক'রে।' স্বভাবতই বাদ পড়েনি সুন্দরীদের চলার ছন্দও। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যত লুব্ধ দৃষ্টিতেই ভারতীয়রা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের দিকে তাকান না কেন, বিশ শতকের প্রথম দিকে তাঁরা জানতেন—ওঁরা ভারতীয়দের নাগালের বাইরে। বাঙালি যুবার খেদ মিটত অতএব রসিকতামূলক পদ্যবন্ধে, 'কড়ায়া বাড়ায়ে বাড়া'। ('Kareya bareya bara') অর্থাৎ, কড়ায়ার মেয়েরা বেড়ে জিনিস!

নীরদচন্দ্র লিখেছেন, দ্বিতীয়, তৃতীয় দশক থেকে নকল ইংরেজিয়ানার জন্য ভারতীয় হিন্দুরা ওঁদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেন। তাঁর মতে ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায়ের পক্ষে সেটাই বিপদের কথা। হিন্দুর লালসা তাঁদের পক্ষে বিপদস্বরূপ। (দ্রষ্টব্য : The Continent of Circe, Nirod C Choudhury.)

প্রসঙ্গত সত্তরের দশকে দেখা একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। পার্ক স্ট্রিট ফ্রিস্কুল স্ট্রিটের মোড়ে একটি দোকানে বসে পরিচিত বাঙালি দোকান-মালিকদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ততক্ষণে বাড়ির সব প্রধান ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ওই দোকানের দরজা কিছুটা খোলা। বসে থাকতে থাকতেই

দেখলাম সেজেগুজে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা সেই ফাঁকটুকু দিয়ে দোকানে ঢুকছেন। তারপর মাথা হেলিয়ে দোকানের মালিককে 'গুড ইভিনিং' বলে নেমে যাচ্ছেন পেছনের উঠোনে। আমি জিজ্ঞাসু চোখে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি ইঙ্গিতে বললেন, পরে বলছি। আপাতত কেউ ঢুকছে না দেখে বললেন,—পিছনে গিয়ে তাকিয়ে দেখুন, সব বুঝতে পারবেন। কৌতূহলি হয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম আবছা অন্ধকারে একটা লাক্সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে। আর, তার ভেতরে বসে আছেন বেশ কয়েকজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে। ফিরে আসার পর আরও কয়েকজন 'গুড ইভিনিং' বলতে বলতে ভেতরে চলে গেলেন। এদিকে দোকান বন্ধ করারও সময় হয়ে গেল। শেষ মেয়েটি চলে যাওয়ার পর দোকানদার ভদ্রলোক বললেন এখানেই শেষ। তাঁর মুখেই শোনা গেল প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে এখানে। বললেন, কিছু নয়, বাস বোঝাই হয়ে ওঁরা যাবেন খিদিরপুরের মেরিন ক্লাবে। সেখানে নাচগান খানা পিনা সেরে মাঝরাত্তির পেরিয়ে আবার এখানে ফিরে আসবেন। তারপর আবার যে যার ঘরে। ভদ্রলোক, মনে হল রীতিমতো সহানুভূতিশীল এই মেয়েদের সম্পর্কে। আমার সেই সন্ধ্যায় মনে পড়ছিল ঊনিশ শতকের বিদেশি নাবিকদের একটি গান:

"Gone away are the Kidderpore girls,
With their powdered faces and tricketed up curls;
Gone away are those sirens dark,
Fertile of kisses, but barren of heart,—
Blowing alternately cold and hot
Steadfastly sticking to all the got
Filling a bevy of sailor boys
With maddenning hopes of synthetic joys."

জানা ছিল না সেই সঙ্গীতের রেশ এখনও চলছে। জেনে বিন্দুমাত্র অবাক হইনি। কেননা, কলকাতার অন্ধকার জীবনের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা এটাও জানেন, মহানগরীর প্রমোদের আয়োজনে শুধু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরাই নন, ভারতীয় মেয়েরা ছাড়াও দীর্ঘকাল ধরে ছিল সারা দুনিয়ার সুন্দরীদের আমন্ত্রণ। নীরদচন্দ্রর চোখে শুধু কড়েয়ার মেয়েরাই ধরা পড়লেন, এটাই দুঃখের কথা। তাঁর মতো মনস্বী একটু ভাবলেই বুঝতে পারতেন এজীবন প্রমোদের নয়। দুঃখের। আশ্চর্য, একজন সাধারণ বাঙালি ব্যবসায়ীর মধ্যে যে বোধ ও সহানুভূতি দেখেছি, তিনি তা দেখাতে পারলেন না। কি কড়েয়া, কি খিদিরপুর, কি অন্যত্র, এসব কিন্তু অসহায়তা এবং দারিদ্র্যেরই ছবি।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা, আগেই বলেছি ভারতে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সংখ্যায় ওঁরা খুবই কম। পুরানো সেন্সাস রিপোর্টগুলোতে ওঁদের সনাক্ত করা শক্ত। কেননা, সেখানে ওঁরা অনেকেই নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন ইউরোপিয়ান বলে। ১৯৩১ সালের সেন্সাসে এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি মনে করেন ১৯৪১ সালে এদেশে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিলেন ২.৫ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালের জনগণনায় দেখা যায় এদেশে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩৭ জন। ১৯৬১ সালের গণনায় আলাদা ভাবে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সনাক্ত করা হয়নি। মাতৃভাষা ইংরেজি এমন মানুষের সংখ্যা ধরা হয় ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৮১ জন। এখন নিশ্চয় আরও কম। বেশ কিছুকাল আগে একটা হিসাবে দেখেছিলাম কলকাতা শহরে খ্রিস্টান নাগরিকের সংখ্যা তখন ৬০ হাজার, তার মধ্যে ২০ হাজার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। যতদূর মনে পড়ে ষাটের দশকে একজন হিসাব কষে দেখিয়েছিলেন তখন ভারতীয়দের ভিড়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের অনুপাত—০০০০৪৩ ভাগ।

কেমন আছেন ওঁরা? এক কথায় উত্তর—ভাল নেই। ওঁরা এক অসুখী সম্প্রদায়। ষাটের দশকে

বি বি সি ওঁদের নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করেছিল একটা, "দিস আনহ্যাপি ব্রিড—" সে ছবি হৃদয় বিদারক। বৃদ্ধ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলছেন, 'আমরা পথের ধারে পড়ে থাকা মৃত কুকুরের মতো।'—'নতুন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার যোগ্যতা নেই আমাদের,' আর একজনের বক্তব্য। কেউ ক্ষুব্ধ, কেউ হতাশ, কেউ বিষণ্ণ। ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনির বক্তব্য ছিল—'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সাম্রাজ্যের কুলিতে পরিণত করা হয়েছিল।' কলকাতার একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে বলেছিলেন—'আমরা যদি নবযুগের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে পারি তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।'

ইতস্তত আশাবাদ নিশ্চয় এখনও আছে। কিন্তু নৈরাশ্যের খবরও গোপন নেই। একটা হিসাবে দেখছিলাম স্বাধীনতার পর কয়েক দফায় অন্তত ৫০ হাজার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এদেশের মায়া কাটিয়ে দেশান্তরী হন। ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনির ধারণা তার মধ্যে ২৫ হাজার গিয়েছেন ব্রিটেনে, ৫ থেকে ১০ হাজার অস্ট্রেলিয়ায়, আরও ৫ থেকে ১০ হাজার নিউজিল্যান্ডে, কানাডা এবং আমেরিকায়। ওই সব দেশে কিছুটা কড়াকড়ির জন্য সেই প্রবাহে হয়তো পরবর্তী কালে ভাটা পড়েছে, কিন্তু যাত্রা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে বলা যাবে না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এখনও যেন বিদেশে নতুন জীবন খুঁজে পেলেই খুশি। যাঁদের হাতে পাড়ানি কড়ি নেই, একমাত্র পড়ে আছেন নাকি তাঁরাই। সেটা হয়তো সত্য নয়। কিন্তু ভারতীয় মোজাইকের একটি রঙিন পাথর যে ক্রমেই বিবর্ণ হয়ে আসছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কেন চলে গেলেন ওঁরা? কেনই বা চলে যাচ্ছেন? অনেক পর্যবেক্ষকই তা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। একটা কারণ অবশ্যই কঠোর থেকে কঠোরতর জীবন সংগ্রাম। বি বি সি-র ভাষ্যকার সেই সেকালেই বলেছিলেন বিশ্বের নিষ্ঠুরতম শহর কলকাতায় অন্তত ১০ হাজার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছেন। তাঁদের একমাত্র ভরসা দাতব্য প্রতিষ্ঠান। তাদের বিতরিত বিনা মূল্যের বা নামমাত্র মূল্যে 'লাঞ্চ' ছাড়া ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনও দ্বিতীয় পথ নেই সেই হতভাগ্যদের সামনে। তবে কি দারিদ্র্য এবং বেকারী থেকে মুক্তির জন্যই ওঁরা বিদেশযাত্রী? প্রশ্ন উঠবে দারিদ্র্য কি সেকালেও ছিল না। উইলিয়াম হান্টার এক সময় খেদ করে লিখেছিলেন—আলবুকার্ক, ডি সিলভা, ডি সুজা ইত্যাদি বিখ্যাত নামগুলো আজ বহন করে ফিরছে বোম্বাই মাদ্রাজে কিছু 'কিচেন বয়' আর কুক। সেকালের অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মধ্যেও গরিবের অভাব ছিল না। কিন্তু সেদিন কেউ চট করে এদেশের মায়া কাটিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতেন না।

সুতরাং দারিদ্রের তাড়না একমাত্র কারণ নয়। অন্য কারণও অবশ্যই আছে। হতে পারে, এই নৈরাশ্য সাম্রাজ্য-যুগেরই খোয়ারির ফল। কিন্তু মনে হয় না, সে-কারণে কেউ নিজেদের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অকুল দরিয়ায় ভাসতে রাজি হবেন। আসলে অনেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নাকি মনে করেন ভারতীয় সংবিধান তাঁদের সব নাগরিক অধিকার দিয়ে থাকলে অন্যদের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে তাঁদের সামনে পেশাগত সুযোগ সুবিধা ক্রমেই কমে আসবে। তাঁরা আর্থিক সমস্যার কথা ভেবে চিন্তিত। তাছাড়া, কেউ কেউ মনে করেন সংবিধানই শেষ কথা নয়, ভারতীয় উগ্র জাতীয়তাবাদের মুখে তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনাচার, কিছুই ষোল আনা নিরাপদ নয়। ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি বলেন এই অনিশ্চয়তাবোধ নতুন করে দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা দেয় ১৯৬৪ সালে নেহরুর মৃত্যুর পর। তাঁর রাষ্ট্রীয় ধারণা ও সাধনায় অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মতো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কাছেও ছিল আশ্বাস স্বরূপ। তারপর ১৯৬৭ সালে নানা রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় দেখে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা আরও উদ্বিগ্ন বোধ করতে শুরু করেন। দুর্ভাবনার কালো মেঘ আরও ঘনীভূত হয় উগ্র হিন্দিপ্রেমিকদের কাণ্ডকারখানা দেখে। এমনিতেই অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ্যতা ও আনুগত্য সুপ্রমাণিত করা সত্ত্বেও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা সব সময় সুবিচার পাচ্ছেন না। চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগও শোনা গিয়েছে। তার উপর হিন্দিওয়ালাদের

হামলা। তখনও উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা আসরে অবতীর্ণ হননি। বাবরি মসজিদ ধ্বংস কিংবা খ্রিস্টান মিশনারিদের হামলার যে ধারাবাহিক ঘটনা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার কায়েম হওয়ার পর দেখা গেছে তখনও তা শুরু হয়নি। তবু বলা যাবে না, উগ্র জাতীয়তাবাদের কণ্ঠস্বর সেদিন ছিল স্তব্ধ । 'আংরেজি হঠাও' আন্দোলন উপলক্ষে আওয়াজ উঠেছে—'দেশি মুরগি বিলাতি চাল চলবে না।' খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপের বাসনাও গোপন ছিল না। কে কী খাবেন, কে কী খাবেন না, তা নিয়েও আলোচনায় অরুচি ছিল না হিন্দুত্ববাদীদের।ধর্মে খ্রিস্টান, ভাষা যাঁদের ইংরেজি এবং খাদ্যাভ্যাসে যাঁরা ইউরোপিয়ান তাঁরা ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিত হলে বলার কি থাকতে পারে? খ্রিস্টান-নিগ্রহের পরবর্তী ঘৃণ্য, লজ্জাকর ঘটনাবলীর কথা ভাবলে বোধহয় কারও মনে হবে না সত্তর বা আশির দশকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের দুর্ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ অমূলক। অনেকের নিশ্চয় মনে পড়বে খ্রিস্টিয় ২০০০ অব্দে উত্তরপ্রদেশে হিন্দুত্ববাদী তরুণেরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপীয় পোশাক পরার অনেক আগে তাদের পূর্বসূরিরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের উপলক্ষ্য করে জিগির তুলেছিলেন—স্কার্ট ছেড়ে এবার শাড়ি ধর!' অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা এই সব কথাবার্তা যেমন কান পেতে শুনেছেন, তেমনই মুখের মতো জবাবও দেওয়া হয়েছে তাঁদের তরফে। (দ্রষ্টব্য : These are the Anglo Indians, Reginald Maher) কিন্তু তথাকথিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও অলীক বিশুদ্ধ সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার যাঁদের স্বপ্ন তাঁরা যুক্তির কথা শুনবেন কেন? ফলে বর্ণাঢ্য সংখ্যালঘু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা ক্রমেই আরও ক্ষীণকায়, ভারত দিনে দিনে আরও বর্ণহীন।

অথচ গরিষ্ঠ ভারতীয়দের ব্যবহারিক জীবনে ও আচারে কিন্তু আত্মখণ্ডনের ঘটনা গোপন নেই। স্কার্ট ব্লাউজ পরার অপরাধে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের যাঁরা কিছুদিন আগেও আখ্যা দিয়েছেন 'অভারতীয়' কিংবা 'বিজাতীয়', আজ তাঁদের অধিকাংশর ঘরের মেয়েরাই কিন্তু স্কার্ট-ব্লাউজ কেন, ট্রাউজার্স, জিনস, এমনকী শর্টস পরেও দিব্যি ঘুরে বেড়ান শহরের পথে ঘাটে, হাটে বাজারে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের মতো মেয়েদের পরনেও কিন্তু হামেশাই দেখা যায় পশ্চিমী পোশাক। তার বদলে যাঁরা সালোয়ার কামিজ চালু করতে চান, বলাই বাহুল্য তাঁরাও আর এক ধরনের বিদেশি পোশাকের জন্যই সওয়াল করেন। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন ভারতে শাড়ির আর সে সুদিন নেই। অন্তত শহরে মধ্যবিত্তের ঘরে তার কদর কমে গেছে। ভারতীয় নারী ও পুরুষের পোশাকে পশ্চিমের প্রভাব কোথায় পৌঁছেছে তার জ্বলজ্বলে প্রমাণ হিন্দি সিনেমার নায়ক নায়িকা এবং অন্যান্য অভিনেতা, অভিনেত্রীদের পোশাকের দিকে তাকালে। পোশাকের ফ্যাশন-প্যারেডেও আমরা দেখি শাড়ি নয়, ছন্দিত ভঙ্গিতে 'বিল্লি'রা হাঁটছেন প্রায়শ 'বিজাতীয়' পোশাকে!

কথায় বলে, 'আপরুচি খানা', সুতরাং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে এখানে আলোচনা বোধহয় জরুরি নয়। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট, এদেশের শহরে শহরে বড় বড় হোটেল এবং রেঁস্তোরায় কিন্তু শুধুই 'ভারতীয় খানা' পরিবেশিত হয় না। এবং সেখানে যাঁরা পূর্ব পশ্চিম নির্বিশেষ যে নানা ধরনের খাদ্য উপভোগ করেন তাঁরা কদাচিৎ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। এইসব হোটেল রেঁস্তোরায় অধিকাংশ পৃষ্ঠপোষকই কিন্তু ভারতীয়। বিদেশী 'ফাস্ট-ফুড'-এর কাউন্টারেও তাদেরই ভিড়। অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের সাহেবিয়ানা প্রতিদিনই বেড়ে চেলেছে। আর তা নিয়ে আমাদের গর্বেও ঘাটতি নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যযোগ্য আজ ব্রিটেনে যে ভারতীয় কারির রমরমা, তার জনপ্রিয়তার পিছনেও রয়েছে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বিশেষ অবদান। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত লন্ডনের বিখ্যাত রেঁস্তোরার প্রতিষ্ঠাতা এডোয়ার্ড পামার ছিলেন চারপুরুষ ধরে ভারতের বাসিন্দা জেনারেল পামার পরিবারের সন্তান। পামার বিয়ে করেছিলেন এক ভারতীয় রাজকুমারীকে। বিলাতে বেড়াতে গিয়ে ভারতের খাবারের স্বাদ গন্ধ কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না এডোয়ার্ড পামার। তা-ই প্রতিষ্ঠা করলেন—ভারতীয় রেঁস্তোরা 'বীবস্বামী'। সে রেঁস্তোরা বেঁচে রয়েছে আজও। এবং সগর্বে।

সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইংরেজির প্রতি আমাদের পরিবর্তিত মনোভঙ্গি দেখে। ইংরেজি তো হঠানো সম্ভবই হল না, তার বদলে ইংরেজি জাঁকিয়ে বসেছে আমাদের হৃদয়ের সিংহাসনে। আমাদের নব্য শাসন ব্যবস্থার প্রাণবায়ু ইংরেজি। ইংরেজির জোরে আমরা বিশ্বজয়ে প্রয়াসী। ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় লেখকদের সাফল্য নিয়ে যেমন আমাদের গর্বের শেষ নেই, তেমনই বিদেশে জীবনের ক্ষেত্রে ভারতীয় তরুণ তরুণীর সাফল্যের কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়—ইংরেজির জ্ঞান। 'ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুলগুলোতে ভিড়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। অধুনা সেখানে চলেছে ভরা কোটাল। কেননা, গ্রামের গরিব ঘরেও স্বপ্ন এখন ইংরেজি। তাতে আপত্তির কিছু নেই। ইংরেজির প্রচার এবং প্রসারের স্বপক্ষে অনেক যুক্তিই রয়েছে। বলার কথা একটাই, তা-ই যদি হয় তবে কেন ইংরেজি মাতৃভাষা বলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের নিন্দামন্দ করা, তাঁদের পরদেশি বলা? ম্যাকক্লাস্কির স্বপ্ন সফল হয়নি বটে, কিন্তু চলতি পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে তাকালে মনে হয়না কি ভারতের প্রতিটি শহরই আজ এক অর্থে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ? সত্য বলতে কী, ইংরেজি শিক্ষিত শহরে মধ্যবিত্ত বোধহয় এক ধরনের 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান!'

মজার কথা এই, আধুনিক ভারত যখন প্রাণপাত চেষ্টা করছে রাজনীতি, অর্থনীতি, এমনকী সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও পশ্চিমকে বরণ করে নিয়ে এক অর্থে 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান' কিংবা 'ইন্দো-আমেরিকান' হতে, সাত সমুদ্রের ওপারে দূর বিদেশে বেচারা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কিন্তু শেষ চেষ্টা করছেন ভারতের সৌরভটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য। মেলাভন ব্রাউন সম্পাদিত কলকাতা থেকে প্রকাশিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের নিউজলেটার-এ দেখিয়েছিলেন যেসব অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বিদেশে চলে গেছেন তাঁরা ভারতে, কিংবা বিদেশের অন্যত্র আত্মীয় বন্ধু ও সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার চেষ্টা করেন। শুধু তা-ই নয়, প্রতি তিন বছর অন্তর কোথাও না কোথাও মিলনমেলায় সমবেত হন। কখনও ইংল্যান্ডে, কখনও কানাডায়, কখনও বা অস্ট্রেলিয়ায়। এই আত্মীয়তাবোধের গভীরে মিলনসূত্র কিন্তু ছেড়ে আসা ভারত। মনে পড়ছে কয় দশক আগে দেখা সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারটির কথা যাঁদের আন্তরিকতায় অভিভূত হয়েছিলাম। ফিরে আসার ক মাস পরে পাওয়া জিমের চিঠিতে খবর ছিল : ওঁর বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর ব্রিটিশ বউ মাঝে মধ্যে শাড়ি পরার চেষ্টা করেন। বাবা ভাল আছেন, তাঁর একটি ছোট্ট অনুরোধ আছে। সেটি এই : আবার যদি কোনও উপলক্ষে এদিকে আস তবে আসবার সময় একটি মোটামুটি সাইজের ডেকচি নিয়ে এসো। ঢাকনা সমেত সরুগলার অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি। কারণ এই ডেকচি ছাড়া, বাবা মনে করেন, কিছুতেই ডাল ঠিকঠাক রান্না হতে পারে না। তাঁর মতে মাংসের কারি রাঁধতে হলেও তা অপরিহার্য।

জিম লন্ডন নিবাসী সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র!

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু বই :

Anglo-Indians and Eurasians, S.F. Heron, London, 1881.

Half-Caste, C. Dover, London, 1937.

The Empire of the Nabobs, L.T. Hutchinson, London,1937.

The Hearseys— Five Generations of a Anglo-Indian Family, H. Pearse, 1905.

Hostages to India, H.A. Stark, Calcutta, 1926.

John Ricketts and His Times, H.A. Stark, Calcutta, 1934.

Verdict on India, Beverley Nicholes, London, 1946.

British Betrayal : The story of the Anglo-Indian community, Frank Anthony, Bombay, 1969

The Memshibs : The women of victorian India, P. Barr, London, 1976.

The Social Condition of the British Community in Bengal, 1767-1800, Suresh Chandra Ghosh, Leiden , 1970.

Calcutta in Urban History, Pradip Sinha, Calcutta, 1978.

The Anglo-Indians, V.R. Gaikwad, Bombay, 1967.

These are the Anglo-Indians., Reginald Mehar, Calcutta, 1962.

Life of Sir Henry Gidney, Kenneth Wallace, Calcutta, 1947.

In Search of a Homeland, Anglo-Indians and Mccluskiegunge, Kuntala Lahiri-Dutt, Calcutta, 1990.

The Anglo-Indians of Calcutta, S.S. Sarkar and others. Man in India, Ranchi, Vol 33, No-2, 1953.

Race, Sex and Class under the Raj, Kenneth Ballhatchet, New Delhi, 1979.

Empire and Sexuality, Ronalo Hyam, London, 1992.

Anglo-Indian Quiz-Book, Melvin Brown, Calcutta, 1994.

Bhowani Junction, John Masters, New York, 1954.

Cotton Mary, Ismail Merchant, Screen-Play—Alexandra Viets, New Delhi, 2000.

The Jadu House, Travels in Anglo India, Laura Roychowdhury, London, 2000.
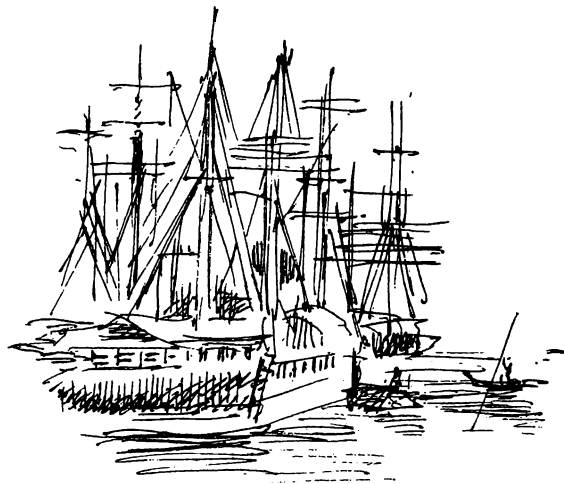
'রাজ'-নর্তকী

"একদিন এক ধনিক সম্ভ্রান্ত বাঙালিবাবুর বাড়ি ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। বাবুর নাম—রামমোহন রায়। বেশ বড় চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর বাড়ি; ভোজের দিন নানা বর্ণের আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। চমৎকার আতসবাজির খেলাও হয়েছিল সেদিন। আলোয় আলোকিত হয়েছিল তাঁর বাড়ি।

বাড়িতে বড় বড় ঘর ছিল এবং একাধিক ঘরে বাইজি ও নর্তকীদের নাচগান হচ্ছিল। বাইজিদের পরনে ছিল ঘাঘরা, সাদা ও রঙিন মসলিনের ফ্রিল দেওয়া, তার উপর সোনারূপার জরির কাজ করা। শাটিনের ঢিলে পায়জামা পা পর্যন্ত ঢাকা। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী, পোশাকে ও আলোয় আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। গায়েতে অলঙ্কার ছিল নানা রকমের। তারা নাচছিল দল বেঁধে বৃত্তাকারে, পায়ের নূপুরের ঝুম ঝুম শব্দের তালে তালে। নাচের সময় মুখের, গ্রীবার ও চোখের ভাব প্রকাশের তির্যক ভঙ্গিমা এত মাদকতাপূর্ণ মনে হচ্ছিল যে তা বর্ণনা করতে পারব না। নর্তকীদের সঙ্গে একদল বাজিয়ে ছিল, সারেঙ্গী মৃদঙ্গ তবলা ইত্যাদি নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল তারা।

গানের সুর ও ভঙ্গি সম্পূর্ণ অন্যরকম, আমরা শুনিনি কখনও। মধ্যে মধ্যে মনে হয়, সুর কণ্ঠ থেকে নির্গত না হয়ে নাসিকার গহ্বর থেকে তরঙ্গায়িত হয়ে আসছে। কোনও কোনও সুর এত সূক্ষ্ম ও মিহি যে কণ্ঠের কেরামতির কথা ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয়। বাইজিদের একজনের নাম নিকি, শুনেছি সারা প্রাচ্যের বাইজিদের মহারানি সে, তার নাচগান শুনতে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

বাইজিদের নাচগান শোনার পর রাতের খাওয়া-দাওয়াও শেষ হল। তারপর এদেশের ভেলকিবাজ জাগলারদের ক্রীড়াকৌশল আরম্ভ হল।"...

(অনুবাদ বিনয় ঘোষ। সুতানুটি সমাচার, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৯৭৫)

১৮২২ সালে ফেনি পার্কস কলকাতায় এসেছিলেন। রামমোহন রায়ের বাড়িতে নাচের আসরে যোগ দেন তিনি ১৮২৩ সালে। তিনি একজন অসাধারণ ভ্রমণকারী। দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর ভারত ভ্রমণের কাহিনীর নাম—Wanderings of a Pilgrim in search of Picturesque। ফেনি চমৎকার ছবি আঁকতেন। তাঁর মতো উদার, মুক্তদৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভ্রমণকারী বিশেষ দেখা যায় না। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত শুরু করেছিলেন হিন্দুর দেবতা গণেশকে 'সেলাম, সেলাম' বলে। কলকাতায় তিনি বেশি দিন ছিলেন না। এই শহর থেকে তিনি চলে যান স্বামীর কর্মস্থল এলাহাবাদে। যে দিনগুলো তিনি কলকাতায় কাটিয়েছেন তা তিনি মোটে অপচয় করেননি। দু'চোখ ভরে দেখেছেন এই শহরের

ইংরেজ ও ভারতীয়দের জীবনাচার। সুতরাং, নাচের আসরও বাদ পড়েনি। রামমোহন রায়ের বাড়িতে তিনি লক্ষ করেছেন—"বাড়ির ভিতর সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো, এবং সবই ইউরোপীয় স্টাইলে, কেবল বাড়ির মালিক হলেন বাঙালিবাবু।"

রামমোহন রায়ের বাড়ির পর পুজোর সময়ে একজন ধনী বাঙালিবাবুর বাড়িতে ফের নাচের আসরে হাজির হন ফেনি পার্কস। দেবী দুর্গার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি লিখছেন—

> "পূজামণ্ডপের পাশের একটি বড় ঘরে নানারকমের উপাদেয় সব খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিল। সবই বাবুর ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য। বিদেশি পরিবেশক 'মেসার্স গান্টার অ্যান্ড হুপার' সরবরাহ করেছিলেন। খাদ্যের সঙ্গে বরফ ও ফরাসি মদ্যও ছিল প্রচুর। মণ্ডপের অন্যদিকে বড় একটি হলঘরে সুন্দরী সব পশ্চিমা বাইজিদের নাচগান হচ্ছিল এবং ইউরোপীয় ও এদেশি ভদ্রলোকেরা সোফায় হেলান দিয়ে, বা চেয়ারে বসে সুরা-সহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। বাইরেও বহুলোকের ভিড় হয়েছিল বাইজিদের গান শোনার জন্য। গানের হিন্দুস্থানী সুর মণ্ডপে সমাগত লোকজনদের মাতিয়ে তুলেছিল আনন্দে।" (অনুবাদ—বিনয় ঘোষ)

এবার একপাক ঘুরে আসা যাক অন্য বাড়িতে, দুই দশক পরে। ১৮৪৩ সালে কলকাতায় এসেছিলেন ক্যাপ্টেন লিওপোল্ড ফন অরলিক (Capt. Leopold Von Orlich)। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে (Travels in India) আমরা মুখোমুখি হই আর এক বাঙালি যুগপুরুষের। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর। সাহেব লিখছেন, দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয় লন্ডনে। তিনি যখন রানির সঙ্গে তাঁর বৈঠকখানায় দেখা করেন তখন তিনি সেখানে হাজির ছিলেন। দ্বারকানাথের সঙ্গে স্ট্র্যান্ডে গাড়ি চড়ে তিনি বেড়িয়েছেন। সুতরাং কলকাতায় মার্চের শেষ দিকে দ্বারকানাথ তাঁর বাগানবাড়িতে পুরনো বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক গোড়াতেই জানিয়ে রেখেছেন দ্বারকানাথ ইউরোপীয় চালচলন ও আদবকায়দা অনেকটাই রপ্ত করেছিলেন। তাঁর প্রাসাদ ও বাগান সবই ইউরোপীয় কায়দায়। অবশ্য তার সঙ্গে যুক্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নিসর্গ দৃশ্য। বিশাল এলাকা। হ্রদ, ফুলের কেয়ারি, ফলের বাগান। বাড়ির চারপাশ ঘিরে কোকো ও পামের সারি। শহরের নতুন দম্পতিরা এখানে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে। উদার গৃহপতি তাদের সাদরে আমন্ত্রণ করেন। প্রাসাদটি দোতলা। পুরোপুরি ইউরোপীয় আসবাবে সাজানো। ঘরে ঘরে বেশ কিছু ভাস্কর্য ও ছবি। ছবির মধ্যে তাঁর নজরে পড়ে সোফায় হেলান দেওয়া এক ভারতীয় সুন্দরীকে। তিনি আরাম করছেন। সাহেব লিখছেন— "দ্বারকানাথ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে এই সুসংস্কৃত মহিলাকে দেখাচ্ছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল দ্বারকানাথ তাঁর অনুরাগী, 'হি এভিডেন্টলি এপেয়ার টু হ্যাভ বিন ভেরি মাচ অ্যাটাচড টু হার।" কে সেই পটের বিবি, আজ সে প্রশ্ন অবান্তর।

যা হোক, অতিথি প্রাণভরে পানাহার করলেন। খানার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছিল দামি মদ্য। তারপর শুরু হল নাচের আসর। ছয়জন নর্তকী (bayaderes) বাদ্যকরদের নিয়ে হাজির হল আসরে। সহেব ফেনি পার্কস-এর মতো রসিক নন। তিনি লিখেছেন যথারীতি তাদের নাচ এমন কিছু প্রশংসাযোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ, তাদের সুন্দর হাত-পা-মুখ, এবং Contour দেখবার মতো বটে। শেষ পর্যন্ত তাদের নাচ এমন আপত্তিকর ভঙ্গি (offensive) ধারণ করল যে, আমাদের তা বন্ধ করতে অনুরোধ করতে হল। তাঁর বক্তব্য—দ্বারকানাথ অবশ্যই সুসংস্কৃত মানুষ, তাঁর বেশ রুচিবোধ রয়েছে। কিন্তু নৈতিকতা ও শালীনতা সম্পর্কে ভারতীয়দের ধারণা বাস্তবিকই অন্যরকম। আমরা যা দেখে আহত বোধ করি, তারা তাতে দূষণীয় কিছু দেখতে পান না। নাচ শেষে সুন্দরী দুই বাইজি তাঁদের সামনে আসে। সাহেব তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। একজনের বয়স তেরো। সে মুসলমান। তার মা-বাবা নেই। অনাথ মেয়ে অতএব বাধ্য হয়ে এই পেশায়। ইত্যাদি।

নৈতিকতার প্রশ্ন নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। কারণ প্রশ্নটি সে কালেও বিতর্কিত। আপাতত

এটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট যে সব বিদেশি নারীপুরুষ ভারতীয়দের 'নচ' (Nautch) বা নাচ সম্পর্কে সমান শুচিবাইগ্রস্ত ছিলেন না। কেননা, তার আগে, ১৮৩৬ সালের ৩ ডিসেম্বর 'সমাচার দর্পণ' জানাচ্ছে—

> "শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যানে মহাভোজ ও তামাসা।—গত সোমবার রজনীতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অত্যুত্তম উদ্যানে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ও অন্যান্য ন্যূনাধিক তিন শত সাহেব ও বিবি সাহেব লোককে মহাভোজন করাইয়া পরমসন্তোষক তামাসা দর্শাইলেন। বিশেষতঃ নৃত্যগীত, বাদ্য ও বহুত্যুৎসবজনক ও অত্যুৎকৃষ্ট বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত ছিল। ...অনন্তর মহানাচ আরম্ভ হইল।"

চার বছর পরে, ১৮৪০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি "সমাচার দর্পণ" লিখছে—

> "গত বুধবারে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার স্বীয়োদ্যান বাটীতে এতদ্দেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহা ভোজন করাইলেন তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবুর শিষ্টাচারে ও বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সন্তোষ জন্মিল। ...এবং গত রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু ঐ উদ্যানে স্বদেশীয় স্বজনগণকে লইয়া মহা ভোজ আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তদুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার মধ্যে প্রাপ্য সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্ত্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহাদের নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ জন্মাইলেন এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট আতস বাজির রোসনাইও হইয়াছিল।"

মুখে মুখে এসব খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সেদিনের কলকাতায় রচিত হয় একটি জনপ্রিয় ছড়া বা গান—

"বেলগাছিয়ার বাগানে হয়
ছুরি-কাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা
আমরা তার কি জানি?
জানে ঠাকুর কোম্পানি।"

শুধু রামমোহন আর দ্বারকানাথের বাড়ি আর বাগানবাড়িতে নয়, শহরের সম্ভ্রান্ত ধনবানদের অনেক বাড়িতেই তখন নাচের আসর। এমনকী পুজোমণ্ডপেও বাইজির ঘুঙুরের বোল। তৎকালে বাঙালিবাবুর লক্ষণ ছিল নয়টি—

মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
খোষ পোষাকী যশমী দান,
আড়িঘুড়ি কানন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'

এই বাবুয়ানায় বাইজির নাচগান ছিল অপরিহার্য। বাইজির নূপুরঝঙ্কার ছাড়া এমনকী মহামায়াও বুঝি বা প্রাণ পান না। সুতরাং, পুজোর মরসুমে শারদীয় বার্তায় বাইজির নিত্য উপস্থিতি।

১৮২৬ সালের নভেম্বরে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর খবর: নেটিভদের উৎসব উপলক্ষে বাবু রূপলাল মল্লিকের বাড়িতে মহাসমারোহে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে ইংরেজি বাদ্যকরদের সমাবেশ হবে। সেইসঙ্গে থাকবে নাচ এবং আপ্যায়নের অঢেল বন্দোবস্ত। বাবুর বন্ধুরা ছাড়াও আমন্ত্রিত হচ্ছে শহরের গণ্যমান্য সাহেব ও বিবিরা। তাঁদের 'টিকিট' বা আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হচ্ছে। অতিথিদের সান্ধ্যভোজ সরবরাহ করবে গুন্টার অ্যান্ড হুপার। খাদ্য ছাড়াও পরিবেশিত হবে স্যাম্পেন, ক্ল্যারেট এবং সব ধরনের মদ্য।

চিৎপুরে রূপলাল মল্লিকের প্রাসাদে আগের বছরও (১৮২৫) সমান সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছিল বাবুদের উৎসব। এই সব সম্ভবত রাসলীলা উপলক্ষে। 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ নিমন্ত্রণের

আশ্বাস দিয়ে বাবুর তরফে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছিল তাতে পরিকল্পিত নৃত্যগীতের আসর সম্পর্কে বলা হয়েছিল—এই শহরে ইতিপূর্বে এমনটি আর কেউ কখনও দেখেননি—"সুপিরিয়ার টু এভরিথিং অব দ্য কাইন্ড বিফোর গিভেন ইন দিস সেটেলমেন্ট।"

১৮১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর সংবাদের মর্ম: 'গ্রান্ড হিন্দু ফেস্টিভাল' এসে গেল। সেই সঙ্গে এল ধনী হিন্দুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মরসুম। মহারাজা রামচন্দ্র রায় ও বাবু নীলমণি ও বৈষ্ণবদাস মল্লিকের বন্ধুরা শুনে উল্লসিত হবেন তাঁদের পরিতৃপ্তির জন্য এই ভদ্রজনেরা তাঁদের প্রাসাদে আমোদের কী বিপুল আয়োজনই না করেছেন। বিপুল অর্থব্যয়ে তাঁরা সেই সব বিখ্যাত গায়িকাদের এনেছেন যাঁরা আগে কখনও এই প্রেসিডেন্সিতে কোনও অনুষ্ঠান করেননি। যাঁরা নিকির মধুর, রঙিন গান (Voluptuous) কিংবা বেদনাবিধুর জাদুকরি গানের সঙ্গে পরিচিত, এবং যাঁরা আসরুনের বৈচিত্র্যময় মধুর সুর উপভোগ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই উৎসবের দিনগুলোতে সানন্দে সুরসাগরে ভাসতে রাজি হবেন। "অ্যান্ড গিভ দেমসেলভস আপ টু দ্য স্যুদিং ইনফ্লুয়েন্স অব দ্য কনকর্ড অব সুইট সাউন্ডস।" প্রতিবেদনের ভাষা রীতিমত কাব্যিক। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে এই মরসুমেই জনসাধারণের সামনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন 'প্রাচ্যের লাইস' (Estern Lais)—চিত্তহরণকারী যৌবনবতী নূর বক্স। তাঁর রূপগুণের বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে—এই মেয়েটির যে প্রতিভা ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে রসিকেরা আশা করেন ক্রমে চর্চা ও অভিজ্ঞতায় তা আরও বিকশিত হবে এবং একদিন সে হবে প্রাচ্যের তিন সাইরেন-এর একজন ('উইল অ্যাটেন আ ডিস্টিংগুইসড প্লেস অ্যামং দ্য ট্রাইয়ুমভিরেট (Triumvirate) অব ইস্টার্ন সাইরেন্স।' এই ত্রয়ী বাকি দু'জন ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নিকি ও আসরুন। এদের পাদস্পর্শে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় বাবুদের প্রাসাদগুলো পরিদের রাজ্য। পত্রটি প্রসঙ্গত আরব্য রজনীর কথাও দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে ভোলেনি।

পুজোর পর ১৮১৯ সালের অক্টোবরে উল্লেখিত উৎসবের 'রিভিউ' বা আলোচনা করতেও উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর। বলা হয়েছে নাচের আসর বসে পর পর তিন রাত। শেষ দিন নাচ চলে ভোর ছ'টা অবধি। ইউরোপীয় অতিথিদের আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি ঘটেনি। বাবুদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ, অতিথিরাও পুরোপুরি তৃপ্ত। রাজা রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতে সুখ্যাত নিকি তার সাইরেন-কণ্ঠে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। কাশ্মীরি সুন্দরী বান্নুর রূপ লাবণ্য এবং ছন্দোময় নৃত্য দেখার জন্য ভিড় জমে বাবু রূপচাঁদ রায়ের বাড়িতেও।

এক দশক পরেও দেখি কলকাতার বাংলা ইংরেজি পত্রে একই সমাচার। পুজো উপলক্ষে বাইজির নাচগান সহযোগে ইংরেজ ভজনা। অবশ্য বাঙালিটোলায় শহরের খানদানি সাহেব বিবিদের অভিযানের পিছনে আর এক আকর্ষণ ছিল—চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়-র বিপুল ও বিচিত্র আয়োজন।

১৮২৯ সালের ১০ অক্টোবর 'সমাচার দর্পণ' লিখছে—দুর্গোৎসব উপলক্ষে

> "... ...এ বৎসর ৪/৫ স্থানে বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল বিশেষত ঁমহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটীতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরল লার্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও প্রধান২ সাহেবলোগ আগমন করিয়াছিলেন পরে দুই দণ্ড পর্য্যন্ত নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণকরত অবস্থিতি করিয়া প্রীত হইয়া গমন করিলেন। ইংরেজ লোকের গতিবিধি ঐ রাজার দুই বাটী ও ঁরাজা রামচাঁদের বাটী ও ঁদেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাটী এই তিন বাটীতে প্রায় ছিল অন্যত্র অত্যল্প।... ..."

বলা হয় কলকাতায় প্রথম জাঁকের পুজো করেন রাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর, পলাশিতে ইংরেজের সাফল্যের বিজয় উৎসব হিসাবে। নবকৃষ্ণকে হুতোমপ্যাঁচা তুলনা করেছেন ইংলন্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথের সঙ্গে। তিনি যেমন তাঁর রাজত্বকালে দেশের শিল্পী ও কবিসাহিত্যিকদের পেট্রন

ছিলেন, নবকৃষ্ণ তেমনি ছিলেন স্থানীয় কবিয়ালদের পৃষ্ঠপোষক। হুতোম প্রসঙ্গত নীলু হারু প্রভৃতি কবিয়ালদের নাম উল্লেখ করেছেন। নবকৃষ্ণ তাঁর পুজোয় ইংরেজদের আরাধনা করেছিলেন বটে, কিন্তু নাচের আসর বসিয়েছিলেন কিনা স্পষ্ট নয়। তবে নাচে যে তাঁর আসক্তি বা উৎসাহ ছিল না এমন নয়। বাস্টিড লিখেছেন, সমকালে কলকাতার এক সুন্দরী মিস র‍্যাংহাম-এর জন্মদিন উপলক্ষে ১৭৮১ সালের আগস্টে এক বর্ণাঢ্য নাচের আসর বসিয়েছিলেন। নাচের সঙ্গে যথারীতি খানাপিনার বন্দোবস্তও ছিল অঢেল। দিশি আপ্যায়ন শেষ হওয়ার পর সাহেব মেমরা নাকি বলনাচে মাতেন। পুব আর পশ্চিমের সাংস্কৃতিক মিলন ঘটে।

তবে পুজো উপলক্ষে বাবুদের বাড়িতে প্রথম বাইজি নাচের যে বিবরণ, তা এক দশক পরের, ১৭৯২ সালের। সে আলো-ঝলমল আসরের আয়োজন করেছিলেন পোস্তার সুখময় রায়। তাঁর বাড়ির নাচই নাকি ছিল যাকে বলে—সর্বোত্তম। তপ্ত আসর ঠাণ্ডা রাখার জন্য মাথার উপরে চলছে বিরামহীন টানা পাখা, বিবরণ দিচ্ছেন প্রত্যক্ষদর্শী। ওঁদের প্রাসাদেই প্রথম দেখা যায় নৃত্যসভায় নব সংযোজন, বাইজির নাচের পাশাপাশি ইংরেজি বাদকবৃন্দ, "আ কম্বিনেশন অব ইংলিশ এয়ারস (airs) উইথ হিন্দুস্থানি সঙস্।" প্রভু ইংরেজদের ভজনার জন্য সেদিন বাবুদের ব্যাকুলতা সত্যই শোনার মতো।

শুধু দুর্গোৎসব কেন, আপন আপন বশ্যতা জানাবার জন্য কলকাতার বাবুরা কোনও সুযোগই হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না। রূপলাল মল্লিকের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২৩ সালের নভেম্বরে রাসযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত নাচের আসর সম্পর্কে 'সমাচার দর্পণ' লিখেছিল—"সকলে কহে যে এমত নাচ বাবুরদের ঘরে আর কোথাও হয় নাই।" দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানবাড়ির কথাও আগে বলা হয়েছে। ১৮২৩ সালের নভেম্বরে তাঁর 'নবীন বাটী'র উদ্বোধন উপলক্ষেও শুনি একই কাহিনী। "অনেক২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া" তাঁদের তৃপ্ত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বভাবতই বাইজির নাচও ছিল। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, "উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন।"

সে বছরই অন্য এক খবরে (অক্টোবর) জানা যায়, "বড় আদালতের কৌশুলি শ্রীযুত ফারগিসন সাহেব অতি ত্বরায় বিলাত গমন করিবেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার প্রীত্যর্থে শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক আপন বাটীতে ফারগিসন সাহেব" এবং তাঁর স্বজাতীয় কয়েকজন আত্মীয়বন্ধুকে "নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি উপাদেয় চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য ও নানা প্রকার পেয় দ্রব্যের খানা দিয়াছিলেন।" তারপর সাহেবরা নাচঘরে গিয়া অপূর্ব নর্তকীর নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণান্তর সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরের বছর, ১৮২৪ সালের মার্চের খবর: "খানা। ১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মল্লিক কলিকাতার বড়বাজারের বাটীতে অনেক সাহেবলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নানা প্রকার উত্তম দ্রব্য ভোজন পান করাইয়াছেন ও ভোজনান্তে উত্তম বাইয়ের নাচ দেখাইয়া বাদশাহী ইংলণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণ করাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।" একটু পিছনে ফিরলে শোনা যায়—১৮২৩ সালের মার্চ মাসে মতিলাল মল্লিকের শুঁড়োর বাগানবাড়িতে এক বিরাট মজলিশ হয়। তার বিবরণ নাকি এমনকী খাস বিলাতের 'এশিয়াটিক জার্নাল'-এ পর্যন্ত প্রকাশিত। সেখানে নাচের আসরে নবাগত দুই বাইজির আবির্ভাব। তাঁদের একজন নান্নিজান, অন্যজন সুপন জান।

এমনকী বাঙালিবাবুর বিয়েবাড়িতেও বাইজির নাচ চাই। সেইসঙ্গে চাই সাহেব-বিবিদের পদধূলি। সম্ভবত বাঙালিটোলায় সেদিন ভাগ্যবানের পক্ষে সেটা যাকে বলে—'স্ট্যাটাস সিম্বল'—গৌরব তিলক। সুতরাং ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারিতে "শ্রীযুত রূপলাল মল্লিকের প্রধান পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের বিবাহ" উপলক্ষে রাত্রি জুড়ে যে মহোৎসবের আয়োজন হয় তাতে "আহুত হইয়া

এতন্নগরস্থ প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান লোক” ছাড়াও “ইংলণ্ডীয় ও মুসলমানাদি অনেকের আগমন” হবে না কেন? এই পরব উপলক্ষেও পুনশ্চ হিসাবে প্রতিবেদক বলতে ভোলেননি যে, “নর্তকীও উত্তম ছিল।” ১৮৩১ সালেও শুনি একই সমাচার। শুভবিবাহ উপলক্ষে ‘মহানাচ’। এবার শ্রীযুত কানাইলাল ঠাকুরের কনিষ্ঠ শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুরের বিয়ে। এবার পাঁচ রাত্রি ধরে উৎসব। তার মধ্যে

> “... ... তিন রাত্রি এতদ্দেশীয় শিষ্টাবিশিষ্ট লোকেরদের ও দুই রাত্রি ইউরোপীয় সাহেবদিগের সমাগম হইয়াছিল।... ইউরোপীয় সাহেবেরদের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল নেবাল ও মিলিটারিসম্পর্কীয় এত কর্ম্মকারক ও তাঁহারদের বিবিসাহেবেরা সমাগত হইলেন যে তাঁহারদের তাবতের নাম লেখা অসাধ্য।”

উল্লেখ থাকে যে, এই বিবাহ আসরেও “অনেক বাইয়ের নাচ” ছিল।

(এই সব সংবাদের সূত্র হিসাবে দ্রষ্টব্য: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২ খণ্ড, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ‘ইন দ্য ডেজ অব জন কোম্পানি’, সম্পাদনা এ. সি. দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৯৫৯, এবং ‘সিলেকশন্স ফ্রম ইন্ডিয়ান জার্নালস’, ২ খণ্ড, সম্পাদক—সত্যজিৎ দাশ, কলকাতা, ১৯৬৫)

এসব বাবুদের বাইজিপ্রীতির সামান্য ইঙ্গিত মাত্র। বস্তুত বাবু ও বাইজি নিয়ে বলার কথা অনেক। হয়তো অফুরন্ত। বিশেষত, অষ্টাদশ শতকে যে শৌখিনতার সূচনা তেজি মন্দা পেরিয়ে তার জের চলেছে একাল পর্যন্ত। সেই ইতিবৃত্তে সুধা ও গরল দুই-ই ছিল। বিশেষত কলকাতা কলির শহর। এই অর্বাচীন শহরে একালের মতোই সেকালে নিশ্চয় প্রকৃত কলাবিদ, সঙ্গীত ও নৃত্যরসিকের অভাব ছিল না। কিন্তু নৈতিকতার সুস্পষ্ট মানরেখা যে শহরে অস্পষ্ট সেখানে বাইজি যে কখনও রূপ আর যৌবনের পশারি বলে গণ্য হবেন তাতে আর বিস্ময় কী। ‘আদি পেশা’ কলকাতার শৈশব থেকেই এ শহরে বাস্তব ঘটনা। তথ্য সহযোগে রেভারেন্ড লঙ জানিয়েছেন পলাশির অনেক আগে ১৭৫৩ সালে কোম্পানির কর্তারা ঈশ্বরী এবং বুভি নামে দুটি মেয়ের বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিলাম করে ৫৩৯ টাকা ৪ আনা ৩ পাই উপায় করেছিলেন। কী তাঁদের অপরাধ, কে জানে। শুধু এটুকু বলা হয়েছে তাঁরা নগরকুল বধূ। পলাশির পরে, সিরাজের ভাণ্ডার থেকে যখন নগরের কলকাতা দখলের সময় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তখন ব্ল্যাক-জমিদার গোবিন্দ মিত্রের দু’জন রক্ষিতাও ক্ষতিপূরণ পান। তাঁদের একজনের নাম—রতন, অন্যজন—লতা। তাঁরা কি সামান্য নারী, না নৃত্যগীতে পটিয়সী দুই যুবতী? আমরা জানি না। তৎকালে কারও কারও কাছে বাই আর বারবনিতা সমার্থক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘নববাবুবিলাস’ (১২৬০ বঙ্গাব্দ) ও ‘নববিলাস’-এ (১২৫৯ বঙ্গাব্দ) বাইদের যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন তাতে স্পষ্ট কিছু মানুষের কাছে তাঁরা ছিলেন নিছক ভোগ্যপণ্য। ভবানীচরণ লিখেছেন—(অন্যের জবানিতে)

> “গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর যাহাতে সর্ব্বদা জিউ খুসি থাকিবেক এবং যত প্রধানা নবীনা গলিতা যবনী বারাঙ্গনা আছে ইহাদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া ঐ বারাঙ্গনাদিগের সর্ব্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবা, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা, কারণ পলাও অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রশুন যাহারা আহার করিয়া থাকে তাহারদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোন রাঁড়েই পাইবা না।” ... ...।

স্পষ্টতই এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্তই শুচিবাগীশের সংকীর্ণ সামান্যকরণ। কলকাতায় সেকালে যে গন্ধর্বলোক সৃষ্টি হয়েছিল, আগেই বলা হয়েছে, তাতে নিজেদের রসবোধকে জারিত করার মতো রসিকের অভাব ছিল না। সঙ্গীত এবং নৃত্যের প্রতি তাঁদের আসক্তি কারও কারও ক্ষেত্রে এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে, তাঁরা প্রিয় নর্তকীর সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য সমাজকে ত্যাগ করতেও পিছুপা ছিলেন না।

ওই 'সমাচার দর্পণ' পত্রেই দেখি ১৮৩৪ সালের এপ্রিলে গোঁড়াদের সংগঠন ধর্মসভা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে:

> "কিয়ৎকাল হইল কোন প্রধান বংশোদ্ভব পরম মান্যব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্বক সর্বান্তঃকরণের সহিত ত্বক্‌চ্ছেদ ইত্যাদিপূর্ব্বক জবন ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া আনারোনাম্নি জবনি রমণীকে মহম্মদ্দীয়ান শরার মতে বিবাহ করেন ও জবনেরা তাঁহার হিন্দু নাম পরিবর্ত্তে এজ্জত আলী খাঁ নামকরণ করে তিনি ঐ জবনী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যথারীতি ক্রমে রোজা নমাজে তৎপর হইয়া বহুদিবস ঘরবসত করেন..."

আবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত আর এক প্রশ্ন,

> "এতন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি নান্নিজান ও সুপনজান ও নিক্কিপ্রভৃতি জবনী নর্ত্তকীদিগের সহিত তাবৎকাল নানারূপ আহার ও ব্যবহার করিয়া এবং মির্জা জান তপসের সহিত দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল একান্নভুক্ত থাকিয়া নগরকীর্ত্তনোপলক্ষে পুনরায় হিন্দুদিগের মধ্যে গৃহীত হন।... ..."

এটাই বা কেমন কথা? হীরাবুলবুলের সন্তানকে হিন্দু কলেজে পড়ুয়া হিসাবে পাঠানোর মধ্যে যে অনুরাগের ছায়া দেখা যায়, এই সব উপাখ্যানেও কিন্তু তারই প্রতিচ্ছবি। বস্তুত এসব কাহিনী বাইজি ও বাবুর ভালবাসার কাহিনী হিসাবেই বন্দিত হওয়ার যোগ্য। রাজকীয় বা বাদশাহি প্রেম যদি যুগযুগান্ত ধরিয়া কাব্যকথার মর্যাদা পায়, তবে বাবুদের প্রেমোপাখ্যানই বা নিন্দিত হবে কেন? সুতরাং ১৮১৯ সালের ১৬ অক্টোবর 'সমাচার দর্পণ'-এর খবর শুনি—

> "শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন।"

বাইজির প্রতি বাঙালিবাবুর আকর্ষণের হেতু বুঝতে অসুবিধা নেই। ভারতীয় সাংস্কৃতিক চেতনায় নাচ এক চিরকালীন কলাকৃতি। মহেঞ্জোদরোর সেই ব্রোঞ্জ নর্তকী প্রতিমার কথা কে না জানেন? পরবর্তিকলের বৈদিক, পৌরাণিক, স্মৃতিশাস্ত্র সর্বত্রই রয়েছে কলাপটিয়সী নাগরিকার কথা। সর্ব যুগেই এ দেশের মানুষ সর্বতোভাবে উপভোগ করতে চেয়েছেন জীবনকে। আর সেই স্বপ্নে নর্তকীর নূপুর নিক্কন যুগ থেকে যুগান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলে। তা-ই দেখি আমাদের স্বর্গকল্পনায়ও উপস্থিত নর্তকী আর অপ্সরার দল। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা—আরও কত না অনন্তযৌবনা সুন্দরী। সুরলোকে দেবতারাই শুধু বিরাজ করেন না, রয়েছে গন্ধর্ব ও কিন্নররাও। শুধু তাই নয়, দিব্য বেশ্যার মতো কলাবতী রূপোপজীবিনীও বুঝিবা আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির নিত্যসঙ্গী। বৈদিক যুগের পুংশ্চলী, মহানাগনী—তবে কারা? ঋগ্বেদে কুমারীপুত্র, অবিবাহিতা জননীর সন্তান অগরুর কথাও রয়েছে। রয়েছে হেটাইরাই (Hetairai) বা সুসংস্কৃত নগরকুলবধূরাও। গবেষকরা মনে করে ঊষা-রা আসলে নর্তকী। মৎস্যপুরাণে উপস্থিত পণ্যাস্ত্রী। তাছাড়া কৃষ্ণের ষোল হাজার রুক্মিণী গোপিনীও বোধহয় আনন্দময় এক জগতের কথাই বলে। কৌটিল্যের কাল নাকি খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-২০০০ অব্দ। বাৎসায়ন খ্রিস্টিয় ২য় থেকে ৩য় শতকের মানুষ। 'শৃঙ্গার শতকম'-এর লেখক ভর্তৃহরির কাল খ্রিস্টিয় ৭ম শতক। দণ্ডির 'দশকুমার চরিত' রচিত হয়েছে ৭ম শতকে। ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' ১৬ শতকে। কলাকুশলী প্রমোদকন্যারা প্রত্যেকের রচনায় উপস্থিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্র (রচনাকাল ১০০-৩০০ খ্রিস্টাব্দ) বলে—নৃত্যগীত দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। শুধু সংস্কৃত, পালি বা বৌদ্ধ সাহিত্যে নয়, প্রমাণ তার ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ভাস্কর্যে, এবং চিত্রশিল্পের নমুনা সেখানে এখনও রয়েছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য, ভাস্কর্য, এবং পরবর্তিকালের মন্দির শিল্পেও দেখি আমোদ বিতরণ করে চলেছে নর্তক-নর্তকীর ছন্দোবদ্ধ পদযুগল। এই ঐতিহ্য দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রেখেছিল দেশের নানা মন্দির এবং রাজসভা। সেখানে শাস্ত্রসম্মত ধ্রুপদী নৃত্যের চর্চা ছিল বলতে

গেলে ধারাবাহিক। 'পাণ্ডববর্জিত দেশ' বলে কথিত হলেও বাঙালির কাছে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অবশ্যই অজ্ঞাত ছিল না। বস্তুত অতি সম্প্রতি একজন বাঙালি নৃত্যশিল্পী এবং গবেষক প্রমাণ করেছেন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশ্বখ্যাত ধ্রুপদী নাচের মতো একসময় বাংলা মুলুকেও ছিল উচ্চাঙ্গের গৌড়ীয় নৃত্য, যা মূলত একই ধারার নৃত্য হলেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলায়ও নিশ্চয় চিরকাল বহমান ছিল লোকজীবনের জীবনছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লোকসঙ্গীত ও আনুষ্ঠানিক নৃত্য। সুতরাং, বাঙালির কাছে নৃত্যগীতের আবেদন বিফলে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

লৌকিক ঐতিহ্য বা লোকসংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় অবশ্যই কোনওদিন ছেদ পড়েনি। কিন্তু ধ্রুপদী নৃত্য বলতে গেলে প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় মুসলিম আমলে। নববিজেতারা যে এলাকারই আগন্তুক হোন না কেন, তাঁদের দরবারি সংস্কৃতির আদর্শ ছিল পারসিক কেতাকানুন ও সভ্যতা সংস্কৃতি। সেই সূত্রেই একদিন পশ্চিম থেকে এই প্রাচীর মঞ্চে উত্তর ভারতে হুরীর মতো নব্য নর্তকীদলের পদসঞ্চার। একদিকে আমির খশরুর মতো সাঙ্গীতিক প্রতিভা যেমন সেদিন পরমপ্রাপ্তি, অন্যদিকে নবযুগে উত্তেজনার নতুন উপলক্ষ্য হয়ে আর এক প্রাপ্তি এই পরদেশি বিনোদিনীরা। ফেরিস্তা লিখেছেন, ১৩ শতকে দাস বংশের সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের দ্বিতীয় পুত্র কুরা খান আপন প্রাসাদে নর্তকী এবং গায়কদের এক সভা গড়ে তুলেছিলেন। ১৪ শতকে বাহমানি শাসক দ্বিতীয় মোহম্মদ শাহের দরবারও বলতে গেলে পরিণত হয় এক ইন্দ্রসভায়। সেখানে দিল্লি, লাহোর, পারস্য, খোরাসনের নর্তকীদের আমন্ত্রণ। আমির খশরু জানিয়েছেন খিলজি বংশের আলাউদ্দিন (শাসনকাল ১২৯৬-১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ) গুজরাতের কন্যা দেবলাদেবীর সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে নানা অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে রীতিমত এক সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন নর্তকীদের।

মুঘল আমলে আসর আরও জমজমাট। মুঘল বাদশাদের অন্যতম ব্যসন ছিল নাচ। আইন-ই-আকবরি-তে আবুল ফজল একটা পুরো অধ্যায় লিখে গেছেন ওঁদের নিয়ে। আকবরের রাজত্বকালে আগ্রায় তাঁদের রীতিমত ভিড়। আবুল ফজল লিখেছেন উত্তর ভারতে তখন নর্তকীদের অনেক গোষ্ঠী ছিল। যথা: নাচওয়া, সেজদ্, সেজেতালি, ভুগলিয়ে, তুনওয়ে, কানজিরি, নাট ইত্যাদি। তাছাড়া ছিল লোলনি, ডোমনি, হরাকেনি, হেন্তসিনি। বাদশা যাঁদের নাচ দেখে খুশি হতেন তাঁদের খেতাব দিতেন—কাঞ্চনী। বলা হয় আকবর নাকি একজন পর্তুগিজ বাইজির নাচ দেখে এমন প্রীত হয়েছিলেন যে, তাঁর নাম দেন তিনি—দিলরুবা,—হৃদয়কে যিনি উষ্ণ করেন। সেলিম আর আনারকলির বিয়োগান্ত প্রেমের উপাখ্যান আকবরের আমলেরই ঘটনা। জাহাঙ্গিরও ছিলেন পিতার মতো নর্তকীর নৃত্যছন্দে আবিষ্ট। বার্নিয়ার জানিয়েছেন একবার বার্নাড নামে এক ফরাসি একজন রূপলাবণ্যময়ী কাঞ্চনীর প্রেমে পড়েন। তিনি তাঁকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু বিধর্মী খ্রিস্টান বলে মেয়েটির মা কিছুতেই রাজি নন। বার্নাড বাদশাহের কাছে মেয়েটিকে প্রার্থনা করেন। জাহাঙ্গির বলেন—সে আর কী সমস্যা। উপহার হিসেবে সেই নর্তকীকে তিনি সমর্পণ করলেন ফরাসি অভিযাত্রীর হাতে। হাতে না বলে, বলা উচিত কাঁধে—জাহাঙ্গির নাকি কাঞ্চনীকে তাঁর প্রেমিকের কাঁধেই চাপিয়ে দিয়েছিলেন। শাজাহানের রাজত্বেও বিলক্ষণ খাতির নর্তকীদের। তাঁরা দল বেঁধে রাজকীয় মেলা এবং উৎসবে যোগ দিতেন। এমনকী প্রাসাদের অন্দরেও প্রবেশাধিকার ছিল তাঁদের। বার্নিয়ার বাইজিদের রূপ, তাঁদের দেহসৌষ্ঠব, পোশাক এবং নৃত্যকলার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন; বলেছেন—আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নাচেন ওঁরা। মানুচ্চি লিখেছেন একবার পাঁচশো কাঞ্চনী নাচ দেখিয়েছিলেন মশালের আলোয় প্রকাশ্য স্থানে সুন্দর সুন্দর যানবাহনে চড়ে। শাজাহান নিজেও নাকি এক জন নর্তকীর প্রেমে পড়ে তাঁকে ঠাঁই দিয়েছিলেন নিজের হারামে। আউরঙ্গজেব এই উত্তরাধিকার এড়িয়ে চলেছেন বটে, তবে তাঁর আমলে প্রাসাদের অন্দরে নাকি যাতায়াত ছিল বাইজিদের।

শাহজাদা দারা প্রেমে পড়েছিলেন রানাদিল নামে এক রূপসী কলাবতীর, দারা তাঁকে সঙ্গিনী করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন দারার প্রতি বিশ্বস্ত। পরবর্তী মুঘলের কেউ কেউ তো নাচনেওয়ালির হাতে রীতিমত পুতুলে পরিণত। জাহান্দর শা নর্তকী লালকনোয়ারের প্রেমে এমনই হাবুডুবু যে তাঁকে তিনি বেগমের মর্যাদা দিয়েছিলেন। সেসব কাহিনী আজ উপকথার মতো শোনায়। মহম্মদ শাহ রঙ্গিলা আর উত্তম বাঈ, ওরফে খুদাসিয়া বেগমের উপাখ্যানও যেন নিছক গল্পকথা। অথচ সবই রয়েছে লিখিত ইতিহাসের পাতায়।

এই রাজকীয় বিলাস বলতে গেলে সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতময়। রাজা বাদশারা শুধু নন, নাচের নেশায় তন্দ্রাচ্ছন্ন এমনকী আমির ওমরাহ থেকে শুরু করে সাধারণ সামন্ত প্রভুরাও।

ছত্রপতি শাহু (১৭০৭-১৭২০) সযত্নে চয়ন করে নিজের প্রাসাদ সাজিয়েছিলেন বর্ণাঢ্য ফুলের তোড়ার মতো সুন্দরী নর্তকীর দল।

দ্বিতীয় পেশোয়া বাজিরাও (১৭২০-১৭৪০) আর নর্তকী মাস্তানির প্রেমকাহিনী এখনও বেঁচে রয়েছে কাব্যে, গাথায় এবং লোককথায়। মালবের শাসক বজবাহাদুর ও রূপমতীর বিয়োগান্ত প্রেম কাহিনীও আজও মুখে মুখে ফেরে। প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেছিলেন এই প্রেমিক গায়িকা-নর্তকী। সেকালে খ্যাতনামা যে সব নর্তকীর নাম আজও বেঁচে আছে তাঁদের মধ্যে আছেন: কমলাবাই, পান্না বাই, চামানি, ছাকমাক ধনি (চকমক কি?) প্রভৃতি। আদ বেগম নামে একজন নাকি সম্পূর্ণ দিগুবসনা হয়ে নাচতেন, কিন্তু দর্শকরা তাঁর চিত্রিত রঙিন নকশি ছন্দিত পদযুগল ছাড়া কিছুই আর দেখতে পেতেন না।

মুঘলদের গৌরবসূর্য যখন অস্তাচলে তখন দিল্লি আর আগ্রার জলসাঘরে ঝাড়ের আলো নিভে আসে। নর্তকীরা রাজধানী ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েন নানা রাজ্যে আঞ্চলিক শাসকদের দরবারে। সাময়িক ভাবে তাঁদের প্রধান আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায় লক্ষ্ণৌ। ওয়াজিদ আলি শাহর পরিখানায় নর্তকী ছিলেন নাকি একশো। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের এক প্রেরণাস্বরূপ বেগম হজরত মহল ছিলেন যৌবনে সেই বেহস্তেরই এক হুরি। উল্লেখ্য, কোনও কোনও নর্তকী শুধু যে রানি বা বেগমের মর্যাদা লাভ করেছেন তাই নয়, কেউ কেউ তাঁদের উপহার দিয়েছেন উত্তরাধিকারীও।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ক্ষমতার কেন্দ্র ক্রমে সরে আসে বিদেশি পতাকার তলায়। ঝড়ে ছত্রখান হয়ে যাওয়া নিরাশ্রয় পাখির মতো বাইজিরা পাড়ি জমায় নয়া পত্তনি শহরে এবং ছাউনির আশেপাশে। সেই সূত্রেই সপ্তদশ শতকের কলকাতায়ও শুনি তাঁদের নূপুর-গুঞ্জন, আর নতুন সুরের মদিরা। বাদশাহি নেশায় যেমন আক্রান্ত হয়েছিলেন ভূভারতের মতো বাংলার সামন্তপ্রভুরা, তেমনই অচিরাৎ নেশাগ্রস্ত হয়ে গেল ইংরেজদের প্রসাদে পুষ্ট নব্যধনী বাবুরা।

কী সে নাচ, যা দেখে তাঁরা বিমোহিত! সেই সংগীত সুধাই বা কী যা পান করে আবেশে তাঁরা টলমল। রসিক বিশেষজ্ঞরা বলেন বাইজির নাচে পারসিক উপাদান যেমন ছিল, তেমনই ছিল ভারতীয় উপাদান। এই শিল্প এক মিশ্র সৃষ্টি। তার সঙ্গে বাইজিরা মিশিয়েছিলেন উত্তর ভারতের লুপ্তপ্রায় নৃত্য—কথক। দক্ষিণের শিল্পীরা তার সঙ্গে মিশিয়েছিলেন নাকি দাসী-আট্টম বা সাদির। একজন গবেষক লিখেছেন—বাইজিদের কথক মূল কথক থেকে স্বতন্ত্র। কথকের আধ্যাত্মিকতা বহুলাংশে বর্জন করে তাঁরা তাকে পরিণত করেছিলেন শারীরিক আবেদন তথা কামনা বাসনার প্রতীকে। তাঁদের নাচ মানে "ভলাপচুয়াসনেস অ্যান্ড ল্যাসিভিয়াসনেস, অ্যান্ড দ্য উইমেন কেম টু বি ক্যাটাগোরাইজড অ্যাজ উইমেন অব ইজি ভার্চু।" তবু তিনি মনে করেন বাইজিদের কাছে জাতির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। প্রথমত দাস বংশের আমল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পাঁচশো-ছশো বছর ধরে এদেশে নৃত্যগীতের আবহাওয়া বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা। দ্বিতীয়ত, এই জাতিবর্ণ ভেদে বিদীর্ণ এই দেশে কথককে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে দেননি তাঁরাই।

কী গান গাইতেন ওঁরা, সেটাও এক প্রশ্ন বটে। বাইজিরা সাধারণত গাইতেন ঠুমরি, গজল। পরবর্তীকালে কোনও শিল্পী খেয়াল এবং ধ্রুপদও। একসময় তাঁদের গলায় প্রায়শ শোনা যেত পারসিক কবি হাফেজের সুরায়িত কবিতা। অনেক ফার্সি এবং উর্দু কবির কবিতা ও সায়েরও গেয়েছেন তাঁরা। অনেকে আবার নিজেরাই ছিলেন গীতিকার ও সুরকার। পরবর্তীকালে বাইজিদের কিছু কিছু গান উদ্ধৃত করেছেন নবীন সন্ধানী গোপা মুখোপাধ্যায়। তাঁদের গলায় রঙিন গানও যেন বেদনার গান। প্রেম সংগীত যেন বিষাদ সংগীত। অপূর্ণ কামনা বাসনা, না-পাওয়ার বেদনা অনুরণিত সে সব গানে। তাঁদের গানকে নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন প্রভা রাও নামে একজন গবেষক। বাইজিরা কেন সম্প্রদায়গতভাবে ব্যক্তিজীবনে বিষণ্ণ এবং বেদনাবিধুর তার একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন রেবা মুহুরী। তিনি অনেক বাইজির ঘরের দেওয়ালে অষ্টম এডোয়ার্ড ও মিসেস সিম্পসন-এর ছবি দেখেছেন। সম্ভবত ওঁদের কাছে তারা প্রেমের প্রতীক। প্রেমের জন্য কেউ কেউ সিংহাসন ছাড়তে পারেন বই কি। কিন্তু সবাই কি আর পারে। বেদনা সে কারণেই!

এই গান, এই নাচ ভারতীয় দর্শক এবং শ্রোতার উত্তরাধিকার। এই অধিকার রাতারাতি অর্জিত হয়নি। তার পিছনে রয়েছে যুগ যুগান্তরের ধারাবাহিকতা। বাইজির আবির্ভাব হয়তো সুলতানি আমলে। কিন্তু আসর সাজানো ছিল দূর অতীতে। কলকাতার বাবুরা মূলত সেই ঐতিহ্যেই লালিত। সুতরাং, তাঁদের বাইজি বিলাস যত সমালোচিতই হোক না কেন, অনধিকার চর্চা নয়। দূর পশ্চিমের অভিযাত্রীরা সে দাবি পেশ করতে পারেন না অথচ ঔপনিবেশিক আমলে রাজা বাদশা, আমির ওমরাহ, সামন্ত প্রভু এবং বাবুদের মতো ভারতীয় বাইজি যেন তাঁদের কাছেও অপ্রতিরোধ্য। তাঁদের নাচ ভাল লাগুক না লাগুক, তাঁদের গান অপছন্দ হোক, কেউ যেন তাঁদের এড়িয়ে চলতে পারছে না। এমনকী মেমসাহেবরা পর্যন্ত। ইংরেজ 'রাজ'-এর আমলে দেশীয় নর্তকীদের নিয়ে পরদেশি প্রভুদের মধ্যে যেন এ ব্যাপারে ভারতীয় রাজা-বাদশা এবং সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে অঘোষিত প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা অবশ্য সমানে সমানে নয়।

ভারতীয়দের ছিল রাজা, ইংরেজের—'রাজা'। সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে কেমন করে বিলাসিতার পাল্লা দেবেন কোম্পানির কর্মচারীরা? তবু এ দেশে ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে ঘটনাগুলো বোধহয় পুরোপুরি অবহেলাযোগ্য নয়। বিশেষত, বলতে গেলে ষোড়শ শতক থেকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদেশি আগন্তুকদের অনেকেরই রচনায় ঠাঁই পেয়েছেন আমাদের দেশের এই নর্তকীরা। কেউ তারিফ পেয়েছেন, কেউ মুখ গুমরো করে আসর ত্যাগ করেছেন, এই যা। বিদেশি দর্শকদের কিছু কিছু মন্তব্য দৃষ্টান্ত হিসাবে শোনা যেতে পারে।

আঠারো শতকের শেষ দিকে ভারতে এসেছিলেন মিসেস কিন্ডারসলি। ১৭৭৭ নাগাদ কলকাতায় বিখ্যাত 'নচ' দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়ার সংক্ষিপ্তসার: এই প্রমোদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া শক্ত। শুধু কৃষ্ণাঙ্গরা নন, অনেক ইউরোপিয়ানের কাছেও (নাচ) বিশেষ আনন্দদায়ক। আলোকিত বিশাল হলঘর। একদিকে বসে আছেন গণ্যমান্য অতিথিরা যাঁদের আপ্যায়নের জন্য এই আয়োজন, অন্যদিকে নর্তকীরা আর তাঁদের অনুচর-সহচরবৃন্দ। নর্তকীরা কদাচিৎ একসঙ্গে নাচেন। একজন এগিয়ে এসে নাচতে শুরু করেন। নাচ বলতে একবার শাল দিয়ে (ওড়না?) মাথা ঢাকা, আর একবার খুলে ফেলা। প্রথমে একটি হাত প্রসারিত করা, পরে আর একটি। পায়ের কাজও একই ভঙ্গিতে, একগজ জায়গা পেলেই যথেষ্ট। কিন্তু তাঁদের মদির কটাক্ষ, ইঙ্গিতপূর্ণ স্মিত হাসি এবং অশালীন অঙ্গভঙ্গিই তারিফ পায়। যে নর্তকী অন্যদের চেয়ে এই কলায় বেশি পারঙ্গম সেই সর্বোত্তম নর্তকী। মিসেস কিন্ডারসলি অবশ্য বাইজিদের গানের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন ওঁরা পারসিক কিংবা হিন্দুস্তানি গান গেয়ে থাকে। কোনও কোনও গান শুনতে মধুর। কিন্তু বাদ্য এবং অন্যদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে সে সুর হারিয়ে যায়। ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতকের আর এক অভিযাত্রী 'হার্টলি হাউস, ক্যালকাটা'-র অনামা এক ইংরেজ লেখিকা (কারও কারও অনুমান তিনি সোফিলা গোল্ডবোর্ন) ১৭৮৯ সালে কলকাতার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন—হঠাৎ কানে গুঞ্জরিত অচেনা ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেন পাঁচ ছয়জন কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে। তাঁদের পরনে সাদা মসলিন, নানা রঙের ফিতেয় সাজানো তাঁদের পোশাক। নাকে তাঁদের দুটি তিনটি করে আংটি (নথ)। এ সব তাঁদের গয়না। হাতের কবজিতে এবং পায়ের গোড়ালিতে ঘুঙুর। তা দিয়ে তাঁরা তাল রাখেন, সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঙ্গীরা বাদ্য বাজান। তাঁদের গানের সুর কোমল, প্রাণবন্ত। ভাষা জানি না, কিন্তু হাত আর চোখের ভঙ্গি থেকে তাই আমার মনে হল। চমৎকার নাচলেন ওঁরা।—"অ্যান্ড, আই কুড পারসিভ, ভেরিওয়েল রিওয়ার্ডেড।" স্পষ্টতই এই বিবি নিন্দুকদের দলে পড়েন না।

অষ্টাদশ শতকের আর এক দর্শক ফরাসি অভিযাত্রী লে কাউন্টার (Le Counter)। তিনিও বাইজির নাচ দেখেছিলেন কলকাতায়, ১৭৮৫ সালে। তাঁর বক্তব্যের মোটামুটি সার কথা: এত দিন ধরে যাঁদের কথা শুনে আসছি সেই নচ-গার্লদের দেখলাম। তাঁদের রূপ এবং লালিত্যময় ভঙ্গি সম্পর্কে যেসব বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই অতিরঞ্জিত। এ দেশের সুন্দরী মেয়েদের তুলনায় তাঁদের রূপ কিছু নয়। তাঁদের নাচেও আমি কোনও মাধুর্য বা চমৎকারিত্ব খুঁজে পাইনি। বাইজিরা শুনলে নিশ্চয়ই ভাবতেন এই পরদেশি বেরসিক।

কাছাকাছি সময়ে কলকাতায় নাচ দেখেছিলেন মিসেস এলিজা ফে। তাঁর 'দ্য ওরিজিন্যাল লেটার্স ফ্রম ইন্ডিয়া' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে। তিনি লিখেছিলেন: নর্তকীরা এখানে প্রায়শ আমোদের উপলক্ষ্য। আমাকে কিন্তু তাঁরা নিরাশ করেছেন। তাঁরা পেটিকোটের মতো শরীরের চারদিকে এমন বিপুল পরিমাণ মসলিন জড়ান যেন 'হুপ' (আংটা, কড়া বা চাকা। ঘাঘরার ঘের প্রয়োজন মতো বাড়ানোর জন্য স্থিতিস্থাপক চক্রবিশেষ) রয়েছে। তাঁদের ছন্দ ধীর এবং মামুলি। সামান্য একটু দেখলেই বুঝিবা পুরো নাচ দেখা হয়ে যায়।

গ্রান্ড কায়রোর একই পেশার মেয়েদের তুলনায় তাঁরা নিম্নমানের। আমি অবশ্য সেখানে জনপথে কখনও তাঁদের নাচ দেখিনি। তবে এটা মানতেই হবে এখানকার নাচ অনেক কম অশালীন। অন্তত দেখে আমার তা-ই মনে হল।

ক্যাপ্টেন ফর্বেস—এর অভিমত কিন্তু অন্যরকম। তাঁর স্মৃতিকথায় (১৮১৩) তিনি বাইজির নাচ এবং নর্তকীদের সম্পর্কে অনেক কিছুই লিখে গেছেন। তাঁর মতে এঁদের (বাইজিদের) নাচ এবং গান বুঝতে হলে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া চাই। সাধারণত দুটি মেয়ে একসঙ্গে নাচে। তিনি তাঁদের দেখে খ্রিস্টিয় শাস্ত্রে বর্ণিত মিরিয়াম এবং অ্যারনকে স্মরণ করেছেন। আধুনিক গ্রিক নর্তকীদের কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন। নাচের সঙ্গে তাল রেখে তাঁরা যে গান করেন তাতে সুর পায় ভালবাসা, আশা, ঈর্ষা, নৈরাশ্য। এবং সেই আবেগ যা প্রেমিক প্রেমিকার কাছে চিরচেনা। ভাষা না জানলেও সে গানের মর্ম বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। ভারতীয়রা এই আমোদ প্রাণভরে উপভোগ করেন, এবং প্রিয় নর্তকীর জন্য তাঁরা সানন্দে বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন। এই বিদেশি দর্শক নর্তকীদের প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ। তাঁরা দেখতে কৃশতনু, তাঁদের অবয়ব কোমল এবং গড়ন যথাযথ ও ছন্দিত। শৈশব থেকে তারা এই পেশার জন্য তৈরি হলেও তাঁদের ভঙ্গিমায় যথেষ্ট শালীনতা ও রুচিশীলতা। তিনি মনে করেন একই পেশায় অন্যান্য দেশে যাঁদের দেখা যায় এই নর্তকীদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা হয় না।

মিসেস শেরউড ভারতে ছিলেন ১৮০৫ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত। তিনি ভারতীয় পটভূমিতে বেশ কিছু বই লিখেছেন। কলকাতায় তিনি নাচও দেখেছেন। কিন্তু নর্তকীদের গান তাঁর ভাল লেগেছিল। বলেছেন, প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব গান আছে। তার বিশিষ্ট চরিত্র ও গায়ন-পদ্ধতি আছে। পূর্ব দুনিয়ার গান একদিকে খুবই সুমিষ্ট, অন্য দিকে বিষাদপূর্ণ। কিন্তু সব মিলিয়ে চমৎকার সুরেলা সে গান।

সংগীত সম্পর্কে আমি বিজ্ঞানীর মতো মতামত দিতে পারি না। কিন্তু যা আমি শুনেছি তা অতিশয় মন মাতানো। পুরনো ভারতীয় সংগীতের গভীর বেদনা মনকে স্পর্শ করে। ইউরোপে এমন গান আমি কদাচিৎ শুনেছি।

বিশপ হিবার বলেন, (তাঁর জার্নালের এই সংস্করণের প্রকাশ ১৮২৮ সালে) আমরা আসন গ্রহণ করার কিছুক্ষণ পরেই নর্তকীদের প্রবেশ। পেছনে পেছনে বাদ্যকারেরা। আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ডঃ স্মিথ আমাকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন—ভদ্র হিন্দুরা অতিথিদের জন্য এই আসরের আয়োজন করেছে। এখানে নাচে বা গানে অশালীনতার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আমি নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। মেয়েরা নাচ আরম্ভ করল। বেচারারা নিছক ছেলেমানুষ। কারও বয়স চৌদ্দর বেশি হবে না। আমার স্ত্রীর কাছে যা শুনেছিলাম তা-ই করছিলেন ওঁরা। সেই একঘেয়েমি। তাতে অশালীনতা যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না এমন লাবণ্য যা আগ্রহ সৃষ্টি করে। এই নাচের প্রধান হাতের আস্তিন একবার কনুই পর্যন্ত তোলা আর নামানো। সেই সঙ্গে যান্ত্রিক ভাবে হাত একবার সামনের দিকে আর একবার পিছন দিকে আন্দোলিত করা। তাঁদের পোশাক খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। কিন্তু পেটিকোট, পাজামায় প্রচুর পরিমাণ লাল রঙের কাপড়ের ব্যবহার। কোমরে জড়ানো শালের উপর শাল। তাছাড়াও শরীরে নানা ধরনের স্কার্ট চাপানো। ফলে তাঁদের শরীর পুরোপুরি আড়ালে চলে গেছে। দেখলে মনে হয় গুটি কয় ডাচ-পুতুল। অবশ্য দু'তিনটি মেয়ের মুখশ্রী দিব্যি ভাল। ওঁরা গাইছিলেন পার্শিয়ান ও হিন্দুস্তানি গান। কণ্ঠস্বর তাঁদের খুব জোরালো না হলেও প্রীতিপদ। ...আমি ওদের বকশিস দিলাম।...' বিশপ হিবার ভারতীয় নাচগান সম্পর্কে নানা উপলক্ষে আরও অনেক কথাই বলেছেন। আমরা তাঁর একাংশের হুবহু অনুবাদ নয়, সার কথা উল্লেখ করলাম মাত্র। প্রসঙ্গত বলা দরকার এই পাদ্রি পথেঘাটে শোনা বাংলা ভাষা এবং বাংলা গানের সুরের প্রশংসা করে গেছেন।

মিসেস হিবার বলতে গেলে স্বামীর সঙ্গে সহমত। একটি আসরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, নাচ মানে হাত, মাথা, শরীর এবং পায়ের আন্দোলন। কিছুটা যেন জোর করে। খুবই ধীর গতিতে চলছে সব। বলতে গেলে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাঁদের মুখের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর কোনও কাহিনী বিবৃত করছেন, কিন্তু আমার পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না। তারপরই তাঁর মন্তব্য—"আই নেভার স পাবলিক ড্যান্সিং ইন ইংল্যান্ড সো ফ্রি ফ্রম এভরিথিং অ্যাপ্রোচিং টু ইনডেসেন্সি।" অবশ্য তিনি মনে করেন, নর্তকীদের পোশাক শালীনতার প্রতীক যেন, মুখ, হাত আর পা ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। ইনিও তারিফ করেছেন বাইজির গানের।

আর এক দর্শক মারিয়া গ্রাহাম। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ১৮১০ সালে। তিনি জানাচ্ছেন দুর্গাপুজো উপলক্ষে মহারাজা রাজকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। (অবশ্য চিঠিতে গ্রাহাম নয়, লিখেছিলেন 'মিসেস গ্রাম'। এবং 'হার' স্থানে 'সি'।) রাজার প্রাসাদ এবং পুজো মণ্ডপ দেখে ভদ্রমহিলা অভিভূত। আতর, গোলাপ জলে অভিষিক্ত করা হল অতিথিদের। হাতে হাতে তুলে দেওয়া হল পুষ্পস্তবক। আনুষ্ঠানিকতার শেষে শুরু হল নাচ। প্রথমে নাচেন একদল ছেলে। কিন্তু পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল মেয়ে। ওঁদের নাচ, গান ও বাদ্য ভদ্রমহিলার ভাল লাগে। গায়করা কাশ্মিরি। তারপর এলেন নর্তকীরা। সন্দেহ নেই তাঁরা সুন্দরী, তাঁদের নাচের ছন্দও মনোরম। কিন্তু ভারতীয় 'নাচ-গার্ল'দের সম্পর্কে এত কথা শুনেছেন যে, সে তুলনায় তাঁকে কিছুটা হতাশ হতে হয়। একটি মেয়ে নাচতে নাচতে মসলিনের টুকরোয় দিব্যি ফুল তৈরি করছিল, এক একটা টুকরোয় এক এক রঙের ফুল। ইত্যাদি। সব মিলিয়ে তাঁর ভালই লেগেছিল। কিন্তু আসরে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টানে কোনও ভেদাভেদ নেই দেখে পরদিন আর যাননি।

মিস এমা রবার্টস (১৮৩৫) তাঁর জার্নালে বাইজিদের সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। এখানে তার পুরো বিবরণ উদ্ধৃত করার সুযোগ নেই। তাঁদের পোশাক এবং অলঙ্কারাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ

বিবরণ দিয়ে তিনি লিখছেন—এখানকার প্রথা মতো যে মেয়েরা দাঁত কালো করে না (অর্থাৎ দাঁতে মিসি দেয় না) এবং যাদের বয়স কম এবং দেখতে সুরূপা তাঁরা চমকপ্রদ, এবং পছন্দ করার মতো। কিন্তু তার জন্য চাই দীর্ঘ এবং লাবণ্যময় অঙ্গসৌষ্ঠব। তাছাড়া এই পোশাক অন্যদের পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেছেন এ দেশীয় দর্শকদের 'ওয়াহ্' 'ওয়াহ্' ধ্বনি শুনে উত্তেজনায় নর্তকী কখনও কখনও নাকি নাচতে নাচতে পোশাক ছিঁড়ে ফেলে। অবশ্য সে-ধরনের আসর সব সময় দেখা যায় না। এ দেশীয় সম্ভ্রান্ত দর্শকদেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। মিস রবার্টস কলকাতার বিখ্যাত গায়িকা ও নর্তকী নিকির প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, নিকিকে বর্ণনা করা হয় হিন্দুস্তানের ক্যাটালনি। অন্য বাইজিদের মানদণ্ড তিনি। তাঁর সঙ্গে তুলনা করেই বিচার করা হয় অন্যদের। অনেক নর্তকীই রীতিমত সম্পন্না। কলকাতার ওই নায়িকার এক রাত্রির নজরানা এক হাজার টাকা (১০০ পাউন্ড)। তিনি আরও শুনেছেন যে আসরে ইউরোপীয় মেয়েরা থাকেন নাচ সেখানে সংযত, সাদামাঠা, এবং রুচিসম্মত। কিন্তু দর্শকরা যখন শুধুই পুরুষ তখন তা সম্পূর্ণ অন্যরকম,—'অ্যাজিউম আ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার।"

১৮১৪ সালে কলকাতায় এসেছিলেন অজ্ঞাতনামা এক পর্যটক। ইনিও বাইজির নাচ দেখেছেন রাজা রাজকৃষ্ণের বাড়িতে। তিনি লিখেছেন, ইউরোপিয়ানরা শুনলে অবাক হবেন পূর্ব পৃথিবীতে এমনই রীতি যে, কোনও সম্ভ্রান্ত এশিয়ান কখনও নিজেরা নাচেন না। তাঁরা মনে করেন সেটা খুবই লজ্জাকর ব্যাপার। যাঁরা নাচেন তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিতে হীন বারবনিতা এবং পুরুষ হলে নিছক ভাঁড়। বারোটি করিন্থিয়ান স্তম্ভের ওপর বিশাল হলঘর। চারদিক রেশমি কাপড়ে মোড়া, মেঝেয় কার্পেট। তারই মধ্যে সম্ভ্রান্ত ইউরোপিয়ান এবং ভারতীয়দের সঙ্গে নাচের আসরে যোগ দেন তিনি। বলেছেন, মেয়েরা মোটে সুন্দরী নন। তাঁরা পারসিক এবং হিন্দুস্তানি গান করেন। একটি জনপ্রিয় নাচ 'ঘুড়ি উড়ানো'। তখন যে ভঙ্গি সেটা ঠিক শালীনতার পর্যায়ে পড়ে না। যা হোক, ইনিও প্রবাদপ্রতিম নিকির নাচ এবং গানের একজন দর্শক ও শ্রোতা। নিকি সুন্দরী, গায়িকা হিসাবেও সেরা। সঙ্গে ছিল আশরুন। মনোহারিণী নিকিই তাঁকে আকর্ষণ করে বেশি। তাঁর মতে নিকির বয়স হবে চৌদ্দ। লাবণ্যে ভরা তাঁর মুখ এবং অঙ্গের গঠন। তাঁর গভীর তীক্ষ্ণ কালো চোখে তাঁর হৃদয় ও মনের আনন্দ প্রতিফলিত। তাঁর মুখে স্মিত হাস্য লেগেই ছিল। তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ নিকির সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরেরও। একই সঙ্গে এ কথাও বলতে ভোলেননি যে, যদিও এই আসরে যোগ দিয়ে তিনি অভিভূত, তবু তিনি মনে করেন সত্যকারের ভাল নাচ এবং গান উপভোগ করা সম্ভব একমাত্র উত্তর ভারতেই। নিকি সম্পর্কে আরও কিছু খবর দিয়েছেন এই অনামা বিদেশি। বলেছেন, পর পর তিন রাত্রি অনুষ্ঠান করার জন্য এই নর্তকী পেয়ে থাকেন বারোশো টাকা এবং সমমূল্যের এক জোড়া শাল।

লর্ড মিন্টোর কালে কলকাতায় এসেছিলেন লেডি মারিয়া ন্যুজেন্ট। তাঁর জার্নালের কালসীমা ১৮১১ থেকে ১৮১৫ সাল। ১৮১২ সালে তিনি কলকাতার চিৎপুরের নবাবের বাড়িতে নাচ দেখেছিলেন। সেই আসরেও হাজির ছিলেন নিকি। লেডি নুজেন্ট লিখেছেন—বাইজিদের গান তাঁর ভাল লেগেছে। কিন্তু নাচ, তাঁর কথায়—একে যদি নাচ বলা যায়। নতুন ঠেকেছে তাঁর কাছে পা নয়, হাত আর আঙুলের ভঙ্গিমা। পা দিয়ে ওঁরা তাল রাখেন। অবশ্য খুব ধীর লয়ে। বড় জোর এক গজ এলাকার মধ্যে চলে সব। তবে তিনি যাঁকে বলা হয় কলকাতার 'ক্যাটালনি', সেই নিকির গান শুনেছেন। ভাল লেগেছে। তবে তিনি মনে করেন নিকি তাঁর সত্যকারের নাম নয়। বাইজিদের পোশাকও নজর করেছেন। সোনালি রুপালি পোশাক বটে, কিন্তু তাতে শরীরের গঠন ঢাকা পড়ে যায়।

সেদিন সবচেয়ে মনোহারি অলঙ্কার পরেছিলেন নিকি। মণিমুক্তো খচিত গহনা। নর্তকীদের রূপের বর্ণনাও দিয়েছেন তিনি। চোখে কাজল, ঠোঁট, দাঁত রক্তিম, সিঁথি করা চুল মাথার পিছনে বেণীবদ্ধ।

লেডি ন্যুজেন্ট যেমন বাইজিদের নাচ দেখে বা গান শুনে উচ্ছ্বসিত নন, তেমনই সমালোচনায় রূঢ়ও নন।

উচ্ছ্বসিত বলা চলে বরং উনিশ শতকের কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী মিসেস বেলনস। তাঁর সুখ্যাত অ্যালবাম "টুয়েনটি ফোর প্লেটস ইলাসট্রেটিভ অব হিন্দু অ্যান্ড ইউরোপিয়ান ম্যানারস ইন বেঙ্গল" প্রকাশিত হয় ১৮৩২ সালে। বইটিতে বাইজিদের আসরের একাধিক এবং তিনজন সুন্দরী বাইজির একটি অপূর্ব ছবি রয়েছে। দূর বিদেশে বেডফোর্ড স্কোয়ারে বসে বইটি উপহার পেয়ে রামমোহন রায় শিল্পীকে লিখেছিলেন—ছবি দেখে এবং তার বিবরণ পড়ে তিনি আনন্দিত। এ সব চিত্র বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। ছবিগুলো এতই বাস্তব যে, স্মৃতিতে তাঁর দুঃখী দেশের নানা বাস্তব দৃশ্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নর্তকীদের ছবি দেখে রাজার কি নিজের বাড়িতে এবং অন্যত্র দেখা নাচের আসরগুলোর কথা মনে পড়েনি?

যা হোক, মিসেস বেলনস-এর নাচের ছবিগুলোর পরিচয়লিপিগুলো পড়ার মতো। একটি ছবিতে একটি আসরের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তিনি। জাঁকাল প্রাসাদ, চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাই, বাহারি আয়না, দেওয়ালগিরি, পিতলের মোমদানি—কিছুই বাদ পড়েনি তাঁর বিবরণে। সোফা, চেয়ার, কার্পেট সব দেখেছেন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, শিল্পীর চোখ দিয়ে। নর্তকীরা তো বটেই, আসরের দেশি-বিদেশি দর্শক শ্রোতারাও তাঁর নজর কেড়ে নেয়। আতর, গোলাপ এবং চন্দনের গন্ধে আমোদিত আসর। নর্তকীদের ঝকমকে পোশাক, তাঁদের ছন্দোময় ভঙ্গি,—সব মিলিয়েই তাঁর কাছে সে আসর ছিল রীতিমতো উপভোগ্য। মিসেস বেলনস লিখেছেন—নবাগত কেউ অভিভূত না হয়ে পারবেন না। তিনি কল্পনা করবেন যেন চলে গেছেন কোনও জাদুপুরীতে। সমস্ত দৃশ্যটাই তাঁর কাছে মনে হবে পরিদের দেখার মতো।

মিসেস বেলনস-এর মতো বাইজির নাচের আর এক অনুরাগী মিসেস এলউড। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হয় ১৮৩০ সালে। নাচকে যাঁরা ক্লান্তিকর একঘেয়েমি বলে মনে করেন তিনি তাঁদের সঙ্গে একমত নন। তিনি মনে করেন নাচ শুধু অভিনব নয়, পুরোপুরি প্রাচ্যদেশীয়। আহা, সার গুয়ান্টার স্কটের মতো বর্ণনার ক্ষমতা যদি তাঁর থাকত, তা হলে তিনি হয়তো এই লাবণ্যময় প্রমোদের একটা ধারণা পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করতে পারতেন। তাঁর মতে, এটা বিস্ময়কর যে, ইংরেজি মঞ্চ পরিচালকরা কখনও নচ-গার্লদের সে দেশে নিয়ে যায়নি।

সার চার্লস ডয়লি উনিশ শতকের বিখ্যাত চিত্রকর ও লেখক। ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির বাংলা বিভাগে তিনি ছিলেন ১৭৯৬ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত। ১৮২৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'টম রো, দ্য গ্রিফিন' ব্যঙ্গ কবিতায় তিনি নাচের আসরের সুন্দর এক বিবরণ দিয়েছেন। ডয়লি প্রথম নাচ দেখেন শোভাবাজারে 'নব-কিসেন' বা নবকৃষ্ণের বাড়িতে। বাইজির নাচের তিনি এক সুরসিক সমঝদার। লিখেছেন,—

> "See! how invitingly they creatures dance!
> What elegance and ease in every motion!
> Not as the ladies do at home, or France,
> So turbulent and full of strange commotion;
> Of this our Indian fair have an odd notion;
> Their step is slow and measured—not a caper
> That lift them from the ground,—but great devotion
> To time, and suppleness of figure's taper
> It no doubt the modestest —at least on paper!

Or how describe the graceful play of arms,
Which beautifully waving, as they move,
Reveals, at every step, a thousand charms;
Expressing terror, languishment, or love
With their dark, speaking eyes, unceasing rore."... ...

ডয়লি বাইজির নাচ তো বটেই, সুন্দর পোশাক, গহনা সব কিছুই ছন্দে বিবৃত করেছেন। তিনি নিকির গানও শুনেছেন:

"But hark, at Nickie's voice—such, one never hears
From Squalling nautchness, straning their shrill throats
In naural warblings, how it great our ears,
And brilliant gingling of delicious notes,
Like nightingles that the forest floats..."

নিকি! নিকি! নিকি! উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক কলকাতা যেন নিকির করতলগত।

শুধু কলকাতায় নয়, উনিশ শতক জুড়ে গোটা ভারতই যেন এক উন্মত্ত উদ্দাম জলসাঘর। শহরে শহরে মাইফেল। উদ্যোক্তা কখনও দেশীয় রাজন্যবর্গ, কখনও অন্য সামন্তপ্রভু বা ধনাঢ্যরা। কখনও বা সাহেবরা নিজেরাই।

দিল্লিসহ উত্তর ভারতের নানা জায়গায় বাইজির নাচ দেখেছেন ক্যাপ্টেন মান্ডি। তাঁর "পেন অ্যান্ড পেন্সিল স্কেচেস" প্রকাশিত হয় ১৮৩২ সালে। লুধিয়ানায় ইংরেজ বাহাদুরের প্রধান সেনাপতির সম্মানে আয়োজিত এক নাচসভা দেখেছেন ক্যাপ্টেন মান্ডি। স্থানীয় ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট আয়োজিত সে সভায় নেচেছিলেন ছেচল্লিশজন নর্তকী। দিল্লিতে একই সেনাপতিকে অভ্যর্থনা জানাতে যে কিন্নরীর আসর আয়োজিত হয়েছিল তাতে নেচেছিলেন একশো জন। নাচ অতএব শুধু ভারতীয় অতিথি আপ্যায়নের মাঙ্গলিক ছিল না, ইংরেজরা নিজেরাও কখনও কখনও রাজা-রাজরাদের মতো আয়োজন করতেন ইন্দ্রসভা। অপ্সরীদের আহ্বান করে জমিয়ে তুলতেন সে সব আসর। এ-রীতি ইংরেজ বাহিনীতে চালু ছিল অষ্টাদশ শতকেও। মেজর ম্যাকনিল নামে একজন সামরিক অফিসার ১৭৮৩ সালে লিখেছেন আর্কটে তাঁর বাহিনীর সৈন্যরা তাঁকে স্বাগত জানান নাচ-সহযোগে। তাঁরা তাঁর পালকি ঘিরে নাচতে নাচতে তাঁকে পৌঁছে দেন তাঁর বন্ধুর বাড়িতে। বস্তুত সৈন্যবাহিনীতে নাচ এত জনপ্রিয় ছিল যে অনেক নর্তকী শহর ছেড়ে আস্তানা গাড়তেন ছাউনির আশেপাশে। ১৮১৩ সালে ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন লিখেছেন ১৭৭৮ থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে অনেক নর্তকী ক্যান্টনমেন্টে ঠিকানা করে নেয়। বাহিনীর সৈন্যরা তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন। নিঃসঙ্গ সৈনিকেরা একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তাঁদের নিজেদের ঘরে নিয়ে আসতেন। কখনও কখনও অন্যরাও যোগ দিত সে সব আসরে। কোনও কোনও গোরা সৈন্য তাঁদের কাছে গান শিখে নিজেরাও গাইবার চেষ্টা করতেন। সৈন্যরা বাইজিদের বলতেন 'নাচনি'। একা একা নাচ উপভোগ করাকে ছাউনিতে বলা হত—"নাচিং অ্যালোন।" ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন খানুম (Kannum) নামে একজন নর্তকীর কথা বলেছেন—নবীন প্রবীণ ভেদাভেদ নেই, তাঁর জন্য একটি আস্ত বাহিনী পাগল। বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেন সুন্দরী খানুম।

যা হোক, ক্যাপ্টেন মান্ডি বাইজির নাচ নিয়ে অনেক কথাই লিখেছেন। বাইজির নাচের এমন অনুপুঙ্খ বিবরণ সচরাচর এ দেশের রসিকদের কলমে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তার এক কারণ এই নাচ পরদেশির কাছে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। ফলে কৌতূহলও বেশি। সন্দেহ নেই ক্যাপ্টেন মান্ডির

দেখবার চোখ ছিল এবং ছবি লিখবার মতো কলম। আম্বালায় এক আসরে নাচ দেখেছেন তিনি হিন্দুস্তানি গানের সুর আর নর্তকীর দেহছন্দে ভাসতে ভাসতে। মুখে তাঁর গড়গড়ার নল, হাতে ক্ল্যারেট বা লাল-সরাবের গ্লাস। তবু সজাগ তাঁর দৃষ্টি। বোঝা যায়, নাচ তিনি উপভোগ করেছেন। সেই সঙ্গে বাইজিদের রূপও। 'ঘুরি-উড়ানো' নাচ দেখতে দেখতে তিনি মন্তব্য করেছেন, এই নাচে যে নৈপুণ্য ও লাবণ্য ভারতীয়রা তা খুবই পছন্দ করেন। তিনিও অপছন্দ করেছেন বলে মনে হয় না। কারণ লিখেছেন, ওঁরা যখন আকাশের দিকে চোখ মেলে হাত তুলে নাচ দেখায় তখন, আমাদের দেশের মেয়েরাও জানেন, তাঁদের দৈহিক লাবণ্য কেমনভাবে প্রকাশ পায়। ক্যাপ্টেন মান্ডি ভারতীয় বাইজিদের পোশাকে কোনও অশালীনতা খুঁজে পাননি। লিখেছেন, ওঁদের পোশাক ফরাসি এবং ইতালিয়ান সুন্দরীদের তুলনায় অনেক বেশি রুচিসম্মত। কিন্তু উত্তমাঙ্গের পোশাক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লক্ষণীয়। লিখেছেন: "দ্য আপার পোরসান অব দ্য কস্টিউম, হাউএভার, আই অ্যাম বাউন্ড টু সে, ইজ নট অলওয়েজ কুয়াইট ইমপারভিয়াস টু সাইট অ্যাজ এ বডিজ অব মোর ওপেক টেক্সচার দ্যান মসলিন মাইট রেন্ডার ইট।" অর্থাৎ, বডিস বা বুকের জামা চোখে অনেক সময় অভেদ্য নয়, যেমন হতে পারত মসলিনের বদলে অস্বচ্ছ কোনও কাপড় ব্যবহার করলে। বাইজির দেহসৌষ্ঠব কেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন এই পরদেশির মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট। উল্লেখ্য, প্রান নেভিল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি জন গ্রোস নামে এক সাহেবের বাইজি-বৃত্তান্তের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন বাইজিরা তাঁদের স্তনের গঠন অবিকৃত না করার জন্য হালকা কাঠের 'কাপ' বা একই আকারের এক ধরনের বন্ধনী ব্যবহার করেন। ফিতে দিয়ে তা পিঠের সঙ্গে বাঁধা থাকে। তার উপর ওঁরা চাপিয়ে থাকেন মণিমুক্তো খচিত রুপো কিংবা সোনার চোলি। এই সাহেব প্রসঙ্গত আরও একটি খবর দিয়েছেন। বলেছেন, শুধু কাজল ব্যবহার নয়, চোখকে আরও আয়ত করার জন্য শৈশবে তার একদিক কেটে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে চোখের হাস্যলাস্য এবং কটাক্ষ আরও খেলাবার সুযোগ মেলে।

প্রান নেভিল ক্যাপ্টেন রবার্ট স্মিথ নামে একজন দর্শকের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করেছেন। স্মিথ নাচ দেখেছেন দিল্লিতে। তবে সবচেয়ে ভাল আসরের অভিজ্ঞতা তাঁর মিঃ জি নামে একজনের বাড়িতে। ওই বিদেশি বিয়ে করেছেন এ দেশের মেয়ে। স্মিথ বিখ্যাতদের তো বটেই অতি সাধারণ বাইজিদের প্রশংসায়ও মুখর। তাঁদের পোশাক তাঁর মতে সুরুচিসম্মত, তাঁদের ভঙ্গি সহজ সরল, এবং নাচের ছন্দ লাবণ্যময়।

তাঁর অকপট মন্তব্য: দিল্লিতে ওই আসরে যা দেখেছি তার মতো কখনও দেখিনি।

দিল্লিতে কলকাতার নিকির সমসাময়িক এক জনপ্রিয় বাইজি ছিলেন আলফিনা। ক্যাপ্টেন মান্ডি তাঁর গান শুনে উচ্ছ্বসিত। এদেশের ইংরেজ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লর্ড কম্বারমেয়ার। লেফটেনান্ট টমাস ব্রেস নামে এক দর্শক লিখেছেন—আলফিনা 'ক্যাটালনি অব দ্য ইস্ট।' এই খ্যাতি কিছু সংরক্ষিত ছিল কলকাতার নিকির জন্য। যাক সে কথা। আলফিনা যেমন রূপসী, তেমনই গুণবতী। তাঁর গহনা এবং পোশাকের দাম ছিল নাকি চল্লিশ হাজার টাকা। হিরা পান্না নাকি তাঁর নথে। দিল্লির অনেক খানদানি মানুষ তাঁর সৌজন্যে সেদিন ফকির।

দিল্লিতে সাহেবদের নজর কেড়ে নিয়েছিল আর এক নর্তকী—পান্না। তাঁর নরম মিষ্টি গলায় পার্শিয়ান গান ছিন মন মাতানো। লেফটেনেন্ট বেকন বলেন—পান্না দেখতে ছোটখাটো। কিন্তু অপূর্ব তাঁর দেহ সৌষ্ঠব। ছোট ছোট হাত, ছোট ছোট পা। শরীরের গড়ন যেন কোনও ভাস্করের সৃষ্টি। তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল সুন্দর মুখমণ্ডলে আয়ত দুটি চোখ, মুখময় ছড়িয়ে পড়া মৃদু হাসি। চালচলনেও পান্না অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক।

দিল্লির চেয়েও বেশি জমজমাট বুঝিবা লক্ষ্ণৌ। নাসিরউদ্দিন হায়দারের আমল (১৮২৭-১৮৩৭)

আমরা দেখি বিদেশি গণ্যমান্যরা আপ্যায়িত হচ্ছে নর্তকীর নাচ আর গানে। সম্ভবত নাসিরউদ্দিনের দরবারেই নাচ দেখেছিলেন লর্ড ও লেডি বেন্টিঙ্ক। তার আগে পরেও লক্ষ্ণৌর জলসাঘর বাইজির নূপুর নিক্কনে ঝংকৃত। আসরের সৌকর্য চরমে পৌঁছায় ওয়াজিদ আলি শাহর আমলে। তাঁর পরিখানা আজও প্রবাস। ভাগ্যান্বেষী যে সব বিদেশি নবাবি আমলের লক্ষ্ণৌয়ে আস্তানা গেড়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশেরই ছিল নাচের নেশা। তাঁদের কেউ কেউ এদেশি বিবি নিয়ে সানন্দে ঘর করেছেন, চরম বিলাসিতার মধ্যে সুখে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেছেন। মার্টিন, পলিয়ার এবং আরও অনেকের ঘরেই সেদিন নিয়মিত বসত নাচের আসর। ওদিকে মেরঠের কাছে সারদানায় বেগম সমরুর প্রাসাদে, খাসগঞ্জে কর্নেল জেমস স্কিনার-এর আস্তানায়, আর এক অভিযাত্রী এডোয়ার্ড গার্ডনার-এর ঘরে, নর্তকীর নাচ হল অন্যতম আমোদ। কর্নেল জেমস স্কিনারকে বলা হত—'সিকেন্দর সাহিব'। আর এক রসিক সার ডেভিড অক্টরলনি ছিলেন—"লুনি আখতার!" প্রসঙ্গত, শিল্পী, অভিযাত্রী, প্রশাসক এবং ব্যবসায়ী উইলিয়াম ফ্রেজারের কথাও উল্লেখযোগ্য। ম্যাটকাফ-এর সময় তিনি ছিলেন রেসিডেন্ট চার্লস সিটন-এর সহকারী। দিল্লির কাছেই রানিয়া নামে একটি গ্রামের মেয়ে অম্বিবান ছিলেন তাঁর বিবি। সমসাময়িক অন্যান্য বিদেশিদের মতো উইলিয়াম ফ্রেজারও (১৭৮৫-১৮৩৫) ছিলেন নাচ এবং নর্তকীদের অনুরক্ত। নিজে তিনি শিল্পী ছিলেন। তাঁর কলকাতা ও হিমালয়ের চিত্রমালা এখনও দর্শকদের আপ্লুত করে। ভারতীয় শিল্পীদের দিয়েও এদেশের জনজীবনের অনেক ছবি আঁকিয়েছিলেন। একজন শিল্পীর নাম লালজি। তাঁর সংগ্রহে যে সব নর্তকীর ছবি পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অপূর্ব সুন্দরী মালাগুরি, আমির বক্স, কাদের, পিয়ারি প্রমুখ। কিছুকাল আগে (১৮৮৯) সালে তাঁদের ছবি সহ এডোয়ার্ড ফ্রেজার এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের ভারত-অভিজ্ঞতার কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। (দ্য প্যাশোনেট কোয়েস্ট, দ্য ফ্রেজার ব্রাদার্স ইন ইন্ডিয়া, মিলড্রেড আর্চার।) সমসাময়িক অন্য অভিযাত্রীদের সম্পর্কেও রয়েছে বেশ কিছু বই। বেগম সমরু একালের গবেষকদের কাছেও এক কৌতূহলের বিষয়। সাম্প্রতিককালে অন্তত দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁকে নিয়ে (ডার্ক লিগেসি, দ্য ফরচুনস অব বেগম সমরু, নিকোলাস শারিভ, লন্ডন, ১৯৯৬; বেগম সমরু, ফেডিং পোর্ট্রেট ইন আ গিল্ডেড ফ্রেম, জন লাল, দিল্লি ১৯৯৭) বলা হয়, বেগম সমরু নিজেও প্রথম জীবনে ছিলেন নর্তকী। আরও কিছু কিছু বাইজির মতো তিনিও উন্নীত হয়েছেন বেগমের আসনে। এখানে সেসব কাহিনী অপ্রাসঙ্গিক। আমরা বরং বাইজির বর্ণাঢ্য আসরে ঢুলঢুলে বিদেশিদেরই আরও একবার দেখে নিই।

জমজমাটি নাচের আর এক আসর ছিল লাহোর। রণজিৎ সিং নর্তকী বিলাসী ছিলেন। তাঁর ছিল নিজস্ব দেড়শো সুন্দরীর দল। পঞ্জাব ছাড়াও কাশ্মীর, এমনকী পারস্য থেকেও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের। একবার একজন সাহেব তাঁর দরবারে নাচ দেখে দু'জন নর্তকীর বিশেষ করে তারিফ করেছিলেন। রণজিৎ বলেন,—ঠিক আছে, সন্ধ্যায় দু'জনকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। একজনকে উপহার দিলাম তোমাকে। ডব্লিউ জি ওসবর্ন লিখেছেন, লাহোরের দরবারে বন্দিত যে নর্তকী নাম তাঁর—'লোটাস'। (সম্ভবত পদ্ম, বা অন্য কোনও ভারতীয় নাম) তাঁকে কাশ্মীর থেকে উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন রণজিৎ। লোটাস সাহেবকে বলেছিলেন—রণজিৎ নানা সময়ে তাঁর নাচে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সাতটি গ্রাম দান করেছিলেন।

১৮৩১ সালে দিল্লিতে মশালের আলোয় নাচ দেখেছিলেন লেফটেন্যান্ট টমাস বেকন। একজন হিন্দু রাজা সে নৃত্যসভার আয়োজন করেছিলেন। সুসজ্জিত নর্তকীরা নাচছেন, মশালের আলো তাঁদের মুখ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে নীচের দিকে, নর্তকীর মনোহারিত্ব ফুটে উঠছে আলোয়।

নাচ কি এক রকম? সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ রকমারি। কত না বৈচিত্র্য সেদিন বাইজি-বিলাসে। অবশ্য তা সত্ত্বেও সমালোচকের অভাব ছিল না। বিশেষত মেমসাহেবরা। কেউ

বলছেন, এমন ক্লান্তিকর একঘেয়ে ব্যাপার যে, ঘুম পায়। কারও মন্তব্য, একবার দেখলেই শখ মিটে যায়। কেউ হয়তো আবার—আহা, একেই বুঝি বলে পোয়েট্রি অব...! এমনকী পুরুষরা সবাই সমান রসিক ছিলেন, একথা বলা যাবে না। একজন তো নর্তকীর পোশাক দেখে বলেছেন—যেন মিশরিয় মমি! তা সত্ত্বেও আগ্রহীর যেমন অভাব ছিল না, তেমনই অভাব ছিল না অনুরাগীর।

দিল্লিতে মশালের আলোয় নাচের কথা বলা হয়েছে। তার বেশ কিছুকাল পরে (১৮৬০) কাশ্মীরে শালিমার উদ্যানে চাঁদের আলোয় নাচ দেখেছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল টোরেন। সেখানে এক নাচসভা দেখে তাঁর মন্তব্য—বেহেস্ত থেকে পরিরা যেন নেমে এসেছে মর্তে। এ যেন কল্পনা নয়, বাস্তব।

ভারতীয় নর্তকীদের আর একটি বিশিষ্ট অনুরাগী বলা যায় লর্ড অকল্যান্ডের বোন এমিলি ইডেনকে। ১৮৩৭ সালে বেনারসে এক নৃত্যসভা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: একটি মেয়ে অপরূপা। এমন লাবণ্যময়ী কম দেখা যায়। যদি সময় পাই তাহলে ওঁর পোশাকটি দেখাবার জন্য একটি রঙিন স্কেচ পাঠাব। ওই মেয়েটি এবং আর একটি মেয়ে ধীর লয়ে আধঘণ্টা ধরে নাচলেন। নাচের সময় তাঁদের ঘিরে উড়ছিল তাঁদের পোশাক। নাচতে নাচতে রঙিন স্কার্ফ দিয়ে তাঁরা ফুল তৈরি করছিলেন। তৈরি শেষ হয়ে গেলে এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে আমাদের উপহার দিলেন।

অন্য এক আসরে। বাইজিরা সাধারণত মজলিশে বিশেষ একজনকে লক্ষ করে তাঁদের নাচগান পেশ করেন। সেদিন একজন নর্তকী স্বভাবতই তাক করেছিলেন গভর্নর জেনারেল স্বয়ং লর্ড অকল্যান্ডকে। এমিলি দেখেন মোটাসোটা একটি মেয়ে তাঁকে লক্ষ করে একটি গান নিবেদন করে চলেছে। অকল্যান্ড জানতে চাইলেন গানটির বক্তব্য কী। তাঁকে বলা হল নর্তকী মেয়েটি বলছেন—আমি দেহ, তুমি আত্মা; এখানে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি, কিন্তু কেউ যেন একথা বলতে না পারে পরেও আমরা বিচ্ছিন্ন থাকব। আমার বাবা আমাকে ত্যাগ করেছেন, আমার মা বেঁচে নেই, আমার কোনও বন্ধু নেই। আমার কবর হা করে আছে, সেদিকে একবার তাকাও।—তুমি কি আমার জন্য চিন্তা করো? গানের মর্ম শুনে অবিবাহিত গভর্নর জেনারেলের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা অবশ্য জানার উপায় নেই। এমিলি ইডেন নীরব। কে জানে, এই বিষাদ সঙ্গীত হয়তো তাঁকেও স্পর্শ করেছিল।

অনেক, নবীন প্রবীণ নিঃসঙ্গ পরদেশি 'রাজ'-এর সেবায়েত নিশ্চয় এ-ধরনের গানে বিচলিত হতেন। রঙিন গানে আনন্দিত, উত্তেজিত। আসর সাধারণত মিশ্র ছিল। নারী পুরুষ দু'দলই যোগ দিতে পারতেন তাতে। তবে মেমসাহেবদের দেখলে নর্তকীরা নাকি সংযত হয়ে যেতেন। একজন বিদেশি লিখেছেন মেয়েরা আসবেন জানা থাকলে উদ্যোক্তা পুরুষেরা আগেই নর্তকীদের হুসিয়ার করে দিতেন। নিছক পুরুষালি ব্যাপার হলে নাচঘর নাকি একসময় উদ্দাম হয়ে উঠত। 'উয়াহ্' 'উয়াহ' ধ্বনি উঠত। 'প্যালা' পড়ত পুষ্পবৃষ্টির মতো। 'প্যালা' শব্দটির আদি নাকি 'পেয়ালা', তার অর্থ এক পেয়ালা সুরার দাম হিসাবে দেয় নজরানা।

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—সর্বত্রই বৃত্তান্ত এক। সাহেব-মেমরা কেউ নর্তকীর তারিফ করেন, কেউ বা উদাসীন সমালোচক। কিন্তু বাইজিরা তবু চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেন তাঁদের। কারও সাধ্য নেই নাচনি, বা তরফাওয়ালিদের পাশ কাটিয়ে চলে যান। কেনই বা তা যাবেন? অন্তত সার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন তাতে সম্মত নন। বস্তুত বাইজিদের এমন অনুরাগী খুব কমই দেখা যায়। বার্টন বিশেষ করে প্রশংসা মুখর সিন্ধুর নর্তকীদের সম্পর্কে। সেটা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। অপছন্দ থেকে ধীরে ধীরে কী করে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের ভক্ত হয়ে ওঠেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন বার্টন। প্রকৃত সমঝদারের মতো বর্ণনা করেছেন একাধিক নাচের আসর। একটি আসরের নায়িকা ছিলেন মহতাব, বার্টন বলেন চাঁদের আলো। যে ভাবে তিনি এই 'লারকানার সেরা নর্তকী'র

রূপ বর্ণনা করেছেন তার কাছে বুঝি বা সংস্কৃত ভাষার কবিদের কলমে নায়িকার রূপ বর্ণনাও ম্লান। মহতাবের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিত্র তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে।

মুখের শ্রী ও লাবণ্যের পর ধীরে ধীরে গ্রীবা, কাঁধ, বুক হয়ে নেমে এসেছেন নীচের দিকে। সবই বলছেন তিনি মিঃ বুল নামে একজন নবাগত সাহেবকে সামনে রেখে। নাচসভার সেই কাব্যময় বৃত্তান্ত পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে তাঁর 'সিন্ধ, অর দি আনহ্যাপি ভ্যালি'র (২য় খণ্ড, লন্ডন ১৮৫১) পাতা উল্টানো দরকার। এমন বিবরণ কদাচিৎ মেলে।

অসংখ্য ডাইরি, ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতিকথা। অগণিত বিবরণ। তা ছাড়া বিপুল সংখ্যক ছবি। কত বিদেশি চিত্রকরই না এঁকেছেন ভারতীয় নর্তকীদের। এঁকেছেন স্বদেশের চিত্রকরেরাও। মন্দির স্থাপত্যে গন্ধর্ব, কন্নর, অপ্সরা এবং মায়াবী সুরসুন্দরীদের যে প্রতিমা দেখি, তাঁদেরই মতো কত না ভঙ্গি ওঁদের। প্রান নেভিলের উল্লেখিত বইটিতে তার বেশ কিছু নমুনা আছে। অনুমান করতে অসুবিধা নেই, তার বাইরেও রয়েছেন পরবর্তীকালের এই অপ্সরারাও, স্বদেশের সব মানুষের চোখেও যাঁরা যথেষ্ট মর্যাদা পাননি। সুতরাং, বিদেশি সাহেব-বিবিরা যদি কেউ কেউ বাঁকা চোখে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে থাকেন তবে বলার আর কী আছে। সকলের সব মতামত এখানে উল্লেখ করার সুযোগ নেই। প্রয়োজনও বোধহয় নেই। সমগ্রভাবে একটা সংক্ষিপ্ত খতিয়ান পেশ করা হল মাত্র। তা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আঠারো এবং উনিশ শতকে ভারতীয় নর্তকী তথা, বাইজিরাই ছিলেন পরদেশি শাসককুলের কাছে—'রাজ-নর্তকী'। গভর্নর জেনারেল, প্রধান সেনাপতি থেকে শুরু করে সাধারণ সরকারি-বেসরকারি কর্মী, ফৌজি, শ্রেষ্ঠী—কেউ অনুপস্থিত ছিলেন না আসরে। এমনকী প্রিন্স অব ওয়েলসকেও আপ্যায়ন করা হয়েছে বাইজির নাচে।

কেন তাঁরা সেদিন এমন আকর্ষণীয়? কেনই অপ্রতিরোধ্য তাঁদের ঘুঙুরের বোল? এ-সম্পর্কে এখানে অন্তত কিছু পরিমাণে হলেও আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পার্সিভ্যাল স্পিয়ার সার জন শোরকে সাক্ষী রেখে মন্তব্য করেছেন, ১৭৭৫ সাল নাগাদ সাহেব মেমদের নিজেদের মধ্যে নাচ চালু হয়ে যায়। (শোর ভারতে আসেন ১৭৬৯ সালে)। কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব নাচঘর হারমনিক হল ১৭৮০ সালে। বিলাত থেকে যথেষ্টসংখ্যক ইংরেজ মহিলা এদেশে পৌঁছবার পর সাহেব মেমদের যৌথ নৃত্য চালু হয়ে যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভারতীয়দের নাচের প্রতি আকর্ষণ পুরোপুরি কেটে যায়। স্পিয়ারের মতে, এদেশের ইংরেজদের নাচ উপভোগ করার মতো একটি দৃশ্য। এখানে নাচ দেখা অনেকটা মিশরে ব্যালে দেখতে যাওয়ার মতো ব্যাপার। পার্থক্য এই, ভারতে নর্তকীরা নাচ দেখায় কোনও বারোয়ারি নাচঘরে নয়, উদ্যোক্তাদের ঘরে এসে। তাঁর শিকার করা যেমন একটা ব্যসন, ইংরেজদের কাছে নাচ দেখাও তা-ই। শিয়ারের মতো অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, ১৭৯৪ সালেও দেখা যায় কোনও ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার এদেশে পদার্পণের পর বন্ধুরা তাঁদের প্রীত্যর্থে নাচের আয়োজন করছেন। অবশ্য ক্রমে সে-রীতি পাল্টে যায়, নাচ ইংরেজদের কাছে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। স্পিয়ার মনে করেন এই নিরাসক্তির পিছনে ছিল এক ধরনের অপরাধবোধ, নাচ উপভোগ করার অক্ষমতা, একঘেয়েমিবশত ক্লান্তি এবং শেষ পর্যন্ত বিতৃষ্ণা। তিনি স্বীকার করেন, সিভিলিয়ানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারালেও নাচ সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর সাহেবদের আগ্রহ অনেক দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। অনেকদিন বলতে পার্সিভ্যাল স্পিয়ার কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দু-তিন দশকের এদিকে আর এগোননি। অথচ আমরা দেখেছি, শতকের মাঝামাঝিতেও ফিরিঙ্গিটোলায় রয়েছেন অনেক নাচভক্ত।

হান্টার লিখেছিলেন, সাহেব-মেমদের নাচ দেখে এ দেশের গ্রামের লোকেরা অবাক। তাঁরা ভেবে পান না, দেশে এত নাচনেওয়ালি থাকতে ওঁরা নিজেরা কেন নাচছেন। অন্য এক সাহেব কথা প্রসঙ্গে

লিখেছেন—একজন বাইজি জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে সাহেব-মেমদের নাচ দেখার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—কেমন দেখলে। তাঁর উত্তর,—ভালই। তবে ওঁরা থেকে থেকেই বড্ড লাফিয়ে ওঠেন। সে-কারণেই কি সুযোগ পেলেই সাহেবরা হানা দেন বাইজির আসরে?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তাকাতে হবে ঔপনিবেশিক আমলের আদি পর্বে। মানদণ্ড অথবা রাজদণ্ড যা-ই হোক না কেন, তখন সবই পুরুষালি ব্যাপার। অভিযাত্রীদের উদ্যোগে কোনও ভূমিকা ছিল না স্বদেশের মেয়েদের। ভারতের উদ্দেশে প্রথম দু'জন ইংরেজ মহিলা জাহাজে ওঠেন ১৬১৬ সালে। সঙ্গে একজন পরিচারিকা। পথে সে বেচারা কিছুটা শারীরিক অসুবিধায় পড়ে। ফলে বাধ্য হয়েই গাছতলায় একজনকে বিয়ে করতে হয়। একজন মন্তব্য করেছেন—সেই গাছটি অবশ্য আপেল গাছ ছিল না। অন্যরাও রকমারি সমস্যায়। পরের অভিযাত্রী (১৬৫২) সে সমস্যা মিটিয়ে নেন ক্যাপ্টেনকে বিয়ে করে। পরিস্থিতি দেখে ১৬৯২ সালে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেন, সৈন্যদের ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করতে উৎসাহ দাও। কারণ, দেশে সাধারণ মেয়ে পাওয়া ভার। ভদ্রঘরের মেয়েরা অবশ্য যেতে রাজি, কিন্তু তাঁদের পথখরচা জোগাবে কে? সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে একজন দেশ থেকে মেয়ে পাঠাবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাজি হলেন। যাঁরা এলেন তাঁদের দুর্দশার একশেষ। যদিও বিয়ে না হলে প্রথম বছর তাঁরা কোম্পানির কাছ থেকে খোরপোশ পেতেন, দ্বিতীয় বছর খাওয়া-খরচা। সে খবর রটে যাওয়ার পর দ্বিতীয় একদল ভারত-অভিযানের জন্য তৈরি হল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বেকার-ভাতা জুগিয়ে যেতে নারাজ। ফলে আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত রফা হল বটে কিন্তু যাঁরা এলেন তাঁরা সবাই স্বামী ধরতে পারলেন কই! এ দিকে ৬/৮ প্যাগোডায় (এক প্যাগোডা তখন ৮ শিলিং) প্রাণ ধারণ কেমন করে সম্ভব। সুতরাং, চরিত্র বলতে যৎসামান্য যা অবশিষ্ট ছিল তাও খোয়াতে হল। ইতিকথা লেখকের ভাষায়,—"দ্য স্মল স্টক অব ভার্চ্যু ব্রট আউট উইথ দেম দে ওয়ার ড্রিভেন টু সেল!" কোথায় স্বদেশের মেয়েরা? ১৭৯০ সাল নাগাদও শুনি কলকাতায় সাহেব যদি চার হাজার, নানা বয়সের মেম তবে মোটে আড়াইশো। সুতরাং, যা হওয়ার তা-ই হল। কালো-বিবিরা আলো করতে লাগলেন গোরাদের ঘর। রসিক পরদেশি তখন রাখঢাক না রেখেই আওড়ে যান কালের জীবন সংগীত—"উই আর সিওর টু ফাইন্ড সামথিং ব্লিসফুল অ্যান্ড ডিয়ার/অ্যান্ড দ্যাট উই আর ফার ফ্রম দ্য পিপ্‌স উই লাভ/উই মেক লাভ টু দ্যা লিপ্‌স দ্যাট আর নিয়ার।"

অষ্টাদশ শতক জুড়ে নানা সাহেবি অন্তঃপুরে কালা বিবির অধিষ্ঠান। তৎকালে অভিযাত্রীদের জন্য প্রকাশিত গাইড-বইয়ে বিবি পোষার সম্ভাব্য খরচ কী পড়তে পারে তাও বলে দেওয়া হত। একজন বলছেন, তা মাসে চল্লিশ টাকা লেগে যেতে পারে। পরবর্তীকালে এক রসিক সাহেব মন্তব্য করেছেন, একজন 'বোজম ফ্রেন্ড' -এর জন্য তা আর এমন বেশি কী, বিশেষত স্বদেশি মেয়ে পোষার খরচের তুলনায়। অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় আগন্তুক ছদ্মনামা লেখক 'এশিয়াটিকাস' লিখেছেন, সামান্য 'রাইটার' সব মিলিয়ে যাঁর বার্ষিক আয় মেরে কেটে ২০০ পাউন্ড তিনিও দেখছি এখানে 'সেরালিও' (জেনানামহল) সাজিয়ে বসে আছেন যা একমাত্র রাজকীয় আয় যাদের তাঁদেরই মানায়। তা বললে চলবে কেন? বেপরোয়া ইংরেজ অভিযাত্রীদের মুখে তখন গান—'হিয়ার টু ডে অ্যান্ড গন টুমরো/ইন দিস ভেল্ অব টিয়ার্স অ্যান্ড সরো;/নেভার লেন্ড বাট অলওয়েজ বরো/কুছ পরোয়া নাই মেরি জান!" সাহেবরা এটি চালাতেন অবশ্য একজন বাঙালি বাবুর নামে।

এই যদৃচ্ছ জীবনাচার, উদ্ধত অসামাজিকতা, কিংবা রমণী-বিলাস দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। একালের স্পষ্টবাক ঐতিহাসিকরা অনেকেই স্বীকার করেন শুধু বাণিজ্য, শুধু টাকা-কড়ি বা ধনদৌলত আর পরদেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নয় ঔপনিবেশিকতার পেছনে নিঃশব্দে প্রাণশক্তি জুগিয়েছে যৌনতা। স্বদেশে বর্ণভেদ ছিল না হয়তো, কিন্তু ছিল শ্রেণীভেদ। শ্রেণীতে শ্রেণীতে শুধু

আর্থিক বৈষম্য নয়, ছিল বিভেদের রকমারি প্রাচীর। সাত সমুদ্রের ওপাশে অভিযান ছিল সেই লিখিত অলিখিত নিষেধের প্রাচীর ভেঙে মুক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়ার সামিল। তাতে একদিকে যেমন নতুনকে জানার রোমাঞ্চ, তেমনই জীবনের নানা ক্ষেত্রে স্বাধীনতার উদ্বোধন। এই স্বাধীনতা যদি অজস্র সহস্রবিধ পথে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে থাকে, তবে না মেনে উপায় নেই, তার পিছনে অন্যতম প্রেরণা ও তাড়না ছিল যৌন জীবন। সেই সব কামনাবাসনার নিবৃত্তি যা স্বদেশের আঁটোসাটো সমাজে, পরিচিত পরিবৃত্তে সম্ভব নয়। স্বভাবতই বৈচিত্র্যময় এই দেশে, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারতীয় নারী যেন প্রথম দর্শনেই স্বপ্নলোকের মানবী। বায়রন লিখেছিলেন,—"হোয়াট মেন কল গ্যালেনট্রি অ্যান্ড দ্য গড্‌স কল অ্যাডালটরি/ইজ মাচ মোর কমন হোয়ার দ্য ক্লাইমেট ইজ সালট্রি।" গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। আবহাওয়া তপ্ত। আমাদের উপকরণ স্বপ্ন। জীবন অনিশ্চিত। চারদিকে মৃত্যুর উৎসব। গড়পড়তা আয়ু নাকি মাত্র দুটি বর্ষা, 'টু মনসুনস'।

সুতরাং শুদ্ধ, অশুদ্ধ, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না। ফলে কারও ঘরে যদি কালো বিবি, কেউ কেউ তবে বাইজির আসরে। সত্যই, ভারতীয় নারীর সৌন্দর্যের কোনও তুলনা হয় না। আমরা শুনেছি বিশপ হিবার বাইজির নাচ পছন্দ করেননি। ১৮২৮ সালে তাঁর ভ্রমণ-বিবরণে তিনিই কিন্তু স্বীকার করেছেন—ভারতের অনেক মেয়েই রূপসী। সাদার চেয়ে ব্রোঞ্জ মেয়েদের দেহবর্ণ হিসাবে চোখে ভাল লাগে বেশি। বস্তুত কথাটা বলেছেন তিনি সরাসরি ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের সঙ্গে এ-দেশের মেয়েদের তুলনা করে। অন্য একজন প্রশংসা করেছেন ভারতীয় মেয়েদের গড়ন, চলার ভঙ্গি, সুডৌল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কমনীয় হাত পা। সব মিলিয়ে লাবণ্যময় তাঁদের দেহছন্দ। ঐতিহাসিক রবার্ট ওর্ম (Robert Orme) মনে করেন—মনে হয় অন্য যে-কোনও দেশের তুলনায় প্রকৃতি যেন হিন্দুস্তানের মেয়েদের উপর উদারভাবে রূপ-লাবণ্য ঢেলে দিয়েছে।

রূপবতীদের এই দেশে বাইজিরা বুঝিবা সুরসুন্দরীর দল। তাঁরা রূপসী। তাঁরা সুসংস্কৃত। তাঁরা নৃত্যগীত পটিয়সী। কামসূত্রের এই দেশে তাঁরা কলানিপুণা। তাঁরা শৃঙ্গারে পটু। কে জানে কামকলায়ও হয়তো। অন্তত একজন নর্তকী প্রকাশ্যে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি অনঙ্গলীলায় পটিয়সী। দক্ষিণী এই নারীর নাম—মধুপপানি। তিনি ছিলেন একসময় দেবদাসী। নারীর যৌনতা নিয়ে এমন খোলাখুলি আলোচনা নাকি কেউ কখনও করেননি। বাধ্য হয়েই—বইটি নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হন ইংরেজরা। স্বাধীনতার পর তবে সে পুঁথির মুক্তি। সর্বোপরি তাঁরা স্বাধীনা। অথচ তাঁরা বারবধূ নন। স্বভাবতই নিঃসঙ্গ সাহেবদের কাছে তাঁদের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন তাঁর "ইস্ট ইন্ডিয়ান গাইড অ্যান্ড ভেডে (Vede) মেকাম"-এ (১৮১০) লিখেছেন তরুণদের কাছে নর্তকীদের আবেদন অপ্রতিরোধ্য। তাঁদের আগ্রহ স্বভাবতই কৌতূহলকে ছাপিয়ে যায়। ফলে প্রায়শ অনেক বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনা হয়। প্রথমে নষ্ট হয় অর্থ, তারপর কিছুদিনের মধ্যে বরবাদ হয় শরীরস্বাস্থ্য। মিসেস মারি শেরউড আরও বিষণ্ণ। তিনি একজন লেখিকা। উনিশ শতকের প্রথমদিকে দশ বছরেরও বেশি দিন ভারতে ছিলেন। তাঁর স্বদেশের তরুণেরা বাইজিদের নিয়ে যা করছেন তা দেখে তিনি অতিশয় হতাশ। তিনি ভেবে পান না ইংল্যান্ডে যাঁদের জন্ম, সেখানে যাঁরা বড় হয়েছেন এবং স্বদেশের মেয়েদের যাঁরা প্রশংসা ও সম্মান করেন তাঁরা এসব কী অনাসৃষ্টি কাজ করছেন! তিনি 'দ্য হিস্ট্রি অব জর্জ ডেসমণ্ড' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন বাইজির সঙ্গে সাহেবের প্রেম এবং তার বিয়োগান্ত পরিণতি নিয়ে। স্বদেশের যুবকদের সতর্ক করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু এত সহজে কি তাঁদের নিরস্ত করা চলে? বাইজি এবং সাহেবের সম্পর্ক নিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে হাসান সা নামে একজনও নাকি আত্মজীবনীমূলক একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। বইয়ের নাম 'নাসতার' (ছুরি)। বাইজান নামে নাচের দলের একটি মেয়ে মাসিক একশো টাকার বিনিময়ে এক সাহেবের 'বিবি' হয়েছিলেন। তা-ই নিয়ে কাহিনী। প্রতিটি

অনুষ্ঠানের জন্য মেয়েটি নাকি আলাদা নজরানা পেতেন সাহেবের কাছ থেকে।

উইলিয়ামসন লিখেছেন কিছু কিছু বাইজি বিশেষ কোনও সাহেবদের নজরে পড়ে গেলে তিনি দলত্যাগ করে তাঁর 'বিবি' হয়ে যেতেন। অষ্টাদশ-ঊনিশ শতকে এই সব 'বিবি'দের যেসব তৈলচিত্র ছড়িয়ে আছে এ-দেশে এবং বিদেশে সেই সুন্দরীদের মধ্যে কয়জন ছিলেন বাইজি কে জানে!

সে এক আশ্চর্য কাল। সাহেবরা তখন স্বদেশে ফিরে যাওয়ার আগে ঘরবাড়ি বিক্রির সময় বিজ্ঞাপনে দিব্যি জানিয়ে দেন বাড়ির সঙ্গে পাওয়া যায় 'হিন্দুস্তানি বান্ধবী'ও।

তারপর একদিন হারিয়ে গেলেন ওঁরা। হঠাৎ একদিন নয়, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে। প্রথমে দিন বদলের খবর পাই কলকাতায়। ১৮২৯ সালের ১৭ অক্টোবর 'সমাচার দর্পণ' জানাচ্ছে...সকলেই কহেন যে ইহার পূর্ব্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহপূর্ব্বক নৃত্যগীত ইত্যাদি হইত এক্ষণে বৎসর২ এই সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে।... ..." ১৮৩২ সালের ১৩ অক্টোবরের সংবাদ—"বাইজীরা গলি-গলি বেড়াইয়াছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই অনেকে এ-বৎসর পূজাই করেন নাই এবং যাহারদের বাড়িতে পাঁচ-সাত তরফা বাই থাকিত এ-বৎসর কোন বাড়িতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে।" সমসাময়িক বাংলা এবং ইংরেজি কাগজে পুজোয় বাইজির নাচে সাহেব মেমদের ভজনায় এই ঘাটতি নিয়েও রীতিমত আলোচনা গবেষণা হয়েছে। তার সার কথা, বাবুদের সুবর্ণযুগে পিতলের রং ধরেছে, অনেকেই আর আগের মতো ধনী নন। সুতরাং অপচয় করার সামর্থ্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহও কমে এসেছে। তাছাড়া, চারদিকে তাকিয়ে তাঁদের 'জ্ঞানবৃদ্ধি'ও ঘটেছে। পুজোয় বাই নাচের চেয়ে সমাজের পক্ষে হিতকর যে অনেক কিছুই রয়েছে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো কোনও কোনও বাবু তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সর্বোপরি ক্রমাগত শুদ্ধাচারী স্বদেশীয় সমালোচকদের সামনে পড়ে সাহেব মেমরাও অনেক সংযত হয়েছেন। নাচের আসরে নিমন্ত্রণের নামে তাঁরা আর নেচে ওঠেন না।

অবশিষ্ট ভারতের পরিস্থিতিও উৎসাহজনক নয়। অন্যত্রও শুরু হয় সমালোচনা। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি অযোধ্যা এবং দক্ষিণের তাঞ্জোর ইংরেজ অধিকারে চলে যায়। ফলে এই দুই সংস্কৃতি কেন্দ্রের ভাঙা হাটের দশা। নবাবদের দিন ফুরিয়েছে, আমির-ওমরাহরাও অবসন্ন। তারই মধ্যে শুরু হল খ্রিস্টান মিশনারিদের আন্দোলন। তাঁরা ভারতীয় ধর্মাচারের কঠোর কঠিন সমাচোলক। এ-দেশের সংস্কার-সংস্কৃতিও মোটেই প্রশংসাজনক নয় তাঁদের চোখে। তাঁরা প্রশ্ন তুললেন—বিধর্মীদের নাচের আসরে কেন যোগ দেবেন খ্রিস্টানরা? কেনই বা নিজেরা মেতে উঠবেন বাইজিদের নিয়ে। তাঁদের মতে নাচ খ্রিস্টধর্ম-বিরোধী, নাচ নৈতিকতার প্রশ্ন। ওদিকে সুয়েজ খুলে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছেন মেমসাহেবরা। সাহেবপাড়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বল নাচ। প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতে মাঝে মাঝে হানা দিচ্ছেন নানা ইউরোপীয় গায়ক, নর্তকী এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল। তাছাড়া রাজা-প্রজার সম্পর্কও আর আগের মতো নেই, সবাই জেনে গিয়েছেন কার স্থান কোথায়। ফলে ১৮৭৫ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস সানন্দে ভারতে নৃত্য উপভোগ করলেও ১৮৯০ সালে প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টর নৃত্যসভায় যোগ দিয়ে মিশনারিদের তোপের মুখে পড়েন। এই ভারতীয় আমোদের বিরুদ্ধে মিশনারিরা বলতে গেলে ঝড় তোলেন। মেমসাহেবদের তাঁরা পরামর্শ দেন স্বামীদের ঘরে আটকে রাখতে।

শুচিবাইগ্রস্ত পশ্চিমী মিশনারিদের সঙ্গে নাচ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন ইংরেজি শিক্ষিত কিছু কিছু ভারতীয়ও। তাঁরাও মনে করেন নাচ বীভৎস এবং নৈতিকতা বিরোধী; কোনও পার্থক্য নেই রূপোপজীবিনীদের সঙ্গে বাইজিদের। কিছু সংবাদপত্র এবং সামাজিক সংগঠনও গলা মেলায় তাঁদের সঙ্গে। বাংলা মুলুকে একসময় আক্রমণের পুরোভাগে কেশবচন্দ্র সেন। তিনি বলেন—নাচনেওয়ালির চোখে নরক, তাঁর বুকে গরল-সমুদ্র, তার সুন্দর ক্ষীণ কটিতে নরকের আগুন, তাঁর হাতে অদৃশ্য ছুরি।

ইত্যাদি। আন্দোলনকারীরা বললেন এই নাচ শাস্ত্র অনুমোদিত নয়, তাকে ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গও বলা যায় না। সুতরাং উচ্ছেদ চাই। রাজ সরকারের কাছে আর্জি পেশ করা হল বাইজির নাচ আইন করে বন্ধ করার জন্য। কিন্তু সরকার সে কথায় আমল দিলেন না। লর্ড ল্যান্সডাউন নিজে নাচ পছন্দ করতেন না। তবু বললেন এতে আমি আপত্তিকর কিছু খুঁজে পাই না। শুধু তাই নয়, এই বিপরীত পরিবেশেই ১৮৯৪ সালে নাচের আসরে গিয়ে বসেন সার চার্লস এলিয়ট। সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। কিন্তু সরকার তবু অনড়। এই শতকের গোড়ায় আন্দোলনকারীরা দরখাস্ত পাঠালেন লর্ড কার্জনের দরবারে। তাঁর সাফ উত্তর—আমার কিছু করার নেই। তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে মাতামাতির কারণ বুঝি না। সুতরাং বাইজিরা পুরোপুরি অনাথ হয়ে গিয়েছিলেন এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। ১৯২০ সালেও তাঁদের সমর্থনে জোরালো কলম ধরেছিলেন অটো রথফেল্ড নামে একজন সিভিলিয়ান। যুক্তির সঙ্গে আবেগ মিলিয়ে দীর্ঘ সওয়াল। নাচকে তিনি বলেছিলেন—ভারতের একমাত্র জীবন্ত শিল্প।

নব্যপন্থীরা বাইজির উচ্ছেদ চাইলেও কিছু কিছু সনাতনপন্থী তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে আধুনিক কালেও বেশ কিছু জমজমাট মাইফেল দেখা গেছে এ-দেশে। এই কলকাতায় আমরা শুনি মালকা জান, অদ্দা বেগম, জদ্দন বাই, গহর জান, আখতারি বাই, আশ্চর্যময়ী দাসী এবং আরও বেশ কিছু খ্যাতনামা বাইজি ও গায়িকার কথা। তবু না মেনে উপায় নেই দিন তাঁদের ফুরিয়ে এসেছে। কালের হাওয়া তাঁদের বিরুদ্ধে। দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক আবহাওয়া পাল্টে গেছে। সামন্ততন্ত্রের ভিত নড়ে গেছে। বড়মানুষের সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারিত হচ্ছে। নাগালে আসছে আমোদের রকমারি আয়োজন। বাইজির গান এখন গ্রামোফোনেও শোনা যায়। সুতরাং, হাসপাতালে শায়িত মৃত্যুপথযাত্রীকে আর কতদিন জীবনরক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা চলে?

তবে বিদায়ের কালে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে একটি ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেলেন বাইজিরা। শত শত বছর ধরে যে জলসাঘরের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা তার দরজা খুলে দিয়ে যান নবাগত আর এক নর্তকীর সামনে।

তাঁরা ধ্রুপদী শিল্পী। প্রায় হারিয়ে যাওয়া ভারতীয় ঐতিহ্যসম্মত নৃত্যকলার পুনরুজ্জীবনে, বলতে গেলে তাঁরা ছিলেন অনুঘটক। সে-কাহিনী সবিস্তারে আলোচনা করেছেন মুলকরাজ আনন্দ, প্রান নেভিলের উল্লেখিত বইটিতে স্বাক্ষরিত একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে। তাছাড়া অন্যত্রও লভ্য বিশদ আলোচনা। (দ্রষ্টব্য: মার্গ প্রকাশিত এনসাইক্লোপেডিয়া বা কোষ গ্রন্থ) সংক্ষেপে বললে—এই পুনরুজ্জীবন ছিল জাতীয়তার আন্দোলনের অভিঘাতের জের। জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে নব জাগরণের তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল ভারতের শিল্প চেতনায়ও। ফলে তোয়ায়েফ, দেবদাসী এবং সাইকানরা যখন ক্লান্ত, অবসন্ন তখন আশার নতুন আলো নিয়ে আসরে হাজির হলেন দক্ষিণে কৃষ্ণ আইয়ার, রুক্মিণী দেবী, রঙ্গিণী দেবী, এবং অন্যরা। নৃত্যকলা এবং সংগীতকে অগৌরবের হাত থেকে উদ্ধার করতে অগ্রণী উদ্যোগী তাঁরা। শুরু হল উপযুক্ত গুরুর সন্ধান। দক্ষিণে ফিরে এল ভরতনাট্যম। গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র চালু করলেন ওড়িশি, অন্ধ্রে ফিরে এল কুচিপুড়ির চর্চা। শুরু করলেন ইন্দ্রাণী রহমান, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, শান্তা মিত্র, কেরলে কবি ভাল্লাথলের প্রেরণায় ফিরে এল কথাকলি, মোহিনী অট্টম ও অন্যান্য নাচ। পশ্চিম ভারতে বাঙালি গৃহিণী মেনকা সখী কত্থক এবং কথাকলির চর্চার জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন। আচ্ছান মহারাজ, শম্ভু মহারাজ, লাচু মহারাজের উত্তরসূরি হয়ে এগিয়ে এলেন বিরজু মহারাজ। তাঁদের উদ্যম আর উদ্যোগের ফলে ভারতীয় ধ্রুপদী নাচ আর সঙ্গীতের খ্যাতি আজ বিশ্বজোড়া। সবাই স্বীকার করেন—নাচকে ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের। তাছাড়া, উদয়শংকরের অবদানও যথেষ্ট। ত্রিশের দশকে এসেছিলেন রাশিয়া থেকে আনা পাভলোভা, আমেরিকা থেকে রুথ সেন্ট ডেনিস ও টেডশন প্রমুখ। পরোক্ষে

প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন তাঁরাও। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের প্রকাশ্যে আসার হাতছানি দিয়ে ডেকে আনার কাজে অন্তরালে সক্রিয়া ছিলেন এক শ্রেণীর সমালোচকদের কাছে নিন্দিত ধিকৃত বাইজিরাও। মনে পড়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস। এক অর্থে তারই পুনরাবৃত্তি নৃত্যসভায়ও।

তার মানে কি এই যে ধ্রুপদী নাচের পুনরুত্থানের পর পুরোপুরি হারিয়ে গেল বাইজির নাচ? লিখিত আর চিত্রিত বিবরণ ছাড়া তাঁদের কি আজ কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না? তা কেমন করে সম্ভব। সংস্কৃতির ইতিহাসে কোনও উপস্থাপনই পুরোপুরি মুছে যায় না। কিছু না কিছু রেশ থেকেই যায়। সুতরাং, একটু চোখ মেলে তাকালে দেখা যাবে বাইজির নাচও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি আজ। মনে পড়ে চিদানন্দ দাশগুপ্ত জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা নিয়ে লেখা বইটিতে বলেছিলেন—'হিন্দি সিনেমায় যে নাচ, মূলত তার দুটি ভাগ। একদিকে বৈঠকখানায় নর্তকীর একক নৃত্য। সেটি বাইজিদের 'কোঠা'য় বা ঘরোয়া আসরের স্মারক। আর এক দৃশ্যে আমরা দেখি অনেক মেয়ে এক সঙ্গে নাচছেন, গাইছেন। তাঁদের পুরোভাগে নায়ক নায়িকা। এ নাচ কি কৃষ্ণ, রাধা এবং ষোল হাজার গোপিনীর নাচের কথা মনে করিয়ে দেয় না? বস্তুত, বাইজির জমজমাট মাইফেল বলতে এককালে যা বোঝাত এখনও অনেক হিন্দি চলচ্চিত্রে দেখি সেই উদ্দামতা। সেই হাস্য, লাস্য, আনন্দ বেদনা, মিলন এবং বিচ্ছেদ, সেই প্রকট যৌনতা। কে বলেন বাইজিরা হারিয়ে গেছেন। বরং টিভির সৌজন্যে ঘরে ঘরে আজ তাঁদের জীবন্ত আসর!

শেষ করার আগে আর একটি আসরের কথা। সম্ভবত সেটাই পুরোপুরি বিদেশি দর্শক-শ্রোতাদের সামনে একজন ভারতীয় বাইজির সর্বশেষ আসর। সেটা এই শতকের কুড়ির দশকের কথা। আসর বসেছিল তৎকালের বেন্টিক স্ট্রিটের 'ত্রিভোলি' নামে একটি হোটেলে। পটনয় নামে এক রাশিয়ান ইহুদি ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। সেখানে যত রাজ্যের নাবিক, সৈনিক ও ফুর্তিবাজদের আড্ডা। তারই মধ্যে একদিন এসে হাজির হন প্রবাদপ্রতিম গায়িকা ও নর্তকী স্বনামধন্য গহরজান। আকস্মিকভাবেই সে আসরে হাজির একজন সাহেবের লেখা বিবরণ চোখে পড়ে যায়। হ্যারি হবস তাতে গহরজান সম্পর্কে অনেক কথাই লিখেছেন। মজার কথা, এই শিল্পী সম্পর্কে কোনও খবরই শেষ কথা নয়। রীতিমত রহস্যর জাল তাঁর জীবন ঘিরে। গহরজান যেন কোনও মানবী নন। উপকথার নায়িকা। তাঁর পিতৃপরিচয় নিয়েও এক একজনের বয়ান এক এক রকম। অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'দি নাইটিঙ্গেল অব বেঙ্গল' গহরজানকে বিলক্ষণ জানতেন। তিনি লিখেছেন, 'গহরজানের পিতা ছিলেন কালো চেহারার মানুষ। মাতা ছিলেন সুন্দরী ইহুদী। মায়ের বর্ণ ও রূপ পেয়ে ছিলেন গহরজান। মামলা উপলক্ষে গহরজানের মাতা পিতা, সেই প্রিয়পাত্র আব্বাস (যাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ উপলক্ষে মামলা) ও তাঁর পিতা সকলকেই দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল।' 'ত্রিভোলি' আসর উপলক্ষে হ্যারি হবস লিখেছেন—গহরজানের বাবা ছিলেন রবার্ট উইলিয়াম লিউয়ার্ট নামে একজন ইঞ্জিন ড্রাইভার, মা মালকাজান নামে একজন মুসলমান রমণী। তাঁর মৃত্যুর পর 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজে ১৯৩০ সালের ২৮ জানুয়ারি যে সংবাদ বের হয় তাতে বলা হয়েছে গহরজানের জন্ম ১৮৭৩ সালে (মৃত্যু ১৯২৯)। তাঁর বাবা মিঃ রবার্ট উইলিয়াম ইউওয়ার্ড ছিলেন একজন 'প্ল্যান্টার' বা বাগিচা মালিক ও ইঞ্জিনিয়ার, মা অ্যাডোলাইন ভিক্টোরিয়া হেমিংস। বাল্যে গহরজানের নাম ছিল ইলিন এঞ্জেলিনা ইউওয়ার্ড। ছয় বছর বয়সে তার ইসলাম ধর্মে দীক্ষান্তর। ইত্যাদি (পুরো বিবরণ উদ্ধৃত, গোপা মুখোপাধ্যায়ের 'বাইজী মহল' বইয়ে।) তার মা নিজে নর্তকী কিংবা গায়িকা ছিলেন কিনা তা নিয়েও বিতর্ক। হ্যারি হবস—এই উপকথাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন নানা তথ্য বা গুজব দিয়ে। যথা: তাঁর সম্পত্তি ছিল দেড় থেকে দু' লক্ষ পাউন্ডের। যথা: একজন

বড়লোকের প্রাসাদে এক ঘণ্টার আসর করার বিনিময়ে গহরজান পেয়েছিলেন চৌদ্দ হাজার টাকা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল কমপক্ষে তিনবার। ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে যদিও তিনি ভারতীয় নাচ-গানের আদৌ ভক্ত নন, তবু স্বীকার করেছেন রূপে গুণে গহরজান অতুলনীয়া। তাঁর 'নিতম্বের তরঙ্গে', দর্শকেরা এমন উত্তেজিত হতে পারেন যে টাকা পয়সার বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। গহরজানকে তিনি একটা আত্মজীবনী লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বলেছিলেন তিনি নিজে সে জবানবন্দিতে ভাষা দেবেন। গহরজান সে প্রস্তাব আমল দেননি।

তাঁর সম্পর্কে তৎকালে অনেক কথা-উপকথা। কিছু নিশ্চয়ই শোনার মতো। ১৯০২ সালে বিদেশি গ্রামোফোন কোম্পানি যখন এ দেশে প্রথম ব্যবসা শুরু করেন তখন তার ভিত গড়ে দেন এই গহরজান, গানের শেষে সুরেলা গর্বিত গলায় যিনি বলতেন—'আই অ্যাম গহরজান।' গেইসবার্গ নামে কোম্পানির একজন কর্মকর্তা লিখেছেন—গহরজান একজন আর্মেনিয়ান ইহুদি। তিনি ইংরেজি সহ কুড়িটি ভাষা ও উপভাষায় গাইতে পারতেন। তাঁর চমৎকার গাড়ি এবং ঘোড়া ছিল। প্রতিদিন বিকালে তা চড়ে তিনি ময়দানে হাওয়া খেতে বের হতেন। রেকর্ডিংয়ের সময় ওঁরা কখনও তাঁকে এক পোশাকে দ্বিতীয়বার দেখেননি। গয়নাগাটি পরতেন এক একদিন এক একরকম। ইত্যাদি। চিৎপুর এবং ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে বেশ কয়েকটি বাড়ি ছিল গহরজানের। প্রেমিকের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরও উদারভাবে নাকি একটি বাড়ি দান করেছিল তাঁকে। সামাজিক দায়িত্ব পালনেরও প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছেন তিনি। কংগ্রেসের মহিলাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার জন্য অনুষ্ঠান করেছেন 'স্টার' থিয়েটারে। মৃত্যুর বছর তিনেক আগে মাত্র (!) দু'হাজার টাকার মাইনেয় মহীশূরে চলে যাওয়ার আগে ভারত-বন্দিত এই শিল্পীর ঠিকানা ছিল কলকাতায়। এখানেই তাঁর 'গহর ভবন'। আশ্চর্য, তবু আজ পর্যন্ত গহরজানের একটি তথ্যনির্ভর জীবনী রচিত হল না। আধুনিক নারীবাদীদের কাছে এমন একটি চরিত্র, পশ্চিমের কোনও দেশে কিন্তু অবশ্যই পরিণত হত গভীর আলোচনার বিষয়ে। লোলা মনতেজকে নিয়ে এখনও প্রকাশিত হচ্ছে বইয়ের পর বই।

যা হোক, হ্যারি হবস লিখেছেন—'ত্রিভোলি'র মতো একটা হুল্লোড়ে জায়গায় গহরজানের মতো একজন শিল্পী এসেছিলেন কারণ তখন তাঁর পড়ন্ত বয়স। জনপ্রিয়তাও কমতির দিকে। এমনও তো হতে পারে তাঁর বিদেশি পৃষ্ঠপোষকদের দাবি মেনে পোটনয় উদ্যোগ নিয়ে আয়োজন করেছিলেন এই আসরের। যথারীতি সেদিন তুমুল উত্তেজনা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের 'ত্রিভোলি'তে। হ্যারি হবস-এর প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয় পুরনো দিনের বাইজির আসর সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না তাঁর। থাকলে আসরটির একটি বিশ্বস্ত বিবরণ থেকে যেত উত্তরকালের জন্য। বাধ্য হয়েই স্মরণ করতে হয় অন্য একটি আসরের উপস্থিত আর এক দর্শককে। 'স্মৃতির অতল'—এর পাতায়। অমিয়নাথ সান্যাল লিখছেন: বৈঠকে গহরের আগমনের অর্থ, জল্পনা-কল্পনা লণ্ডভণ্ড, তখনকার অন্য সব কাজ পণ্ড! তাঁকে মনে করতে গেলে খুব বড় হয়ে দেখা দেয় সেই বিচিত্রজীবন আর অদ্ভুত প্রতিভা। কিন্তু সেই সন্ধ্যালগ্নের গহর বলতে মনে পড়ছে, এলোমেলো হাওয়ার একটি ঘূর্ণী, যা নিজেও থাকে না, পরকেও দিশেহারা করে দিয়ে যায়। গহর বৈঠকে এলে অঙ্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে অধ্যবয়সায় রক্ষা করা অসম্ভবই ছিল। তাঁর দেহ সমান কি অসমান, খর্ব কিংবা দীর্ঘ, ক্ষীণ অথবা মেদবহুল—এরকম গবেষণার অবসর পাইনি; অনুপস্থিতিতে আন্দাজ করতে গেলেই সংশয় হত। কারণ, তাঁর বাক্যে ও আচরণে দেখা দিত তরুণীর উদভ্রান্ত লীলাচপলতা; তাঁর নিত্যকারের রূপসজ্জার লক্ষ্য হত যোড়শীর গর্ব ও গৌরব; তাঁর স্বাভাবিক গমনেই ছিল কুঞ্জরের গতিবিভ্রম। তাঁর হাব-ভাব-কটাক্ষের সামান্য সাবলীল ভঙ্গিমা দেখে তওয়ায়েফবাই লজ্জিত আড়ষ্ট হয়ে যেতেন কুলবধূর মতো। চিকের আড়ালে সত্যকারের কুলবধূরা সে দৃশ্য দেখে কী মনে করতেন তা আমি এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি। গহরের সঙ্গে তুলনা করে মনে হয়, আজকের বাইজিরা ত সরল, নিরীহ! আজকের সিনেমা-তরুণীরাও শিশু; আমেরিকানরা

যাদের পিঠ চাপড়ে বাৎসল্যের ভাবে বলে—'বেবি!'
'ত্রিভোলি'র বিদেশি দর্শকরা এই গহরজানকেই নিশ্চয় দেখেছিলেন সেদিন।

প্রাসঙ্গিক কিছু বইপত্র:

Sexual Life in Ancient India, Johann Jakob Meyer, (Eg. Ed), Delhi, 1st publish in India in 1971, New Edition 1989.

Prostitution in India, Sontosh Kumar Mukherji, Calcutta, Date not mentioned.

Race, Sex and Class under the Raj: Imperial attitudes and policies and their critics, 1793-1905, K. Balhatchet, London, 1980.

Empire and Sexuality, the British Experience, Ronald Hym, Manchester, 1980.

Dangerous Outcast, the Prostitutes in 19th Century Bengal, Sumanta Banerjee, Calcutta, 1998.

The World of Courtesans, Moti Chandra, New Delhi, 1973.

The Adventure of Qui Hi, 'Que Hi', London, 1816.

The Costumes and Customs of Modern India, C. D'oyly, London, 1824.

The European in India, C. D'oyly, London, 1813.

Twenty-Four Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal, Belnos London, 1832.

British Social Life in India, 1608-1937, Dennis Kincaid, London, 1938.

British Life in India, 1750-1947, Ed. R.V. Vernede, New Delhi, 1995.

The Social Condition of the British Community in Bengal 1757-1800, Suresh Ch. Ghosh, Liden, 1967.

A various Universe, A Study of the Journals and Memoirs of British Men and Women in the Indian Subcontinent, 1765-1856, Ketaki Kusari Dyson, New Delhi, 1978.

The Sahibs: The Life and Ways of the British in India as Recorded by Themselves, Hilton Brown London, 1948.

The Good Old Days of Honourable John Company, New Edition, Calcutta, 1964.

Glorious Sahibs, M. Edwards, London, 1968.

British Social Life in Ancient Calcutta, P. Thankappan Nair, Calcutta, 1983.

Calcutta in the 18th Century, P. Thankappan Nair, Calcutta, 1984.

Calcutta in the 19th Century, P. Thankappan Nair, Calcutta, 1989.

Lucknow: The Last Phase of an Oriental Culture, Tr. E.S. Hancowit & F. Hussain, A.H. Sharar, Delhi, 1989.

Vanishing Culture of Lucknow, A. Hassan, Delhi, 1990.

John BarleyCorn Bahadur: Old Time Taverns in India, Major Harry Hobbs, Calcutta, 2nd Edition, 1943.

Dance in Indian Painting, Kapila Vatsayayan, New Delhi, 1982.

Nautch Girls of India/Dancers, Singers, Playmates, Pran Nevil, New Delhi, 1996.

The Social History of the Nautch Girl, Mildred Archer, The Saturday Book, Vol-22, 1962,

Thumri as Feminine Voice, Vidya Rao, Economic and Political Weekly, April 28, 1990.

Nautch -Girls, Baijnath, Marg, Vol-XII, No-4, Sept. 1959.

ভারতের শিল্প ও আমার কথা, অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬৯।

স্মৃতির অতলে, অমিয়নাথ সান্যাল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৯।
বীণার ঝঙ্কার, সম্পাদক অমৃতলাল বসু, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩১৯, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৩১।
ভারতের সঙ্গীত গুণী, (১ম খণ্ড), দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৮৪।
বাঈজী মহল, গোপা মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৯।
বেশ্যাসঙ্গীত, বাঈজী সঙ্গীত, সমন্বয় ও সম্পাদন, দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০০০।
গৌড়ীয় নৃত্য, মহুয়া মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৪০৭।
কালা বিবি, কেয়াবাৎ মেয়ে, শ্রীপান্থ, কলকাতা ১৯৮৮।
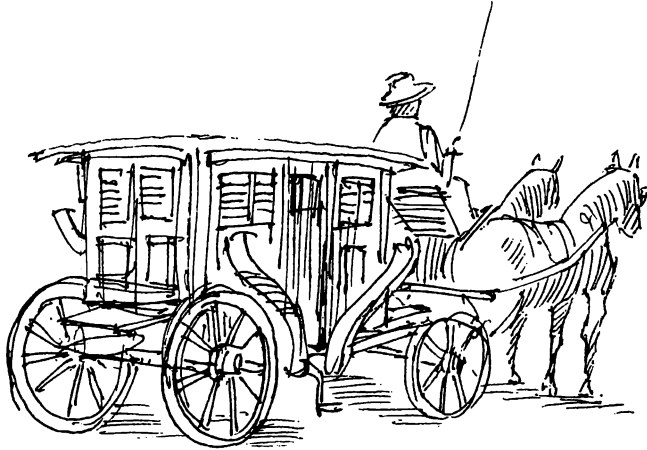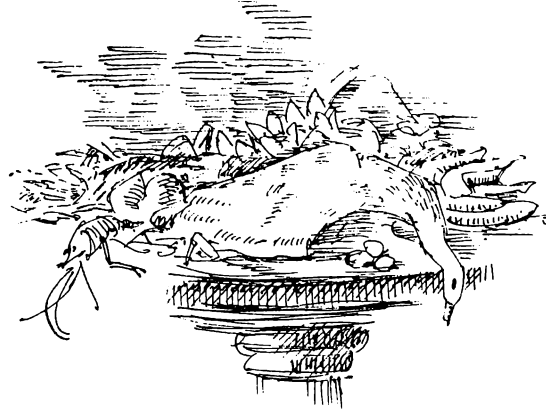
কারি-কাহিনী

" First a sun, fierce and glaring that scorches and bakes,
Palankeens, perspiration, and worry;
Mosquitoes, thugs, coconuts, Brahminsand snakes,
With elephants, tigers and curry..."
'Curry and Rice on Forty Plates,' George Franklin Atkinson, 1859.

* * *

কারি আর কারি। ভারতে নাকি কানু ছাড়া গীত নেই, আজকের ব্রিটেনে নাকি কারি ছাড়া খানা নেই। ফ্রান্সে জাতীয় খাদ্য যদি চিজ আর ওয়াইন, ব্রিটেনেও তেমনই এতকাল সাহেব-মেমদের প্রিয় খাদ্য ছিল ফিস অ্যান্ড চিপস। মাছভাজা আর আলুভাজা। সেই ব্রিটেনে আজ ফিস অ্যান্ড চিপসকে পেছনে ঠেলে সামনে এগিয়ে এসেছে ভারতের কারি। ফুটবল-পাগল ব্রিটিশ দর্শকরা প্যারিসে নিজেদের দলকে অভ্যর্থনা জানান কারির জয়গান গেয়ে :

"We are off to Waterloo
Me and me mum and me dad and me gran
we're off to Waterloo
Me mum and me dad and me gran and a bucket of Vindaloo"

সেটা ১৯৯৮ সালের ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের সময়কার কথা। এই গান গেয়েই ফ্রান্সের নানা মাঠে নিজেদের দেশের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেছেন ইংল্যান্ডের দর্শকরা। এই গান একটি পপ-গোষ্ঠী রেকর্ড করেছেন। সেটি রাতারাতি বেস্ট সেলার। 'ভিন্দালু' কিন্তু এক ধরনের ভারতীয় কারি। শব্দটি মূলত পর্তুগিজ! 'Vind' অর্থ ওয়াইন এবং ভিনিগারে জারিত মাংস, 'Alhos' অর্থ রসুন। গোয়ার ভারতীয়রা তার সঙ্গে ঝাল লঙ্কা মিলিয়ে যে কারি রান্না করতেন প্রথম দিকে তার নাম ছিল—'Vinthaleaux.' তাই থেকে ক্রমে 'ভিন্দালু'। ভিন্দালু সঙ্গীত জনপ্রিয় হওয়ার পর ওই পপ গ্রুপটি নাকি কারি নিয়ে আরও গান বাঁধছে। তার একটি 'কোরমা খামেলেওন' (Korma Khamelon), আর একটির শিরোনাম পাপড়ম প্রিচ (Poppadom Preach) ফুটবল-পাগলদের কাছে কারি এমনই জনপ্রিয়

যে লন্ডন থেকে তাঁরা বিদেশে কারি আনিয়েছিলেন বিমানে। খাবারের দাম ৬০০ পাউন্ড। বিমানভাড়া ৮০০ পাউন্ড!

শুধু ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে নয়, ব্রিটেনে ভারতীয় কারির অনুরাগী এখন সমাজের সর্বস্তরে। সাধারণ ইংরেজরা আগেকার দিনে মাংস খেতেন সপ্তাহে একদিন, রবিবার। 'মিট অ্যান্ড থ্রি ভেজ', তাই নিয়ে ছিল তাঁদের রবিবাসরীয় ভোজ। এখন মাংস ছাড়া ওঁদের চলে না। মাংস মানে মাংসের কারি। ১৯৯৭ সালে গ্যালপ পোলের ফলে জানা যায়—"নিঃসন্দেহে জাতির প্রিয় খাদ্য কারি। ব্রিটেনের চার ভাগের একভাগ মানুষ অন্তত সপ্তাহে একদিন কারি খেয়ে থাকেন।" অ্যালকোহোলিক-এর মতো অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে "কারিহোলিক" কারি-নেশাগ্রস্ত-ব্রিটেনের ছ'কোটি মানুষের রসনা হার মেনেছে ভারতীয় কারির কাছে। ব্রিটিশ ট্যুরিস্ট গাইডে ইংল্যান্ডের খাদ্য তালিকাতে ঠাঁই করে নিয়েছে ভারতীয় কারি। ২০০০ সালে নতুন সহস্রাব্দে সত্যসত্যই বিশ্ব যদি ঈশ্বরের রোষে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়, তাহলে কী করতে হবে সে সম্পর্কে পশ্চিমের কোনও কোনও দেশে নাগরিকদের সাবধান হতে পরামর্শ দেয় সরকার। ব্রিটেনে সম্ভাব্য আপৎকালে কী কী সঞ্চয় করে হাতের কাছে রাখতে হবে তার যে তালিকা ব্রিটিশ সরকার নাগরিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাতে অন্যান্য বস্তুর মধ্যে ছিল—কারি। প্যাকেট-করা কারিও চাই, স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ।

রেডিওতে কারি-কাব্য, You're hot, you're there, you want me to eat you/ Your pungent beauty with a radiant hue. ..." টিভিতে মাধুর জাফরি কারি রান্না করা শেখান। তাঁর লেখা ভারতীয় রান্নার বই ওই অনুষ্ঠানের মতোই অতিশয় জনপ্রিয়। নানা হাতে বেশ কিছু রান্নার বই বের হয়েছে ইতিমধ্যে। প্যাট চ্যাপম্যান নামে একজন ইংরেজ ভারতীয় এবং পূর্বদেশীয় নানা রান্নার বই লিখেই ক্ষান্ত হননি—কারি, মশলা ইত্যাদি বিষয়ে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই উদ্যোগী ইংরেজ দেশের নানা শহরে ও বন্দরে কারি-ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ১৫ হাজার। তিনি নিয়মিতভাবে 'গুড কারি গাইড' প্রকাশ করে চলেছেন। অনেক ভারতীয় রেস্তোঁরার তিনি পরামর্শ দাতা।

ভারতীয় কারি সসম্মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ব্রিটিশ রাজনীতিতেও। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের নিয়ে গঠিত ইন্দো-ব্রিটিশ গোষ্ঠীর সংঘের নামও কারি-ক্লাব। তার সদস্য ৬০ জন ব্রিটিশ এম. পি. । তাঁরা সকলেই ভারত সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী। স্বভাবতই ভারতের কারি বাদ দিয়ে ভারত-চর্চা কেমন করে সম্ভব ওঁদের পক্ষে? কখনও কখনও ভারতীয় রাজনীতিক ও কূটনীতিকরাও যোগ দেন ওঁদের আসরে। এমনকী ব্রিটিশ লেবার পার্টির বার্ষিক সম্মেলনেও প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠদের জন্য পরিবেশন করা হয় ভারতীয় কারি।

যেসব ইংরেজ ঘরে বসে কারি উপভোগ করতে চান তাঁদের সামনে খোলা রয়েছে শহরের নানা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স-এর শাখা প্রশাখা। সুখ্যাত মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার তাঁদের অসংখ্য দোকানে বিক্রি করেন ছাব্বিশ রকম ভারতীয় রান্না করা খাবার। ওঁদের তালিকায় নতুন কোনও ডিশ যোগ হলেই নাকি দেখতে দেখতে তা উবে যায়। ওঁরা সপ্তাহে কমপক্ষে আঠার টন চিকেন টিক্কা মশলা বিক্রি করেন। ব্রিটেনে এই ভারতীয় ডিশ নাকি অতি জনপ্রিয়। আর একটি বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স 'হ্যারডস'। ওঁদের বিক্রির শীর্ষে রয়েছে—কারি। এইসব দোকান থেকে সুদৃশ্য মোড়কে ঠাণ্ডা বা গরম যেসব ডিশ বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে : চিকেন কোর্মা, চিকেন জাল ফ্রেজি, চিকেন মালাবারি, রেশমী কাবাব, লাজিজ কাবাব, নীলগিরি গোস্ত কোর্মা, লসুন ঝিঙ্গা, মালাই টিক্কা, বিরিয়ানি ইত্যাদি। তাছাড়া ভারতীয় সস, চাটনি, পাপড় এসব তো আছেই। তবে ভিন্দালু বাদ দিলে দোকানে জনপ্রিয় তৈরি খাবার বলতে বেশ জনপ্রিয় নাকি চিকেন টিক্কা মশলা, তন্দুরি চিকেন, বোম্বাই-এর

পটেটো, বিরিয়ানি আর ডাল।

যাঁরা দোকানে বসে অন্য পরিবেশে খেতে চান তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য ভারতীয় রেস্তোঁরা। ব্রিটেনে আজ (২০০০ সালে) তাদের সংখ্যা নাকি আট হাজার ছাপিয়ে গিয়েছে। অথচ ১৯৮২ সালে সংখ্যাটা ছিল তিন হাজার পাঁচশো। ১৯৪৬ সালে ছিল মাত্র তিনটি, ১৯৮৪ সালে ছয়টি, ১৯৬০ সালে দেখতে দেখতে ছশো রেস্তোঁরা, ১৯৭০-এ দ্বিগুণ হয়ে সংখ্যাটি দাঁড়ায় বারোশোতে। পরের দশকে পৌঁছায় তিন হাজারে।

পর্যবেক্ষকদের অনুমান সংখ্যাটা অদূর ভবিষ্যতে দশ হাজারে পৌঁছাবে। বস্তুত খাস লন্ডনে আজ এত ভারতীয় রেঁস্তোরা আছে যা নয়াদিল্লি ও বোম্বাই-এর মিলিত সংখ্যার চেয়ে বেশি। বলা হচ্ছে ভারতীয় কারির রাজধানী এখন ভারতের কোনও শহর নয়, লন্ডন। সব মহল্লায় ভারতীয় রেস্তোঁরা। তাদের নামও ভারতীয় বটে। যথা—বেঙ্গল ক্লিপার, দ্য বোম্বে ব্রাসেরি, কাফে লাজিজ, কাফে স্পাইস নমস্তে, চাটনি মেরি, রস, সোহো স্পাইস, দিওয়ানা ভেলপুরি, লাহোর কাবাব হাউস, ইন্ডিয়া ক্লাব, পেলেস বালতি পাব, চোর বিজারি, কোহিনুর, দ্য জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন, মহারাজা, দ্য তাজমহল, বীরস্বামী, দ্য আই অব দ্যা টাইগার, ইত্যাদি ইত্যাদি। লন্ডনের টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা উল্টালে এমন পঞ্চাশটি ভারতীয় রেস্তোঁরার নাম পাওয়া যাবে যার আদিতে রয়েছে কারি। যথা কারি মহল, কারি ঘর, কারি হাউস, কারি এক্সপ্রেস, কারি প্যারাডাইস, কারি রয়াল, কারি ইন আ হারি, কারি হাট ইত্যাদি। তাছাড়া রয়েছে ইংরেজদের নিজস্ব পানশালা, সংক্ষেপে যাদের বলা হয় 'পাব।' সংখ্যায় সেগুলো সাড়ে ছয় হাজার তো হবেই। সেখানেও পরিবেশিত হয় ভারতীয় কারি।

তার বাইরেও ব্রিটেনে রয়েছে অসংখ্য ইংরেজ পরিবার যাঁরা ঘরেই নিজেদের কারি রান্না করে থাকেন। অনেকে অবশ্য ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে আধা রান্না করা খাবারের প্যাকেট এনে নিজেরাই বাকি রান্নার কাজটুকু সেরে নেন। কিন্তু পুরো রান্না নিজেরাই করেন এমন পরিবারও অনেক। দোকানে দোকানে কারির জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই পাওয়া যায়। যাবতীয় মশলা তো বটেই, সস, চাটনি, পাপড়—কোনও কিছুর অভাব নেই। যাঁরা মশলা গুঁড়ো করার ঝামেলা পোহাতে চান না তাঁদের জন্য রয়েছে রকমারি ব্রান্ডের কারি-পাউডার এবং কারিপেস্ট। তবে অনেকেই নাকি কারির সত্যকারের স্বাদের জন্য বিবিধ প্রাক-প্রণালী, রেডিও টিভির পরামর্শ মতো আগাগোড়া প্রস্তুতি পর্ব নিজেরাই সেরে নেন। তারপর রান্না।

সাহেব-মেমরা আজ কী পরিমাণ মশলা ব্যবহার করছেন তার আভাস মেলে দু একটি পরিসংখ্যানে। ১৯৯৬ সালে ভারত থেকে ব্রিটেনে যা মশলা রপ্তানি করা হয়েছিল তার দাম—ছিল ১৪.৪ মিলিয়ান পাউন্ড। আর ১৯৯৭ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮.৩ মিলিয়ান পাউন্ড। প্রতি বছর গড়ে দশ হাজার ছশো টন মশলা রপ্তানি করা হচ্ছে ভারত থেকে। অন্যদেশ থেকেও যাচ্ছে। ভারত থেকে যাচ্ছে প্রধানত গোলমরিচ, লঙ্কা, হলুদ, আদা, এবং কারি পাউডার । এ সম্পর্কে পরে আরও আলোচনার সুযোগ পাব আমরা। আপাতত কারি প্রসঙ্গেই ফেরা যাক।

ঘরে কেতাবি-কারি রান্না করতে হলে শুধু মশলাই যথেষ্ট নয়, চাই ডেকচি, কড়াই, খুন্তি, হাতা ইত্যাদি ভারতীয় রান্না ঘরের নানা সরঞ্জাম। হেরডস, সেলফ্রিডস, জন লুইস, উলওয়ার্থ ইত্যাদি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স থেকে পাক-প্রণালী, বোতল বা বাক্সবন্দি মশলার সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে বাসনপত্র। ইস্তক পরিবেশনের থালা। মজার কথা এই, বালতি-কুকিং কড়াই-কুকিং বলেও রান্না চালু হয়েছে ব্রিটেনে! বালতি-কুকিং শুরু হয় আশির দশকে, বার্মিংহামে। বালতি কি পাকিস্থানের বালটিস্থান থেকে? অনেকেই মনে করেন একটি ভারতীয় রেস্তোঁরা বালতি থেকে খাবার পরিবেশন করত বলেই এল—বালতি-কুকিং। কড়াই-কুকিং বা কড়াই-ডিশেসও, অনুমান করতে অসুবিধা নেই এসেছে রান্নার কড়াই থেকে।

একটি খতিয়ানে দেখা যায় ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে গড়ে কুড়ি লক্ষ ইংরেজ নারী-পুরুষ হানা দিয়ে থাকেন। প্রতি বছর তাঁরা কমপক্ষে দুই বিলিয়ান পাউন্ড খরচ করেন ভারতীয় রেস্তোঁরায়। অর্থাৎ কারির জন্য প্রতি সেকেন্ডে নজরানা গুণে দিতে হচ্ছে সাত পাউন্ড! তবে বলা হয় বটে ভারতীয় রেস্তোঁরা, কিন্তু কথাটার মধ্যে এক বিরাট ফাঁকি রয়েছে। এই সব 'ভারতীয় রেস্তোঁরা'র শতকরা আশি ভাগই কিন্তু আসলে বাংলাদেশি। আরও স্পষ্ট করে বললে শ্রীহট্টের সন্তান, সৈয়দ মুজতবা আলী যাঁদের বলেছেন—সিলেটি। বেঁচে থাকলে আজ তিনি নিশ্চয় নতুন করে লিখতে বসতেন 'সিলেটি সাগা'। এইসব রেস্তোঁরা (হোক না তাদের নাম দ্য জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন, দ্য গোর্খা তন্দুরি, কিংবা তাজমহল) বছরে ব্যবসা করে ১.৬ বিলিয়ান পাউন্ড পরিমাণ। বছরে সরকারকে বাংলাদেশি রেস্তোঁরা পরিচালকরা ট্যাক্স দেন ২৫০ মিলিয়ন পাউন্ড। টাকার অঙ্কে বললে কোটি কোটি টাকা। আর ওদের রেস্তোঁরায় কাজ করেন নাকি প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ। ব্রিটেনের ইস্পাত এবং খনিশিল্পেও এত মানুষ কাজ করেন না। কারি কোথায় পৌঁছেছে এই খবর থেকে সহজেই তা বোঝা যায়।

প্রসঙ্গত, একটা খবর উল্লেখ না করলে সাহেব-মেমদের প্রতি অবিচার করা হবে। তাঁরা শুধু পরের হাতে ঝাল খেয়েই তুষ্ট হচ্ছেন না। ভারতীয় উপমহাদেশের অভিযাত্রীদের উদ্যোগে গড়া এই কারির সাম্রাজ্যে তাঁরাও ইতিমধ্যে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওঁরা শুধু ভারতীয়দের তৈরি খাবারই বিক্রি করছেন না, নিজেরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে টন টন তৈরি খাবার বিক্রি করছেন। গরম, ঠাণ্ডা, জমানো—সব ধরনের খাবার। তবে রান্না ভারতীয় মেনু ও পাকশাস্ত্র অনুসারী। দু'চারটে পদ অবশ্য নিজেরাও সৃষ্টি করছেন। সেগুলোতে ভারত আর ব্রিটেনের যুগল স্পর্শ তার বাইরেও নানা অবিশ্বাস্য কাণ্ড। কারি রান্না নিয়ে 'শেফ' বা পাচকদের মধ্যে যে প্রবল প্রতিযোগিতার আসর বসে হেঁসেলের সেই লড়াইয়ে ১৯৯৮ সালে মাথায় বিজয় মুকুট পরানো হয় সারে-র তেত্রিশ বছর বয়স্ক পাচক নিয়াল গর্ডনকে। তাঁকে বলা হয়—'ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান শেফ অব দ্য ইয়ার! তার আগের বছর ন্যাশনাল কারি-শেফ খেতাব যিনি অর্জন করেন তিনিও একজন ইংরেজ। নাম তাঁর—সাইমন ম্যানর। গুরুমারা বিদ্যা আর কাকে বলে!

তাই বলে কি উপমহাদেশের ভাগ্যে কোনও পুরস্কারই মেলেনি? প্রথম তথা সর্বোচ্চ পুরস্কার তো এই কারির ব্রিটেন জয়। ভারতীয় রেস্তোঁরা বলতে যেমন বাংলাদেশি, পাকিস্তানী, ভারতীয়, উপমহাদেশের অধিকাংশ রেস্তোঁরাকে বোঝায়, তেমনই ভারতীয় কারি বলতে উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয়, গোয়ান, পশ্চিম ভারতীয় ভারতের প্রায় সব এলাকার রকমারি কারিকেই বুঝতে হয়। ভারতে যে কারিকে বলা যায় আঞ্চলিক বা বিশেষ এলাকার নিজস্ব কারি, সেই প্রাকৃত স্বাদ ও সৌরভ অপরিবর্তিত রেখেই ব্রিটেনে তা পরিণত হয়েছে প্রিয় ভারতীয় কারিতে। এক এক জাতির হেঁসেল এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশেষ, সেখানে সহসা বি-জাতীয় খাদ্য বা রান্না প্রবেশাধিকার পায় না। কিন্তু একটা সাম্রাজ্যগর্বী ব্রিটেন তা আর রক্ষা করতে পারল না, আগেই বলা হয়েছে ওই বিশেষ সংরক্ষিত এলাকায় ভারতীয় মশলাদার রান্নার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এবং ব্রিটেন সানন্দে আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় কারির কাছে। বিদেশে খাবারের মধ্যে এতকাল সেখানে বিশেষ সমাদর ছিল চিনা খাদ্যের। ফিস অ্যান্ড চিপস-এর মতো নুডল চাউমিনও আজ পিছু হটেছে। আর যতসব বিদেশি খাদ্যের চল আছে সেগুলো ইংরেজের চোখে 'এথনিক ফুড' বা দূরাগত বিশেষ সভ্যতা সংস্কৃতির বিশেষ অবদান। আর ভারতীয় কারি সেই রহস্যময়তা কাটিয়ে এখন ইংরেজের 'জাতীয় খাদ্য'। ১৯৯৬ সালের একটি সমীক্ষায় জানা যায় ব্রিটেনের শতকরা আটষট্টি জন মানুষ মাসে অন্তত একবার ভারতীয় রেস্তোঁরায় হানা দেন। তাঁরা সেখানে গড়ে ১৭.৯৩ পাউন্ড ভারতীয় খাবারের জন্য খরচ করেন। দেশের শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ নিজেদের ঘরে ভারতীয় খাবার রান্না করে খান। শতকরা চল্লিশ জন মানুষ মাসে অন্তত একবার দোকান থেকে ভারতীয় খাবারের প্যাকেট কিনে ঘরে ফেরেন।

দেশের শতকরা সাতষট্টি জন মানুষের পছন্দ ভারতীয় রেস্তোঁরা। অনুপাতটি চিনা রেস্তোঁরার তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি। এক কথায় ব্রিটেনে কারি-বিপ্লব সম্পূর্ণ। দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্তরে, হাউস অব লর্ডস-এ শুধু ন্যাশনাল কারি ক্লাবই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, প্রতিবছর ঘটা করে পালিত হচ্ছে 'ন্যাশনাল কারি ডে!'

এই চূড়ান্ত বিজয়ের পরই কারির বিজয়রথ থেমে যায়নি, অভিযানকারীদের পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের অন্য এক স্বর্গে। কারি বেশ কিছু কোটিপতির সৃষ্টি করেছে ব্রিটেনে। ১৯৯৮ সালে দুটি কাগজ এশিয়ার দুশো কোটিপতির একটি তালিকা প্রকাশ করে। তালিকায় ছিলেন বেশ কিছু কারি-সওদাগর। একজন বিহারের পারভিন ওয়ারসি। তাঁর দুই দুইটি কারখানা বা আধুনিক রন্ধনশালা। সেখানে কাজ করেন ছশো পঞ্চাশ জন সূপকার। সপ্তাহে দশ লক্ষ 'মিল' বা খাবার প্যাকেট সরবরাহ করেন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স বা বিপনি মালায়। ইউরোপের অন্যত্রও যায় তাঁর 'এস অ্যান্ড আ' প্রতিষ্ঠানের সুদৃশ্য প্যাকেটে বন্দি ভারতীয় খাবার। বছরে তাঁর বাণিজ্যের পরিমাণ পঞ্চাশ মিলিয়ান বা পাঁচ কোটি পাউন্ড। তিনি রাজকীয় সম্মানে ভূষিত। সরকার একশো উঠতি শিল্পস্রষ্টার তালিকায় তাঁকে ঠাঁই দিয়েছেন একুশ। ওঁকে ব্রিটেনে বলা হয় 'কারি কুইন'—'কারির রানি।'

তেমনই সেখানে রয়েছে 'কারি কিং,' কারির রাজা। ইনি নূর প্রোডাক্টস-এর প্রতিষ্ঠাতা জি. কে নূর। তৈরি খাবার দোকানে দোকানে সরবরাহ করার সঙ্গে ওঁর রেস্তোঁরাও রয়েছে। কুবের এশিয়ানদের তালিকায় তিনি পঁয়ত্রিশ তম আসনের অধিকারী।

আর এক কোটিপতি প্রয়াত লাখুভাই পাঠকের উত্তরাধিকারীর। পুত্র কিরীট আর পুত্রবধূ মীনা। ওঁরা রান্না খাবার বিক্রি করেন না। ওদের বাণিজ্য রকমারি চাটনি, পেস্ট, মশলা ইত্যাদি। বিশাল ব্যবসা। ১৯৯৪ সালে কোকা কোলা পর্যন্ত হার মেনেছে ওঁদের প্রতিষ্ঠানের কাছে।

কারি আরও অনেককেই কোটিপতি করেছে। চাল, ডাল, মশলা, বাসনপত্র—ইত্যাদির কারবারের সঙ্গে যুক্ত অনেক ভারতীয়, পাকিস্তানী, বাংলদেশি এবং ইংরেজ আজ কোটিপতি। এক কালের বাংলায় প্রবাদ ছিল চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি। এখন বড় বড় দামি গাড়ি নিজস্ব নাম্বার-প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে হাড়ি খুন্তির দৌলতে! প্রসঙ্গত বলা দরকার, বালতি কারি, কড়াই কারির মতো হাঁড়ি কারিও রয়েছে সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে।

কারি সম্পর্কে এ-পর্যন্ত যা কিছু খবর বলা হল সবই সম্প্রতি প্রকাশিত (১৯৯৯ সাল) একটি বই থেকে নেওয়া। বইটির নাম 'কারি ইন দ্য ক্রাউন।' লেখক শ্রাবণী বসু ('curry in the crown' Shrabani Basu, New Delhi, 1999)। শ্রাবণী বসু আনন্দবাজার পত্রিকা ও দ্য টেলিগ্রাফ পত্রের লন্ডন প্রতিনিধি। ভারতীয় কারির ইংল্যান্ড বিজয়ের খবর এদেশের মানুষের সম্পূর্ণ অজানা নয়। মাঝে মাঝেই এদেশের কাগজে প্রকাশিত হয় বিদেশে কারির বিজয়বার্তা। সেসব খুচরো খবর। শ্রাবণী বসু দুই মলাটের মধ্যে বন্দি করেছেন প্রাসঙ্গিক প্রায় যাবতীয় খবর। এবং সেসব শুধু সে দেশের কাগজপত্র থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করেননি, বিস্তর পরিশ্রম করে সরেজমিনে অনেক অজানা খবর সংগ্রহ করেছেন এই বইয়ের জন্য। তিনি ভারতীয়দের হেঁসেলে হানা দিয়েছেন, হানা দিয়েছেন নানা রেস্তোঁরায় এবং উঁকি দিয়েছেন বিপনিমালায়। তা ছাড়া কারির সাম্রাজ্য যাঁরা গড়েছেন সেই অজানা-প্রায় সংগ্রামীদেরও মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। এমন একটি তথ্য বহুল, সুখপাঠ্য বই পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য শ্রাবণী বসুকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বিনা অনুমতিতে তাঁর তথ্য ভাণ্ডার লুঠ করার জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী।

শ্রাবণী বসু লন্ডনে ভারতীয় রেস্তোঁরার কিছু ইতিহাসও শুনিয়েছেন। বলেছেন সেখানে ভারতীয় রান্না প্রথমে চালু করেন শ্রীহট্টের মাঝি মাল্লারা। সেইসব বাঙালি জাহাজিদের সঙ্গে অকূল দরিয়া পাড়ি দিয়ে ব্রিটেনে পৌঁছাতেন যেমন দক্ষিণ ভারতীয়রা, তেমনি ইংরেজ কর্মীদের পাশাপাশি কাজ

করতেন ফরাসি নাবিকরাও। প্রধানত নিজেদের খাবার হিসাবেই ওঁরা স্বদেশি পদ্ধতিতে রান্না করতেন। ক্রমে কোনও কোনও জাহাজি ওই সব ভারতীয় নাবিকদের জন্য বন্দর এলাকায় ছোটখাটো রেস্তোঁরা খুলে বসেন। কারির ইতিহাসের দুটি পর্ব রয়েছে। একটি আধুনিক কালের অন্যটি হারানো অতীতের। শ্রাবণী মনে করেন একালে প্রথম ভারতীয় রেস্তোঁরা 'দ্য স্যালুট হিন্দ।' প্রতিষ্ঠা কাল ১৯১১ সাল। দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালে। প্রতিষ্ঠাতা একজন অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান। রিজেন্ট স্ট্রিটের এই রেস্তোঁরায় দেশি-বিদেশি অনেক মহাজনেরই পদধূলি পড়েছে। রাজা, মহারাজা, ব্রিটেন ও ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, সংস্কৃতি ক্ষেত্রের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, কেউ বাদ নেই। আনন্দের কথা রেস্তোঁরাটি এখনও বেঁচে আছে। এবং সগর্বে। একালের অন্যান্য রেস্তোঁরার সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা তো আগেই দেওয়া হয়েছে। সামান্য সূচনা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে সংখ্যাটি বিশাল এক অঙ্কে পৌঁছেছে তাও বলা হয়েছে। কারির আধুনিক কালের প্রথম অধ্যায় থেকে একেবারে হালফিলের ইতিহাসের এখানেই ইতি।

পুরানো দিনের কারি-কাহিনী বলতে শ্রাবণী যা বলেছেন তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য দুজন মেম সাহেবের লেখা দুটি সংক্ষিপ্ত ভারতীয় পাক-প্রণালীর পাণ্ডুলিপি। সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে লন্ডনের 'ওয়েলকাম ইনস্টিটিউট অব দ্য হিস্ট্রি অব মেডিসিন' নামে একটি সংগ্রহশালায়। পাণ্ডুলিপি দুটির রচনাকাল ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল। প্রথমটিতে কারি-পাউডার তৈরির অনুপান ও কৌশল শিখিয়েছেন জনৈক মিসেস টার্নবুল। অবশ্য ভারতীয় রান্নার কৃৎ-কৌশলও নাকি রয়েছে সেটিতে। দ্বিতীয়টিকে একটি ভারতীয় রান্নার পাণ্ডুলিপি। সেটিকে বলা চলে—'কারি বুক।' তাতে তিনপাতা জুড়ে রয়েছে মিসেস হর্ন-এর ভারতীয় কায়দায় মাংস-কারি রান্নার কায়দা। তাছাড়া রয়েছে মিসেস হেনরি উডস-এর চিকেন-কারি প্রকরণ। সুতরাং কেমন করে বলা চলে যে ইংরেজ একালেই প্রথম কারির স্বাদ পেল?

আমরা আরও পেছনে তাকাতে চাই। উনিশ শতকেরও আগে, অষ্টাদশ শতকে। প্রয়োজনে আরও পিছনে। কিন্তু তার আগে 'কারি' দুই অক্ষরের জাদুকরি এই শব্দটির রহস্যভেদের চেষ্টা করা যাক।

কারি শব্দটি এখন বাঙালির মুখে অহরহ শোনা যায়। ঝোল, ঝাল, ব্যঞ্জন, রসা, ডালনা—এসব শব্দ যত শোনা যায় তার চেয়ে বুঝিবা বেশি শোনা যায়—কারি। অথচ এই শব্দটি মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে খাবার টেবিলের মতো এসেছে অনেক পরে, ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশার ফলে। মেগাস্থিনিস লিখেছেন ভারতীয়রা নানা রকমের মাংস ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে ভাত খায়। এ খাদ্য কারি নয় কি? ৪৭৭ অব্দে মহাবংশে কাশ্যপ সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি ভাত, মাখন আর 'কারিজ' খান। মূল পালিতে শব্দটা ছিল 'সূপ'। 'সূপ' পালি ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই রয়েছে। ইংরেজি ভাষায়ও তা চালু শব্দ এবং প্রিয় খাদ্য। মনে হয় শব্দটা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দ। এই সূপ থেকেই সংস্কৃতে সূপকার বা পাচক। সূপও কিন্তু এক অর্থে কারি। ইয়ুল আর বার্নাল সাহেবের বিখ্যাত অভিধান 'হবসন-জবসন'-এ বলা হয়েছে—কারি মানে তণ্ডুল জাতীয় কোনও শস্য, মাংস, মাছ, ফল সবজি মিলিয়ে এমন এক রসায়ন যা দিয়ে ভারতীয়রা তাদের প্রধান খাদ্য খায়। ওঁরা অনুমান করেছেন ভারতীয় মুসলমান এবং ভারতস্থ ইংরেজরা যে কারি খান তা পুরোপুরি ভারতীয় নাও হতে পারে। ওঁদের মতে মধ্যযুগের ইউরোপীয় খাদ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মশলাদার খাবার ভারতের কারিকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। তার মানে এই নয় যে ওঁরা ভারতে 'কারি' শব্দটির আদি অন্ত কিছু খুঁজে পাননি। ওঁরা বলেন কারি শব্দটি এসেছে তামিল শব্দ কারিয় থেকে। কন্নড় ভাষায় তামিল কারি পরিণত হয়—কারিল-এ। পর্তুগিজদের দৌলতে গোয়ায় এই কারিল-ই চলছিল। ওঁরাও কিন্তু স্বীকার করেছেন সংস্কৃত রন্ধন-শাস্ত্রে রকমারি কারি খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য ওই বিশেষ শব্দটি নয়, অনুপান

আয়োজন ও রন্ধন প্রকরণ। ইউরোপিয়ানরা সেই খাদ্য মাত্রকেই কারি বলতেন ভারতীয়রা যা দিয়ে মেখে ভাত খায়। অর্থাৎ, মাছ, মাংস, সবজির বা অন্যকিছুর 'স্টু' বা সেদ্ধ ঝোল। শুকনো করে রান্না করা হলে তাকে বলা হত 'ড্রাই কারি', আমরা যাকে বলি কষা বা চচ্চড়ি। ওই দুই পরিশ্রমী গবেষক জানিয়েছেন তৎকালে জাভায় ডাচরা কারি খেতেন। ক্যান্টনের মতো বন্দরে চিনারাও খেতেন—কারিল। ষোড়শ শতক থেকেই ইউরোপিয়ান পর্যটকরা ভারতে কারি-র প্রচলনের কথা বলে আসছেন। তাঁদের বর্ণনা থেকে কিছু কিছু অংশ শোনা যেতে পারে।

১৫৬৩ সালে একজন (গার্সিয়া) লিখছেন—ওঁরা (ভারতীয়রা) মুরগি এবং মাংসের একটা ডিশ রান্না করে। তাকে বলা হয় কারিল। ১৬০৬ সালে আর একজন (গোভিয়া) লিখছেন—ওঁদের (ভারতীয়দের) খাদ্য সাধারণত ভাত। তাতে তারা সুপ ঢেলে তা দিয়ে মেখে খান। রান্না করা সেই বিশেষ সুপকে ওঁরা বলেন—কারিল। ১৬২৩ সালে আর এক ইউরোপিয়ান ভ্রমণকারী (ডেলা ভেলা) লিখছেন ভারতের কারিল অনেকটা ইউরোপের 'হচ-পচ'-এর (hotch-potches) মতো। তাতে অনেক কিছুই থাকে। মাখন, নারকেল, বাদামবাটা রস, নানারকম সবজি, ফল এবং হাজার রকমের মশলাপাতি। খ্রিস্টানরা তদুপরি তার সঙ্গে যোগ করেন মাছ, মাংস, এমনকী ডিম পর্যন্ত। ১৬৮১ সালে আর এক ভ্রমণকারীও (নক্স) কারিতে ফল দেওয়ার কথা বলেছেন। ইনি নাকি কারিল না বলে সরাসরি বলেছেন 'কারি'।

আগেই বলা হয়েছে 'কারি' শব্দটির সঙ্গে পর্তুগিজদের বিশেষ সম্পর্ক। কারিল-এর বহুবচন হিসাবে ওঁরা ব্যবহার করতেন—কারিজ। হতে পারে তাই থেকে কারি। এসব তথ্য 'হবসন-জবসন' থেকে নেওয়া। উৎসাহী পাঠক খুঁটিনাটির জন্য বইটি দেখে নিতে পারেন। তবে অন্য সূত্রেও দেখতে পাচ্ছি সপ্তদশ শতকের একটি পর্তুগিজ রান্নার বইয়ে (Arte de Cozinha) ওঁরা কারি নয়, কারিল-ই ব্যবহার করছেন।

তবু সতেরো শতকে ইংরেজ পর্যটকের পক্ষে 'কারি' শব্দটির ব্যবহার অবশ্যই সম্ভব। কারণ, অন্তত একজন ইংরেজ, উইলিয়াম হকিনস ১৬০৮ সালে মুঘল দিল্লিতে বসে জানাচ্ছেন—'কারি'তে থাকে মাংস, মাছ, ফল, সবজি, নানা মশলা। তিনি আলাদাভাবে হলুদের উল্লেখ করেছেন, আর মশলাকে ইংরেজিতে মশলাই বলেছেন। তাই দিয়ে ওঁরা ভারতীয়রা রাশি রাশি ভাত উড়িয়ে দেন। ওঁর ভাষায়—" আ লিটল অব দিস গিভস আ ফ্লেভার টু আ লার্জ মেস অব রাইস!"

সুতরাং অষ্টাদশ শতকে ইংরেজের কাছে কারি চেনা ডিশ-এ পরিণত হলে তাতে বিস্ময়ের কী আছে? পর্তুগিজদের মতো ডাচদের কাছেও যথারীতি শব্দটি বিবর্তিত হতে থাকে। প্রথমে ছিল কেরি (kerrie) তারপর ক্যারি (karrie) এবং অবশেষে কারি (kari)। বস্তুত অষ্টাদশ শতকেই (১৭৮১) দেখি ভারতে এক ইংরেজ তাঁর ভারতীয় পাচককে হুকুম দিচ্ছেন, আজ ডিনারে আমার কারি চাই, এবং প্রচুর পরিমাণে। আমার বন্ধুর (রুম মেট) পেটে গোলমাল। তাঁর ভাগটাও আমার চাই। সেবছরই (১৭৮১) আর একজন কাব্য করে বলছেন, "দ্য বেঙ্গল স্কোয়াড হি ফেড সো ওয়ান্ডারাস, বারিং হিজ কারি টুক্, অ্যান্ড স্কট হিজ রাইস!"

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে খাস ইংল্যান্ডেও পৌঁছে গেছে কারি সমাচার। এমনকী কারি-পাউডার, কারি পেস্ট, কারি লিফ, —কিছুই আর পুরোপুরি অজানা নয়। তবে 'কারি'তে এদেশে ইংরেজের দীক্ষা সম্পূর্ণ হয় উনিশ শতকে। ইংল্যান্ডেও ততদিনে মাধ্যমিক পাঠ শেষ। সেই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ স্নাতক হল অবশ্য এত দিনে, সবে এই সেদিন। অথচ উনিশ শতকেই উইলিয়াম ম্যাকফ্যাসে থ্যাকারে তাঁর 'কিচেন মেলোডিজ'-এ (Kitchen melodies) কারি-র বন্দনা গেয়ে গেছেন এই চতুর্দশপদী লিখে (১৮৪৬)। তার কয়টি ছত্র শোনা যেতে পারে।

"Ps— Beef, mutton, rabbit, if you wish,
Lobsters, or Prawns, or any kind of Fish,
Are fit to make a curry. 'Tis, when done ,
A dish for Emperors to feed upon . "

দু'বছর পরে ১৮৪৮ সালে থ্যাকারে তাঁর বিখ্যাত 'ভ্যানিটি ফেয়ার'-এ (Vauity Fair) এক জায়গায় কথা প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন—'নাউ উই হ্যাভ সিন হাউ মিসেস সেডলি হ্যাভ প্রিপ্রেয়ারড আ ফাইন ক্যারি ফর হার সান।' মেম সাহেব ততদিনে শিখে গেছেন কারি রান্না করতে। এদিকে ভারতে তার অনেক আগেই (১৮১৬) কারি সঙ্গীত :

March to barracks where with joy
Their Masticators they employ
On curry, rice, and beef and goat
Voraciously they cram each throat.

('Quiz' The Grand Master of Adventure, of Qui Hi? in Hindustan, Quiz London, 1816)

অষ্টাদশ শতক থেকেই ভারতে প্রবাসী ইংরেজের খানার টেবিলে অন্যতম ডিশ ভারতীয় বাবুর্চির রান্না করা কারি। সাধারণ ইংরেজের কাছে এক আমোদ যদি বাইজির নাচ, তবে আর এক উপভোগ্য জিনিস কারি-র স্বাদ। উনিশ শতকে অনেক ধরনের ভারতীয় খাদ্যই উপভোগ করেছেন বিদেশি ঔপনিবেশিক অভিযাত্রীরা। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে এই কারি। সেকালের দুটি সাহেবি রান্নার বইয়েও দেখি ঠাঁই করে নিয়েছে ভারতীয় খাদ্য। তালিকায় কারিও বাদ নেই। প্রথমেই উল্লেখ করা যাক মিসেস ইসাবেল বিটন-এর 'দ্য বুক অব হাউস হোল্ড ম্যানেজমেন্ট' নামে এক কালের অতি জনপ্রিয় বইটির কথা । বইটির প্রথম প্রকাশ ১৮৪০ সালে। তারপর ১৯১০ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয়েছে। বইটি মূলত গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের বই। এই দেশের বিশেষ জল হাওয়ায়, সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে সদ্য আসা মেমসাহেব কীভাবে ঘর সংসার করবেন তারই বিস্তারিত আলোচনা। স্বভাবতই রান্নাঘরও বাদ পড়েনি। এই মেমসাহেব প্রধাণত ইংলিশ পাক-প্রণালী শিখিয়েছেন তাঁর নবীন বোনদের। তবে তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারেননি ভারতীয় কারি। তাঁর বইয়ে ভারতীয় পাঞ্চ, 'মুলিঘাটাউনি'র মতো রয়েছে চিকেন কারির কথাও।

সমকালের আর একটি বই ফ্লোরা অ্যান স্টিল এবং জি গার্ডিনার-এর লেখা 'দ্য কমপ্লিট হাউস কিপার অ্যান্ড কুক।' ফ্লোরা অ্যান স্টিল ভারতীয় জীবনের পটভূমিতে উপন্যাস লিখে এদেশে এবং স্বদেশে তখন খুবই জনপ্রিয় লেখক। বিজ্ঞাপনে তাঁকে এমনকী রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর সঙ্গে পর্যন্ত তুলনা করা হয়েছে তৎকালে। তাঁর বইটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে। তারপর নব নব সংস্করণ। আমি যে বইটি নেড়ে চেড়ে দেখেছি সেটি ১৯০৯ সালে প্রকাশিত সপ্তম সংস্করণ। এই বইটিও মূলত ঘরকন্নার ব্যাপারে বিস্তারিত পরামর্শ, ভারত নামক এই অকূল দরিয়ায় কী করে নির্বিঘ্নে সংসার নামক বজরাটিকে সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে নেওয়া যাবে, পাকা নাবিকের মতো তার-ই অনুপুঙ্খ নির্দেশ। গৃহসজ্জা, ভৃত্যকূল নির্বাচন ও নিয়োগ করা, আসবাবপত্র কেনা থেকে শুরু করে শিশুপালন, আকস্মিক বিপদে চিকিৎসা বিধান, ঘোড়া গোরু হাঁস মুরগি কুকুর প্রতিপালন, বাগান চর্চা—কী নেই তাতে? হ্যাঁ রান্নাবান্নার কথাও আছে বটে। আছে রান্নাঘর, ভাঁড়ার, পাচক এবং রন্ধন প্রণালীর কথাও। তবে এই মহিলাও প্রধানত ইংরেজি খানার অনুরাগী। অর্থাৎ খাদ্যের ব্যাপারে অনেক মেমসাহেবের মতো তিনিও রীতিমতো রক্ষণশীল। সুতরাং প্রধানত তিনি ইংরেজিখানাই রাঁধতে শিখিয়েছেন নবাগত বোনদের মারফতে ভারতীয় পাচকদের। তবে হেঁসেলে ভারতের

প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেননি। বইটি অবশ্য বিশাল। বইয়ে মাত্র দেড় পৃষ্ঠা খরচ করেছেন তিনি 'নেটিভ ডিশেস' বা ভারতীয় খাদ্যের জন্য। তাও নাকি 'অনুরোধ বশত' 'অ্যাডেড বাই রিকুয়েস্ট'। মিসেস বিটন আনারির মতো লিখেছিলেন ইলিশ মাছ নাকি বলতে গেলে অবিকল ম্যাকারেল-এর মতো। (সামন এবং হেরিংয়ের সংকর বললে তবু একটা কথা ছিল!) অ্যান স্টিল সে ধরনের কোনও উদ্ভট কথা শোনাননি। অন্তত আমার চোখে পড়েনি। তিনি পোলাও (Pilau) কিডগিরি (Kidgirre), ডাল (Dal), ডালপুরি (Dal Puri), ভর্তা (Burtas), কুলিয়া যক্ষিণী স্টু (Kulleah Yakhanne), দমপোক্ত (Dumpoke) এমনি গুটিকয় ভারতীয় রান্নার কথা বলেছেন। কারি বলতে তিনি বলেছেন একমাত্র আমিষ ডিশ—ফিস কারি (Curry Fish) আর নিরামিষ কারি 'চিটচিকি কারি (Chitchkee) ব্যস! বোঝা যায় খানদানি মেমসাহেবরা প্রবল অবরোধের মধ্যেও সহসা নিজেদের দুর্গটিকে রক্ষা করতে চাইছেন। হেঁসেল নয় তো, যেন তাঁরা বাঁচাতে চাইছেন লখনৌ-এর ব্রিটিশ রেসিডেন্সি।

রেসিডেন্সি অবশ্য ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু এদেশে ইংরেজের খানার টেবিলের যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে নির্দ্বিধায় বলা চলে হেঁসেলের এই প্রতিরোধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়, কারির কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেন এদেশের ইংরেজ। তাঁদের বিবিরাও ব্যতিক্রম নয়। আমিষ ও নিরামিষ কত রকমের কারি যে ওঁরা উপভোগ করেছেন তার লেখা জোকা নেই।

আরও দুটি পুরানো সাহেবি রান্নার বই দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। প্রথমটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। নাম 'দ্য অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান কুক, কনটেইনিং রেসেপিস ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল কুকারি।' লেখকের নাম নেই। ছোট্ট বই। তার অনেকখানি জুড়েই সাহেবদের সেই 'রোস্টিং' আর 'বয়লিং', সেদ্ধ পোড়া আর ভাজা। কিন্তু ভারতীয় খাদ্যের কথাও আছে। হালকা পোলাও (Light Pulo), যক্ষী পোলাও (Yakhi Pulo), আনারস পোলাও (Ananass Pulo) ইত্যাদি রকমারি পোলাও-এর কথা আছে (পোলাও-এর ইংরেজি বানানও রকমারি), আছে খিচুরি (Kichry) মুরগি রোস্ট (Fried Foul of Muhammed Shah Kormah) খাজিনা ওমলেট (Khajina omelette) ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে কাবাব পছন্দ, হুসেনি কাবাব, দো-পিয়াজা, নৌশের মহল, বাখরখনি, চাপাটি, বেগুনভাজা, তেঁতুল পাতার চাটনি ইত্যাদি। কারির তালিকাটি রীতিমতো বৈচিত্র্যময়। যথা ফাউল কারি (Fowl Curry), কলার কারি (Plain Plantain Curry) ইচড়ের কারি (Jack -fruit curry) টক কাঁচকলার কারি (Sour Plantain curry) বেগুনকারি (Brinjal Curry) ইত্যাদি। সাহেবরা বুঝিবা বাঙালির নিরামিষ ডালনাও খেতে শিখে গেছেন!

দ্বিতীয় বইটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত। কবে, সেটা জানা নেই। এক শিলিং দামের এই বইটির নাম 'নাববস কুকারি বুক'। লেখক পি. ও. পি। (Nabobs cookery Book, Manual of East and West Indian Recipes, P. O. P) বইটিতে যেন কারির প্রদর্শনী। কারি সুপ, নারকেলের সুপ, লর্ড ক্লাইভের কারি, মালয় কারি, কাবাব কারি, সবজি কারি, শুকনো কারি, রকমারি চিংড়ি কারি, মাদ্রাজ কারি, বেঙ্গল কারি, জে. পিজ কারি, আওয়ার কারি বা ওঁদের নিজস্ব কারি, মিসেস ডব্লিউ' স কারি ইত্যাদি। নবাব এবং কারির বানান দেখে মনে হয় বইটি আগে উল্লেখ করা বইটির তুলনায় বেশ পুরানো। সম্ভবত এই বইয়ের লেখক ইতিমধ্যে আধা ভারতীয় বনে গেছেন। তিনি কারির ভাত, পোলাও, পিস পাস (Pish Pash) রান্নার কথাও বলতে ভোলেননি।

একালের এমন কিছু কিছু ভারতীয় রান্নার বই প্রকাশিত হয়েছে যার পাতায় সেকালের ভারতের রান্নাবান্নার কথাও আছে। বিশেষ করে ভারতে ইংরেজদের খানা পিনার কথা। এমন একটি বই প্যাট চ্যাপম্যানের 'টেস্ট অব দ্য রাজ' (Taste of the Raj, Pat Chapman, London, 1997) চ্যাপম্যানের কথা আগে বলা হয়েছে। একালের ব্রিটেনে তিনি কারির জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য অনেক কাণ্ডই করে

চলেছেন। দেশময় কারি ক্লাবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর এ বইটিও বলতে গেলে কারি-র প্রচারপত্র। ওঁদের পরিবারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কয়েক পুরুষের। কোম্পানির আমল থেকে একেবারে একাল পর্যন্ত অনেকেই রাজ-সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজেও অনেকবার এদেশে এসেছেন। সুতরাং, তাঁর এধরনের একটি বই প্রকাশের অধিকার আছে বই কি।

বইটির আদি আর একটি বই। চ্যাপম্যানের ভারতপ্রবাসী ঠাকুরমার একটি রান্নার বই ছিল। বইটির নাম 'ইন্ডিয়ান কুকারি বুক। লেখক পঁয়ত্রিশ বছর এদেশে আছেন এমন কেউ, 'আ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্ট।' কলকাতা থেকে ১৮৭৭ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিল থ্যাকার স্প্রিঙ্ক। ঠাকুরমার বইটি ছিল ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ষষ্ঠ সংস্করণ। ভদ্রমহিলা নিজেও বইটিতে বেশ কিছু ভারতীয় রান্না যোগ করেছিলেন। মূল বই, ঠাকুরমার সংযোজন এবং নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়েই কারি প্রেমিক চ্যাপম্যানের এই নতুন বই।

চ্যাপম্যান ইংরেজ রাজত্বকালে প্রচলিত যেসব কারির উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আছে: চিকেন গ্রেভি কারি, দো পিঁয়াজা, কিমা কারি, কোপ্তা কারি, মালয় কারি, (প্রসঙ্গত তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন মালয়ে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৬ সালে।) পর্তুগিজ কারি, ভিন্দালু, (এর কথা আগেই বলা হয়েছে)। এগ কারি উইথ গ্রিন পিজ (অর্থাৎ কড়াইশুঁটি দিয়ে ডিমের কারি) এবং সিম, আলু মটরের নিরামিষ কারি। এখানে উল্লেখ করা দরকার যেসব বই থেকে এখানে কারির কথা লেখা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে রান্নার উপকরণ এবং প্রণালীও বলে দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে রান্না শেখানোর চেষ্টা করছি না, ইংরেজদের সঙ্গে পূর্বাপর কারির সম্পর্কই আমাদের আলোচ্য। সেইসঙ্গে এদেশে তৎকালে ইংরেজরা অন্য যেসব ভারতীয় ডিশ উপভোগ করেছেন, তার কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। চ্যাপম্যানের বইয়েই আরও কয়টি কৌতূহলোদ্দীপক ডিশের নাম রয়েছে। যথা রাম্বল-টাম্বল, স্ক্যান্ডেল ডগস, (অর্থাৎ স্ক্রেম্বলড বা ভাঙ্গা ডিমের রান্না চচ্চড়ি বিশেষ), জলি বয়েজ, খুম্বি থুম্বি, কেডাগিরি, ইত্যাদি। ইনিও অবশ্য আলুভর্তা বা আলুভাতে, চাপাটি, পাকোরা, লস্যি, প্রভৃতি ভারতীয় খানার উল্লেখ করেছেন। সাহেবরা, বলাই বাহুল্য, সব প্রাণভরে খেতেন। আমাদের মনে হয় এই সব খাদ্যের মধ্যে ইংরেজি শব্দ বন্ধের পদগুলো খাঁটি ভারতীয় খাদ্য নয়, মূলত পূর্ব-পশ্চিমের মিশ্র অবদান। অর্থাৎ, অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান।

'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ফুড অ্যান্ড কাস্টমস' নামে সম্প্রতি কালে প্রকাশিত একটি বইয়েও সাহেবি আমলের বেশ কিছু জনপ্রিয় ডিশের কথা বলা হয়েছে। (Anglo-Indian Food and Customs, Patricia Brown, New Delhi, 1998) তাঁর বইয়ে কারি ছাড়া অন্যান্য ডিশের নাম: চিকেন কান্ট্রি ক্যাপ্টেন, জংলি পোলাও, তন্দুরি, পর্ক-ভুনি, টম্যাটো পোলাও, খিচুরি, মাটন বিরিয়ানি, মাটন মুলিঘাটাউনি, মুসুরি ডাল, ফিরনি এবং মশলা ফ্রায়েড বোম্বে ডাক। শেষোক্তটি শুটকি মাছ। এতগুলো বইয়ের মধ্যে একমাত্র এই বইটিতেই শুটকি মাছের উল্লেখ চোখে পড়েছে।

এই ভদ্রমহিলা নিজে অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান। এ দেশেই জন্মেছেন, বড় হয়েছেন। এখন অবশ্য বিদেশে। কিন্তু ভারতীয় খাদ্যের প্রতি ঝোঁক তাঁর এখনও প্রবল।

আর একজন অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান লেখিকা জেনিফার ব্রেনাম। এই ভদ্রমহিলার মা এবং দিদিমা ছিলেন কলকাতার মানুষ। বাবা কাজ করতেন উত্তর পশ্চিম ভারতে এখন বিদেশে। ইংরেজ আমলে ভারতে ইংরেজদের খাওয়া দাওয়া নিয়ে সুন্দর একটি বই লিখেছেন তিনি। বইটির নাম —'কারিজ অ্যান্ড বিউগাল।' (Curries and Bugles, A Cook-Book of the British Raj, Jenuifer Brennam, New Delhi, 1990) বইটিতে বাড়িতে, ক্লাবে হোটেলে, ডাক বাংলায়, ছাউনিতে, ক্যাম্পে, শিবিরে, সাহেব মেমরা কী খেতেন, কী তার অনুপান, মশলা রন্ধন প্রণালী সবই বলা হয়েছে। বইটিতে এমনকী চলমান রেলের গাড়ির খাবারের কথাও বাদ পড়েনি। সব মিলিয়ে উপভোগ্য বই।

বইয়ের নাম থেকেই বোঝা যায়, এই বইয়ের অন্যতম প্রতিপাদ্য—কারি। প্রচলিত সাধারণ কারি ছাড়াও উল্লেখ করেছেন কিছু অন্যধরনের ডিশ। যেমন রেলপথে মিলত নিজস্ব 'রেলওয়ে ল্যাম কারি,' 'ফাস্ট ক্লাস চিকেন ফ্রিকাসে' (First class chicken Fricassée) , ভুনা চিকেন (Bhuna Chicken)। ইত্যাদি। ক্যাম্পের খাদ্যের মধ্যে ছিল 'ক্যাম্প সুপ', 'বাইগন মশলা', 'কিমা মটর' 'চিক পি' স্মোকড ফিস, সালাড, ইন টম্যাটো কাপ (Chick Pea and smoked Fish salad in Tomato cups) ইত্যাদি। ঘরে বাইরে কারি গোত্রের আর যেসব ডিশের বিবরণ রয়েছে তাঁর বইয়ে তার মধ্যে আছে: মাদ্রাজ ক্লাব কোর্মা, শাক-গোস্ত, আম-মুরগি-বোম্বে, হানি/লাইম স্পাইসড গ্রিলড চিকেন, পাঠান চিকেন, পোলাও, চিকেন স্টাফড উইথ অ্যাপ্রিকট, স্টিমরোলার চিকেন, স্পাইসড বিফ, সার্ডিন কারি পাফস, শামিয়ানা চিকেন লিভার পাতে (Liver pâté) পলো পিলাফ (Pilaff) অ্যালাব্যাস্টার চিকেন (Alabaster chicken), চিকেন হট-পট, ইত্যাদি। ইংরেজর অন্যান্য যেসব ভারতীয় চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় আস্বাদ করে ক্রমে আসক্ত হয়ে পড়েন এই বইয়ে তার তালিকা দীর্ঘ। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন ডাল চচ্চড়ি , আলু-পরোটা, আলুর চপ, সামোসা, পাপড়, নিম্বুপানি, নানরুটি, পাপড়, কাসুন্দি কুলপি মালাই, রাবড়ি, খোয়া, লাড্ডু, বরফি, জিলাপি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৎকালের এবং একালে লেখা ইংরেজ আমলের যে কোনও রান্নার বই নাড়াচাড়া করলে বোঝা যায় অন্য সব ভারতীয় ডিশ হয়তো সর্বত্র সমান খাতির পায়নি, তবে কারি ছিল ব্রহ্মের মতো সর্বব্যাপ্ত। উত্তর, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে স্থানীয় রুচিভেদের প্রভাব পড়েছে ঔপনিবেশিকদের রান্নাঘরেও । কারিও এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। কিন্তু সর্বত্র, সর্বাবস্থায় সাহেব-মেমদের খানার টেবিলে হাজির নানারূপে, নানা রঙে, সেজে সুরভিত কারি। ডেভিড বার্টন-এর 'দ্য রাজ অ্যাট টেবিল'-এ মাংসের কারি, মাছের কারি, সবজি কারি—যথারীতি হরেক কারির বিবরণ রয়েছে। কত রকমের কারিই না চেটেপুটে খেয়েছেন সাহেব বিবিরা! বুনো হাঁসের কারি, কুইল কারি (Quail Curry) ডাল কারি, ডিম কারি, ফিস কারি, ফিস আমচুর কারি, চিকেন কারি, সিলোন কোকোনাট কারি, পিসেস ফ্রামজিস চিকেন কারি টম্যাটো, কিড কারি, হুশেইনি কারি, মিসেফ বিটনস চিকেন কারি উইথ চিকপিজ (অর্থাৎ চানা বা ছোলা কারি) তাছাড়া মিটবল কারি, কিমা কারি, টার্কি রোস্ট, পিকক রোস্ট বা কারি, খরগোস কারি এসব তো আছেই। তিনি নানা সূত্র থেকে যেসব নিরামিষ কারি উদ্ধার করেছেন তার মধ্যে রয়েছে, ক্যাপসিকাম কারি, ব্রিঞ্জল বা বেগুন কারি, এমনকী ড্রামস্টিক কারি পর্যন্ত। ড্রামস্টিক মানে সজনে ডাটা। অবশ্য ড্রামস্টিক বলতে অন্তত একজন লেখিকা মুরগির পায়ের হাড়কেও উল্লেখ করেছেন। যথারীতি তাঁর বইয়েও কোর্মা, কাবাব, ভর্তা, বড়া, (যেমন ডালবড়া), ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। রয়েছে সেই মুলিঘাটাউনি, কেডগিরি এবং ভিন্দালুর কথা।

সাহেব-মেমরা তৎকালে এত রকমের কারির উপকরণ কোথায় পেতেন, সে এক প্রশ্ন বটে। উত্তর একটাই । অঞ্চল ভেদে প্রাকৃতিক কারণে প্রাপ্তিযোগে তারতম্য ঘটলেও এদেশে শাসক শ্রেণীর অন্তত কোনও কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁরা রাজার জাত। প্রজাকুল প্রভুদের সেবার জন্য সদাই প্রস্তুত। তাছাড়া প্রকৃতিও অনুকূল। সম্পন্ন এবং শক্তিমান বিদেশিদের পক্ষে সংগ্রহযোগ্য মাছ মাংস সবজি সবই মজুত। অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকে শুধু হাতি আর বাঘ ভালুক মেরেই হাতের সুখ মেটাননি তাঁরা, বিস্তর হরিণ, বুনো শূকর, সম্বর, নীলগাই, বুনো খরগোস ইত্যাদি খতম করেছেন ওঁরা। বুনো শূকর শিকার তো এদেশে সাহেবদের কাছে ছিল শিকার-পরব। স্বদেশে পরব যেমন—শেয়াল শিকার। ভারতে শিকার নিয়ে বেশ কয়েকটি সাময়িকপত্রও প্রকাশ করেছেন ওঁরা। কার্টন লিখেছেন—১৮৭৮ সালে একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী চার ঘণ্টায় শিকার করেছিলেন তিনশো পাখি (snipe)। ১৯২০ সালে আর এক বীরপুঙ্গব একদিনে ধরাশায়ী করেছিলেন আটশো বুনো হাঁস

(duck) শিকার শেষে দেখা গেল বন্দুকধারী শিকারির সামনে হাজার হাঁসের প্রাণহীন শব! স্বাধীনতার মুখে কলকাতার সাহেবদের এক খেলা ছিল লবণ-হ্রদে পাখি শিকার। পাখি বলতে প্রধানত বালি হাঁস, পাতিহাঁস, এই সুখাদ্যম। এদেশীয় গরিবরাও সাহেবদের জন্য হাঁস মুরগি পায়রা ছাড়াও নানা রকমের ভোজ্য পাখি পুষতেন। সাহেবি বাজারে সেসব পাখি বিক্রি হত। সাহেবপাড়ায় বাঁকে ঝুলিয়ে নিজেরাও ফিরি করে বেড়াতেন। বলতে গেলে স্বাধীনতার পরেও কলকাতায় চালু ছিল এই রেওয়াজ।

সাহেবদের ক্ষুধা যেন তবু মেটে না। এদেশে টার্কি পাওয়া যেত না। সুতরাং, বড়দিন উপলক্ষে অষ্টাদশ শতক থেকে টার্কি আমদানি শুরু হয় আমেরিকা থেকে। এখানেও চাষের চেষ্টা চলে। সে টার্কির দাম বেশি পড়ে সুতরাং বিনাশ করো সহজলভ্য ভারতীয় ময়ূর। তবু বুঝি বা মাংসের ক্ষুধা মেটে না। অনেক সাহেব বাড়িতে হাঁস মুরগি পায়রা পুষতেন। কেউ কেউ ছাগল ভেড়াও। উনিশ শতকে কোনও কোনও শহর গঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মাটন ক্লাব।' সেখানে গরমের দেশে মাছ মাংস বেশি দিন সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব হয় না। সুতরাং এক দম্পতির পক্ষে একটা আস্ত খাসি কিংবা ভেড়া কাটা মানে অপচয়। তা-ই সমবেত উদ্যোগ ক্লাব, ভাগাভাগি করে নেওয়া। উনিশ শতকে অনেক ইংরেজ বাহিনীর নিজস্ব ভেড়া পোষার বন্দোবস্ত ছিল। ১৮১০ সাল নাগাদ 'মাটন ক্লাব'-এর অবলুপ্তি ঘটে। সব ধরনের মাংসেই কারি রান্না হত। নানা নামে, নানারকম কারি। সেকালে সাহেবের রসুইখানায় কারির সুবাস, কারির সৌরভ বাইরেও। ডাঙ্গায় কারি, জলে কারি। সামরিক এবং অসামরিক নৌবহরে প্রিয় ডিশ কারি। সেনা বাহিনীতেও। বিশ শতকের প্রথম দিকেও সেনা বাহিনীর মেসে সপ্তাহে দু'দিন পরিবেশিত হত কারি। সুতরাং, কারির বংশ-লতায় স্যান্ডহার্স্ট কারি থাকবে, তাতে আর বিস্ময় কী। বিস্ময়কর ঠেকে এদেশে মাংস নিয়ে সাহেবদের পাগলামি। অফিসের সামনের মাঠে সাহেবি-কেতায় লালিত একটি গোরু কাটা হয়েছে। সবাই ভাগাভাগি করে মাংস নেবেন, স্থানীয় কাগজে সেকথাই বলা হয়েছিল বিজ্ঞাপনে। সাহেব তাঁর ভারতীয় পাচককে হুকুম দিলেন মাংস নিয়ে আসতে। তারপর প্রভু-ভৃত্যের কথোপকথন।

'Cook,'

'yes, sir',

'Cook, I have eaten 12, 39, or 364 chickens since we last had meat.'

'yes, sir,'

'I do not wish this meat to he finished or go bad in one day or two, for I have no wish to eat another chicken until I must.'

'Yes sir'

'I will eat the liver for lunch

'I will eat the brain for dinner followed by the grilled fillet or tournedos.

'I will have kidneys and bacon for breakfast.

'I will have steak and kidney pudding or pie for lunch tomorrow and roast meat (sirtoin or fillet) for dinner tomorrow which I will eat cold the next day.

'In the meantime you will he preparing the oxtail and the tongue and this piece of silverside or brisket we will put into salt and I shall eat them next week. ...

'Yes sir,'

'In fact I shall even be glad to see chicken on sunday next.'

'No, sir.'

'Perhaps you are right.'

(A Household Book for Tropical Colonies, E. G. Bradley, London 1948, Quoted in `The Raj at Table.')

ওঁদেরই বোধ হয় বলা চলে সত্যকারের মাংসাশী। এ যেন রাক্ষুসে হুংকার হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মাংসের গন্ধ পাঁউ!

অথচ খাদ্যের জন্য এমন ক্ষ্যাপার মতো খুনখারাপি করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বাজারে সবই পাওয়া যেত। দামও বেশ শস্তা। ১৭৭৯ সালে মিসেস ফে কলকাতায় বসে লিখছেন—খাবার জিনিস এখানে খুবই শস্তা। একটা আস্ত ভেড়ার দাম ২টাকা, ছোট ভেড়া ১ টাকা। ৬ টা ভাল মুরগি বা বড়সরো ভাল হাঁস—১ টাকা। ১২ টা পায়রার দামও ১ টাকা। ১ টাকায় এখানে ১২ পাউন্ড রুটি মেলে। দুই মাস আগে ১ পাউন্ড সরেস চিজ বিক্রি হচ্ছিল অবিশ্বাস্য চড়া দামে, ৩/৪ টাকায়, এখন অবশ্য আবার ১ টাকা থেকে ১ টাকা ৮ আনায় পাওয়া যাচ্ছে।... ইত্যাদি (Original letters from India, Mrs. Eliza Fay, New Edition, New Delhi...)।

হরিহর শেঠ তাঁর 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, কথায় ও চিত্রে' (১৯৫২) সেকালের কিছু কিছু বাজার-দর উদ্ধৃত করেছেন। ১৮০৫ সালের কলকাতায় জিনিসপত্রের দাম ছিল চাউল ১ টাকায় ৮০ থেকে ১৬০ পাউন্ড, গম ১ টাকায় ৬০ থেকে ৮০ পাউন্ড, দুগ্ধ টাকায় ৬০ থেকে ৮০ পাউন্ড, একটা ভেড়া ১ টাকা থেকে ১৬ টাকা, হস্তি ৩০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা, ছাগল ৮ আনা, দুধওয়ালা হলে ১টাকা, পাঁঠা একটা ৪ আনা, মুরগি টাকায় ৩০ টা, হংস টাকায় ১০ টা, পারাবত টাকায় ১০/১২ টা, ডিম্ব টাকায় ৪০/৫০ টা ইত্যাদি।

কলসওয়ার্দি গ্রান্ট লিখেছেন (Anglo Indian Domestic Sketch) ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহের পরে কলকাতায় জিনিসপত্রের দর হঠাৎ বেড়ে যায়। চমৎকার একটা মুরগির দাম নাকি তখন ৮ আনা, ছোট হলে ৩ আনা, ভাল রাজহাঁস ১ টাকা, সাধারণ রাজহাঁস হলে ১০ আনা, টার্কি ৪ টাকা থেকে ৮ টাকা, খরখোস ১২ আনা, বুনো হাঁস ৮ আনা, টিল ৩ আনা, ২৪ টি স্পাইন ১ টাকা, ভেটকি, (সাহেবরা কিন্তু লিখতেন ভেকটি, Bhektiee) খুব বড় হলে ৮ আনা, ইলিশ ৬ আনা, ১০০ তপসে ৩ টাকা! গ্রান্ট তবু লিখছেন, কী মাগ্যি গণ্ডার বাজারই না হল! ১ টাকা এখন ২ শিলিংয়ের সমান, ১ আনা এক ১/৮ পেনি।

ভাবতে অবাক লাগে বৈচিত্র্যময় এই সব ডিশ সাহেবদের টেবিলে যা খিদমদগাররা হাজির করতেন তার পেছনে ছিলেন ভারতীয় পাচক, তৎকালে যাঁদের বলা হত বাবুর্চি। কেউ কেউ লিখতেন—'বোবাজি' (Bobajee)। হেঁসেল সামলাবার কাজ অনেক সময় খানসামারাও করতেন। 'কুক'কে কেউ কেউ 'খানসামা' বা (Khansama) বা 'খানসামের'ও (Khansamer) ব্যবহার করেছেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে একজন বাবুর্চি বা খানসামার মাসে বেতন ছিল বড়জোর পাঁচ টাকা। অবশ্য অ্যান স্টিল-এর মতো পরামর্শদাতারা বলেছেন ওঁরা ডাহা চোর। সুযোগ পেলেই চুরি। অন্য একজন বলেছেন চুরি করার সুযোগ মেলে যদি বাজার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। লর্ড কার্জন-এর একজন খানসামা হিসাব দিয়েছিলেন লাট সাহেব এক মাসে ৫৯৬টি মুরগি খেয়েছেন। মুরগির ব্যবসায়ীর কাছে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সে মাসে রাজভবনে মুরগি এসেছিল ২৯০ টি! তবু তাঁদের ছাড়া চলে না। ভৃত্য-বাহিনীতে বাবুর্চি ছিলেন অপরিহার্য। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের নিয়োগ করা হত। আগে যে সাহেবের ঘরে কাজ করেছেন তাঁর চিঠি বা প্রশংসাপত্র দাখিল করতে হত। সে ধরনের চিঠি নাকি বিক্রিও হত। একের প্রশংসাপত্র কখনও কখনও অন্য ব্যবহার করতেন। নিয়োগের পর রাগী কিংবা বদরাগী সাহেব-মেমের পাল্লায় পড়লে হেনস্তার শেষ ছিল না। কারও কারও ভাগ্যে সেই পুরাতন ভৃত্যের অবস্থা— 'যত পায় বেত, না পায় বেতন'। 'ইউ সুর'! (শূকর) 'ইউ গুডহা!' (গাধা) 'ইউ উল্লু' (পেঁচা) এসব গালমন্দ তো ছিলই, কখনও কখনও উত্তম মধ্যমও মিলত। এরকম বদরাগী এক দম্পতির হঠকারিতার ফলে পাচক যখন পালিয়ে যান, তখন সেই বালিকাবধূ আর তাঁর

স্বামীর কী হাল হয়েছিল তা শুনিয়েছেন ওই এ এম ফ্রাঙ্কলিন নামে একজন লেখক। (উইফস কুকারি বুক) বেচারা কখনও হেঁসেলে ঢোকেননি। সুতরাং, রুটি মাখন দিয়ে ব্রেকফাস্ট যদি বা কোনও মতে সারা গেল, লাঞ্চ টাইমে মেয়েটি নাকের জলে চোখের জলে একাকার। ক্ষুধার্ত স্বামী অফিস থেকে ফিরে এসে যা দেখলেন তাতে তাঁর চোখ চড়কগাছ। রান্নার নামে অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসেছেন তাঁর সদ্য এদেশে আসা বউ। সে বস্তু মুখে তোলেন সাধ্য কার।

সুতরাং বুদ্ধিমানরা ধৈর্যশীল হতেন। খানসামা বাবুর্চির প্রতি সহানুভূতি দেখাতে তাঁদের আপত্তি ছিল না। কেউ কেউ রীতিমতো স্নেহশীল পিতা বা মাতার মতো আচরণ করতেন। এমন বাবুর্চিও ছিলেন যাঁরা পুরুষানুক্রমে ইংরেজ পরিবারের সেবা করেছেন। স্বভাবতই তাঁরা এক অর্থে পরিবারের একজন বলে গণ্য হতেন। তবে এমন ভাগ্যবানের সংখ্যা খুবই কম ছিল বলে মনে হয়। অধিকাংশকেই এমন পরিবেশে কাজ করতে হত যাকে অনুকূল বা আদর্শ পরিবেশ বলা চলে না। কোনও কোনও মেমসাহেব অনবরত নির্দেশ দিয়ে যেতেন। কেউ কেউ এমনকী ভারতীয় কারি কী করে রাঁধতে হয় ওস্তাদের মতো বাবুর্চিকে তারও নির্দেশ দিতেন। ফলে প্রায় গোলমাল হয়ে যেত। ফলে গঞ্জনা। তাছাড়া ভাষার সমস্যাও ছিল। উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথার পাঠকরা জানেন কলকাতায় জাস্টিস হাইড-এর পাচক ওয়ালনাট নিয়ে কী কাণ্ড করেছিলেন। হাইড সাবেবের এক বন্ধু রংপুর থেকে এক বস্তা ওয়ালনাট পাঠিয়েছিলেন। বস্তুটি সাহেবের খুব প্রিয় ছিল। তিনি খানসামাকে বললেন প্রতিদিন অল্প সস তৈরি করে খানার টেবিলে হাজির করতে। যতদিন ফুরিয়ে না যায় ততদিন অল্প অল্প করে পরিবেশন করতে হবে, এই ছিল হাইড সাহেবের নির্দেশ। তিনি বই থেকে চোখ না তুলে বিড়বিড় করে এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে, বাবুর্চি ঠিকমতো কিছুই বুঝতে পারেনি। তাঁর কানে কেবলই বাজতে লাগল কয়টি শব্দ; বয়েলিং পিলিং, মিল্ক, পুডিং! ফলে এক মাসের বরাদ্দে তৈরি হল বিশাল এক পুডিং! ইউ আন অ্যাকাউন্টেবল বিস্ট! ইউ ব্রুট উইদাউট প্যারালাল!... সাহেব বুঝিবা রেগে ফেটে যান।—ওহ্ ইউ কার্সড ফুল! ইউ অ্যাবোমিনেবল স্টুপিড অ্যাস!... 'ড্যাম ইউ, ইউ বিস্ট!' ইত্যাদি। ভাগ্যিস সেদিন ওঁর ঘরে বাইরের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা ছিলেন, না হল কী হত কে জানে!

আগেই বলা হয়েছে এমন সহনশীল গৃহপতিও ছিলেন যাঁদের সহ্য করার ক্ষমতা ছিল যেমন অফুরন্ত, তেমনই সেই সঙ্গে ছিল রসবোধ। ছদ্মনাম লেখক 'এহা' (Eha) তাঁর বিহাইন্ড দ্য বাংলো (Behind the Bunglo) বইটিতে ডোমিঙ্গো নামে এক কুকের চরিত্র-চিত্র এঁকেছেন যা পড়লে না হেসে পারা যায় না। ওই রসুইকার প্রতিদিন নিজের মতো করে লিখিত মেনু পেশ করতেন টেবিলে। ইংরেজি ভাষায় লেখা সেসব ডিশ-এর নাম এবং বানানের আসল খানা এবং ভাষার দূরত্ব সাতসমুদ্র তেরো নদীর এপার ওপার!

রসিক সাহেব আদৌ মাথা গরম না করে ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি ফুটিয়ে অনেক সময় উপভোগ করতেন খানসামা বা বাবুর্চির ইংরেজি বিদ্যা। যথা : 'one mutton of line beef for alam or estoo' (ắ la mode stew) 'mutton for curry pups' (puffs), eggs for saps, snobs, tips and pups' (chops, snipes, tipsycake and puff), mediation (medicine) for ducks, ইত্যাদি। ফর্দের তলায় ghirand totell (grand total) পাকাসাহেব বা মেম যা বুঝবার ঠিক বুঝে নেন বইকি! হল্লাগোল্লা বাঁধান কাঁচারাই।

ইংরেজিতে যত কাঁচাই হোন না কেন নিজেদের শিল্পে এই সব গরিব বাবুর্চিরা ছিলেন এক একজন বিস্ময়কর শিল্পী। ইসাবেল অ্যাবট নামে এক ভদ্রমহিলা শুনিয়েছেন তাঁর পাচকের বাহাদুরির কথা। একদিন তাঁর শ্বশুর হাড়সমেত মাংস আর বাঁধাকপি হাতে এসে হাজির। আমি এতদূর কষ্ট করে এলাম শুধু তোমার হাতে এই বাঁধাকপি রাঁধিয়ে খাব বলে। এদেশে কোনও পাচক ইংল্যান্ডের মতো

বাঁধাকপি রাঁধতে জানে না! ভদ্রমহিলা শ্বশুরমশাইকে বসিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বাঁধাকপি এবং মাংস তাঁর মুসলিম পাচকের হাতে দিয়ে দু'একটা নির্দেশ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। যথাসময়ে খাবার টেবিলে রান্না করা কপি এল। শ্বশুর খেয়ে রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বললেন—ঠিক এটাই চেয়েছিলাম। কিন্তু ইন্ডিয়ান কুকরা কিছুতেই এমনটি রাঁধতে পারে না। —থ্যাঙ্ক ইউ, মাই ডিয়ার, আই নিউ অনলি অ্যান ইংলিশওম্যান ক্যুড কুক ক্যাবেজ!' ভদ্রমহিলা নিশ্চয় তখন মনে মনে হাসছেন।

পাচক বড় বড় রান্না ছাড়াও অনেক সময় অন্য খাবারও তৈরি করতেন। জ্যাম, জেলি, কেক, পুডিং প্যাস্ট্রি, সস, চাটনি—কী নয়? ইংরেজ আমলে সাহেব হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান—সব সম্প্রদায়ের লোকেরাই কাজ করতেন। বোম্বাইয়ে কর্মীবাহিনী গড়ে উঠেছিল প্রধানত পর্তুগিজ-গোয়ান, পার্শি, এবং ইউরেশিয়ান বা অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের। মাদ্রাজে—ভারতীয় খ্রিস্টানরা ছিলেন দলে ভারি, কলকাতায় সব এলাকার, সর্ব শ্রেণীর আগন্তুকরা। কারণ, কলকাতা তখন রাজধানী শহর, এখানে যত রাজ্যের কর্মপ্রার্থীর ভিড়। তবে পাচক বা বাবুর্চি ও খানসামা হিসাবে কদর বেশি ছিল নাকি গোয়ানদের। হিন্দুরা সাহেবকুঠিতে রান্নার কাজ করতে রাজি ছিলেন না। কারণ, সাহেবরা ম্লেচ্ছ, তাঁরা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে থাকেন। মুসলমানদের এমন শুচিবাই ছিল না। একজন সাহেব বলেছেন যদিও হিন্দুদের কাছে গোমাংসের মতো মুসলমানদের কাছে শূকর-মাংস নিষিদ্ধ, তবু কোনও কোনও মুসলমান কখনও কখনও তাকে আপত্তিকর বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সম্মত ছিল না। তাঁরা এই প্রাণীটির নাম দিয়েছিলেন—'বিলাইতি হিরণ', অর্থাৎ বিলাতি হরিণ। কলকাতায় যে এক সময় বাবুর্চি বা খানসামা হিসাবে বেশ কিছু মুসলমান রন্ধন শিল্পী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ শহরের বেশ কিছু রাস্তার নাম। যেমন, ছকু খানসামা লেন, পাঁচু খানসামা লেন, ইত্যাদি। আর একজন খানসামার নামে রয়েছে একাধিক রাস্তা। তিনি করিম বক্স।

গভর্নর জেনারেলের হেড খানসামা। রাজভবনের দেওয়ালে একসময় শোভা পেত তেল রঙে আঁকা তাঁর বিশাল প্রতিকৃতি!

সাহেব-কুঠিতে খানা বলতে চার দফা। প্রথমে 'ছোট হাজরি'। একালের ভাষায় তাকে বলা চলে—বেডটি। ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে চায়ের সঙ্গে টা। তারপর হাত মুখ ধুয়ে স্নানপর্ব সেরে 'বড় হাজরি' বা ব্রেক ফাস্ট। সেই প্রাতরাশও বলতে গেলে ভোজন-পর্ব বিশেষ। অতঃপর অফিস যাত্রা, এবং দুপুরে অফিস থেকে এসে—টিফিন। পরবর্তী কালে যাকে বলা হয় লাঞ্চ। 'টিফিন' এসেছে নাকি অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি স্ল্যাং বা অপভাষা 'সিপিং' থেকে। 'টু টিফ' (to tiff) মানে মদ্যপান। তাই থেকে 'টিপসি' (tipsy), টলমল অবস্থা। 'হবসন-জবসন'-এ ভারতে 'টিফ' এবং 'টিফিন'-এর ব্যাপক ব্যবহারের নানা নমুনা পরিবেশন করা হয়েছে। দুপুরে 'টিফিন' খাওয়ার সে কী এলাহি বন্দোবস্ত! দুপুর গড়িয়ে বিকাল আসে তবু খানা আর শেষ হয় না। ডি ক্যুয়েন্সি পর্যন্ত খবর পেয়ে গিয়েছেন ভারতের টিফিন পরব সম্পর্কে। লিখেছেন—

> "Reader! I, as well as Pliny, had an uncle, an East Indian uncle,... every body has an Indian uncle. ...He is not always so orientally rich as he is reputed; but he is always orientally munificent. Call upon him at any hour from two to five, he insists on your taking tiffin and such a tiffin! The English correspoding term is luncheon; but how meagre a shadow is the European meal to its glowing Asiatic cousin."

(উদ্ধৃতি 'হবসন-জবসন' থেকে)। তার মানে এদেশে বেলা ২টা থেকে ৫টা যে কোনও সময় অতিথি এসে যোগ দিতে পারেন টিফিন-এর টেবিলে। ভারতে ইংরেজ অতিশয় অতিথি বৎসল। তার

দ্বিপ্রাহরিক ভোজসভায় যে কোনও আগন্তুক স্বাগত। দ্বিতীয়ত, সময়ের দিক থেকে ভারতের টিফিন আর ইংল্যান্ডের লাঞ্চ সমার্থক হলেও আয়োজনের কথা ভাবলে দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ভারতীয় 'টিফিন'-এর সঙ্গে কোথায় লাগে ইংলন্ডের লাঞ্চ!

তারপরেও আছে কিন্তু নৈশ ভোজ, ডিনার। টেবিলে ফের গড়ে উঠে খাদ্যের পাহাড়। টিফিন ক্রমে লাঞ্চ হয়েছে। ডিনারও সময় বদল করে রাত আটটা সাড়ে আটটায় স্থিতিলাভ করেছে। মেনুও হয়তো সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু প্রাতরাশ থেকে নৈশ ভোজ—বলতে গেলে সব পরবেই কারি কিন্তু কোনও না কোনও বেশে হাজির। ছুটি নেই বেচারা বাবুর্চির। এমনকী ডাকবাংলোয়ও তিনি ব্যস্ত সাহেব-মেমের মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটাতে। তার জন্য নগদ পুরস্কার ছাড়াও অন্য পুরস্কার জুটতে পারে, অতিথির প্রশংসাপত্র। ডেভিড বার্টন একজন সুরসিক সাহেবের লেখা এমন একটি সার্টিফিকেট উদ্ধৃত করেছেন তাঁর বইয়ে। মি. ক্যাডেট ব্রাউন নামে ওই সাহেব লিখেছেন :

> "So I will praise Peter wherever I go,
> And always speak of his Dakbunglow
> If I gets food just as good as he gives
> In time I shall get jolly fat— if I lives."

ভারতীয় ডিশ নিয়ে ইংরেজদের পাগলামির ঢেউ পৌঁছেছিল বাঙালির রান্নাঘরেও। উনিশ শতকে শহুরে বাঙালি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সংসারে শনশন পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল। মেয়েরা ক্রমেই বেশি সংখ্যায় স্কুলে যাচ্ছিল। বাড়ির কর্তারা নতুন ধরনের সামাজিকতায় অভ্যস্ত হচ্ছিলেন। কর্মসূত্রে দেশের অন্যত্র যাতায়াত এবং বাস করা প্রয়োজন হচ্ছিল। সেখানে এবং নিজেদের শহরেও অন্য সম্প্রদায়, এমনকী বিদেশিদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আসে। এক সময় পূজা-পার্বণে বিদেশি অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্য খাদ্য পানীয় আনা হত বড় বড় হোটেল রেস্তোঁরা থেকে। সামাজিকতার নতুন পর্বে অনেককে যেমন সস্ত্রীক বিদেশির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হত, তেমনই কখনও কখনও বিদেশিদের ঘরে নিমন্ত্রণ করে অতিথি সৎকার করতে হত। তখন রকমারি রান্নার জন্য বাইরে থেকে পাচক বাবুর্চি আনতে হত। পড়াশুনার জন্য মেয়েরা মা ঠাকুমার কাছ থেকে প্রথাগত রান্না শেখার সময় পাচ্ছিলেন না। ঘরে বাইরে যেসব নতুন খাদ্যের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হচ্ছিলেন তার জন্য পাচকের বা বাবুর্চির বিকল্প হতে পারেন একমাত্র গৃহিণীরা নিজেরাই। কেউ কেউ পাচকের কাছ থেকে কিছু কিছু ইতিপূর্বে অপরিচিত রান্না শিখে নিতেন। অন্যরা হা পিত্যেশ করতেন রান্নার বইয়ের জন্য। উনিশ শতকের সত্তর এবং আশির দশকের মেয়েদের পত্রিকাগুলোর পাতা উল্টালে বোঝা যায় মুঘলাই তথা উত্তর ভারতীয় এবং ইংরেজি রান্না শেখার জন্য কোনও কোনও মহিলা ব্যাকুল। তাঁদের দাবি মেটাতেই যেন ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা রান্নার বই—'পাক রাজেশ্বর।' তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অবান্তর। বর্ধমান রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত নানা ধরনের মুসলমানি ডিশ থাকলেও (যথা : কাবাব মাহী অর্থাৎ মৎস্য ভর্জ্জন, কোপ্তা সামী কাবাব, সীরাজি প্রলেহ, মাংস গোল প্রলেহ, সীরাজি পলান্ন, পক্ষী শূল্য ইত্যাদি), 'কারি' শব্দটি কোথাও নেই। রাজকীয় এই বইয়ের পাকপ্রণালী মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে অনুসরণ করা সহজ সাধ্য ছিল না। বাঙালি ভদ্রমহিলাদের মনের মতো প্রথম বাংলা রান্নার বই বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের—'শৌখিন খাদ্য পাক।' প্রথম খণ্ডে খেচরান্না ছাড়াও ছিল, পোলাও, কারি, কোর্মা, শিককাবাব, কোফতা, কাটলেট, চপ ইত্যাদি। বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। তার আগে, ১৮৮৩ সাল থেকে বিপ্রদাস 'পাক-প্রণালী' নামে একটা মাসিক পত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। তার পৃষ্ঠায় ও দেশি-বিদেশি নানা ধরনের খাবার রান্না করার

কৌশল শেখাচ্ছিলেন তিনি। ১৮৪২ সাল থেকে ১৯১৪ সালের পাক-প্রণালীর বেশ কিছু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাতে বাঙালির হেঁসেলের প্রথাগত রান্না যেমন আছে, তেমনই আছে কারি, কোপ্তা, কাটলেট, ছাড়াও মাদ্রাজ কারি, কলকাতা কারি, কাবাব কারি, ইত্যাদি। কখনও কখনও অভ্যাসবশত কারি-কে অবশ্য ব্যঞ্জনও বলা হয়েছে। যথা ইংলিশ ব্যঞ্জন। অবশ্য কারি-ই প্রাধান্য। বইয়ে আছে হায়দ্রাবাদী কালিয়া, পাখি মালাই কারি, বাগদাচিংড়ির মালাই কারি। তার বাইরে দো পিঁয়াজা, ইটালিয়ান মাংস গোলক, হোসেঙ্গা কাবাব, নূরজাহানী কাবাবের কথাও রয়েছে। মনে হয় বিপ্রদাস ওস্তাদ বাবুর্চির সাহায্য নিয়েছেন। কিংবা ইংরেজি কুক-বুক-এর ।

দ্বিতীয় বই ধরা যাক প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর আমিষ ও নিরামিষ আহার। সংক্ষিপ্ত আমিষ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে। প্রজ্ঞাসুন্দরী অবশ্য আগে 'পুণ্য' নামক পত্রে রন্ধনপ্রণালী শেখাতে শুরু করেন। বইয়ের প্রথম খণ্ড দুটি ছিল নিরামিষ রান্না নিয়ে। সেখানে দেখি কারির ছড়াছড়ি। হঁচড়, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শাল গমের কারি! কালিয়া ও সব নিরামিষ। প্রজ্ঞাসুন্দরী লিখছেন—'কারিকে কালিয়ার বড় বোন বলা যায়।' সুতরাং লাউয়ের মালাইকারি, কিংবা কচি ডুমুরের কোপ্তাকারি রাঁধতেই বা অসুবিধা কোথায়?

তাঁর বইয়ের আমিষ খণ্ডে দেখি কারি আর কারি। ডিমের কারি, কই মাছের মালাই কারি, চিংড়ির মালাইকারি, বোম্বাই খুর্মিকারি, মসুর ডালের মাদ্রাজী কারি, মুরগির কারি, হটকারি, পাঁঠার কারি, মটনের ভিন্দালু, হুসেনি কারি, কাশ্মিরী কোপ্তা কারি ইত্যাদি। মনে হয় না কি বইটিতে পাকা বাবুর্চির হাত আছে। একই সঙ্গে হয়তো রয়েছে ইংরেজি কুক-বুকের ছায়াপাত।

আর একটি জনপ্রিয় রান্নার বই দিঘাপাতিয়া (রাজশাহী) রাজবাড়ির গৃহবধূ কিরণলেখা রায়ের 'বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ'। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ সালে। সম্প্রতি (২০০০ সাল) এটির পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে । প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রয়াত ভদ্রমহিলার স্বামী শরৎকুমার রায় লিখেছিলেন—

> "বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়া ও আধুনিক রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আধুনিক রন্ধন হিসাবে এই গ্রন্থকে পূর্ণাবয়ব করিবার নিমিত্ত সচরাচর প্রচলিত কতিপয় ইউরোপীয় এবং ইসলামীয় রন্ধণ এই গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হল।"

স্বভাবতই এই বইয়ে কাবাব, কালিয়া, রোস্ট, শিক বা শূল্য কাবাব, কোপ্তা, গ্রিল, চপ ইত্যাদি রয়েছে। কারি তো বটেই। কাবাব-এর মধ্যে ইনি হাড়ি কাবাব রান্নার কৌশল শিখিয়েছেন। কারির তালিকায় রয়েছে 'সিলোন' বা মালাই কারি, কেঠোর কালিয়া, পক্ষীর কালিয়া, ঝাল ফ্রেজী, কোপ্তাকারি, ভিণ্ডালু ইত্যাদি।

বুঝতে অসুবিধা নেই বাঙালির ঘরে কারি পাকাপাকিভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে। সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় একালের একটি প্রধান রান্নার বইয়ের পাতা উল্টালে। বইটির নাম 'রকমারি নিরামিষ রান্না'। লেখক ময়মনসিংহের কালীপুরের জমিদার ও সমকালের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর সহধর্মিণী রেণুকা দেবী চৌধুরানী। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮ সালে। এ বইয়ে অভাবিত সব নিরামিষ রান্নার কথা আছে। সেখানেও দেখি কারির পর কারি। হ্যাঁ, নিরামিষ কারি। নিরামিষ রোস্ট, ক্রোকে, কাবাব, কোপ্তা, ছাড়াও হরেক বস্তুর কারি। রেণুকা দেবী চৌধুরানীর লেখা 'রকমারি আমিষ রান্না' নামে আরও একটি বই সম্প্রতি (২০০০ সাল) প্রকাশিত হয়। বইটি প্রয়াত লেখকের পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে সম্পাদিত। নিরামিষ খণ্ডেই যখন এত কারি, তখন আমিষ খণ্ড যে কারির সৌরভে ভুরভুর করবে তাতে আর বিস্ময় কী। বস্তুত বইটিতে মাছের কারি-ই রয়েছে ডজন দুই। মাছের স্টু, মাছের ভিন্দালু, দমপকত, রেজেলা প্লাসি কী নেই? বাঙালির মাছ এ বইয়ে কী অনায়াসেই না কখনও মুঘলাই, কখনও ইংলিশ হয়ে গেছে। সুতরাং মাংসের ডিশ সাজিয়ে আর টেবিলকে ভারাক্রান্ত করার দরকার নেই। বস্তুত, এই দুটি বইয়ের মতো এত রকম আমিষ ও নিরামিষ

রান্নার খবর বোধ হয় আর কোনও বাংলা রান্নার বইয়ে নেই। বইটির একটি বৈশিষ্ট্য লেখক ফাঁকে ফাঁকে জানিয়ে গেছেন কোনও বিশেষ রান্না তিনি কার কাছে শিখেছেন। পাচক, রাঁধুনি, বাবুর্চি—সকলকেই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি। নুরা বাবুর্চি নামে একজন মুসলিম রসুইকর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"তখনকার দিনে মুসলমান বাবুর্চির রান্না কর্তারা বারবাড়িতে খেতেন, কিন্তু সরকারি ভাবে স্বীকৃত হত না; সেইজন্য মাইনের খাতায় নুরা নামের সঙ্গে চক্রবর্তী পদবি যোগ!" পরে এই বাবুর্চিকে বাড়ির ভেতরে এনে তিনি অনেক রান্না শিখেছেন। এই স্বীকারোক্তিও তাৎপর্যপূর্ণ। অনুমান করতে অসুবিধা নেই বাঙালির হেঁসেলে চপ, কাটলেট, কোর্মা, কাবাব এবং কারির অনুপ্রবেশ ঘটেছে প্রায়শ পাচক-বাবুর্চিদের হাত ধরে। অথচ এই ঘটনা অনেক বাংলা রান্নার বইয়েই উহ্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত পূর্ণিমা ঠাকুরের লেখা "ঠাকুরবাড়ির রান্না" বইটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নানাসূত্রে কারও বোধ হয় জানতে বাকি নেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কাজ করেছেন বেশ কিছু পাচক ও বাবুর্চি। কিন্তু এই বইয়ে মাছের ঝাল ফিরেজী, ইলিশ বা রুই মাছের রোস্ট, ছোলার ডালের কিমা কারি, মোচার সাম্মি কাবাব, লাউয়ের কোপ্তা কারি, পটলের মালাই কারি, মাদ্রাজ কারি, মাংসের কারি, মাংসের ভিন্দালু, মাংসের চাওমিন, পেশোয়ারি মুর্গি, কিমার কোপ্তা কারি, শাহি কোর্মা, ফিলিপিনি মুর্গি কারি ইত্যাদি হরেক মুসলমানি ও ইংলিশ রান্নার কথা থাকলেও তা রাঁধতেন কে বা কারা, তার কোনও হদিশ নেই। অথচ ঝাল, ঝোল, চচ্চড়ি, রসা ডালনা, ব্যঞ্জন কী অবলীলায়ই না রূপান্তরিত হয়ে গেল কারি-তে!

ডেভিড বার্টন ইংরেজ আমলের খাওয়া দাওয়ার ইতিহাস চর্চা করার পর ('দ্য রাজ অ্যাট টেবিল') মন্তব্য করেছেন যদিও ভারতীয় খাদ্য সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে ব্রিটেনে দিব্য পৌঁছে যায়, তবু দীর্ঘকাল ইংরেজ সংসর্গের ফলে ভারতীয় খাদ্যে ব্রিটেনের প্রভাব আজ আর বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। একালে ইংরেজের অবদান বলতে রয়েছে চা, বিস্কুট, দ্বিতীয় শ্রেণীর রুটি (হোয়াইট সোডা ব্রেড), টোস্ট, আর ওমলেট। ক্লাবগুলোর ব্রেকফাস্ট টেবিলে ইংরেজিখানা কিছু কিছু পরিবেশিত হয় (যথা : পরিজ, মার্মালেড), কিন্তু অন্যত্র তালিকা অতিশয় হ্রস্ব। ওমলেট প্রাতরাশের টেবিলে খুবই জনপ্রিয় খাদ্য ছিল সেকালে। উনিশ শতকে বেঙ্গল ক্লাবে নাকি চার-চারজন বাবুর্চি দিনভর শুধু ওমলেট-ই ভাজতেন। একজন মেমসাহেব লিখেছেন ভারতীয় বাবুর্চির মতো উৎকৃষ্ট ওমলেট ইংল্যান্ডে কেউ বানাতে পারেন না। তাঁর কথায়—'বাই দি বাই, অ্যান ওমলেট ইজ নেভার কুকড টু সাচ পারফেকশন অ্যানি হোয়ার অ্যাজ বাই অ্যান ইন্ডিয়ান কুক।' (An English woman in India, Harriet Tytler.) তাতে কী আসে যায়। ডেভিড বার্টন রসিকতা করে বলেছেন—ওমলেটকে ভারতীয়রা বলেন 'আমলেম'। আর এক সাহেব বলছেন—ওমলেট-কে ওঁরা 'মামলেট'ও বলেন।

সে আর এমনকী। সাহেবরা নিজেরাও কি ভারতীয় খাদ্যের নাম নিয়ে বিভ্রাট কম করেছেন? ভিন্দালুর কথা গোড়ায় বলা হয়েছে। এই বিশেষ ডিশটির নাম বাঙালি রান্নার বইয়ের লেখকরাও নানা ভাবে উচ্চারণ করেছেন। বৃন্দালু থেকে ভেন্দালু—কত না বানান তার। ভারতীয় ডিশ-এর সাহেবি নামকরণের দুটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত 'মুলিগাটাউনি'র (Mulligatawny) কথা। এটি একটি পানীয়। সাহেবরা সুপও বলেন। অনুপান ধনে, জিরা, সরষে, শুকনো ক্যাপসিকাম বা লঙ্কা, রসুন, লবঙ্গ। এসব আস্ত জ্বাল দিতে হয়। তার আগে গোলমরিচের জলে ফেলতে হবে অবশ্য। সঙ্গে অল্প হলুদ এবং তেঁতুলও চলেতে পারে। নিয়ম এই তরল কাপে ঢেলে চায়ের মতো চুমুক দিয়ে খাওয়া। তামিল শব্দ 'মিলাগু' (milagu) এবং 'টুন্নি' (Tunni) দুইয়ের যোগ ফল এই মুলিগাটাউনি। তামিলে এটি 'রসম', নিছক পেয় রস। তাই থেকে কত না কাণ্ড। সাহেব মেমরা প্রাতরাশে গরম ভাত দিয়েও খেতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে লেবুর রস। শুধু তাই নয়, মাংস,

পেঁয়াজ এবং আর নানা কিছু মিশিয়ে সম্পূর্ণ অন্য কিছু বানিয়েছেন ওঁরা। ডালও বাদ ছিল না। 'মুলিগাটাউনি' সহজ সরল রসম থেকে পরিবর্তিত উদ্ভট সুপ-এ। জর্জ ফ্রাঙ্কলিন অ্যাটকিনসন-এর কবিতায় (Curry and Rice of Forty Plates, 1859) কারির মতো বন্দিত মুলিগাটাউনিও।

Then jingles, fakeers, dancing -girls, prickley heat,
Shawls, idols, durbars, brandy-pawny;
Rupees, clever jugglars; dust-storms, slippered feet.
Rainy season, and Mullygatawny."

অথচ বানান থেকে শুরু করে দফায় দফায় কতভাবেই না বিকৃত করা হয়েছে দক্ষিণ-ভারতীয় একটি পানীয়কে!

আর একটি ভারতীয় ডিশ-এর নাম বিকৃতির দৃষ্টান্ত খিচুড়ি। কলকাতা থেকে আটষট্টি মাইল নীচে মেদিনীপুরে হুগলী নদীর তীরে খেজুরি এক সময় ছিল একটি বন্দর। পশ্চিমী নাবিকদের মুখে সপ্তদশ শতক থেকে স্থাননামটি নানাভাবে বিকৃত হয়ে স্থিতিলাভ করে 'কেডগিরি'তে (Kedgeree) আশ্চর্য এই খিচুড়িও তৎকালে ইংরেজিতে কেডগিরি (Kedgeree)। সেই চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতা ভারতে মুগ ডাল আর চাল মিশিয়ে ঘি দিয়ে খিচুড়ি রান্নার উল্লেখ করেছেন। সেটি ছিল নাকি সকালে নিত্য খাদ্য। পঞ্চদশ শতকে বিদেশি পর্যটকরা হাতি ও ঘোড়াকেও ডাল চালের খিচুড়ি খাওয়াবার কথা বলেছেন। প্রথম দিকে কিন্তু বিদেশিরা কম বেশি সঠিক খিচুড়ি-ই লিখেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সৌজন্যে খিচুড়িকে টেনে আনেন প্রাতরাশের টেবিলে। কিন্তু শুধু চাল ডাল ঘি মাখন আর যৎসামান্য মশলায় মন ভরে না। সুতরাং খিচুড়িতে যোগ হল মাছ, ডিম ইত্যাদি। ক্রমে খিচুড়ি 'কেডগিরি'তে পরিণত হল, তাতে আর ডাল বা মশলার দরকার নেই। পরিবর্তে রচিত হয় বিকৃত খিচুড়ি 'কেডগিরি'। আঠারো শতকে সেই জনপ্রিয় খাবার স্কটল্যান্ড হয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছায়। ভিক্টোরিয়ান এবং এডোয়ার্ডিয়ান ইংল্যান্ডে প্রাতরাশের টেবিলে রীতিমতো জাঁকিয়ে বসে কেডগিরি। প্রথম প্রথম ওঁরা মনে করতেন ডিশটি মূলত স্কটিশ। ক্রমে জানা যায় আদি তাঁর ভারতীয় খিচুড়ি। একজন ইংরেজ লেখক লিখেছেন খিচুড়ির কেডগিরিতে রূপান্তর ভারত ও ব্রিটেনের রান্নাঘরে এক ধরনের 'ফিউসান' (fusion)-এর প্রমাণ। একালের একজন অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান গবেষকের প্রশ্ন—'ফিউসান, না কনফিউশান (confusion)? আমাদের সৌভাগ্য 'কেডগিরি'র মায়ায় সব সাহেব মেম ভারতীয় খিচুড়ির স্বাদ ভুলে যেতে রাজি হননি। পুরানো ইংরেজি রান্নার বইগুলোতে রকমারি ভারতীয় খিচুড়ির পাক-প্রণালীও রয়েছে। সাধারণ খিচুড়ি থেকে শুরু করে রকমারি সবজি সহযোগে খিচুড়ি, মাছ, মাংস মিশিয়ে আমিষ খিচুড়ি, মশলা খিচুড়ি, ভুনি খিচুড়ি কিছুই বাদ নেই। এমনকী খুনি খিচুড়ি পর্যন্ত!

এবার কারি-র কালাপানি পার হওয়ার কাহিনীতে ফেরা যাক। ডেভিড বার্টন তাঁর উল্লেখিত 'দ্য রাজ অ্যাট টেবিল' বইটিতে লিখেছেন কারি প্রথম ব্রিটেনে পৌঁছায় অষ্টাদশ শতকে ভারত থেকে ঘরে ফেরা ইংরেজ নবাবদের হাত ধরে। হাত ধরে, না জিভে ভর করে? তিনি বলছেন ১৭৭৩ সালে লন্ডনে অন্তত একটি কফি হাউসে কারি পরিবেশিত হত। ১৭৮০ সালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সেখানে বাজারে আসে কারি পাউডার। ১৮১৭ সালে ডাঃ কিচেনার তাঁর রান্নার বই 'কুকস ওরাকেল'-এ (cooks oracle) কারি পাউডার তৈরির কৌশল শেখান। সুতরাং, তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন অষ্টাদশ শতকে সাহেব-নবাব এবং ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে তাঁদের উত্তরাধিকারী সাহেবরা ঘরে ফিরে কারিকে কৌলিন্য দান করেন। কে জানে, ইউরোপিয়ান 'নবাব' বা অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ানরা নন, তাঁদের আগেই ভারতীয় মাঝিমাল্লারা কারির হাঁড়ি নিয়ে পৌঁছেছিলেন বন্দরে বন্দরে। তারপর সেখান থেকে

ক্রমে কারি পৌঁছায় দেশের অন্দরে।

সাহেব-নবাবরা তাঁদের ধনদৌলত, চালচলন, বিলাসিতা এবং হঠকারিতার জন্য স্বদেশের মানুষের কাছে যেমন অপ্রিয় ছিলেন, তেমনই তাঁদের নতুন জীবনযাত্রা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রতিবেশীদের কৌতূহলও ছিল প্রভূত। বিশেষত, তাঁদের ভারতীয় ভৃত্য, ভারতীয় পাচক এবং ভারতীয় খাদ্য সম্পর্কে তো বটেই। সুতরাং, কারি চালু করার ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা থাকা খুবই সম্ভব। ১৭৭৩ সালে লন্ডনের হে মার্কেটে নরিস স্ট্রিট কফি হাউসে অতএব পরিবেশিত হত ভারতীয় কারি। একজন গবেষক লিখেছেন তার এগারো বছর পরও দেখা যায় এয়ার স্ট্রিটের কাছে ২৩ পিকাডেলির সোরলিজ পারফিউমারি ওয়ারহাউস থেকে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে কারির আশ্চর্য গুণাবলী। ১৭৮৪ সালের সেই বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে কারি— "renders the stomac active in digestion—the Blood naturally free in circulation—the mind vigorous,— and contributes most of any food to an increase of the Human Race." বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল 'Morning Herald'-এ। (তারিখ ৪ মে, ১৭৮৪।) এই গবেষক বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করেছেন কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের সুরে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই, একালের ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন দুশো বছরেরও প্রায় দুই দশক পরে! কারি তাঁরা বলেন পরিপাকের সহায়ক, কারি বলকারি, স্নায়ু উত্তেজক, কারি আনন্দানুভূতি জাগাতে সমর্থ এবং কারি সক্রিয় ভাবে উত্তেজক। প্রজাবৃদ্ধির হয়তো আজ প্রয়োজন নেই, কিন্তু শারীরিক মানসিক আবেগ ও উত্তেজনা কে না চাহেন। বস্তুত ঠারে ঠারে আজ কারিকে বলা হয়েছে কামোদ্দীপক (aphrodisiac)।

আর একজন গবেষক জানাচ্ছেন ১৮০৯ সালে দীন মহম্মদ নামে একজন ভারতীয় অভিযাত্রী লন্ডনের জর্জ এবং চার্লস স্ট্রিটের কোণে পোর্টম্যান স্কোয়ারের কাছে 'হিন্দুস্থানি কফি হাউস' নামে একটি রেস্তোঁরা খোলেন। সেই কফি হাউসে মোটে কফি পরিবেশিত হত না, তার বদলে মিলত ভারতীয় খানা। তিনি আর তাঁর ইংরেজ বিবি জেন সে রেস্তোঁরা চালাতেন। খানদানি এবং ভদ্র ইংরেজদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তাতে বিশেষ করে স্বাগত জানানো হয়েছিল ভারত-ফেরত ইংরেজ ভদ্রজনদের। বিজ্ঞাপনটির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃতি যোগ্য। দীন মহম্মদ জানাচ্ছেন তিনি—

> "...has fitted up the above house, neatly and elegantly, for the entertainment of Indian gentlemen, where they may enjoy the Hoakha, with real Chilm tobacco, and Indian dishes in the highest perfection, and allowed by the greatest epicures to be unequalled to any curries ever made in England with choice wines, and every accommodation, and now looks up to them for their future patronage and support and gratefully acknowledges himself indebted for their former favours, and trusts it will merit the highest satisfaction when made known to the public."

দুঃখের বিষয় মাত্র বছর তিনেক পরে ১৮১২ সালে রেস্তোঁরাটি বন্ধ হয়ে যায়। অভিযাত্রী দীন মহম্মদকে অতঃপর গ্রহণ করতে হয় অন্য জীবিকা। বিচিত্র তাঁর প্রবাস জীবন। নব নব উদ্যোগে তৎকালে তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। তবু 'হিন্দুস্থানি কফি হাউস'-এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সম্ভবত সেটাই ব্রিটেনে প্রথম ভারতীয় রেস্তোঁরা। এবং সেখানেই প্রথম পরিবেশিত হয় ভারতীয় হাতে রান্না করা ভারতীয় কারি!

দীন মহম্মদের জীবনীকার প্রসঙ্গত জানিয়েছেন দীন মহম্মদের আগে অর্ধশতক জুড়ে লন্ডনে নাবিকদের আড্ডা জমত 'লয়েডস কফি হাউস'-এ। সেখানে নিশ্চয় পরিবেশিত হত ভারতীয় ডিশ। দীন মহম্মদের সমকালে ছিল আর প্রতিযোগী কর্নহিলের 'জেরুজালেম কফি হাউস'। সেটি ছিল

লন্ডনের 'সিটি' বা বাণিজ্যের কেন্দ্রে। বেচারা দীন মহম্মদ তাই আসর জমাতে পারলেন না। সাহেব-মেমদের কারি খাওয়াতে গিয়ে তিনি দেউলিয়া হয়ে গেলেন। ('The Travels of Dean Mahomet, An Eighteenth Century Journey Through India,' Michael H. Fisher, California, 1997)

বলা হচ্ছে ইদানীং আমজনতার মতো ব্রিটেনে বিশিষ্টজনেরা কারির প্রতি আসক্ত হচ্ছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে। উপর তলায় কারি-র প্রতি আসক্তি কিন্তু উনিশ শতকেও দেখা গিয়েছে। এমনকী দেশের সর্বোচ্চ মহলে। শুনলে অবাক হতে হয়— ভারতীয় মুনশি, ভারতীয় প্রাসাদ প্রহরী, ভারতীয় কেশ-শিল্পীর মতো ভিক্টোরিয়ার দু'জন বাবুর্চিও ছিলেন। প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজে তাঁরা মহারানিকে কারি পরিবেশন করতেন। তাঁর ফার্সি মুনশি আবদুল করিমের উপর আস্থা ও নির্ভরতার কথা তৎকালে মুখরোচক প্রাসাদ-গুজবের অন্তর্গত। দেশের সরকারি কর্তাদের তা নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। নানাভাবে চাপ দিয়ে তাঁরা মহারানিকে মুনশি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া তাঁদের আমল দেননি। মুনশি আবদুল করিম অনেক দিন নাকি নিজে রান্না করে রাত্রে রানিকে খেতে দিতেন। কখনও কখনও ডিনারে নিজেও যোগ দিতেন রানির সঙ্গে।

পুত্র যুবরাজ অ্যালবার্টও ছিলেন কারির ভক্ত। ১৮৭৭ সালে ভারত ভ্রমণের সময় তিনি নাকি মাদ্রাজে প্রথম কারির স্বাদ পান। মাদ্রাজ ক্লাবে 'প্রনকারি' বা চিংড়িমাছের কারি খেয়ে তিনি এমনই মুগ্ধ যে, ফেরার পথে জাহাজে তিনি তাঁর ফরাসি পাচককে দিয়ে নিয়মিত কারি রাঁধাতেন। সে কারি কতখানি ফরাসি, কতখানি ভারতীয়, কে জানে। হয়তো ফরাসি শেফকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় পাচকও ছিলেন জাহাজে। না-ই বা হল উচ্চমানের ভারতীয় কারি, কিন্তু কারি তো বটে।

সপ্তম এডোয়ার্ডের পুত্র অষ্টম এডোয়ার্ড কারি সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু তস্য পুত্র পঞ্চম জর্জ নাকি ছিলেন কারি বলতে অজ্ঞান। তিনিও কারির স্বাদ ও সৌরভের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন ভারতে। দেশে ফিরেও তিনি কারির কথা ভুলতে পারেননি। ব্রিটেনের রাজপ্রাসাদে তখন আর ভারতীয় পাচক নেই। প্রাসাদে ছিলেন সুইস শেফ। সম্রাটকে তিনি যে কারি খাওয়াতেন, কারও কারও অনুমান তা ভারতীয় কারি নয়। এক ধরনের ইংলিশ কারি। সেই সাদামাঠা কারি সেবন কি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতো নয়?

উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে কারির নামে কেউ কেউ যাচ্ছেতাই কাণ্ড করতেন। তাঁরা এমন বিকৃতি ঘটাতেন যে ভাবাই যায় না। পাঁচ সাত দিনের টেবিল থেকে কুড়ানো খাবারের অবশেষ কারি পাউডার আর মাখনে ঘেটে তার উপর এটা-সেটা ছড়িয়ে দিয়ে বলতেন—কারি। অথচ ভারতীয় কারিতে দু'বার সেদ্ধ করা টাটকা মাংসও নিষিদ্ধ। এসব দেখেশুনে বিরক্ত এক ইংরেজ ভদ্রলোক লিখেছিলেন,—

> 'You may curry anything, old shoes should even be delicious, some old oilcloth or staircarpet not to be found fault with, (gloves if much worn are too rich.)"

এই বিরক্তি যে অকারণে নয় তা বোঝা যায় "দ্য ওয়াইফস কুকারি বুক"-এর (১৯০৬) পরিবেশনে (লেখক মিসেস ফ্রাঙ্কলিন)। এক ইংরেজ মহিলা তাঁর পরিচিত এক ভারতীয় মহিলাকে গর্ব করে বলছিলেন—'আজ আমার রাইস অ্যান্ড কারি ডে'। দয়া করে থেকে যাও, দেখবে কেমন রাঁধি। আমার মনে হয় তোমরা ভারতীয়রা ঠিকঠাক রান্না করতে জান না। ভারতীয় মহিলা স্বভাবতই নীরব। তিনি স্বামীর রেজিমেন্টের সঙ্গে বিলাতে এসেছেন, রান্না শিখতে বা শেখাতে নয়। ঝগড়া করতে তো অবশ্যই নয়। ভারতীয় মহিলা থেকেই গেলেন। পরে অনেকের কাছেই তিনি সকৌতুকে সেই পাকা

রাঁধুনির কারি রান্নার গল্প শুনিয়েছেন। মেম সাহেবের কারি রন্ধন প্রণালী সংক্ষেপে অনেকটা এরকম: একটা হালকা কাপড়ে এক কাপ চা বেঁধে তিনি পুটুলিটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি আগের দিনের উদ্বৃত্ত কিছু ঠাণ্ডা মাংস এবং অন্যান্য ডিশ-এর অবশেষ অন্য একটা পাত্রে ঢেলে দিয়ে কিছু কারি পাউডার, মাখন, মাংসের রস মিশিয়ে জ্বাল দিতে লাগলেন। তারপর একটা প্লেটে ভাত ঢেলে তাতে একটা গর্ত বানালেন এবং তাতে ওই মিশ্র বস্তু খানিকটা ঢেলে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন 'রাইস অ্যান্ড কারি' রান্না শেষ!

একালে ব্রিটেনে যখন লক্ষ লক্ষ সাহেব মেম কারি নিয়ে মেতেছেন, কেউ কেউ যে এমন কারি আদৌ রাঁধছেন না, একথা হলপ করে বলা শক্ত। তবে বলাই বাহুল্য সেকালের তুলনায় একালে ভুলের সম্ভাবনা খুবই কম। কেননা, দিকে দিকে শিক্ষক। টিভি, রেডিও, খবরের কাগজ, রান্নার কাগজ, বই, এবং সুপার মার্কেট—যেখানে প্রায়-রান্না সম্পূর্ণ রান্না, হাত বাড়ালে সবই মেলে। তাছাড়া ডাইনে বাঁয়ে রয়েছেন কারির দেশের আগন্তুকরা। এই উপমহাদেশের অভিযাত্রীর দল, প্রয়োজনে তাঁরা কি আর কাউকে কাউকে হাতে ধরে কারি রান্নার জারিজুরি শিখিয়ে দিচ্ছেন না?

শুধু ব্রিটেনে নয়, কারির সৌরভ আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। জ্যামাইকায় পাঁঠা খাসির গোস্ত-কারি বলতে গেলে আজ জাতীয় ডিশ। নিউজিল্যান্ডেও ফিস কারির জনপ্রিয়তা সর্বজনীন। খানায় তেমনি সবার চাই চিকেন কারি। পশ্চিম সামোয়ায় আবার বিশেষ খাতির চাওমিন কারির। জাপানিদের সপ্তাহে একদিন অন্তত অবশ্য চাই—কারি অ্যান্ড রাইস। এমনকী ফরাসিরা পর্যন্ত ইদানীং নিজেদের মতো করে রান্না করছেন কারি। সে কারিতে নাকি মশলা বলতে বিশেষ কিছু থাকে না। আফ্রিকার কোনও কোনও দেশ তো ভারতীয়দের সঙ্গে দীর্ঘ সংসর্গের ফলে অনেক আগেই দীক্ষিত হয়েছে কারিতে। সুতরাং কারি-কে আজ অনায়াসে অভিষিক্ত করা চলে বিশ্বের রন্ধনশালায় রাজদূতের আসনে। এ-দূত অবশ্য সাংস্কৃতিক। তবে সেতার, যোগাভ্যাস বা বিশ্বসুন্দরীর চেয়ে বোধহয় মাহাত্ম্য তার বেশি। কারণ উদরের মধ্য দিয়ে তার আবেদন সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে দেশে দেশে মানুষের হৃদয়ে।

ভারতীয় কারির প্রাণ ভারতীয় মশলা। তার রঙ, রূপ, স্বাদ, গন্ধ বলতে গেলে সবই মশলা নির্ভর। কে না জানেন, এই মশলার সুবাসই একদিন ইউরোপিয়ান অভিযাত্রীদের টেনে এনেছিল ভারতের উপকূলে। মশলা আর খ্রিস্টানের সন্ধানেই না বছর বছর করে দরিয়ায় ডিঙ্গি ভাসিয়ে ছিলেন ওঁরা। ভারতীয় মশলা বলতে গেলে ভারতের মতোই সুপ্রাচীন বস্তু। সেই বেদের কাল থেকে তার ব্যবহার। হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচীন পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় ভারতীয় মশলার। ব্যাবিলন, আসিরিয়া, মিশর—প্রাচীন সভ্যতার ওই সব কেন্দ্রে ব্যবহার ছিল এই মশলার। ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানে, ঔষধে, ভেষজে, তেল এবং গন্ধ দ্রব্যে বিশেষ ভূমিকা ছিল প্রকৃতির এই সব বিশেষ অবদানের। মিশরে মমির প্রস্তুতি-পর্বেও নাকি ব্যবহৃত হত কোনও কোনও মশলা। মশলা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের শাসকবর্গ এবং অভিজাতরাও। ভান্ডারের সোনার বিনিময়ে তাঁরা সংগ্রহ করতেন মশলা। পশ্চিম এশিয়ার বাইরেও প্রসারিত ছিল তাঁদের বাণিজ্য। তৎকালে ভেনিস ও জেনোয়ার ধন-দৌলতও সামুদ্রিক বাণিজ্য সূত্রেই। অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যে ভরা মশলার ইতিহাস।

ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর ইঙ্গিত রাজা সোলোমন-এর বিপুল বিপুল ঐশ্বর্যের পিছনে ছিল মশলার বাণিজ্য। রানি শেবাও নাকি নিয়ন্ত্রণ করতেন দক্ষিণ আরব থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত 'ইনসেন্স রুট' বা সুগন্ধি সড়ক ওরফে মশলার পথের অনেকটা অংশ। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান এবং খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিষ্ঠার পর চিন থেকে ইউরোপমুখী বাণিজ্যপথ 'রেশমি সড়ক' বা সিল্ক রুটের মতো 'ইনসেন্স রুট' বা সুগন্ধী সড়কও খুলে যায়। তুর্কিরা এক সময় ওঁদের এলাকায় স্থলপথ বন্ধ করে দেন। মশলার বাণিজ্য অতঃপর আরবদের করায়ত্ত। তাঁরা একদিকে স্থলপথে যেমন

পণ্যবহন করে আনেন মিশরে নীলনদীর উপত্যকায়, অন্যদিকে লোহিত সাগরের পথে সে পশরা বহন করে নিয়ে যান পশ্চিমের দিকে। তৎকালে তাঁদের নৌবাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল আজকের সোমালিয়া। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকে রোমের পতন। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে পতন আলেকজান্দ্রিয়ার। তারপর ইউরোপের ইতিহাসে যে অন্ধকার যুগ শুরু হয়, তারপর পাঁচশো বছর ধরে, ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ পর্যন্ত মশলার বাণিজ্য ছিল পুরোপুরি আরবদের হাতে। ইউরোপে মশলা তখন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। দ্বাদশ শতকে ইংল্যান্ডে এক পাউন্ড গোলমরিচের যা দাম তা দিয়ে বেশ কয়েকটি ভেড়া কেনা যায়। গোলমরিচ দিয়ে তখন ঋণ শোধ করা যায়, কর দেওয়া যায়। এখন 'পিপারকর্ন রেন্ট' (peppercorn rent) বলতে বোঝায় যৎসামান্য অর্থ। সেদিন তার অর্থ ছিল বাজার দর অনুসারে গোলমরিচে পরিশোধ্য কর। (rent at the market price, payable in pepper.) মশলা এমন চড়া দরের বস্তু, যে স্বভাবতই ভেজালও চলত। ১৪৫৬ সালে নুরেমবার্গ-এ একজনকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়েছিল ভেজাল জাফরান বিক্রির জন্য। ইউরোপে প্লেগের মহামারী শুরু নাকি মশলার জাহাজের ইঁদুর থেকে। সেটা কল্পনা হতে পারে, কিন্তু প্লেগের হাত থেকে বাঁচার জন্য মশলার ব্যবহার একটি ঘটনা। বিষাক্ত, দুর্গন্ধে ভরা বাতাসকে শুদ্ধ করার জন্য প্লেগের সময় অনেকে নাকের সামনে ধরে রাখতেন মশলা গাছের ডালপালা, কিংবা শুকনো ফুলপাতা। এই সুগন্ধী বায়ুশোধককে বলা হত—'নোজগে' (nosegay)

সেসব দূর অতীতের কথা থাক। অবশেষে ১৪৯৮ সালে মালাবার উপকূলে কালিকটের কাছে একটি বিন্দুতে এসে নোঙর করলেন পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো-ডা-গামা। মশলার স্বর্গীয় উদ্যান যে পূর্ব পৃথিবীতে তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ঘটল পশ্চিমের। সেই সঙ্গে শুরু হল ভারত তথা এশিয়ার ভাগ্যবিবর্তন। বণিক আর সৈনিক এক দেহে লীন। সওদাগর বসল রাজতখ্‌তে। প্রথম দিকেই পর্তুগিজ বাণিজ্যতরী স্বদেশে ফিরে ছিল পনের হাজার টন গোলমরিচ নিয়ে। সেই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ অন্যান্য মশলা নিয়ে। মশলার সঙ্গে মুনাফার গন্ধও পাগল করে তুলেছিল ইউরোপকে। অতঃপর সমুদ্রমন্থন করে পূর্ব দিগন্তের দিকে জাহাজ ভাসালেন ডাচ, ইংরেজ এবং ফরাসিরা। পথের নিশানা পেতে গোয়ার পর্তুগিজ আর্চবিশপের তহবিল থেকে মানচিত্র পর্যন্ত চুরি হয়েছিল সেদিন। ডাচরা প্রথম অভিযানে বের হয় ১৫৯৫ সালে। প্রথম যাত্রা শেষে স্পাইস আইল্যান্ড বা মালয় উপসাগর এলাকার দ্বীপগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ লবঙ্গ বহন করে নিয়ে আসেন ওঁরা ইউরোপে। এই একটি পণ্যেই মুনাফা হয়েছিল নাকি শতকরা ২৫০০ ভাগ!

সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ঔপনিবেশিক যুগে ভারত এবং এশিয়ার নানাদেশে পরদেশিদের শাসনে ফেরা যাক। মশলা এখনও বিশ্বময় এক লাভজনক বাণিজ্য। পৃথিবীর অনেক দেশেই তৎপর এখনও দেশে বিদেশি গন্ধ বণিকের দল। ব্রিটেনে ভারতীয় কারি যেমন বেশ কয়েকজন ভারতীয়কে কোটিপতি করেছে, তেমনই ভারতীয় মশলাও বেশ কিছু মানুষকে কুবেরে পরিণত করেছে। তাঁরা কেউ কেউ মশলার পাইকারি ব্যবসা করেন। কেউ কেউ কৌটো এবং শিশি বন্দি করে আস্ত কিংবা গুঁড়ো মশলা সরবরাহ করেন। তাছাড়া, কারি-পাউডার, কারি পেস্ট তো আছেই। ফলে কারির দৌলতে অনেকেরই ঘরে এখন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।

বৈচিত্র্যময় এই মশলার জগৎ। গোলমরিচ বা কালো মরিচ, পিপুল, এলাচি, দালচিনি বা দারুচিনি, ধনে, লবঙ্গ, জিরা, মেথি, মৌরি, রাধুনে, আদা, হলদি, জায়ত্রি, জায়ফল, তেজপাতা, কেশর বা জাফরান, লেবুঘাস, গন্ধরস, ভ্যানিলা, গুলগুল বা ধুনো, অলস্পাইস, গরম মশলা, লঙ্কা বা লাল মরিচ, ক্যাপসিকাম, হিং, আরও কত কী! সব বাংলা বা ভারতীয় নামেরই ইংরেজি রয়েছে। কে জানে, ইংরেজ গিন্নি এবং পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখন নামতার মতো করে নামগুলো মুখস্থ করছেন কিনা। এক এক মশলার এক এক রকম চেহারা, চরিত্র ও স্বাদ,গন্ধ। ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কোন

মশলার কী গুণ তা বিস্তারিত বলা হয়েছে। ভিষকরাও দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত আলোচনায় ভারতীয় মশলার চরিত্র ও গুণাগুণ আলোচনা করেছেন। কিছু কিছু ইংরেজি রান্নার বইয়েও সে ধরনের আলোচনা আছে। মশলার গাছ এবং মশলার চিত্রসহ সেসব আলোচনায় কী ধরনের জলবায়ুতে কেমন মাটিতে, কোন ঋতুতে ওই মশলার চাষ হয়, তার বিবরণের সঙ্গে প্রতিটি মশলার রাসায়নিক বিশ্লেষণও যোগ করা হয়েছে। ফলে কোনও কারি ভক্তেরই আর অন্ধের মতো মশলা ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। তবু এই ব্যস্ততার যুগে পশ্চিমে অনেকেই নিশ্চয় ব্যবহার করছেন রেডিমেড মশলা। বিশেষ করে কারি পাউডার। সে-প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে মশলার ঈষৎ গুণকীর্তন করা যাক। মশলা খাদ্যের রূপ, রঙ, স্বাদ বাড়িয়ে দেয় এটা সকলেরই জানা। মশলা ক্ষুধাবর্ধক, মশলা পরিপাকের সহায়ক, মশলা রক্ত শোধক এবং সঞ্চালক, এসব গুণের কথাও ইদানীং পশ্চিমে শোনা যাচ্ছে। বিশেষ করে শোনার মতো আর একটি খবর, মশলা তেজোবর্ধক, কামোদ্দীপক, ইন্দ্রিয়সুখের পরিপোষক। কিছুকাল আগে একটি অভিনব এবং উপভোগ্য বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ইসাবেল অ্যালান্দের লেখা বইটির নাম—"অ্যাফ্রোডাইট/ দ্য লাভ অব ফুড অ্যান্ড দ্য ফুড অব লাভ।" সাহিত্যের ভাষায় লেখা প্রচুর অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল আশ্চর্য সুন্দর এই সচিত্র বইটি। তার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভারতীয় মশলা। কামসূত্রের খাদ্য নিয়ে তিনি যত না আলোচনা করেছেন তার চেয়ে বেশি মশলা নিয়ে। স্বভাবতই সেসব মশলার অধিকাংশই আদিতে ভারতীয়। (Aphrodite/ The love of Food the food of love, Isabel Allende, London, 1999) মশলা নিয়ে আর একটি সম্প্রতি প্রকাশিত কৌতূহলোদ্দীপক বই চিত্রা ব্যানার্জি দিবকরুনির 'দ্য মিসট্রেস অব দ্য স্পাইসেস'। বইটি একটি নতুন ধরনের উপন্যাস। প্রতিটি অধ্যায় এক একটি মশলার নামে। জাদুকরীর মতো একজন বৃদ্ধা নানা জনের উপর প্রয়োগ করছেন মশলা। শেষে নিজের উপর। কথাকাহিনী বটে, কিন্তু কেন্দ্রে তার রয়েছে মশলা। মশলার গুরুত্ব যে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে সম্ভবত এসব বই তারই ইঙ্গিত দেয়। ('The Mistress of spices' Chitra Banerjee Divakruni, New york, 1997)

এবার কারি-পাউডার প্রসঙ্গে ফেরা যাক। গবেষকরা বলেন ইংরেজরা চতুর্দশ শতক থেকেই এক মশলার সঙ্গে অন্য মশলা মিশিয়ে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। মধ্যযুগে সেসব মিশ্র মশলার নাম ছিল পাউডার ডউস (powder douce) পাউডার ফর্ট (blance fort) ব্লান্স পাউডার (blance powder) ইত্যাদি। সুতরাং ভারতীয় মশলাও যে এক সময় ওঁরা মিশিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করবেন তাতে আর বিস্ময় কী। মনে করা হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিরাই প্রথম ব্রিটেনে মিশ্র মশলা বহন করে নিয়ে আসেন, কিংবা সেখানকার ভারত-ফেরত ইংরেজদের জন্য পাঠাতে শুরু করেন, এবং তার সূচনা সেই সপ্তদশ শতকে। সপ্তদশ শতকে ইংলন্ড কিচেন পিপার (Kitchen pepper) নামে এক ধরনের মিশ্র মশলা চালু হয়। তাতে থাকত গোলমরিচ, আদা, লবঙ্গ, জায়ফল দারুচিনি ইত্যাদি। তবে সত্যকারের কারি-পাউডার তৈরি শুরু হয় ভারতে লালমরিচ বা লঙ্কার ব্যবহার শুরু হওয়ার পর, সেটা ষোড়শ শতকের ঘটনা। তারপর ক্রমে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে তো বটেই, আমেরিকায়ও শুরু হয় কারি পাউডারের ব্যাপক ব্যবহার। উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে শুরু করে সব ইংরেজি রান্নার বইয়ের কারি-পাউডার তৈরির কৌশল শেখানো হয়েছে। বোম্বে কারি পাউডার, বেঙ্গল কারি পাউডার, মাদ্রাজ কারি পাউডার সব ধরনের কারি পাউডারের অনুপান এবং অনুপাত দেওয়া হয়েছে সেসব বইয়ে। সেইসঙ্গে 'কারিপেস্ট' তৈরির কলা কৌশল। বইগুলোতে চাটনি, মোরব্বা ইত্যাদিও রয়েছে।

মশলা পিষে গুঁড়ো করে মেশাবার ঝামেলাই বা ক'জনের পক্ষে সামলানো সম্ভব। ফলে উনিশ শতকেই নামে নামে বোতল-বন্দি হয়ে বাজারে বের হয় কারি-পাউডার, চাটনি ইত্যাদি। যথা : 'টিপু সাইবস ইন্ডিয়ান কারি পাউডার' (Tippoo Saib's Indian Curry Powder) কিংবা ব্রান্ডস আ ওয়ান,

বেঙ্গল ক্লাব চাটনি' (Brand's A-1, Bengal club chutney) ইত্যাদি ইত্যাদি। যথারীতি জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু ব্যবসায়ী ভেজাল মশলাও বাজারে ছাড়েন। আজ সেই বাজারে একদিকে যেমন বৈচিত্র্য বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে প্রতিযোগিতা। ক্রেতারাও এখনও মশলা সম্পর্কে আরও ওয়াকিবহাল, আরও শিক্ষিত। সুতরাং ব্রাণ্ড-নাম নিয়ে যা বিক্রি হচ্ছে তার বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। বিশেষত রয়েছেন সতর্ক প্রহরীরা।

এই মশলার বাজারের অনেকখানিই কিন্তু ভারতের করায়ত্ত। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত একটি বইয়ে দেখছিলাম—ভারত প্রতিবছর ৭০ হাজার টন বা ৭০ কোটি কিলোগ্রাম মশলা বছরে সরবরাহ করে। বিশ্বের মশলা বাণিজ্যে ভারতের শরিকানা শতকরা ২০ ভাগ। ইন্দোনেশিয়ার স্থান ভারতের পরেই,—দ্বিতীয়। তারপর ব্রাজিল, মাদাগাস্কার, মালয়েশিয়া। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত আর একটি বই অনুসারে ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ভারত দুনিয়ার মানুষকে ১৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড গোলমরিচ এবং ১০০ মিলিয়ান পাউণ্ড লালমরিচ সরবরাহ করেছে। তৎসহ ৩০ মিলিয়ন পাউণ্ড দারুচিনি, ৩২.৫ মিলিয়ন পাউণ্ড লবঙ্গ, ২২ মিলিয়ন পাউণ্ড আদা, ১২.৫ মিলিয়ান পাউণ্ড জায়ত্রী ও জায়ফল ৫.৫ মিলিয়ন পাউণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। এক মিলিয়ন, সবাই জানেন ১০ লক্ষ। তিনি লিখছেন, মনে রাখতে হবে উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের চাহিদা মিটিয়ে তবে এই মশলা রপ্তানি করা হচ্ছে বিদেশে। ভারতেও মন ও উদর পাক খায়,—'দ্য মাইণ্ড অ্যান্ড স্টমাক রিল!'

শ্রাবণী বসু লিখেছেন (২০০০)—১৯৯৬ সালে ভারতীয় মশলার রপ্তানি মূল্য ছিল ১৪.৪ মিলিয়ন পাউণ্ড, ১৯৯৭ সালে তা দাঁড়ায় ১৮.৩ মিলিয়ান পাউণ্ড। পরিমাণে তা ১০ হাজার ৬ শো টনের মতো। এর মধ্যে ছিল গোলমরিচ, হলুদ, আদা, এবং লালমরিচ ইত্যাদি। তা ছাড়া প্রভুত পরিমাণ—কারি-পাউডার।

ভারতে আজ বলতে গেলে প্রায় সব মশলাই উৎপন্ন হয়। আদিতে সব কিন্তু ভারতীয় নয়। যেমন অলস্পাইস (allspice) মেক্সিকোর জিনিস। একই মশলা যেন লবঙ্গ, গোলমরিচ, দারুচিনি, আর জায়ফল মিলিয়ে সৃষ্ট। এখন বেশি ফলে জ্যামাইকায়। ভ্যানিলা (vanilla) তেমনি মেক্সিকোর অবদান। লবঙ্গ ইন্দোনেশিয়ার। ১৭৭০ সালে একজন দুঃসাহসী ফরাসি সেটি অতি সংগোপনে অ্যামবোইনা দ্বীপ থেকে চুরি করে আনেন মরিশাসে। ভারতে লবঙ্গ চালু করেন ইংরেজরা সিংহল থেকে আমদানি করে উনিশ শতকের গোড়ায়। এখন লবঙ্গ ভারতের অন্যতম ফসল। সবচেয়ে রোমাঞ্চকর লাল লঙ্কা বা মরিচের উপাখ্যান। আজ লঙ্কা না হলে আমাদের চলে না। লঙ্কা ছাড়া ভারতীয় কারি ভাবাই যায় না। কারি-তে অপরিহার্য ঝাল লাল মরিচ। মরিচ বস্তুত কারির প্রাণ। অথচ অতীতে ভারতে গোলমরিচ, পিপুল বা আদা ইত্যাদি থাকলেও মরিচ ছিল না। মরিচ দক্ষিণ আমেরিকার অবদান। কলম্বাস ১৪৯৩ সালে তাকে বহন করে আনেন স্পেনে। সেখান থেকে ১৫৪৮ সালের মধ্যে লঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের নানা দেশে। ভাস্কো ডা গামা সেই লঙ্কা পৌঁছে দেন ১৪৯৮ সালে। অনেক মশলাই এমনি করে ভ্রমণ করেছে দেশ থেকে দেশান্তরে। ১৫৬০ সালে দেখা গেল লঙ্কা মরিচের চাষ শুরু হয়ে গেছে বলতে গেলে এই উপমহাদেশের সর্বত্র। ভূমিকম্প মাপবার যেমন একটা মান রয়েছে, তেমনি লঙ্কার ঝাল পরিমাপ করারও একটা বৈজ্ঞানিক মাপ রয়েছে। তাতে দেখা যায় সবচেয়ে ঝাল লঙ্কা উৎপন্ন হয় ভারতের তেজপুরে। ভারতীয় লঙ্কার মতো ভারতীয়দের জিভেরও তেজ আছে বটে!

উপসংহারে কারি-প্রেমের সঙ্গে যুবক-যুবতীর প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে ছোট্ট একটি কাহিনী। কাহিনীটি শুনিয়েছেন থ্যাকারে, তাঁর 'ভ্যানিটি ফেয়ার'-এ। ছুটিতে ভারত থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছেন তরুণ যোসেফ। মা তাঁর জন্য যত্ন করে রান্না করেছেন ভারতীয় কারি। এক সঙ্গে খেতে বসেছেন বাবা মি. সেডলি। পুত্র যোসেফ, কন্যা অ্যামেলিয়া আর তাঁর তরুণী বান্ধবী মিস রেবেকা

শার্প। ছেলে কারি খেতে খেতে বলছে—চমৎকার রেঁধেছ মা, অবিকল আমার ভারতীয় কারির মতো, 'ইট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই ওন কারিজ ইন ইন্ডিয়া!' রেবেকা কখনও কারি খায়নি। তার নিশানা বান্ধবীর ভাই যোসেফ। কৌতূহলি হয়ে সে বলল—ওটা কী? —খেয়েই দেখ না, বলল যোশেফ। হাম হাম করে কারি খাচ্ছে সে। বাবা স্ত্রীকে বললেন মিস শার্পকেও দাও না। খুবই উৎসাহ দেখিয়ে রেবেকা বলল—হ্যাঁ, আমি নিশ্চয় খাব। ভারতীয় ডিশ যখন, তখন নিশ্চয়ই ভাল জিনিস। (ওহ্, আই মাস্ট ট্রাই সাম, ইফ ইট ইজ অ্যান ইন্ডয়ান ডিশ! আই অ্যাম সিওর সামথিং মাস্ট্ বি গুড দ্যাট কামস ফ্রম দেয়ার।') চমৎকার! চমৎকার! কারি মুখে দিয়ে বলে উঠল মিস রেবেকা শার্প। (যোসেফের যা পছন্দ তার সেটা না পছন্দ হলে চলবে কেন?) আসলে কিন্তু ঝালে তার মুখ পুড়ে যাচ্ছিল। যন্ত্রণায় চোখে জল আসছিল বেচারার। মনে মনে হাসছে যোসেফ। বলল—এর সঙ্গে লঙ্কা নাও। ট্রাই এ চিলি মিস শার্প। রেবেকা ভাবল চিলি নিশ্চয় শীতল কিছু। তারপর যা ঘটবার তা-ই ঘটল। আর্ত রেবেকার কাতর ধ্বনি—ওয়াটার, ফর হ্যাভেনস সেক ওয়াটার। মিস্টার সেডলি হাসতে হাসতে বললেন—হ্যাঁ, সত্যিকারের ভারতীয় জিনিস! ওগো, মিস শার্পকে জল দাও।

প্রেমের প্রথম পাঠ সম্পূর্ণ হল। সেই মিস রেবেকা কিন্তু আজ দিব্যি চেটেপুটে খেয়ে নিচ্ছেন কারি। হট কারি। এমনকী ভেরি হটেও তাঁদের আপত্তি নেই।

প্রাসঙ্গিক কিছু বই:

The Anglo-Indian Cook, Containing Receipes for European and Oriental Cookery, Author unknown, Calcutta, 1869.

Nabob's Cookery Book, Mannuel of East and West Indian Receipes, By P. O. P, London Publication : Date unknown.

The Book of Household Management, Mrs. Isabella Beeton, London, 1861.

The Complete Indian House Keeper and Cook, F. A. Steel & G. Gardiner, London, 1888, 7th Edition, 1909.

Indian Cookery Book, By ''A Thirty five years Resident,'' Calcutta, 1877.

Anglo-Indian Cookery at Home : A short Treatise for Returned Exiles, by the Wife of a retired Indian officer, Henrietta Hervey, London, 1895.

Curries of India, Harvey Day, Bombay, 1963.

The Raj Cook Book, Eleanor Bobb, New Delhi, 1981.

The Raj at Table, David Burton, London, 1991.

Curries and Bugles, A Cook Book of the Raj, Jennifer Brennam, London 1990.

Anglo-Indian Food and Customs, Patricia, Brown, New Delhi, 1998.

Taste of the Raj, A celebration of Anglo-Indian Cookery: Pat Chapman, London, 1997.

Curry in the Crown, The Story of Britains Favouite Dish, Shrabani Basu, New Delhi, 1999.

The East India Company Book of Spices, Anthony Wild, London, 1995.

The Travells of Dean Mahomed An Eighteenth Century journey through India, Michael H. Fisher, London, 1997.

Aphrodite, The love of Food and food of love : Isabel Allende, London, 1998.

Indian Food, A Historical Companion : K. T. Achaya, New Delhi, 1994.

Food/ An Oxford Anthology, Ed. Brigid Allen, New York 1994.
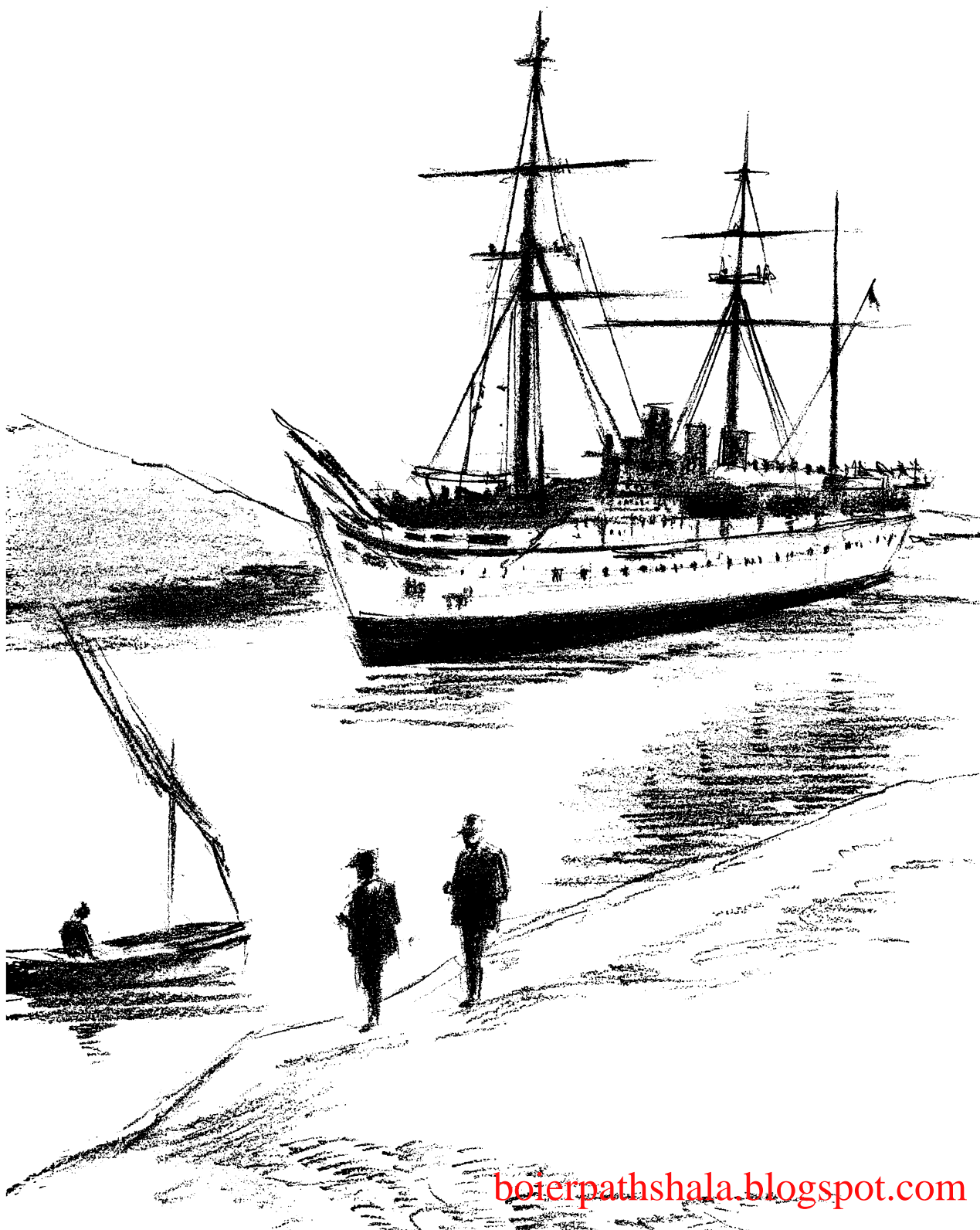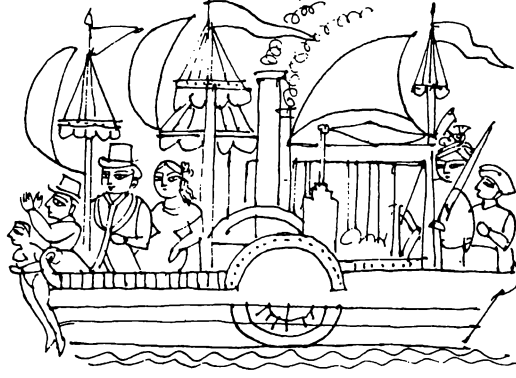
কলের জাহাজ, না কালের বাঁশি

"কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীল জল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ'। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ওই সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে! তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা-ধরাপতি সেই জাতির নরনারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্তিমান আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান—সগর্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ-ঝম্প গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল-উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি; সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার-সম্মিলিত 'রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্' মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল!..."

*

১৮২৫ সালের ডিসেম্বর। বালেশ্বরে এসে নোঙর করে অদ্ভুত-দর্শন একটি বিদেশি জাহাজ। তাতে পাল আছে, আবার কালো রঙের একটি বিশাল চোখও আছে। তা দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে! লোকেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে জাহাজের দিকে। এমন জাহাজ ওই তল্লাটে আগে কেউ দেখেনি। ক'দিন পরে ডিসেম্বরেই জাহাজ এসে হাজির হল কলকাতায়। কলকাতায় কলের জাহাজ অভিনব নয়। তাই বলে এত বড় জাহাজ? 'সমাচার দর্পণ'-এ খবরে বোঝা গেল ব্যাপারটা। 'দর্পণ' লিখেছে—

"আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ইংগ্লন্ডদেশ হইতে বাষ্পের জাহাজ গত কল্য কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে আসিয়াছে কিন্তু এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নয় যেহেতু সকলেই অবগত আছেন যে কোন কর্ম্ম প্রথম

করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়।" (১০ ডিসেম্বর, ১৮২৫)।

এ জাহাজ লখনউ-এর গাজিউদ্দিন হায়দরের সেই খেলনা জাহাজ নয়। নবাব শুনেছিলেন বিদেশে এমন জলযান চালু হয়েছে যার জন্য মাঝিমাল্লার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় না গুন টানারও। শুনে উত্তেজিত নবাব বায়না ধরলেন তাঁরও এমন একটা আজব-নৌকো অবশ্যই চাই। কলকাতার জেসপ কোম্পানি বিলাত থেকে ইঞ্জিন আনিয়ে লখনউর নবাবকে তৈরি করে দিলেন ৫০ ফুট লম্বা এক কলের নৌকো। সেটা ১৮১৯ সালের কথা। পূর্ব পৃথিবীর রাজাবাদশারা তৎকালে এ ধরনের পশ্চিমি খেলনা নিয়ে প্রায়শ মেতে উঠতেন। তার পেছনে বিজ্ঞান কী, কারিগরিই বা কেমন তা নিয়ে কদাচিৎ তাঁরা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসতেন। গাজিউদ্দিন হায়দরও ভাবেননি। তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছেও সে স্টিমার ছিল এক আজব-খেলনা মাত্র। বিদেশি অতিথিদের তাঁরা গর্ব করে সেটি দেখাতেন। স্টিমার যখন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গোমতী তোলপাড় করে ঘুরে বেড়াত প্রজারা অবাক হয়ে তা দেখতেন। নবাবরা মনে মনে তৃপ্তির হাসি হাসতেন। তার বেশি কিছু নয়। সে স্টিমার চলত কয়লা নয়, কাঠের আগুনে।

কলকাতার গঙ্গায়ও তখন কয়েকটি স্টিমার ছিল। 'প্লুটো', 'ফর্বেস', 'টেলিকা', 'কমেট', 'ফায়ার ফ্লাই', 'ডায়না'। কিন্তু ১৮২৫ সালের ডিসেম্বরে বন্দর কলকাতায় নোঙর করা জাহাজটির সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। তুলনা করা চলে না বলতে গেলে প্রায় সমসাময়িক 'গ্যাঞ্জেস' এবং 'ইরাবতী'র সঙ্গেও। এদের কারও কাজ গঙ্গার পলি সারানো, কারও মোহনা থেকে জাহাজের যাত্রীদের শহরে নিয়ে আসা, কারও জাহাজ টানাটানি করা। এসব বলতে গেলে কলের নৌকো, নিছক স্টিমার। ব্রহ্মের কথা মাথায় রেখে তৈরি 'গ্যাঞ্জেস' এবং 'ইরাবতী' অবশ্য সমুদ্র যাত্রায় সমর্থ ছিল। কিন্তু নিকট-সমুদ্র। দৌড় বড়জোর বঙ্গোপসাগরের চৌহদ্দিতে। ১৮২৩ সালে তৈরি ১১০ টনের স্টিমার 'ডায়না'র ছিল দুটো ষোলো অশ্বশক্তির ইঞ্জিন। কলকাতার গর্ব ছিল এই রূপসী স্টিমার। অনেক কৃতিত্বের কাহিনীর নায়িকা সে। সেসব কথা পরে। আপাতত ঘটনা এই 'সমাচার দর্পণ' বর্ণিত জাহাজটির সঙ্গে তার পক্ষে পাল্লা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সেই জাহাজের নাম—'এন্টারপ্রাইজ'। ৫০০ টনের জাহাজ। দৈর্ঘ্যে ১৪১ ফুট। চওড়ায়—সাড়ে ২৭ ফুট। তার রয়েছে ৬০ অশ্বশক্তির দুটি ইঞ্জিন। সে এসেছে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ১৩,৭০০ মাইল সাঁতরে। ইঞ্জিনের পাশাপাশি জাহাজটিতে পালের বন্দোবস্তও রয়েছে। অনুকূল হাওয়া পেলে 'এন্টারপ্রাইজ' চলেছে বায়ু-বলে, অন্য সময় কয়লা পুড়িয়ে বাষ্পের সাহায্যে। কলকাতায় প্রথম বাষ্পীয়পোত 'এন্টারপ্রাইজ'। তার সঙ্গে অন্যদের তুলনা চলে কেমন করে।

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে এই জাহাজটি যিনি কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নাম—জেমস হেনরি জনস্টন (১৭৮৭-১৮৫১)। বাহাদুর জাহাজি তিনি। এক সময় ছিলেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে। ট্রাফালগারে নেপোলিয়ানের সঙ্গে লড়াই করেছেন। ইতালির উপকূলেও নৌযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। যুদ্ধ শেষে আহত জনস্টন যখন আধা বেতনে ডাঙায়, তখন তাঁকে পেয়ে বসে নতুন এক নেশায়—স্টিম ইঞ্জিন। স্টিম নেভিগেশন। ভাগ্যের সন্ধানে তিনি পূর্ব দিগন্তের দিকে তাকালেন। কলকাতা থেকে আগে তিনি দুই-দুইবার পালের জাহাজ নিয়ে পশ্চিমযাত্রী হয়েছিলেন। ১৮২১ থেকে আরাধ্য তাঁর—বাষ্পীয় পোত। 'এন্টারপ্রাইজ' সেই স্বপ্নেরই পরিণিতি। ১৮২৫ সালের ১৬ অগস্ট মালপত্র এবং কিছু যাত্রী নিয়ে দরিয়ায় ভেসেছিলেন লেফটেন্যান্ট জেমস হেনরি জনস্টন 'এন্টারপ্রাইজ'কে নিয়ে। কলকাতায় পৌঁছয় সে বছরই ডিসেম্বরের ১ তারিখ। ('এন্টারপ্রাইজ', 'ডায়না' এবং আদি পর্বের স্টিম ইঞ্জিনের ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য—'Steamboats on the Ganes', Henry Bernstein, Calcutta, 1960. বাংলায় তখনকার সামগ্রিক ইতিহাসের রূপরেখা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ তাঁর 'কলের শহর কলকাতা' বইয়ে। প্রকাশকাল, কলকাতা, ১৯৯১)।

জনস্টনকে বলা হত—'স্টিম জনস্টন'। 'এন্টারপ্রাইজ' নিয়ে দরিয়ায় ভাসার সময় তাঁর চোখে একটি স্বপ্ন ছিল। কলকাতার ইংরেজ সওদাগরেরা ঘোষণা করেছিলেন বাষ্পীয় পোত নিয়ে যিনি ৭০ দিনে কলকাতায় পৌঁছতে পারবেন এবং ৭০ দিনে ফিরে যেতে পারবেন লন্ডনে তাঁকে ১ লক্ষ টাকা (১০ হাজার পাউন্ড) পুরস্কার দেওয়া হবে। কলকাতার ব্যবসায়ীরা তখন বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগী। ওঁরা বাণিজ্য করেন অন্য পথে। ইংল্যান্ড থেকে মার্সাই, আলেকজান্দ্রিয়া কায়রো সুয়েজ হয়ে লোহিত সাগর ধরে ভারতে। তৎকালে সেই পথটিকে বলা হত 'ওভারল্যান্ড রুট', জলে-ডাঙায় মিলিয়ে পথ। কিন্তু সময় লাগে কিছু কম। ঝঞ্ঝাট অবশ্য কম নয়। কায়রো থেকে সুয়েজের দূরত্ব আশি মাইল মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলতে হয়। পথ কষ্টসাধ্য, বিপদের ঝুঁকিও কম নয়। অন্যদিকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো ডা গামার সেই চেনা পথ। কলকাতার ব্যবসায়ীরা সে পথেরই পৃষ্ঠপোষক। তৃতীয় আর একটি পথও ছিল অবশ্য। বসফরাস-পারস্য উপসাগর ধরে। কিন্তু উনিশ শতকের বাণিজ্য পথ বলতে প্রধানত জনপ্রিয় এই দুটি পথ। জনস্টন নিজেও সুয়েজ-লোহিত সাগরের পথ পছন্দ করতেন। কলকাতার ব্যবসায়ীরাও তা-ই। সুতরাং তিনি এই পথেই এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, কলকাতার পুরস্কারটি তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। কারণ, ৭০ দিন নয়, তাঁর সময় লেগে যায় ১১৫ দিন। পথে কেন দেরি হল তার অনেক যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত ছিল। জাহাজ ছাড়তে দেরি হয়েছে, ফলে পবনদেবকে সহায় পাওয়া যায়নি। পথে কয়লা সরবরাহের সমস্যা ছিল। জাহাজ অনুপাতে শক্তির জোগান ছিল কম, ৪ টন প্রতি ১ অশ্বশক্তি। তা সত্ত্বেও 'এন্টারপ্রাইজ' এবং তার ক্যাপ্টেন বাহাদুরি দেখিয়েছেন কম নয়। কিন্তু কলকাতার ব্যবসায়ীরা তবু মনমরা হয়ে গেলেন। যে উৎসাহের সঙ্গে টাউন হলে সভা করে শেয়ার বিক্রি করে তাঁরা পুরস্কারের জন্য কোম্পানি গড়েছিলেন তাতে গঙ্গার জল ঢেলে দেওয়া! যাত্রীরা যেভাবে কালিঝুলি মেখে জাহাজ থেকে ডাঙায় নেমেছেন ফেরার পথে এ জাহাজের পক্ষে যাত্রী সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে যাবে। তবে উপায়? শেষ পর্যন্ত সরকার ৪০ হাজার পাউন্ডে মালিকের কাছ থেকে জাহাজটি নিলেন। কেননা, তখন আপৎকাল।

পুরস্কার বিজয়ে ব্যর্থ হলেও 'এন্টারপ্রাইজ' এক ঐতিহাসিক জাহাজ। এ জাহাজ যুগান্তরের বার্তাবহ। পালের বদলে বাষ্পশক্তিতে উত্তরণের পথে এক বিরাট উল্লম্ফন।

আগে ছিল পালের জাহাজ। শুধুই পাল। স্বামী বিবেকানন্দ সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তার—

> "পালভরে জাহাজ চালানো একটি আশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়া। হাওয়া যে দিকে যাক না কেন, জাহাজ আপনার গম্যস্থানে পৌঁছবেই পৌঁছবে। তবে হাওয়া বিপক্ষ হলে একটু দেরি। পালওয়ালা জাহাজ কেমন দেখতে সুন্দর, দূরে বোধ হয়, যেন বহুপক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরাজ আকাশ থেকে নামছেন। পালের জাহাজ কিন্তু সোজা চলতে বড় পারেন না; হাওয়া একটু বিপক্ষ হলেই এঁকে বেঁকে চলতে হয়, তবে হাওয়া একেবারে বন্ধ হলেই মুশকিল—পাখা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। মহা-বিষুবরেখার নিকটবর্তী দেশসমূহে এখনও মাঝে মাঝে এইরূপ হয়।...পাল-জাহাজ হাওয়ার হাতে। পাল খুলতে, বন্ধ করতে, হাল ফেরাতে হয়তো জাহাজ চড়ায় লেগে যেতে পারে, ডুবো পাহাড়ের উপর চড়ে যেতে পারে, অথবা অন্য জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগতে পারে। এখন আর যাত্রী বড় পাল-জাহাজে যায় না, কুলী ছাড়া।..."

জাহাজ নিয়ে লিখতে বসে বার বার স্বামী বিবেকানন্দের কথাই মনে পড়ছে। ১৭৬৫ সালে নদিয়ার সেই বিলাতযাত্রী 'বিলায়েৎ নামা'র লেখক মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দিন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পরবর্তিকালের অনেকেই পশ্চিম যাত্রী-র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। জাহাজের যান্ত্রিক দিকগুলোর দিকে নজর করেছিলেন সম্ভবত একমাত্র ইতিসামুদ্দিন। তার চৌত্রিশ বছর পরে আর এক যাত্রী মির্জা আবু তালের খানও পশ্চিমি যন্ত্র সভ্যতার পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্বামীজির মতো

জাহাজ ও জাহাজের কর্মী-বাহিনীর কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ বোধ হয় আর কেউ দেননি। তাঁর 'পরিব্রাজক' বইটি সেদিক থেকেও বারবার পড়বার মতো।

হাওয়া জাহাজের অনেক সমস্যা। প্রথমত, জাহাজ তৈরি এক বিরাট কাণ্ড। দ্বিতীয়ত, মালিকানা সাব্যস্ত করা। তৃতীয়ত, কাপ্তান এবং লোকলস্কর সংগ্রহ। তারপর যাত্রার প্রস্তুতিপর্ব। আর কিছু নয়, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি একটা মোটামুটি বড়সড় জাহাজের জন্য কত কর্মী লাগত শুনলে অবাক হতে হয়। ক্যাপ্টেন বা কমান্ডার ছাড়া দলে থাকতেন চিফ 'মেট', তাঁর নীচে আরও পাঁচজন মেট। তারপর চারজন মিড-শিপ ম্যান, সার্জন, সার্জনের মেট, পার্সার, বোটসওয়েইন, গানার, কার্পেন্টার, কলকার, কুপার, সেমেকার, আর্মারার, বুচার, বেকার, পোলট্রিয়ার, কক্সওয়েন, বোটস্ওয়েন মেট, গানারস মেট, কার্পেন্টারস মেট, কুপারস মেট, ক্যাপ্টেন্স কুক, শিপস কুক, ক্যাপ্টেন্স স্টুয়ার্ট, শিপ স্টুয়ার্ট, কোয়ার্টার মাস্টার্স। ক্যাপ্টেন্স সার্ভেন্ট, চিফ অফিসারর্স সার্ভেন্ট, বোটসওয়েন সার্ভেন্ট, সার্জন সার্ভেন্ট, ফোরজ্যাস্ট মেন ইত্যাদি ইত্যাদি। জাহাজ নয়তো যেন ছোটখাটো একটি গঞ্জ। ১৭৪৬ সালে ডারিংটন নামে একটি জাহাজ যাত্রার আগে কী কী জিনিস নেওয়া হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকায় দেখি: এল্ বা বিয়ার সাইডার রাম ইত্যাদি পাঁচ টন। স্ট্রং বিয়ার ছ'টন। স্মল.বিয়ার চল্লিশ টন, ব্রান্ডি এবং ইংলিশ স্পিরিট ২৫০ গ্যালন। ওয়াইন ছ'টন। ব্রেড তিরিশ হাজার ওয়েট। বিফ, পর্ক ইত্যাদি পঁচিশ টন। মাছ সাত হাজার। রেড অ্যান্ড হোয়াইট হেরিং, এবং সামন পাঁচ ব্যারেল। মটর দানা ১৮০ গুসেল। ওট, বার্লি ইত্যাদি তিনশো গুসেল। গম ৭০ হন্দর। চিজ ৫০ হন্দর। বাটার ৩০ ফিরকিনস। ফল ১৫ হন্দর। রাইদানা দশ গুসেল। তেল তিনশো গ্যালন। অরেঞ্জ এবং লেমন ছয় বাক্স। সাদা নুন চল্লিশ গুসেল। চিনি এবং মশলা ১৫ হন্দর। ভিনিগার ছয় হগস হেডস। সস পাঁচ কেস। লাইম জুস একশো গ্যালন। পানীয় জল চল্লিশ গ্যালন। জাহাজটিতে যাত্রী ও নাবিক মিলিয়ে মানুষ ছিল একশো। প্রশ্ন উঠতে পারে, তার জন্য এমন বিপুল আয়োজন? সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ পথ দুর্গম। যা হিসেব করা হয়েছে, তার চেয়ে দীর্ঘতর হওয়াও অসম্ভব নয়। এ জাহাজে যে হিসেব দেওয়া হয়েছে, তাতে জ্যান্ত গরু ভেড়া এবং হাঁস মুরগির হিসেব দেওয়া হয়নি। খাদ্য হিসাবে তা-ও ছিল তৎকালের সব জাহাজে অপরিহার্য সঙ্গী। প্রতি জাহাজে কসাইদের উপস্থিতি তাদেরই জন্য।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতে পৌঁছতে পাল তোলা জাহাজের সময় লাগত গড়ে চার থেকে ছয় মাস। লর্ড ভ্যালেন্সিয়া ১৮০২ সালের জানুয়ারি মাসে যাত্রা করে ভারতে পৌঁছেছিলেন পরের বছর জানুয়ারি মাসে। ১৮০৯ সালে ক্যালকাটা গেজেট জানাচ্ছে, ধরে নেওয়া ভাল ইংল্যান্ড-ভারত যাতায়াতের এক এক পিঠের সময় লাগত গড়ে সাড়ে সাত মাস। ১৮২৩ সালে বিশপ হিবার ইংল্যান্ডের উপকূল ছেড়েছিলেন ১৬ জুন তারিখে, সাগরদ্বীপে পৌঁছন অক্টোবরের ৩ তারিখে। ১৮৩৬ সালে লর্ড অকল্যান্ড ও তাঁর বোনেরা কলকাতা পৌঁছন। তাঁরা জাহাজে ছিলেন পাঁচ মাস। পরবর্তিকালে অবশ্য পালের জাহাজও কিছুটা দ্রুতগতি হয়েছে। ১৮৩০ সালে পোর্টসমাউথ থেকে কলকাতায় একটি জাহাজ পৌঁছেছিল ৭৯ দিনে। প্রায়শ সরাসরি আসা হত না। উইলিয়াম হিকি এক যাত্রায় লিসবন থেকে মাদ্রাজ পৌঁছেছিলেন ২৭২ দিনে। শেষবার ১৮০৮ সালে তিনি যখন দেশে ফিরে যান, তাঁর সময় লেগেছিল ২৭ সপ্তাহ। আসলে যাত্রার আগে জাহাজে উঠবার প্রস্তুতিপর্বেই দু'একমাস কেটে যেত বন্দরের আলস্যে। জাহাজে উঠবার পর দু'তিন সপ্তাহ সমুদ্রে দম বন্ধ করা পরিস্থিতিতে। এক দিকে মাল উঠছে, অন্যদিকে যাত্রীরা নিজ নিজ সংসার গুছোচ্ছেন। তারপর সব চুকিয়ে যদি বা যাত্রা শুরু হল পথে ম্যাডিরা-তে চার-পাঁচ দিনের বিরতি। সেন্ট হেলেনায় আরও দিনকয়। কেপ অফ গুড হোপ-এ হয়তো এক সপ্তাহ। হাওয়া অনুকূল থাকলে পরের দু'মাসে বঙ্গোপসাগর। সাগরে পৌঁছনো মানেই কলকাতা পৌঁছনো নয়, ১৭৭৪ সালে

কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস সাড়ে ছ'মাস জাহাজে থাকার পর বলতে গেলে কপালজোরে জাহাজডুবি থেকে রক্ষা পেয়ে যান মোহনায়। ১৭৭৭ সালে ভারতে আসার পথে হিকির জাহাজ 'সি হর্স' ক্যাপ্টেনের হিসাবের গোলমালে পথ হারিয়ে চলে যায় আরাকানে। জাহাজ বিলাত থেকে যাত্রা করেছিল ৩০ মার্চ। বঙ্গোপসাগরে পৌঁছয় ৮ অক্টোবর। পথ হারিয়ে কলকাতা পৌঁছতে পৌঁছতে ৩ নভেম্বর। সাকুল্যে প্রায় ৩২ সপ্তাহের ধাক্কা! পথে অনেক বাধা-বিপত্তি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত নৌ-বিজ্ঞান পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। কম্পাসে গোলযোগ ঘটত। অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা নির্ণয় দুরূহ কাজ ছিল। চার্ট সব সময় সকলে ঠিকমতো পড়তে পারতেন না। আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে রচিত যে মানচিত্র বা চার্ট তার ব্যাখ্যাও সব সময় নির্ভুল হত না। সমুদ্রস্রোত ও সমুদ্রবায়ুর গতিবিধিও ছিল দীর্ঘকাল পর্যন্ত রহস্যময়। মৌসুমি বায়ুর জারিজুরি আরব নাবিকেরা যেমন জানতেন, পশ্চিমি নাবিকেরা তা জানতেন না। ফলে জাহাজডুবি হত মাঝেমধ্যেই। ১৮০৮ সালে কলকাতা থেকে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পর হিকি লিখছেন, স্কেলটন ক্যাসল নামে তাঁদের বহরের একটি জাহাজ আগে আগে যাচ্ছিল, কেপ টাউনের পর সেটি ঝড়ে পড়ে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। জাহাজটি ছিল 'সাধারণ যাত্রী ও সৈনিকে বোঝাই'। তিনি আরও লিখছেন—দুঃখের বিষয়, ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর আমি অন্তত বিলেতের পক্ষে সাতটি ইস্ট ইন্ডিয়া মেন-এর ধ্বংস সংবাদ শুনেছি।—তাঁর শীতল মন্তব্য—'মোস্ট আনফরচুনেটলি অল দিজ শিপস ওয়ার ফুল অব প্যাসেঞ্জার্স।'

ঝড়-ঝঞ্ঝা ছাড়াও ছিল বোম্বেটে জাহাজের ভয়। এখানে আরও জলদস্যুরা ওত পেতে থাকত। তৎকালে জলেস্থলে ইংরেজ আর ফরাসির বিবাদ বলতে গেলে এক অফুরন্ত বৈরিতার কাহিনী। ফরাসি জলদস্যুরা সুযোগ পেলে যাত্রিবাহী জাহাজেও চড়াও হত। অনেক সময় যাত্রীরা তাদের হাতে বলিও হতেন। কখন কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে ঠেকতে হবে কে জানে! একবার ফরাসি দস্যুরা বঙ্গোপসাগরে ইংরেজের এক যাত্রিবাহী জাহাজ লুঠ করে পুরুষ বন্দিদের পাঠিয়ে দেয় কলকাতায় আর জাহাজের অফিসার এবং মহিলা যাত্রীদের ভদ্রতা করে পাঠিয়ে দেয় মরিশাসে। শেষে ইংরেজের আর এক জাহাজ তাদের উদ্ধার করে। আক্রান্ত জাহাজে বীরত্ব এবং কাপুরুষতা দুইই দেখা যেত। কলকাতার পথে একটি জাহাজ আক্রান্ত হলে জাহাজের জেনারেল সেন্ট জন পালিয়ে লুকিয়ে থাকেন রুটির ভাঁড়ারে। সেখানে নিরাপত্তার জন্য মহিলা যাত্রীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে ওই 'বীর' সেনাপতির নাম 'দ্য ব্রেডরুম জেনারেল'। আর একবার লর্ড নেলসন নামে ইংরেজদের একটি জাহাজ ইংলিশ চ্যানেলের অদূরে ফরাসিদের হাতে আক্রান্ত হয়। জাহাজে সবাই যখন ভয়ে ত্রস্ত, মিস মারি লয়েড নামে এক তরুণী রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করে অসম সাহসের পরিচয় দেন। উপকূলের কাছেই 'রয়াল নেভি'র পক্ষে অতএব সে জাহাজ পুনর্দখল করতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

দীর্ঘ পথ। প্রথম দুশো বছর ধরে এ পথে ছিল পদে পদে অনিশ্চয়তা। বারোশো তেরোশো মাইল দীর্ঘ সমুদ্রপথে বুঝি বা বন্ধুর চেয়ে শত্রুই বেশি। ১৭৭২ সালে সেন্ট হেলেনা ছাড়া দু'দণ্ড জিরিয়ে নেওয়ার মতো জায়গা ইংরেজ কাপ্তেনদের সামনে বলতে গেলে আর নেই। কেপ অব গুড হোপ তখনও কেপ টাউন নাম পায়নি। সেটি তখন ডাচদের হাতে। ইংরেজদের হাতে আসে ১৭৯৫ সালে। মরিশাস ছিল ফরাসিদের হাতে, ইংরেজরা সেটি দখল করে ১৮১০ সালে। সিংহলও ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত ছিল ডাচদের অধিকারে। বলতে গেলে গোটা অষ্টাদশ শতক জুড়ে ভারতের পথে প্রায় সব বন্দরই ইংরেজ নয়, অন্য ইউরোপীয় জাতির অধিকারে। তারই মধ্য দিয়ে পাল খাটিয়ে ঢেউ ডিঙিয়ে সন্তর্পণে ভারতের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

চোখে অজানা দেশের স্বপ্ন। অজানা অচেনা দেশে নব নব অভিজ্ঞতা হবে। সেই উত্তেজনায় যাত্রীরা অধীর। আশা, একদিন বিস্তর মোহর নিয়ে ঘরে ফিরবেন। কিন্তু স্বপ্নপূরণ কি এতই সহজ?

তার জন্য চাই সামর্থ্য। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার প্রয়োজন জাহাজে উঠতে হলে। পোশাক চাই, জাহাজে দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য আয়োজন চাই, সর্বোপরি চাই ভাড়ার নগদ টাকা। কিপলিং লিখেছেন ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে নিঃসঙ্গ কোনও মেয়েকে কলকাতায় আসতে হলে খরচ পড়ত পাঁচশো টাকা। কেবিনে এলে খরচ আরও বেশি। আসবাবপত্র নিয়ে মনের মতো করে সেটি সাজাবার খরচ নিজেকে বহন করতে হবে। খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল আলমারি আয়না সব কিছুর ব্যবস্থা যাত্রীকেই করতে হবে। ফেরার পথে উইলিয়াম হিকিকে ভাড়া দিতে হয়েছিল পাঁচ হাজার সিক্কা টাকা। তার মধ্যে ৮০০ টাকা কেবিন ভাড়া। জাহাজে ওঠার জন্য নৌকো ভাড়া ৫০০ টাকা, আসবাবপত্র ও পোশাক ২ হাজার টাকা। কলকাতার বন্ধুরা বাক্স বাক্স মদ উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। শৌখিন হিকিকে তা সত্ত্বেও আবগারি খাতে খরচ করতে হয় ১,২৩৫ টাকা। ত্রিশ ডজন জলের 'বোতলও' নিয়েছিলেন তিনি। লন্ডন থেকে জাহাজ ছাড়ার সময় জল নেওয়া হত সরাসরি টেমস নদী থেকে। অষ্টাদশ শতকে সে জল ছিল অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধযুক্ত, এক কথায় অপেয়। জাহাজিরা তা-ই পান করেন। জাহাজ চলাকালে নাকি ধীরে ধীরে সে জলের চেহারা এবং চরিত্র পাল্টে যেত। তবু অতি সাবধানীরা সাধ্যমতো পানীয় জল নিয়ে চলাফেরা করতেন। হিকি গোরু এবং ছাগলও নিয়েছিলেন। প্রথম প্রাণীগুলো নিয়েছিলেন তাজা মাংসের লোভে। ছাগলদের কাছে প্রত্যাশা ছিল দুধের। জল প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৮৪৪ সালের জাহাজযাত্রীদের প্রতি প্রচারিত একটি উপদেশ। তাতে বলা হয়েছিল সঙ্গে একটি বালতি ও দড়ি রাখবে, প্রয়োজনে নিজেই সমুদ্র থেকে নোনা জল তুলে নিতে পারবে।

যাত্রীদের পানীয় জল রেশন করে সরবরাহ করলেও অনেক যাত্রী তা নিয়ে ভাবিত ছিলেন না। কেন না, বিকল্প পানীয় মদ্যের সরবরাহ ছিল অঢেল। অবশ্য নিজস্ব সংগ্রহ গড়ে তুলতে হলে টাকা দরকার। তার চেয়েও বেশি টাকা দরকার কিন্তু ওয়ার্ড্রোব ভরাতে। তখনকার ভারতযাত্রীদের জন্য যে সব পোশাক পরিচ্ছদের তালিকা প্রকাশ করা হত, সেগুলো দেখলে মনে হয় বুঝিবা প্রত্যেকেই এক-একটি পোশাকের দোকান সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। ডজন ডজন ট্রাউজার্স, জ্যাকেট, গেঞ্জি, ড্রয়ার, শার্ট, গ্রোস গ্রোস মোজা, দশ বিশ জোড়া জুতো। রাশি রাশি আরও অন্য পোশাক। এক এক জনের লটবহরের পরিমাণ কীরূপ দাঁড়াত তার ইঙ্গিত মেলে ছোট্ট একটি খবরে। ভারত থেকে ফেরার পথে একজন সাধারণ যাত্রী মাল নিয়ে যেতে পারতেন এক টন। জেনারেল অফিসার বা কাউন্সিলের মেম্বার হলে তো কথাই নেই, তাঁদের জন্য বরাদ্দ ছিল পাঁচ টন। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে বুদ্ধিমানরা অনায়াসে বরাদ্দের বেশি মাল নিয়ে আসতে কিংবা যেতে পারতেন।

চার-ছ' মাসের জন্য ডাঙা ছেড়ে অকূল সমুদ্রে ভাসছেন যাঁরা, চার থেকে ছ' মাসের জন্য জাহাজই তাঁদের ঘরবাড়ি। সংসারে যেমন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, গতানুগতিকতা এবং নাটকীয়তা, জাহাজেও তেমনি। অতর্কিতে মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত কাউকে, দুর্ঘটনায় মৃত্যুও ছিল বলতে গেলে নিয়মিত। কখনও কখনও মহামারি দেখা দিত। প্রথম দিকে স্কার্ভির প্রকোপও ছিল বলতে গেলে অবধারিত। তারই মধ্যে সঙ্গীদের আসর, নাচের আসর, নাটক-অপেরা, উৎসব-উত্তেজনা। এক-একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন ভয়ানক বদ্‌রাগী। একবার একজন তাঁর সামনে শিস দিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁকে শিকল পরিয়ে রেখেছিলেন। আর একবার এক ক্যাপ্টেন রেগে গিয়ে তাঁর কেবিনে খিল দিয়ে পড়েছিলেন। একজন মহিলা যাত্রী জনৈক মিসেস জর্জ স্মিথকে বলেছিলেন ঝড় উঠলে তাঁর ১২০টি প্যাকেট তিনি সমুদ্রে ছুঁড়ে দেবেন। ভদ্রমহিলা রেগে গিয়ে বললেন, তুমি একটি বর্বর সামুদ্রিক জন্তু। ক্যাপ্টেন এতই অপমানিত হয়েছিলেন যে তিনি নাকি দিন কয়েকের মতো খাবার সময়টুকু বাদ দিয়ে কারও সামনে বের হতেন না। কোনও কোনও ক্যাপ্টেন অবশ্য পিতৃপ্রতিম ছিলেন। শান্ত, গম্ভীর অথচ মিষ্ট স্বভাবের। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে অন্তত বেশিরভাগই ছিলেন বদমেজাজি, কর্কশ এবং অসংস্কৃত। জাহাজের অন্য অফিসার এবং অন্য নাবিকেরা অনেকেই ছিলেন

রুক্ষ মেজাজের। অধিকাংশই অতিশয় মদ্যপ।

জাহাজে স্বভাবতই রোমান্সও হত। একজন গবেষক জানাচ্ছেন, ভারতে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে যিনি প্রথম ভারত যাত্রা করেন, তিনি মিসেস হাডসন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরিচারিকা এবং ফ্রান্সেস ওয়েব নামে একজন আর্মেনিয়ান। আর্মেনিয়ান ভদ্রমহিলা ভারতেই জন্মেছিলেন। জাহাজেই তিনি একজনের প্রেমে পড়েন। গবেষকের মন্তব্য—আন উইটিংলি সেটিং দ্য প্যাটার্ন ফর কাউন্টলেস উইমেন হু কেম আফটার হার। পরবর্তী কালে যিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের দ্বিতীয় পত্নী সেই ব্যারনেস ইমহফ-এর সঙ্গে হেস্টিংসের প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল কিন্তু জাহাজেই। উইলিয়াম হিকি ১৭৮২ সালে শার্লট ব্যারি নামে যে মেয়েটিকে নিয়ে ভারতের পথে জাহাজে চড়েছিলেন, তিনি তাঁর বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন না। শার্লটকে নিয়ে প্রেমে হাবুডুবু সুরসিক হিকি কিন্তু জাহাজের অন্য সুন্দরী মেয়েদের ওপর নজর রাখতে ইতস্তত করেননি। জাহাজে মিস বার্টিস নামে একটি মেয়ে সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য,—সাদাসিধে মেয়েটি, কিন্তু অতিশয় মার্জিত। সে কলকাতা যাচ্ছে স্বামীর খোঁজে। এ ধরনের মেয়েদের বলা হত, যাচ্ছে জেলে-ডিঙি নিয়ে। যেন মাছ ধরতে। তাদের নিয়ে কত না কাহিনী। জাহাজেরই আর একটি মেয়ে সম্পর্কে হিকি লিখছেন তার দিদি আর তার বোন ভারতে আছেন। মেয়েটি তাদের কাছে যাচ্ছে। আশা সেখানে মনের মতো বর খুঁজে পাবে। কিন্তু ঠিকানায় পৌঁছবার আগেই হিকি খবর নিয়ে জেনেছেন মেয়েটির দিদি মারা গেছে আর সে তার ভগ্নীপতিরই অঙ্কশায়িনী। 'ফিশিং ফ্লিট'-এ সওয়ারি হয়ে যাঁরা আসতেন তাঁদের বাসনা ছিল শীতে এ দেশে পৌঁছানো। যারা বর না পেয়ে ফিরে যেতেন সেই ভাগ্যহীনাদের বলা হত 'রিটার্নস এম্পটি'।

সুতরাং মাছ ধরার চেষ্টা চলত জাহাজ থেকেই। ১৮৮৫ সালে 'দি ইন্ডিয়া গাইড' নামে কলকাতায় একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতার বই বেরিয়েছিল। মিস এমিলি ব্রিটল নামে সম্ভবত ছদ্মনামা কেউ বিলেত থেকে এ দেশে আসার পথে জাহাজে যে সব যাত্রী দেখেছেন তাঁদের সম্বন্ধে চিঠি লিখছেন স্বদেশে মাকে। দীর্ঘ কবিতা। ইংরেজিতে না পড়লে পুরো রস উপভোগ করা যাবে না। কবি-বন্ধু দুটি কবিতা থেকে চারটি করে ছত্র বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছেন এ ভাবে—

'সার্ টিমথি বোর হচ্ছেন
ঘরছাড়া এক লম্পট,
নিত্য করেন মশকরা, আর
তার পরে দেন চম্পট....।
কাউন্সেলর ছোকরা ড্যাপার
ভাব দেখাচ্ছে হেন
কায়দা-কেতা তার চে' ভাল
কেউ জানে না যেন।'

সুযোগ ছিল অনেক, বলতে গেলে অফুরন্ত। মেয়ে যাত্রীদের অধিকাংশেরই সঙ্গে থাকত পিয়ানো, আঁকার সাজসরঞ্জাম, সেলাই বা হাতের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কেউ কার্পেট বুনতেন, কেউ ক্রসেটে, কেউ উল বুনতেন, কেউ ছবি আঁকতেন, কেউ গান করতেন। খাবার ঘরে যাত্রীদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হত, ফ্যান্সি বল-এ, কিংবা অন্যত্র। কোনও কোনও জাহাজে শুধু মেয়েদের জন্য এগ অ্যান্ড স্পুন রেস-এর ব্যবস্থাও হত। কখনও কখনও তাসের আড্ডা বসত। কিংবা দাবার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মী মসলিপত্তমের বিপত্নীক কালেক্টর পিটার চেরির তিন কন্যা বাবার কাছে ভারতে আসবে। সেই উপলক্ষে ১৮১৭ সালের জুন মাসে মেয়েদের জাহাজজীবন সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে ১৪ পাতার একটি চিঠি লিখেছিলেন তিনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ জর্জিয়ানা চেরিকে। এটা করবে, ওটা করবে না তারই পিতৃসুলভ পরামর্শ। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সমুদ্র-যাত্রা

কী ভাবে যাপন করবে, তারই উপরে নির্ভর করবে সুখ অথবা দুঃখ। বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন চিন্তা কর্মে এবং আচরণে পাপ যেন কোনওমতেই স্পর্শ না করে তোমাদের। ঘর ছেড়ে বেরোবে না। বেশি সাজগোজ করবে না। নরম ধাতের মদ্য পান করবে পরিমিত। অন্য মেয়েরা যা করে তা-ই তোমাদের করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। এ চিঠির চার বছর পরে জর্জিয়ানা চেরি বোনদের নিয়ে মাদ্রাজের উদ্দেশে জাহাজে চড়ে। তার জার্নালে কিন্তু থেকে থেকেই দেখা যায় পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনের নজির। মিস্টার ফ্রস নামে উনিশ বছরের এক হবু রাইটারের সঙ্গে তাঁর দিব্যি মেলামেশা। সুযোগ পেলেই সে এসে জর্জিয়ানাকে সঙ্গ দেয়। সঙ্কটে সান্ত্বনা দেয়। মিঃ ফ্রস তাঁকে থেকে পড়ে শোনায়। সে জর্জিয়ানার সঙ্গে দাবা খেলে। বোঝা যায় সমুদ্রবায়ু মেয়েটির মেজাজের পরিবর্তন সূচিত করেছে। থেকে থেকেই সে লেখে বাবা তুমি শুনলে হয়তো রাগ করবে, কিংবা বাবা, তুমি আমায় ক্ষমা করে দিও। আমি কিন্তু সে আমিই আছি। পথে ওয়াল্টার স্কটের ছ'টি উপন্যাস শেষ করে ফেলেছে জর্জিয়ানা। তিন বছর আগে প্রকাশিত 'দ্য হার্ট অব মিডলোথিয়ানো' পড়ে ফেলেছে। নাচেও যোগ দিচ্ছে সে। জার্নালের সম্পাদক মন্তব্য করছেন, দ্য প্রিজন ডোরস ওয়ার স্লোলি ওপেন। মাদ্রাজে পৌঁছবার পর চেরি কিন্তু মেয়েদের অভ্যর্থনা করবার জন্য জাহাজ ঘাটে আসেননি। তাদের নিতে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন চেস নামে এক তরুণ। তার সঙ্গেই ১৮২২ সালের জানুয়ারিতে বিয়ে হয় জর্জিয়ানার। জাহাজের সহযাত্রী মিঃ ফ্রস তখন কোথায় কে জানে। ক্যারোলিন বেকার নামে ২৪ বছর বয়সের আর এক মাদ্রাজ-যাত্রীরও জার্নাল পাওয়া গেছে। সেটা ১৮৩১ সালের কথা। ১৩৫ দিন পর জাহাজটি মাদ্রাজ পৌঁছয়। মনে হয় সে ছিল অতিশয় আমুদে মেয়ে। সাজগোজ, পানাহার, নাচ-গান সব কিছুতেই তুমুল উৎসাহ তার। সাতজন পুরুষ যাত্রীর সঙ্গে বসে মদ্যপান করেছে সে। জার্নালে লিখেছে, মনে হয় আমার দিকে ঝোঁক ছিল ওদের। তার জার্নালে ঘুরে ঘুরেই আসে যাত্রাসঙ্গী ক্যাপ্টেন জোসেফ লেগাট নামে এক তরুণের কথা। প্রকৃত যাত্রাসঙ্গী অবশ্য ছিল, তার এক ভাই এবং তাঁর স্ত্রী। তবু ঘুরে ঘুরেই লেগাট। মাদ্রাজে নামার ক'সপ্তাদের মধ্যেই শোনা গেল ক্যাপ্টেন লেগাটের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ক্যারোলিন বেকারের। শুধু উপনিবেশ নয়, শুধু অজানার উদ্দেশে অভিযান নয়, নয় শুধু বাণিজ্য, পালতোলা জাহাজের দুনিয়ায় সেদিন এক ভাসমান জগৎ।

> 'জাহাজ অবিশ্রান্ত চলিতেছে। ঢেউগুলি চারিদিকে লাফাইয়া উঠিতেছে—তাহাদের মধ্যে এক-একটা সকলকে ছাড়াইয়া শুভ্র ফণা ধরিয়া হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে; গর্জন করিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে; স্পর্ধা করিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া চলিতেছে—মাথার উপরে সূর্যকিরণ দীপ্তিমান চোখের মতো জ্বলিতেছে—নৌকাগুলাকে কাত করিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে কী আছে দেখিবার জন্য উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে; মুহূর্তের মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া নৌকাটাকে ঝাঁকানি দিয়া, আবার কোথায় তাহারা চলিয়া যাইতেছে।...'

রবীন্দ্রনাথ অনেকবার জাহাজে ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু জাহাজের গরিমা মহিমা সম্পর্কে কখনও তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। বরং গঙ্গায় স্টিমারে চলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন,

> "...জাহাজের হাঁস্‌ফাসানি, আগুনের তাপ, খালাসিদের গোলমাল, মায়াবদ্ধ দানবের মতো দীপ্তনেত্র এঞ্জিনের গোঁ-ভরে সনিশ্বাস খাটুনি, দুই পাশে অবিশ্রাম আবর্তিত দুই সহস্রবাহু চাকার সরোষ ফেন-উদ্গার—এ-সকল গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়।..."

কিন্তু কালের গতি কুটিল। যুগের হাওয়া তখন কলের দিকে। পালতোলা জাহাজ থেকে বাষ্পীয় জাহাজ ছিল অনিবার্য জন্মান্তর। বাষ্পীয় জাহাজ সমুদ্রে চালু হওয়ার আগে পালতোলা জাহাজের রকমারি পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত কাঠের বদলে আসে লোহার খোল। দু' ফুট ওক সমান আড়াই ইঞ্চি

লোহা। জাহাজের ওজন কমে দাঁড়ায় চার ভাগের এক ভাগে। অথচ সে জাহাজ ছ'গুণ বেশি মাল বহন করতে পারে। কাঠের জাহাজের চেয়ে লোহার জাহাজ মজবুতও বটে। কাঠের জাহাজে যেখানে শতকরা পঞ্চাশভাগ অংশে মাল নেওয়া চলে লোহার জাহাজে সেখানে নেওয়া চলে শতকরা ৬৫ ভাগ। লোহার জাহাজ চালাতে শক্তিও লাগে কম। গঠনের সীমাবদ্ধতার জন্য কাঠের জাহাজ বড়জোর তিনশো ফুট লম্বা হতে পারত। অষ্টাদশ শতকে ১৫০ ফুট দীর্ঘ জাহাজকে মনে হত যথেষ্ট বড় জাহাজ। 'হোক' নামে কোম্পানির একটি বিখ্যাত জাহাজ ছিল। সেটি লম্বায় ছিল ২০০ ফুট, চওড়ায় ৪০ ফুট। এমনকী যুদ্ধজাহাজও তৎকালে বেশ ছোট ছিল। নেলসনের 'ভিক্টরি' লম্বায় ছিল ১৮৬ ফুট, চওড়ায় ৫২ ফুট। তুলনায় লোহার জাহাজ যত খুশি লম্বা হতে পারে। একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ১৮৫৯ সালে গ্রেট ইস্টার্ন নামে একটি লোহার জাহাজ গড়েন, সেটি দৈর্ঘ্যে ছিল ৬৯২ ফুট। তুলনায় আর সব জাহাজ যেন ডিঙি নৌকো। কাঠের জাহাজকে দরিয়ায় চলতে গেলে খুবই মজবুত হতে হত। লোহার জাহাজ স্বভাবত মজবুত। ১৮৪৭ সাল নাগাদ যে সব কাঠের জাহাজ তৈরি হত সেগুলি চওড়ায় যত লম্বায় তার চেয়ে বড়জোড় ৪.৩ গুণ বেশি। তুলনায় লোহার জাহাজ অনেক বেশি লম্বা হতে পারত। তাতে পালও থাকতে বেশি। ১৮৭০ সাল নাগাদ যে সব লোহার জাহাজ তৈরি হত, সেগুলি চওড়ায় যত না তার চেয়ে ৬-৭-৮ গুণ বেশি লম্বায়। যুদ্ধজাহাজের গড়নও পাল্টে যায় কাঠের বদলে লোহা ব্যবহারের ফলে। সমান তলদেশ, নদীতে দিব্যি চলতে পারে, সমুদ্রেও কোনও অসুবিধা নেই। লোহার জাহাজের খরচ তুলনামূলকভাবে কম। মজবুত বেশি, নিরাপদও বেশি। খোল ভাগ করা থাকে। ফুটো হলে বিশেষ কক্ষটি আটকে রেখে সারাই করা যায়। আগুন লাগার ভয়ও কম। এটা ঠিক, ভাল কাঠে ঠিকমতো তৈরি করলে কাঠের জাহাজও একশো বছর বাঁচতে পারে। কিন্তু সাধারণত দু'তিন বছরের পর তার ক্ষয় আরম্ভ হয়, পরমায়ু গড়ে বারো থেকে পনেরো বছর। কাঠের জাহাজে স্টিম ইঞ্জিন বসালে বয়লারের কাছে কাঠ নষ্ট হয়ে যায়। ইঞ্জিনের কাঁপুনিতে কাঠ আলগা হয়ে যেতে পারে। আরও হরেক সমস্যা। যদিও কাঠের জাহাজে স্টিম ইঞ্জিন বসিয়ে সমুদ্রে চলাচলের চেষ্টা চলেছে পালের পাশাপাশি। কিন্তু সত্যিকারের বাষ্পীয় পোতের যুগ আরম্ভ হয় লোহার জাহাজ তৈরি শুরু হওয়ার পর। সাধারণ লোহার বদলে ইস্পাতের ব্যবহার তার জয়যাত্রার পথে আরেক ধাপ।

কাঠের বদলে লোহা ব্যবহারের পেছনে পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপও ছিল। অষ্টাদশ শতকে এবং পরে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জাহাজ গড়তে ব্রিটেনের বনসম্পদ ফুরিয়ে আসে। ১৬০০ সালে জাহাজের টন প্রতি কাঠের খরচ যদি পাঁচ পাউন্ড, ১৭৭৫ সালে তবে ২০ পাউন্ড, এবং ১৮০৫ সালে ৩৬ পাউন্ড। জাহাজ তৈরির খরচের শতকরা ষাট ভাগই চলে যেত কাঠের জন্য। স্কান্ডিনেভিয়া থেকে কাঠ আনতে হত। আমদানি করতে হত উঃ আমেরিকা থেকেও। এদিকে আমেরিকাও জাহাজ-শিল্পে ক্রমেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরেজেরা সে সব কারণে ভারতেও ওকের বদলে সেগুন কাঠ দিয়ে জাহাজ তৈরি শুরু করে। বোম্বাই এবং কলকাতা-হাওড়া ছিল অষ্টাদশ শতক এবং উনিশ শতকের জাহাজ তৈরির বিশিষ্ট কেন্দ্র। ভারতে তৈরি জাহাজের খ্যাতি এবং খাতির তখন যথেষ্ট। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের চাকা তখন ঘুরে চলেছে। তার প্রাণশক্তি লোহা আর বাষ্প। কাঠের জাহাজকে ছুটি দেওয়ার সুযোগ এনে দিল লোহা। পিগ আয়রন বা সাধারণ মানের লোহার দাম তখন কমছে, উৎপাদন বাড়ছে।। ১৮১০ সালে ১ টন লোহার দাম যদি ৬.৩০ পাউন্ড, ১৮২০ সালে তবে ৪.৫০ পাউন্ড, ১৮৩০-এ ৩.৪৪ পাউন্ড, ১৮৪০-৭০-এ ২.৬০ পাউন্ড। উৎপাদনও বাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। ১৮০০ সালে উৎপাদন যদি ২ লক্ষ টন, ১৮৭০ সালে তবে ৫৫ লক্ষ টন। ফলে জাহাজ নির্মাতারা ক্রমেই এদিকে ঝুঁকলেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই পরীক্ষামূলকভাবে লোহার ছোট ছোট জাহাজ তৈরি শুরু হয়।

১৭৮৭ সালে দেখা যায় 'ট্রায়াল' নামে একটি লোহার জাহাজ ইংলিশ চ্যানেলে যাত্রী এপার-ওপার করছে। ১৮২০ সালে তৈরি হয় 'অ্যারন ম্যানবি'। টুকরো টুকরো করে তৈরি, জোড়া হয় টেমস নদীতে। তারপর ইংলিশ চ্যানেলে। পরবর্তী ২০ বছর যাত্রী পারাপার করেছে এই ট্রায়াল। তবে লোহার জাহাজের সত্যিকারের যুগ শুরু হয় ১৮৩০-এর দশকে। ১৮৩৭-এ তৈরি হয় ১৯৮ ফুট দীর্ঘ স্টিমার 'রেনবো'। তার আগে এত বড় স্টিমার আর তৈরি হয়নি। পরের বছর পনেরো দিনে অতলান্তিক অতিক্রম করে 'গ্রেট ইস্টার্ন' ও 'সাইরাস' নামে দুটি স্টিমার। সে বছরই যান্ত্রিক কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয় জাহাজে। প্যাডেলের বদলে উন্নত প্রপেলার কম্পাসকেও উন্নততর করা হয়। তৎকালের যন্ত্রের সাহায্যে সজ্জিত হয়ে প্রথম সমুদ্রগামী লোহার জাহাজ 'গ্রেট ব্রিটেন'। সেটা ১৮৪৩ সালের কথা। তার আগে এত বড় কোনও জাহাজ সমুদ্রে ভাসেনি। ১৮৪৬ সালে এই জাহাজটি আয়ার্ল্যান্ডের উপকূলে পাহাড়ে ধাক্কা খায়। কিন্তু লোহার জাহাজ বলেই সেভাবে জখম হয়নি। চল্লিশ বছর জল তোলপাড় করে সে জাহাজ ফিরে আসে তার জন্মস্থানে, ব্রিস্টলে। এখন সেটি একটি জাদুঘর। লোহা এবং বাষ্পের গৌরবময় যুগের স্মারক।

১৮৫০ সাল নাগাদ লোহার জাহাজ এবং স্টিম ইঞ্জিন আর অভিনব কিছু নয়। ১৮৪৮ সালেই ভারত মহাসাগরে নব যুগ শুরু হতে পারত। কারণ সে বছরই প্রথম পেনিনসুলার অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল, সংক্ষেপে পি.অ্যান্ড ও. কোম্পানি কাঠের বদলে লোহার জাহাজ চালাবার প্রয়োজন অনুভব করে। কারণ, তাদের জাহাজগুলো উইয়ের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। তবে সত্যকারের নব যুগ শুরু হয় উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। তার আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ ডাক বহন করত কাঠের প্যাডেল স্টিমার। ইতিমধ্যে ইঞ্জিনেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। ডাঙায় বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আর সমুদ্রে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এক নয়। সমুদ্রে নোনা জল ব্যবহার করতে হয়, ইঞ্জিনে নুন জমা হয়, তা কাটাবার ব্যবস্থা করতে হয়। স্যামুয়েল হল নামে এক যন্ত্রবিদ উদ্ভাবন করলেন এক নতুন কৌশল। নুনের সমস্যা কেটে গেল। সাধারণ লোহার বদলে স্টিলের ব্যবহারের ফলে জাহাজের ওজন শতকরা ১৫ ভাগ কমে যায়। চলার বেগ যায় বেড়ে। প্রথম স্টিলের স্টিমার ১৮৫৮ সালে। তাতে জ্বালানির ব্যবহারও কমে যায়। ১৮৫৮ সালে যত স্টিমার তৈরি হয়, তার শতকরা ৪৮ ভাগ ছিল স্টিলের। ১৯০০ সালে দেখা গেল তার অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকার ৯৫ ভাগ। সব দিকে প্রভূত উন্নতির ফলে কয়লার ব্যবহার কমে যায়। এবং ক্রমেই তৈরি হতে থাকে বড় বড় জাহাজ। ১৮৫০ সালে ২০০ টনের জাহাজকে মনে হত বড়সড় জাহাজ। এবং তার পরে ৬ হাজার থেকে ৮ হাজার টনের জাহাজও যেন কিছুই নয়। ১৮৬০-এ পি.অ্যান্ড ও. কোম্পানির সবচেয়ে বড় জাহাজটি যদি ২,২৮৩ টনের, ১৮৯৭ সালে তবে তাদের জাহাজের গড় পরিমাপ ৪,৮৯৬ টন, সবচেয়ে বড়টি ৮ হাজার টনের। ১৯১৪ সালে ২০ হাজার টন বা তার চেয়ে বড় জাহাজ আর বিস্ময়কর কিছু নয়। এক একটি জাহাজ যেন ভাসমান এক একটি শহর।

আকার আয়তন বাড়ছে। বাড়ছে সংখ্যাও। ফলে কমে আসছে ভাড়াও। ১৮৬৯ সালে বোম্বাই থেকে ইংল্যান্ডে মাল পাঠাতে টন প্রতি খরচ ছিল যেখানে ১০-১২ পাউন্ড, ১৮৯৩ সালে সেখানে কমে খরচ দাঁড়ায় টন প্রতি ২০ থেকে ৩০ সিলিং। ১৮৬০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্য তিনগুণ বেড়ে যায়। ছিল ৩,৮৬,০০,০০০ পাউন্ড বেড়ে দাঁড়ায় ১১,৬১,০০,০০০ পাউন্ড।

প্রথম দিকে, আগেই বলা হয়েছে, জাহাজে স্টিম ইঞ্জিনের সঙ্গে পালও থাকত। কিন্তু বিশ শতকে পৌঁছানোর পর পালের জাহাজের দিন বুঝি বা পুরোপুরি ফুরিয়ে গেল। ১৮৭৫ সালে লয়েড কোম্পানির খাতায় মোট জাহাজের সংখ্যা ছিল ৬১,৯০২টি। তার মধ্যে ৫৬,৫৩৭টি জাহাজই ছিল পালতোলা। ১৮৯৯-১৯০০ সালের মধ্যে হয়তো শতকরা ৬০ ভাগ জাহাজেই পাল ছিল, কিন্তু মাল

পরিবহনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল খুবই কম। মোট পণ্যের চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। জাহাজের যুগান্তরের পেছনে একদিকে যদি সমুদ্রবিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদ এবং বাষ্পশক্তির বিশেষ ভূমিকা, তেমনই অন্যদিকে ভারত মহাসাগর তথা পূর্ব পৃথিবীতে যুগান্তরকে সম্ভব করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা যার, তার নাম—সুয়েজ খাল।

১৮৬৯ সালের ১৭ নভেম্বর। ফরাসি সম্রাজ্ঞী ইউজিন-এর (Eugnie) প্রমোদতরী আই জেল (Aigle) ফরাসি পতাকা উড়িয়ে প্রবেশ করল নতুন জলপথ সুয়েজে। তার পিছু পিছু অন্য তরীতে অস্ট্রিয়ার সম্রাট, প্রুসিয়ার যুবরাজ, রাশিয়ার গ্র্যান্ড ডিউক এবং তাদের পিছু পিছু ৬৮টি স্টিমারে রাশি রাশি গণ্যমান্য এবং প্রচার-পাগল পশ্চিমির দল। বাতাস উল্লাসে তপ্ত। শ্যাম্পেনের ধারা খালের জলধারার মতো বয়ে যাচ্ছিল স্টিমারে স্টিমারে। বলা হয়, ঊনিশ শতকের সামাজিক উৎসব বলতে এই তিনদিনব্যাপী সুয়েজ অভিযাত্রা। এই ঐতিহাসিক খালের রোমাঞ্চকর ইতিহাস বর্ণনা করার সুযোগ এখানে নেই। অষ্টম শতকের খলিফা হারুন অল রশিদ চেয়েছিলেন ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরকে একটি জলধারা দিয়ে জুড়ে দিতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মিশর অভিযানের সময় নেপোলিয়ানও স্বপ্ন দেখেছিলেন এই খালের। তাঁর ইঞ্জিনিয়াররা জরিপ করে বলেছিলেন যে, সমস্যা এই, লোহিতসাগর ভূমধ্যসাগরের চেয়ে ৩২ ইঞ্চি উঁচু। সুতরাং স্বপ্নভঙ্গ। ১৮৩০ সালে ফরাসিরা মিশরের পাশা মেহেমেদ আলির কাছে প্রস্তাব দিলেন তাঁরা খাল কাটতে চান। কারণ, তাঁরা জরিপ করে দেখেছেন আগের হিসেব ভুল। লোহিতসাগর আর ভূমধ্যসাগরের জলরাশিতে রয়েছে দিব্যি সমতা। ১৮৪১ সালে মিশর এবং ব্রিটেনের মধ্যে লড়াইয়ের সময় পি. অ্যান্ড ও. কোম্পানির এক কর্তা আর্থার অ্যান্ডারসনও মেহেমেদ আলির কাছে খালের প্রস্তাব পেশ করেন। ১৮৪৬-৪৭ সালে ফ্রান্সে খাল কাটার জন্য এ কোম্পানি গঠিত হয়। নতুন করে ফের জরিপ চলে। দেখা গেল খাল কাটার পথে প্রাকৃতিক কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা রাজনৈতিক। তা না হলে ২০ বছর আগে এই খাল শেষ হয়ে যেত। মেহেমেদ দ্বিধাগ্রস্ত। পরবর্তী পাশা ভাইপো আব্বাস অসম্মত। তাঁর উত্তরাধিকারী মহামেদ সৈয়দের আমলে। তিনি ছিলেন ফরাসি কনসালের অধীনে। কনসাল তখন স্বনামধন্য ফার্দিন্যান্দ ডি লেসেপস। ১৮৫৪ সালের ৩০ নভেম্বর সৈয়দ তাঁকে খাল কাটার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়াল ব্রিটেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে প্রস্তাবিত এই খাল ইংরেজের স্বার্থের পরিপন্থী। মিশর তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। ব্রিটেন অটোমান সাম্রাজ্য রক্ষার নীতিতে বিশ্বাসী। খাল কাটা হলে মিশর হয়তো একদিন অটোমান সাম্রাজ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে। পামারস্টোনের ধারণা, মিশর স্বাধীন হলে সেই ইউরোপিয়ান শক্তির প্রভাবে আসবে, খাল কাটায় ছিল যাদের বিশেষ ভূমিকা। এক্ষেত্রে পরিস্থিত স্পষ্টতই ফ্রান্সের অনুকূলে। ব্রিটেন অতএব বিরোধিতায় নামল। কিন্তু ব্রিটিশ বাণিজ্যিক মহল চান খাল। জাহাজ নির্মাতা, বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিরা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, পি. অ্যান্ড. ও, কলকাতার বাণিজ্যিক মহল সকলেই খালের সমর্থক। কলকাতার বিদেশি বণিকদের তরফে খালের সপক্ষে রীতিমতো সওয়াল শুরু করে 'ক্যালকাটা রিভিউ'। ফলে প্রতিবছরই ব্রিটিশ সরকারের অবস্থান দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগল। ব্রিটেনের তরফে বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হল ১৮৫০ সালে কায়রো থেকে সুয়েজ রেলপথ বসানো হোক। ফলে যাত্রীদের সমস্যা অনেকটাই লাঘব। কিন্তু মাল পরিবহনের সমস্যা থেকেই গেল। ব্রিটেনের কর্তাদের মাথায় এসেছিল দ্বিতীয় একটি রেলপথের কথা। সেটি হল ইউফ্রেটিস ভ্যালি রেলওয়ে। পুরনো মেসোপটেমিয়ার রাস্তায় পুনর্জন্মের প্রস্তাব। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্যকর করা হল না বা গেল না। ক্রমে স্পষ্ট হয়ে যায়, সব সমস্যার মীমাংসা একমাত্র খাল কেটেই সম্ভব।

লেসেপস প্রচারে নামলেন। ব্রিটেনে তিনি হানা দিলেন। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা তাঁকে সমর্থন করলেন।

দেশে দেশে ঘুরে বেরিয়ে খালের সপক্ষে প্রচার খাতে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড খরচ হয়ে গেল তাঁর। কিন্তু জনমত অনুকূলে দেখে তিনি নতুন করে কোম্পানি গড়লেন। মূলধনের বেশিরভাগটাই এল ফ্রান্স থেকে। শুরু হল খাল কাটা। কারিগরি বিদ্যা পশ্চিমের অজানা নয়, তবে উদ্যোগটি বৃহৎ, এই যা। এক সঙ্গে ২০ হাজার মানুষ কাজ করে। পরের মাসে আসে নতুন দল। আসা-যাওয়ায় চলে যায় গড়ে দুই মাস। ফলে তিন মাস সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়, তাই এই ব্যবস্থা। পানীয় জলের সমস্যা ছিল। প্রথম দিকে জল আনতে হত তিন হাজার উট এবং গাধার পিঠে, নীল নদ থেকে। অসুখবিসুখ লেগেই থাকত। মহামারিও হানা দিয়েছে কখনও সখনও। ১৮৬২ সালে নীল নদ থেকে ইসলামিয়া পর্যন্ত মিষ্টি জলের খাল কাটা হয়। যন্ত্রপাতি আমদানি করা হত ইউরোপ থেকে। খাল কাটার সঙ্গে সঙ্গে পোর্টসৈয়দ-এ বন্দর গড়ার কাজও চালিয়ে যেতে হয়। এক সময় মিশরীয় সৈন্যদের জন্য মায়া কান্না জুড়ে দেয় ব্রিটিশ সরকার। আসলে তাদের দুর্ভাবনা ছিল অন্য। খাল কাটতে গিয়ে তুলো চাষে শৈথিল্য দেখা দিলে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপদ। বিশেষত গৃহযুদ্ধের ফলে আমেরিকা থেকে তুলোর সরবরাহ যখন অনিশ্চিত। ব্রিটেনের চাপে পড়ে ফরাসিরা বাধ্য হয়ে যন্ত্রের উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলে। যন্ত্রে ড্রেজিং শুরু হয়, বিশাল বিশাল যন্ত্র, কোনও কোনওটি সদ্য উদ্ভাবিত। ফারাওদের আমল থেকে মিশর দেখে এসেছে মানুষের পেশিশক্তির ক্ষমতা। খাল উপলক্ষে দেখা গেল যন্ত্রশক্তির বাহাদুরি।

কাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন অটোমান শাসনকর্তারা খাল মেনে নিলেন। মেনে নিল ব্রিটেনও। ব্রিটিশ কূটনীতিকরা তৎপর হলেন একটি নিরপেক্ষ জলপথ হিসাবে সুয়েজ খালকে রক্ষা করতে। ক্রমে খালের ওপর ব্রিটেনের শরিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ক্রমে ক্রমে। এক সময় ব্রিটিশ বলতে গেলে লোহিত সাগরের পথে সোকোত্রা (Socotra) নামে একটি বন্দরের শাসককে বলেছিল, ভারতের বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ইংরেজদের কাছে বন্দরটি বেচে দিতে। সেটা ১৮৩৫ সালের কথা। তিনি প্রস্তাবে রাজি হলেন না। সুতরাং ইংরেজরা সেটি জোর করে দখল করে নিলেন। তারপর এডেন। সেখানে বন্দর গড়তে হবে। সুতরাং এডেনের সুলতানকে প্রথম ঘুষ দিয়ে বশ করার চেষ্টা হল। তারপর ভয় দেখিয়ে। অবশেষে গায়ের জোরে। এ ঘটনা ১৮৩৯ সালের। একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন, ব্রহ্মদেশ এবং পঞ্জাব জয়ের মতো এডেন বিজয়ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সাম্রাজ্যবাদের এক ক্ল্যাসিক দৃষ্টান্ত। এ সব রাজ্য বা অঞ্চল ব্রিটেন নয়, দখল করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। তারপর যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রিটেন তার দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়! সুয়েজ খাল উপলক্ষেও যা ঘটেছে তাতে সাম্রাজ্যবাদের লালসার কাহিনী গোপন ছিল না। মিশরের শাসনকর্তা খেদাইভ ইসমাইল (Khedive Ismail) অটোমান শাসকদের কাছে ঋণভারে জর্জরিত। বাধ্য হয়েই ১৮৭৫ সালে তিনি তাঁর ১৭৬৬০২ শেয়ার বেচে দিলেন ইংরেজ সরকারকে। ক'বছর পর অটোমান প্রভুদের চাপে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ইসমাইল। মিশর দেউলিয়া হয়ে গেছে। তাকে রক্ষা করতে হবে আওয়াজ তুলে ব্রিটেন মিশরকে টেনে নেয় তার সাম্রাজ্যের চৌহদ্দিতে। খালে অতঃপর তার শরিকানা ঠেকায় কে? উল্লেখ্য, প্রথম যে জাহাজটি টোল দিয়ে সুয়েজ খাল পার হয়েছিল সেটি ছিল ব্রিটিশ। কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল খাল দিয়ে যত জাহাজ চলাচল করছে, তার চার ভাগের তিন ভাগই ব্রিটিশ!

সুয়েজ খাল ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার, বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের পথ সংক্ষিপ্ত করে দেয় নাটকীয়ভাবে। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে লন্ডন থেকে বোম্বাইয়ের পথ শতকরা ৫১ ভাগ কমে যায়, কলকাতার কমে শতকরা ৩২ ভাগ, সিঙ্গাপুরের সঙ্গে শতকরা ২৯ ভাগ। একশো মাইল লম্বা এই খাল পুব-পশ্চিমের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেমন জাহাজ নির্মাণ শিল্পের পক্ষেও প্রমাণিত হয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দশকে কিছু অসুবিধা ছিল। পালতোলা জাহাজ তাতে চলতে পারত না। এদিকে স্টিমার কম, বিশেষ করে সমুদ্রগামী স্টিমার। খালের পূর্ণ ব্যবহার শুরু হয়, ১৮৮২ সালে।

জাহাজে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা চালু হয় ১৮৮৭ সালে। ফলে রাত্রেও স্টিমার চালাতে কোনও অসুবিধে হয় না। তাতে সময় অর্ধেক কমে যায়। ১৮৭০ সালে যে খাল দিয়ে জাহাজ চলেছিল ৪৮৬টি, পরের বছরে তা বেড়ে ১৪৯৫টি, ১৮৯০ সালে ৩,৩৮৯টি। মিশরের ফ্রান্সের কারিগরির ফল বিশ্বে এক ঐতিহাসিক যোজক এই খাল। জাহাজের জন্য সুয়েজ আরও চওড়া আরও গভীর করতে হয়েছে একাধিকবার। নতুন নতুন বন্দর শহর আবির্ভূত হয় মানচিত্রে। করাচি, মোম্বাসা, সিঙ্গাপুর, পোর্টসৈয়দ, এডেন। সাংহাই এবং বোম্বাইকে যেন আর চেনাই যায় না। ১৮৯২ সালে আফিং যুদ্ধের পর চিনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ছোট্ট গঞ্জ হংকং সুয়েজ খালের দৌলতে লিভারপুলের চেয়েও ব্যস্ত বন্দর। লন্ডনের প্রায় সমান সংখ্যক জাহাজ ছুঁয়ে যায় হংকং। সব বন্দরেই কয়লা মজুত থাকত। কিছু কয়লা বন্দরও গড়ে ওঠে সমুদ্র পথের ধারে। যথা এডেন, সিঙ্গাপুর। এগুলো আবার নৌ-বাহিনীর ঘাঁটিও বটে।

সুয়েজের পর দ্রুত পাল্টাতে থাকে ব্রিটেনের আর্থিক ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্য। ১৮৯০-১৯১৪-র মধ্যে বিশ্বের সমুদ্র বাণিজ্যের অর্ধেকই ব্রিটিশ জাহাজের হাতে। ওই সময়সীমার মধ্যে বিশ্বে যত বাষ্পীয় জাহাজ তৈরি হয়েছে, তার তিন ভাগের দুই ভাগই ব্রিটেনের হাতে। শুরু হয় বিরামহীন পণ্য, মানুষ এবং আইডিয়া বা নব নব ধ্যান ধারণার চলাচল। পশ্চিমি বিজ্ঞান এবং কারিগরির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠতে শুরু করে এক নব্য সভ্যতা। তার পরিধি বিশ্বজোড়া। একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, সবচেয়ে অভিনব এই সামুদ্রিক সাম্রাজ্য। তাঁদের কালে এক সময় মিনোয়ানরা, গ্রিকরা, ফোনেশিয়ানরা এবং ভাইকিংরা তাদের চারপাশের সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু উনিশ শতকে গ্রেট ব্রিটেন যেখানে পৌঁছায় তার তুলনা নেই। ব্রিটেনের বাণিজ্যতরী এবং নৌ-বহর সেদিন দাপিয়ে বেড়িয়েছে বিশ্বের সমুদয় মহাসাগর সাগর এবং উপসাগর। ১৮৪৭ সালে আর একজন লিখেছিলেন, পশ্চিমি জাতিসমূহের অগ্রগণ্য গ্রেট ব্রিটেন। তার হাতে যে গর্বিত শাসনদণ্ড, ইতিপূর্বে তেমনটি আর কেউ দেখেনি। এবং সেটি ধারণ করে রয়েছেন একজন নারী। আলেকজান্ডারের হাতে গ্রিক শাসনদণ্ডের চেয়েও দর্শনীয় এই দৃশ্য। একটি দ্বীপের রানির প্রজামণ্ডলী অন্তর্গত পৃথিবীর সাত ভাগের এক ভাগ মানুষ। এবং তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত বিশ্বের সাত ভাগের এক ভাগ জমি জুড়ে। বিশ্বের জলরাশি যেন ইংরেজদের একটি হ্রদ। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে যে-সব হাতিয়ার তার অন্যতম এই স্টিম ইঞ্জিন আর এই সুয়েজ খাল। কিপলিংয়ের কবিতায় বলা হয়েছিল—'শিপ মি সামহোয়ার ইস্ট অব সুয়েজ, হোয়ার/দ্য বেস্ট ইজ দি লাইক দ্য ওয়ার্স্ট,/হোয়ার দেয়ার ইজ নো টেন কমান্ডমেন্টস'...ইত্যাদি। সুয়েজখাল সেই পূর্ব পৃথিবীর দুয়ার খুলে দেয় পশ্চিমের সামনে। লুব্ধ, ক্ষুধার্ত, পশ্চিম অতঃপর যেন ক্রমেই আরও বেপরোয়া।

ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত মজবুত করার কাজে সুয়েজ খালের অবদান অনেকখানি। এ ব্যাপারে বাষ্পীয় পোতের ভূমিকার পরেই সুয়েজের কথা আসে। কোম্পানির রাজত্বের অবসানে ভারত সরাসরি ব্রিটিশরাজের অধীনে আসার পর প্রজাবর্গের প্রতি যে ক্ষীণ দায়বদ্ধতার লক্ষণ দেখা যায় তার কারণ শুধু রাজকর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছবিচার বা সতর্কতা নয়, খবরদারির সুযোগও এসে যায়। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক বাষ্পীয় পোতের মস্ত সমর্থক ছিলেন। তাঁর কথা ছিল ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে কলের জাহাজ যাতায়াতের শুরু করলে পুব-পশ্চিমের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান বাড়বে। পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ভাব-ভাবনা আরও বেশি করে ভারতীয়দের মধ্যে আসবে। আরও একটা কথা বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন যে, এদেশে যে ইংরেজরা কাজ করছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই 'শীতল স্বার্থপর, অনুভূতিহীন ইংরেজ'। কলের জাহাজ চালু হলে ইংল্যান্ড থেকে তাদের ওপর নজর রাখা সুবিধা হবে। বাষ্পীয় পোতের আবির্ভাব এবং সুয়েজ খাল খুলে যাবার পর ভারত এবং অন্যান্য উপনিবেশের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্যের ইতিহাস অর্থনৈতিক ইতিহাসের

অন্তর্গত। আমরা এখানে তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না। কারণ সহজে স্পর্শগ্রাহ্য এমন কিছু কিছু প্রভাবও রয়েছে। ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত: উনিশ শতকে কলের জাহাজ চালু হওয়ার পর এদেশে ইংরেজদের গড়ে তোলা রক্ষিতা-রাজ অবসানের সূচনা হয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে এদেশি বিবিদের নিয়ে ঘর করতেন অভিযাত্রীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। তৎকালের গাইড বইগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের পোশাক, দৈহিক সৌন্দর্য, আচার-ব্যবহার তো বটেই এমনকী, রক্ষিতা পুষতে সম্ভাব্য খরচ কত তারও হদিস দেওয়া হয়েছে। সমসাময়িক ভ্রমণকারীদের নজর এড়ায়নি সাহেব-কুঠির 'জেনানা'। কলের জাহাজের দৌলতে যাতায়াতের সময় কমে যাওয়ায় 'ফিসিং ফ্লিট' বা বিয়ের কনেদের নিয়ে দরিয়ায় ভাসার ঝুঁকি কিছুটা কমে যায়। মেমসাহেবরা কিছু বেশি পরিমাণে ভারতে আসতে শুরু করেন। ফলে প্রবাসী সাহেবদের জীবনধারায় পরিবর্তন আসতে বাধ্য হয়। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ মেয়েদের ভারত অভিযানে ভাটা পড়ে যায়। নতুন করে আবার জোয়ার আসে সুয়েজের পর।

কলকাতায় স্টিম ইঞ্জিনের অবির্ভাব লর্ড আমহার্স্ট-এর আমলে। 'ডায়না', 'এন্টারপ্রাইজ', 'প্লুটো'-এ সব দেখে গেছেন তিনি। ব্যবহারও করেছেন। ১৮২৮ সালে তার জায়গায় গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। তার আগে দরিয়ায় বা নদীতে যে সব স্টিমার ছিল সেগুলো ছাড়াও ১৮২৮ সালে তৈরি হয় আরও একজোড়া স্টিমবোট—'হুগলি' এবং 'ব্রহ্মপুত্র'। বেন্টিঙ্ক স্টিম-পাগল ছিলেন। সাগর থেকে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল ক্যাপ্টেন জনস্টনের সেই এন্টারপ্রাইজ। বেন্টিঙ্ক স্থির করলেন এলোমেলোভাবে কাজ নয়, স্টিম বোটের কর্মসূচীকে শৃঙ্খলায় আনা চাই। তিনি কোম্পানির একটি বাষ্পীয় নৌবহর গড়ায় উদ্যোগী হলেন। কারণ, নানা কাজে লাগবে এই স্টিমার। কোম্পানির রাজস্ব এবং ধনদৌলত রাজধানীতে আসত নদীপথে, দিশি নৌকোয়, ফৌজির প্রহরায়। তাতে সময় লাগত বেশি, খরচও পড়ত খুব বেশি। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির কর্মীরা কলকাতায় পৌঁছনোর পর দূরে কর্মস্থলে পৌঁছতে সময় নিত তিন-চার মাস। যাঁরা পরিবার নিয়ে কর্মস্থলে থাকতে চান, তাঁদের সমস্যাও ভাবা দরকার। স্টিম বোট এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে। বেন্টিঙ্ক কলকাতা থেকে এলাহাবাদ নিয়মিত স্টিম সার্ভিস চালু করার কথাও চিন্তা করেছিলেন। নদীপথে স্টিমারগুলো কেমন চলবে তা পরখ করে দেখবার জন্য হুগলি ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে তিনি একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। নদীর দু-কূলে নাকি সেদিন অনেক দর্শক। ফলাফল দেখে স্থির হল 'হুগলি' এলাহাবাদ ও কলকাতার মধ্যে চলাচল করবে। পথে চার জায়গায় থাকবে কয়লার ডিপো। পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রা শুরু হল। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক নিজেও 'হুগলি'-তে মালপত্র চাপিয়ে যাত্রা করেছিলেন বারাণসী। ফেরার পথে 'হুগলি' গভর্নর জেনারেলের পানসি টেনে নিয়ে আসে কলকাতায়। 'এন্টারপ্রাইজ'-এর ক্যাপ্টেন জনস্টনের হাতে বেন্টিঙ্ক তুলে দিলেন কোম্পানির সব স্টিমারের পরিচালন ভার। এভাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে কোম্পানির বাষ্পীয় পোতের বহর।

উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক দেশে ফিরে কোম্পানির কর্তাদের কাছে কলকাতায় স্টিম বোট সার্ভিসের জন্য দরবার করেন। কোম্পানি অনেক ভাবনাচিন্তা এবং হিসাবপত্র করে শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়। ১৮৩১ সালে ৪টি বাষ্পীয় 'টাগ' এবং ৪টি যাত্রিবাহী স্টিমার তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। একটি জাহাজের নাম ছিল 'উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক'। দ্বিতীয়টা টেমস, অন্য দুটি মেঘনা ও যমুনা। স্টিমারগুলো তৈরি হয় কলকাতায়, ১৮৩৫-৩৬ সালে। ১৮২৮ সালে বারাণসীর উদ্দেশে কলের নৌকো যখন কলকাতা ছাড়ে তখন সমাচার দর্পণ লিখেছিল—

> কাশী পর্য্যন্ত বাষ্পের নৌকার গমন।—এ সপ্তাহে ইংরেজী সমাচারপত্রে কাশী পর্য্যন্ত বাষ্পের নৌকা প্রেরণের বিষয়ের অনেক কথোপকথন লেখা আছে। লেখক সাহেবেরা বাষ্পের নৌকার বিষয়ে কহেন যে যদি প্রত্যেক ঘণ্টায় ২ ক্রোশ করিয়া প্রতিদিন ১২ বার ঘণ্টা চলে তবে ১৩ দিনের

কাশী পঁহুছিতে পারে এবং ৩/৪ চারি দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারে। অন্য নৌকাদ্বারা এখন সেখানে যাইতে দুই মাসের ন্যূন কাল লাগে না।...

(২৬ জুলাই, ১৮২৮ সমাচার দর্পণ)

১৮৩৬ থেকে শুরু হয়, কলকাতা এলাহাবাদ স্টিমবোট সার্ভিস। কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পৌঁছতে সময় লাগল ২০ দিন। ফেরার পথে সাত দিন। গরমের সময় যেতে ২৪ দিন আসতে ১৫ দিন। ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ছিল সরকারের হাতে। বাংলা প্রেসিডেন্সির বিশেষ কৃতিত্ব এই স্টিম নেভিগেশন। কলকাতার দেখাদেখি উদ্যোগ শুরু হয়ে যায় বোম্বাইয়ে। ১৮৪৪ সালে শুরু হয় পেনিনসুলার অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল লাইন বা 'পি অ্যান্ড ও'। পি অ্যান্ড ও-র সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত একমাত্র কলকাতার কোম্পানি ক্যালকাটা অ্যান্ড বার্মা স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি। তারপর এক সময় দরিয়ায় ভাসে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি। শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই অগণিত সমুদ্র-জাহাজের আনাগোনা ভারতের উপকূলে। এদিকে দেশের ভেতরে নদীতেও কলের নৌকোর দৌড়াদৌড়ি। 'ডায়না' এবং 'এন্টারপ্রাইজ'-কে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে দেশের ভিতরে বাইরে স্টিমবোট।

ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাঙালিরা কি এই ধোঁয়া-কলের নিছক কৌতূহলী দর্শক? ১৮৪৩ সালে কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র রাজনারায়ণ বসু পুজোর ছুটিতে রামগোপাল ঘোষের একটি স্টিমারে চড়ে কলকাতা থেকে রাজমহলের দিকে যাত্রা করেছিলেন। স্টিমারের নাম ছিল 'লোটাস'। রাজনারায়ণ লিখেছেন,

"যখন মহানন্দা নদীর ভিতর স্টিমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গ্রাম্য লোকেরা ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে, ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয় পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্বে বাষ্পীয় পোত কখন মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। স্টীমার হইতে যখন প্রথমে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত যে গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে।...'

সাধারণ লোকে হয়তো স্টিমারকে ভয়ও পেত। তবে সমসাময়িক নানা বিবরণ পড়ে মনে হয় ভয়ের চেয়ে নানা কৌতূহল ছিল বেশি। তাছাড়া কে না জানে যে স্টিমার চালনায় তাদের ভূমিকাও মোটেই উপেক্ষণীয় ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন—

"বাষ্পপোতে সর্বেসর্বা কর্তা হচ্চেন 'কাপ্তেন'। পূর্বে 'হাই সী'-তে কাপ্তেন জাহাজে রাজত্ব করতেন; কাউকে সাজা দিতেন, ডাকাত ধরে ফাঁসি দিতেন, ইত্যাদি। এখন অত নাই, তবে তাঁর হুকুমই আইন—জাহাজে তাঁর নীচে চারজন 'অফিসার' বা (দিশি নাম) 'মালিম', তারপর চার পাঁচ জন ইঞ্জিনিয়র। তাদের যে 'চীফ্', তার পদ অফিসারের সমান, সে প্রথম শ্রেণীতে খেতে পায়। আর আছে চার পাঁচ জন 'সুকানি'—যারা হাল ধরে থাকে পালাক্রমে, এরাও ইউরোপী। বাকি সমস্ত চাকর-বাকর, খালাসী, কয়লাওয়ালা হচ্চে দেশী লোক, সকলেই মুসলমান। হিন্দু কেবল বোম্বায়ের তরফে দেখেছিলুম, পি. এন্ড ও. কোম্পানির জাহাজে। চাকররা এবং খালাসীরা কলকেতার, কয়লাওয়ালারা পূর্ববঙ্গের, রাঁধুনীরাও পূর্ববঙ্গের ক্যাথলিক ক্রিশ্চান।..."

'পরিব্রাজক'-এর লেখক স্বামীজিকে আদার ব্যাপারি বলার জো নেই। জাহাজে খোঁজখবর তিনি এত রাখেন যে ভাবা যায় না। দেশি জাহাজিদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"দেশী মাল্লারা কাজ করে ভাল, মুখে কথাটি নাই, আবার সিকিখানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে অসন্তুষ্ট; বিশেষ—অনেক গোরার অন্ন যাচ্চে দেখে, খুশী নয়। তারা মাঝে মাঝে হাঙ্গামা তোলে। আর তো কিছু বলবার নেই; কাজে গোরার চেয়ে চটপটে। তবে বলে, ঝড়-ঝাপটা হলে,

জাহাজ বিপদে পড়লে এদের সাহস থাকে না। হরিবোল হরি! কাজে দেখা যাচ্ছে—ও অপবাদ মিথ্যা। বিপদের সময় গোরাগুলো ভয়ে মদ খেয়ে, জড় হয়ে নিকম্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসী এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্যন্ত কোন মহা বিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায়নি। বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায়?"...

দেশি নাবিকদের মাইনে সম্পর্কে স্বামীজির উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ১৮৩৭ সালে একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে ক্যাপ্টেনের মাইনে যেখানে মাসে ২৮৫ টাকা, সারেঙ-এর মাইনে সেখানে মাসে ২০ টাকা। লস্করদের মাইনে আট টাকা করে।

প্রতি ক্ষেত্রেই বৈষম্য। সাহেবদের মাইনে যে হারে বেড়েছে ভারতীয়দের মাইনে মোটেই সে হারে বাড়েনি। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, বেতন ভাতা যখন বাড়ে তখন ভারতীয়দের বেতন এক টাকার বেশি বাড়ে না। পরবর্তীকালেও ৮০ টনের চেয়ে বড় কোনও স্টিমারের দায়িত্ব ভারতীয়দের দেওয়া হত না। সিদ্ধার্থ ঘোষ ('কলের শহর কলকাতা') অনেক অনুসন্ধান করে হানিফ সারেঙ নামে একজন সারেঙের সন্ধান পেয়েছেন, যিনি উনিশ শতকের ৮০'র দশকে পূর্ব ভারতের নদীপথে একাধিক স্টিমার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। হয়তো, যাকে বলে 'চিরুনি তল্লাশি' চালালে আরও দু'একজন সারেঙ-এর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যাঁরা স্টিমারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁরা অবশ্যই ব্যতিক্রম। উল্লেখ্য, কলকাতার জাহাজ তৈরির কারখানাগুলোতে বিস্তর স্থানীয় কারিগর কাজ করতেন। লোহার কাজ, কাঠের কাজ, একবার টিটাগড়ের কামার গোলোকচন্দ্র (১৮২৮) তাঁর নিজের তৈরি স্টিম ইঞ্জিন দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

কলের জাহাজের যাত্রী হিসাবে অনেক বাঙালিরই দেখা পাই আমরা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়ে একেবারে একাল অবধি কত না মানুষ স্টিমারে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর কালাপানি পার হয়ে পশ্চিমযাত্রীও সেজেছেন অসংখ্য বাঙালি। দূরের যাত্রীদের কথা থাক। সৈয়দ মুজতবা আলি থেকে নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত থেকে জানা অজানা নদী পথে কত না ভ্রমণ কাহিনী। পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলার মাঝখানে রেল সড়কের যোগসূত্র রচনা করত সিরাজগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ, অন্য দিকে বাহাদুরবাদ থেকে ফুলছরি ঘাট—স্টিমারে নদী পারাপারের স্মৃতি অসংখ্য বাঙালির মনে গেঁথে আছে। বোধ হয়, সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছিলেন, কলকাতায় হস্টেলে থেকে পূর্ববঙ্গের যে ছেলেরা পড়াশুনো করতেন, ছুটিতে দেশে ফেরার পথে তাদের বাড়তি আকর্ষণ ছিল জাহাজে মুসলমান বাবুর্চির করা মুরগির ঝোল আর ভাত। এই ভাতের স্বপ্নে জাহাজ যাত্রী যে কতখানি ব্যাকুল হয়ে উঠতে পারতেন, তার দৃষ্টান্ত সেই রাজনারায়ণ বসু। ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্যাপ্টেন হিক্‌লে সাহেবের নেতৃত্বে যমুনা নামক স্টিমারে আসাম যাত্রা করেছিলেন, রাজনারায়ণ লিখছেন—

'আমাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাই-খরচ দরুন কাপ্তেন সাহেব চার টাকা করিয়া লইতেন। কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না। এরূপ কাপ্তেন আমরা কখন দেখি নাই; ঐ বার আমাদিগের ভাগ্যক্রমে এরূপ কাপ্তেন জুটিয়াছিল।...আমি মধ্যে মধ্যে খানা ও মদ খাইতাম বটে। কিন্তু সচরাচর দুইবেলা মাছের ঝোল ও ভাত না খাইলে চলিত না। ক্রমাগত মদ ও খানা খাইলে শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত। স্টিমারে কিরূপ জীবনযাপন করিতে হয়, তাহা পূর্বে জানিলে সেইরূপ উপায় করা যাইত; অর্থাৎ ফুলেল তৈল ইত্যাদি সঙ্গে লইতাম। স্টিমারে রুক্ষ স্নান ও দিনের মধ্যে তিনবার (অর্থাৎ হাজরি টিফিন ও ডিনারে) মাংস খাওয়াতে, ঢাকায় না পৌঁছিতে পৌঁছিতে তিন চারি দিবসের মধ্যে বিজাতীয় গরম হইয়া উঠিল; রাত্রিতে ঘুম হয় না। ঢাকায় যখন স্টিমার পৌঁছিল, তখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে দেবেন্দ্রবাবুকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে ঢাকায় নামাইয়া দিলেন। আমি মাছের ঝোল খাইবার অভিলাষে আমার কলেজের সমাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ঈ চ. সি-র বাসায় আশ্রয় লইতে তদাভিমুখে গমন করিলাম।"

শুধু যাত্রী হিসেবে নয়, বাষ্পীয় পোতের পরিচালকের ভূমিকায়ও দেখা গেছে কোনও কোনও বাঙালি উদ্যোগীকে। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য স্বনামধন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর। ঔপনিবেশিক পরিবেশে দুঃসাহসিক শিল্পোদ্যোগে তাঁর কোনও তুলনা নেই। কার টেগোরের কোম্পানি গড়ার আগেই জাহাজের দিকে দৃষ্টি পড়েছিল। ১৮৩১ সালে দু'জন ইংরেজের সঙ্গে মিলে খিদিরপুরে 'ওয়াটার উইচ' নামে ৩৬৩ টনের একটি জাহাজ তৈরি করিয়ে ছিলেন। চিনের সঙ্গে আফিমের কারবারেও বেশ কিছু জাহাজ ব্যবহার করেছেন। পার্শি বণিক রুস্তমজি কোয়াসজি (Rustomjee Cowasjee)-ও তখন একজন বিশিষ্ট জাহাজ মালিক। দ্বারকানাথ আর রুস্তমজির জাহাজের দৌড় প্রতিযোগিতা নাকি সেদিনের কলকাতার এক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা। ১৮৩৮ সালে প্রতিযোগীকে পরাস্ত করে 'ওয়াটার উইচ' ক্যান্টন থেকে কলকাতায় পৌঁছে যায় মাত্র পঁচিশ দিনে। দেশের ভেতরে বাণিজ্য পরিচালনায় স্টিমার ব্যবহার করেছেন দ্বারকানাথ। কার টেগোর কোম্পানি প্রতিষ্ঠার পর সব দায়িত্ব চলে যায় তাঁর হাতে। এই কোম্পানির হাতে ছিল ক্যালকাটা স্টিম টাগ অ্যাসোসিয়েশন, ভাসমান সেতু প্রকল্প ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি, স্টিম ফেরি ব্রিজ কোম্পানি, বেঙ্গল পোল কোম্পানি, ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি ইত্যাদি ইত্যাদি। সমুদ্র থেকে গঙ্গার জাহাজ এবং যাত্রীদের টেনে আনার জন্য যে টাগ বোর্ড বা অন্য ধরনের স্টিমার প্রয়োজন তা বুঝতে দ্বারকানাথের কোনও অসুবিধা হয়নি। ম্যাকিনটস কোম্পানি তখন ফরবেস নামে একটি স্টিমারে সে কাজ করছিল। লোকসান হওয়ায় দ্বারকানাথ সেটি কিনে নেন। 'ফরবেস' ছাড়াও ক্যালকাটা স্টিম টাগ কোম্পানির আরও কয়টি স্টিমার ছিল তার মধ্যে একটির নাম ছিল—'দ্বারকানাথ'। এ সব ১৮৩০-৩৩ সালের কথা। তখনই তিনি হাতে নেন, রানিগঞ্জের কয়লা খনি। সেখানেও খনি থেকে জল তোলার কাজে ব্যবহৃত হত বাষ্পীয় পাম্প। বস্তুত, কুড়ির দশক থেকেই দ্বারকানাথের মাথায় ঘুরছিল বাষ্পীয় পোত। শুধু দেশের ভেতরে নয়, ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের কী করে দ্রুত যোগসূত্র রচনা করা যায়, তা নিয়েও ভেবেছেন দ্বারকানাথ। তখন সুয়েজ খাল নেই, কিন্তু আগেই বলা হয়েছে উওমাশা অন্তরীপকে বিকল্প হিসাবে সুয়েজ হয়ে লোহিত সাগর দিয়ে একটা পথ তৈরি হয়েছিল। সে কথা ধরেই ১৮৪২ সালে কলকাতা থেকে নিজের স্টিমার 'ইন্ডিয়া' চড়ে ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন দ্বারকানাথ। এখানেই শেষ নয়, ১৮৩৩ সালে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে মিলে তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল বেঙ্গল স্টিম ফান্ড। দ্বারকানাথের দেখাদেখি অনেক বাঙালি উদ্যোগী চাঁদা দিয়েছিলেন সেই ফান্ডে। কার টেগোর কোম্পানি সম্পর্কে ১৮৩৬ সালের জুন মাসের সমাচার দর্পণ লিখেছিল,—

> "আমারদের ইচ্ছা যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত সমাজের নাম পরিবর্ত্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ফরবিস বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্ম্মে চলিছে। ঐ জাহাজ মাকিন্টস কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হস্তে পতিতহওনঅবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে।..."

তবু শেষ রক্ষা হয়নি। দুঃসাহসী দ্বারকানাথের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত অলীক হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক আমলে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের অধীনে এই পরিণতি ছিল অনিবার্য। বেঙ্গল স্টিম ফান্ড বা বাষ্পের দ্বারা 'জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ' ইউরোপ এবং ভারতের মধ্যে জাহাজ চলাচলের যে পরিকল্পনা করেছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সে প্রকল্প সফল হতে দেয়নি। পরিবর্তে তারা বেছে নিয়েছিল ইংরেজদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পেনিনসুলার স্টিম নেভিগেশন কোম্পানিকে।

দেশে দেশে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে বাষ্পীয় জঙ্গি জাহাজ। ভারতের আর্থিক জীবনের মতো রাজনৈতিক জীবনেও তার অবদান অবহেলা করার মতো নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বলেন, ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত মজবুত করেছে বিজ্ঞানের তিনটি

অবদান। উন্নত মানের অস্ত্র, স্টিম ইঞ্জিন এবং টেলিগ্রাফ। স্টিম ইঞ্জিন বলতে অবশ্য রেল ইঞ্জিনকেও বোঝায়।

এই তিনটি বলিবাহু ইংরেজের রাজত্বকে কী আশ্চর্য দক্ষতায় রক্ষা করেছে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ তার এক দৃষ্টান্ত। সরোজ ঘোষ ভারতে সামরিক কাজে টেলিগ্রাফের ব্যবহার সম্বন্ধে লিখেছেন, বিদ্রোহ ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিতকে কাঁপিয়ে দেয়। সেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মচরিতে জানিয়েছেন, কানপুর থেকে কোনক্রমে রেলে এলাহাবাদে। সেখানে এসে শোনেন পথ বন্ধ, নিরাপত্তার কোনও প্রতিশ্রুতি নেই। তখনও দানাপুরে কুমার সিংহের লড়াই চলছে। এলাহাবাদে স্টিমার ধরতে গিয়ে শোনেন, আপাতত স্টিমার নেই, দিন তিনেক পরে আসতে পারে। কিন্তু শোনা গেল, সে স্টিমার রুগণ ও আহত ইংরেজ সৈন্যদের নিয়ে যাবার জন্য আসছে। সাধারণ যাত্রীর তাতে ঠাঁই নেই। অনেক ধরাধরি করে দেবেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত একটা স্টিমারের সঙ্গে যে কার্গো বোট ছিল, তাতে ঠাঁই পেলেন। কিন্তু কাশীতে পৌঁছে আবার বিপদ। আবার স্টিমার বদল করতে হল। দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন—

> "সাহেব বিবিরা এ স্টিমারে যাইয়া দেখিলেন যে, সে স্টিমারখানি ছোট, এবং তাহার ঘর সংখ্যায় অতি অল্প, ইহাতে তাঁহাদের সকলের সম্পোষ্য হইবে না। সাহেবেরা ডেকে থাকিয়াও এক প্রকার কাটাইতে পারেন, কিন্তু বিবিরা কোথা থাকিবেন? কার্গো-বোটে মিলিটারি সার্জন প্রভৃতি যে সকল সাহেবেরা ছিলেন, কাপ্তান তাঁহাদের কাছে যাইয়া তাঁহাদের ক্যাবিন ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মিলিটারি সার্জন কিছু স্পষ্টবাদী, তিনি বলিলেন, 'এমন কতবার আমি বিবিদের সন্তোষার্থে ক্যাবিন ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহার জন্য একটা 'থ্যাঙ্কও' পাই নাই।' কার্গো-বোটের ক্যাবিনের অধিকারী সাহেবেরা কেউই বিবিদের জন্য তাঁহাদের ক্যাবিন ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে কাপ্তান আমার কাছে আসিয়া নম্রভাবে অনুরোধ করিলেন, 'বিবিদের থাকিবার আর স্থানের সঙ্কুলান হইতেছে না, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার ক্যাবিনটা ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহারা বড় বাধ্য হন।' আমি অতি আহ্লাদের সহিত আমার ক্যাবিন তাঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিলাম। কাপ্তান ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ইংরাজেরা বিবিদের স্বদেশীয় হইয়াও তাঁহাদের একটু স্থান দিলেন না; আপনি কেমন উদার ভাবে তাঁহাদের জন্য আপনার ক্যাবিন ছাড়িয়া দিলেন; ইহাতে আমরা সকলেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম।"

উত্তর ভারত জুড়ে তখন দাউদাউ জ্বলন্ত বিদ্রোহের আগুন। বিপন্ন ইংরেজ স্টিমারে নারী ও শিশুদের নিরাপদ ঠিকানায় পৌঁছাবার চেষ্টা করছে। তাঁদেরই একটি স্টিমারের ডেকে কোনও মতে ঠাঁই করে নিতে পেরেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথের স্বপ্ন ছিল স্টিম ইঞ্জিন। আরও অনেক কিছুর মতো জাহাজ আর জাহাজ। তিনি বিলাত যাত্রা করেছিলেন নিজের স্টিমারে। ভারতের এমনই ভাগ্য, তাঁরই পুত্র দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমি সেই ডেকের মুক্ত বায়ুতে রাত্রিতে সুখে শয়ন করিলাম।'

জাহাজ ছিল মতিলাল শীলেরও। তাঁর এক ডজন জাহাজের মধ্যে 'বেনিয়ান' নামে জাহাজটি ছিল বাষ্পচালিত। তিনিও বাষ্পীয় পোত নিয়ে কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত অপূর্ণ থেকে যায়। ভারতীয় উদ্যোগীদের পক্ষে এটাই ছিল নিয়তি। দ্বারকানাথের পৌত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এই নিয়তি এড়াতে পারেননি। তাঁর ছিল পাঁচটি স্টিমার। কাগজে একটি জাহাজের খোল নিলাম হচ্ছে দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেটি কিনে নেন। তারপর নতুন করে তাকে গড়ে তোলেন। জাহাজটির নাম ছিল সরোজিনী। তারপর একে একে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নৌ-বহরে যোগ দেয় আরও চারটি স্টিমার। 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'স্বদেশী' 'ভারত' ও 'লর্ড রিপন'—এসব ১৮৮৪ সালের ঘটনা। স্টিমারগুলো কলকাতা ও খুলনার মধ্যে রসদ পরিবহণ করত। প্রতিযোগী ছিল ফ্লোটিলা নামে একটি বিদেশি কোম্পানি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজ বরিশাল থেকে খুলনায় যাত্রী বহনও করত। তাই

নিয়ে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে তুমুল প্রতিযোগিতা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজের কথায়—

> "আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্লোটিলা কোম্পানির অনেক খরচ পত্র—লোকজনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রীই আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে, তবু তারা নিয়মিতভাবে সমানে জাহাজ চালাচ্চে, যত্নের একটু ত্রুটি বা শৈথিল্য নাই। আর তারা প্রকাশ্যভাব বলে—বাঙালীর অধ্যবসায় নাই। তাহারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে' কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে। এখানে আমাদের জাহাজ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের—বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখনও দেখিনি।"...

এই স্টিমার বাহিনী নিয়ে নানা কাণ্ড। 'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "...প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল—বরিশাল-খুলনার স্টিমার-লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল।...যাত্রীরা যখন বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্মচারীরা যে তপস্বীর মতো উপবাস করিতেছিল, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই, অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে তাঁহার এই সর্বস্ব-ক্ষতিস্বীকার।"

লোকসানে জর্জরিত, ব্যবসা বিপন্ন। তারই মধ্যে গঙ্গায় ডুবে গেল একটি স্টিমার। স্বপ্নালু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস তাঁর অবশিষ্ট স্টিমারগুলো কিনে নিল ফ্লোটিলা কোম্পানি।

ধোঁয়া কলের কাহিনী ফুরিয়ে এল। তবু তার আসল চেহারাটা কিন্তু এখনও দেখা হল না। বস্তুত, ধোঁয়া কল গঙ্গায় অবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল তার অন্য এক চেহারা। গোড়ায় প্রথম দিককার স্টিমার 'ডায়না' এবং সমুদ্রগামী জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজে'র কথা বলা হয়েছে। বলা হয়নি ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের ভূমিকার কথা। যাত্রিবাহী মালবাহী ওই স্টিমার এবং জাহাজ তখন রাতারাতি জঙ্গি জাহাজ। স্বামী বিবেকানন্দে লিখেছেন,

> "যুদ্ধ-জাহাজ তো একেবারে পূর্বের অবস্থার সঙ্গে বিলকুল পৃথক। দেখে তো জাহাজ বলেই মনে হয় না। এক একটি ছোট বড় ভাসন্ত লোহার কেল্লা। তোপ-ও সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। তবে এখনকার কলের তোপের কাছে সে প্রাচীন তোপ ছেলেখেলা বই তো নয়। আর এর যুদ্ধ জাহাজের বেগই বা কি।"

ডায়না এবং এন্টারপ্রাইজ অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল সেদিন। ১৮২৪-এ মাত্র ২০ মিনিটে রকেট নিক্ষেপ করে রেঙ্গুন দখল করেছিল ইংরেজের ছোট্ট নৌবহর। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইরাবতীতে স্রোতের অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে ডায়নার দৌড়াদৌড়ি এবং অগ্নিবর্ষণের সামনে রুখে দাঁড়াতে পারে ব্রহ্মের নৌ-বহরের সাধ্য কী! সমাচার দর্পণ থেকে জানা যায়—"ভারতবর্ষে ওই বাষ্পের জাহাজ প্রথমে যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হয়। ব্রহ্মের মানুষ ডায়নার নাম দিয়েছিল "মেরটেম্‌বো,—অগ্নিদানব।"

এই রচনায় ব্যবহৃত প্রাসঙ্গিক কিছু বই:

The Tools of Empire, Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century, Daniel R. Headrick, London, 1981.

Steamboats on the Ganges: An exploration in the History of India's Modernization through Science and Technology, T. Bernstein, Bombay, 1960.

Great Britain in the Indian Ocean: A Study of Maritime Enterprise 1810-1850, Gerald S. Graham, London, 1968.

British Shipping, Ronald Hobhouse Thornton, London, 1939.

Lords of the East, The East India Company and its Ships, Jean Sutton, London, 1981.

A Short History of the Steam Engine, H. W. Dickinson, London, 1939.

Eighteen Fiftyseven, Surendra Nath Sen, Delhi, 1958.

The Great Mutiny, India 1857, Christopher Hibbert, London, 1978.

Ladies in the Sun/The Memsahib's India, 1790-1860, Ed. J. K. Stanford, London 1962.

কলের শহর কলকাতা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯১।

কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ

বিজেতার আরও দুটি হাতিয়ার

এইচ জি ওয়েলস-এর একটি বিখ্যাত কল্প-কাহিনী—'ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'। ওয়েলস সে বইয়ে গ্রহান্তরের আশ্চর্য এক প্রাণীর কথা বলেছেন। যারা বিচিত্র এক যান নিয়ে অভিযান চালায় এই পৃথিবীতে। অসহায় মানুষের সাধ্য কি তাঁদের প্রতিহত করতে পারে! তবু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে হয় অভিযাত্রী হানাদারদের। কারণ অদৃশ্য এক জীবাণু তাদের আক্রমণ করে। জীবাণু সংক্রমণের ফলে পৃথিবী অধিকারের কামনা ত্যাগ করে কোনও মতে পালিয়ে বাঁচে তারা।

অনেকটা একই ধরনের ঘটনা দেখা যায় আধুনিককালের ইতিহাসে। কলম্বাস যখন ভারতের পথ খুঁজতে গিয়ে আমেরিকার মুখোমুখি তার আগে কমপক্ষে ষাট বছর ধরে পর্তুগিজরা ঘোরাফেরা করছিল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে। তাদের নাগালেও সেদিন এক বলতে গেলে অচেনা মহাদেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তী সাড়ে তিনশো বছর ধরে আফ্রিকা ইউরোপের কাছে 'অন্ধকার মহাদেশ'। পশ্চিমিদের আঁকা সেকালের মানচিত্রগুলোতে আফ্রিকার সীমারেখা মোটামুটি ধরা পড়লেও উপকূল বাদ দিলে বাকি এলাকা ছিল শূন্য। সেখানে কেউ নেই, কিছু নেই। ওদিকে নতুন মহাদেশ আমেরিকায়, এদিকে এশিয়া, এমনকী অস্ট্রেলিয়া-ইউরোপের অভিযাত্রীরা দেখতে দেখতে বিস্তার করে চলেছে নিজেদের আধিপত্য। ব্যবসায়-বাণিজ্যে, এমনকী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। বণিকের মানদণ্ড ক্রমে অনেক এলাকাতেই পরিণত হয়েছে রাজদণ্ডে। ব্যতিক্রম শুধু আফ্রিকা। আফ্রিকায় মানুষ কেনার হাট বসিয়েছে দাস সওদাগররেরা। কিন্তু সেসব গোলামের হাট ছিল উপকূলের কাছেভিতেই। ভেতরের দিকে পা বাড়াতে উৎসাহ পায়নি কেউ। তার তাগিদও ছিল কম। আফ্রিকা অফুরন্ত ধন দৌলতের ভাণ্ডার বলে ইউরোপিয়ানরা অনেকে কল্পনা করলেও উপকূলে যারা যাতায়াত করতেন, তাঁরা সেই সম্পদের কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ পাননি। আফ্রিকার সেরা সম্পদ তখন ওদের কাছে, ওই কালোমানুষেরাই। কালো আড়কাঠিরাই ভুলিয়ে ভালিয়ে স্বদেশের মানুষকে উপকূলে এনে সামান্যের বিনিময়ে বেচে দিতেন পরদেশি সওদাগরদের কাছে। তা ছাড়া গুপ্তধনের সন্ধানে আফ্রিকার ভেতরে প্রবেশ করার পথে অন্য অসুবিধাও ছিল। আফ্রিকার নদীগুলি অনেক ধারায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। নদীর দু'ধারে সুন্দরবনের মতো ঘন বন। মাঝে মাঝে বালির চরা। নৌ-চলাচল সেখানে দুঃসাধ্য। ইওরোপের জীবজন্তু বাঁচিয়ে রাখা শক্ত কাজ। অতএব ঘোড়ার ব্যবহার অসম্ভব। অন্ধকার মহাদেশের ভেতর প্রবেশ করতে হলে এক উপায় পায়ে হাঁটা। অন্য পথ ডোঙ্গায়

বা গাছ খোদাই করে তৈরি নৌকোয় উজান বেয়ে যাওয়া। এক কথায় আফ্রিকা বিদেশির কাছে যেন কিছুতেই ধরা দিতে রাজি নয়। মহাদেশের হৃদয়ের দরজা তাদের জন্য বন্ধ।

তবে অভিযাত্রী পশ্চিমকে এইসব প্রাকৃতিক বাধা-বন্ধ নয়, যা আফ্রিকার চৌকাঠ পার হতে দেয়নি শত শত বছর ধরে, তা একটি ব্যাধি। তখনও নাম না জানা এই ব্যাধির কাহিনী ইউরোপ শুনেছে শত শত বছর ধরে। গ্রিক এবং রোমানদের রচনাতেও নাকি রয়েছে একই ধরনের ব্যাধির কথা। পরবর্তীকালে সেই ভয়াবহ ব্যাধিরই নাম ম্যালেরিয়া। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল এই জ্বরের সঙ্গে যোগ রয়েছে বদ্ধ জলা, আর্দ্র বাতাস এবং পূতিগন্ধের।

ফরাসি ভাষায় বলা হত 'paludisne' মূল যে লাতিন শব্দ থেকে এই বিশেষ শব্দটি জাত, তার অর্থ—বদ্ধ জলা। 'malaria' ইতালিয়ান শব্দ। বাংলায় বললে 'বদ্-বাতাস'। ম্যালেরিয়ার জীবাণুর সন্ধান পান প্রথমে ফরাসি বিজ্ঞানী আলফাঁস ল্যাভেরান 'Alphonse Laveran ' ১৮৩৮ সালে তিনিই প্রথম বলেন রক্তে জীবাণু সংক্রামিত হয় বলেই ব্যাধি। জীবাণুর নাম দেওয়া হল 'প্লাসমোডিয়াম' 'plasmodium'। আর ম্যালেরিয়ার জীবাণু যে বহন করে অ্যানোফিলিস মশা সেটা জানা যায় ১৮৯৭ সালে। এই কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ব্রিটিশ চিকিৎসক, কবি এবং লেখক রোনাল্ড রস সে তত্ত্ব এবং তথ্য বিশ্ববাসীর গোচরে আনেন ১৮৯৭ সালে। প্রায় একই সঙ্গে দু'জন ইতালীয় বিজ্ঞানীও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। রোনাল্ড রস এই আবিষ্কারের জন্য ১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে বলেছেন অ্যানোফিলিস মশার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, সকলের আগে তিনি নিজেই। তিনি স্বীকার করেন মশার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার যে সম্পর্ক থাকা সম্ভব, বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী তা অনুমান করেছেন। রোনাল্ড রস নিজে তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন। তালিকায় আছেন; কিং (১৮৮৩), কক (১৮৮৩-৮৪), ল্যাভেরান (১৮৮৪), ম্যানসন (১৮৯৪), বিগনামি (১৮৯৬), তবে রস বলেন,ওঁরা কল্পনা করেছেন, অনুমান করেছেন এবং সম্ভাবনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তার বেশি কিছু নয়। এইসব ঘটনা উনিশ শতকের শেষ দিককার। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে আফ্রিকার ইউরোপীয় অভিযাত্রী তা জানবেন কেমন করে? তাঁরা ভেবে পান না, কী এই ব্যাধি যা আফ্রিকাকে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করতে দিচ্ছে না!

১৪৪৫ সালে পর্তুগিজ কাপ্তেন দিয়েগো কাও কঙ্গো নদীতে একদল অভিযাত্রী পাঠিয়েছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁদের মধ্যে মড়ক লেগে যায়। ফলে অভিযান পরিত্যক্ত হয়। ১৫৬১ সালে ফ্রান্সিসকো বারেত্তো এক অভিযানের নেতৃত্ব দেন জাম্বোজি উপত্যকায়। তাঁরা সংবাদ পেয়েছেন নদীমুখ থেকে ১২০ মাইল দূরে রয়েছে এক সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু সেখানে আর পৌঁছানো হল না। পথেই মালবাহী ঘোড়া গরু সব ব্যাধি কবলিত হয়ে মারা যায়। মানুষজন মরতে লাগল অদ্ভুত ব্যাধিতে। ফলে বলতে গেলে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত আফ্রিকান দালাল বা শাগরেদদের সাহায্যে যাবতীয় কারবার করতে হয়েছে পর্তুগিজদের। কলকাতার ইতিহাস পাঠকেরা অনেকেই জানেন, উইলিয়াম বোলটস্ নাম একজন ভাগ্যান্বেষীর কথা। যিনি এই শহরে প্রথম খবরের কাগজ প্রকাশের বাসনা ঘোষণা করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার কর্তৃপক্ষ তাঁকে জাহাজে তুলে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিলেতে। ভাগ্যান্বেষী বোলটস লন্ডনে বাংলা হরফ তৈরি করা শুরু করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্তি তিনি সফল হননি। বোলটস সত্যিকারের উদ্যোগী পুরুষ। ১৭৭৭-১৭৭৯ সালে এক ইউরোপিয়ান বাহিনী নিয়ে তিনি উপস্থিত হন আফ্রিকান ডেলাগোলা শহরে। তাঁর দলে ছিলেন ১৫২ জন ইউরোপিয়ান। ব্যাধি কবলিত হয়ে তাঁদের মধ্যে ১৫২ জনই মারা যান। বোলটসকে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসতে হয় ইউরোপে। ১৮০৫ সালে মুঙ্গ পার্ক নাইজার নদীর উজানে

যে অভিযান চালিয়ে ছিলেন, তাতে যে কজন ইওরোপিয়ান যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সবাই প্রাণ হারান। এবারও ব্যাধি কবলতি হয়ে ১৮১৬-১৭ সালে ক্যাপ্টেন জেমস টাকি অভিযান করেছিলেন কঙ্গো নদী ধরে। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ৫৪ জন ইউরোপিয়ান। তাদের মধ্যে ১৯ জনই মারা যান পথে। আফ্রিকা এভাবেই বার বার পশ্চিমের শত্রুকে প্রতিহত করে। নিঃশব্দে, বিনা যুদ্ধে।

ইওরোপিয়ানরা তবু পিছ-পা নন। শতকের পর শতক গড়িয়ে যায় নতুন উত্তেজনায়, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ইওরোপ পা দেয় উনিশ শতকে। দাস-ব্যবসা উচ্ছেদ করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় আবেগ বিধর্মীদের মধ্যে যিশুর ধর্ম প্রচার করতে, নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর আগ্রহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নব নব ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে। সকলের চোখেই আফ্রিকাকে মনে হয়, বিরাট চ্যালেঞ্জ। সুতরাং আমরা দেখি ১৮৩০ সালে ম্যাকগ্রেগর লেয়ার্ড নামে তেইশ বছরের এক ইংরেজ যুবা তৈরি করছেন এমন বাষ্পীয় ইঞ্জিনযুক্ত জাহাজ যা আফ্রিকার উপকূল থেকে নদী ধরে ভেতরের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। ১৮৩২ সালে লিভারপুলের কিছু সওদাগরকে নিয়ে তিনি এক কোম্পানি খোলেন। তাঁরা একটা মালবাহী জাহাজ কিনে ফেলেন। এবং নাইজার নদী ধরে অভিযানের জন্য দুটি স্টিম তৈরি করা হয়। নদীপথে চলার মতো বাষ্পীয়পোত। কিন্তু প্রথম অভিযানে যে আটচল্লিশ জন ইউরোপিয়ান যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জীবিত ফিরে আসতে পেরেছিলেন মাত্র নয় জন। লেয়ার্ড নিজেও অসুস্থ হয়ে দেশে ফেরেন। তিনি কোনও দিনই তাঁর সুস্থ শরীর ফিরে পাননি। তাঁর ধারণা ছিল যে কালান্তক ব্যাধিতে তাঁর সহযাত্রীরা আফ্রিকায় প্রাণ দিয়েছেন, তার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল, নদী তীরের বন থেকে সংগ্রহ করা বিশেষ এক জ্বালানী কাঠের। এই কাঠ জাহাজের ইঞ্জিনে ব্যবহার করার পর তিনিও নাকি বিষণ্ণ বোধ করতে শুরু করেন। তাঁর উৎসাহ হারিয়ে যায় এবং মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। স্পষ্টতই শমন তখনও শনাক্ত করতে পারেননি ওঁরা।

দাস ব্যবসা উচ্ছেদের পর চোরা পথে মানুষ চালানের চেষ্টা প্রতিহত করার জন্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ইংরেজরা দরিয়ায় যে সব নৌসেনা মোতায়েন করেছিলেন, মড়ক তাদেরও রেহাই দেয়নি। গাম্বিয়া থেকে বোল্ডকোস্ট পর্যন্ত যে 'রয়াল আফ্রিকান কোর' বসানো হয়েছিল, তার সৈনিকেরা অধিকাংশই ছিল দাগী আসামী। স্বদেশে তাঁরা ছিল দণ্ডপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় দণ্ড বলা চলে আফ্রিকার উপকূলে এই নির্বাসন! কেননা, ১৮১৯-১৮৩৬ সালের মধ্যে মিয়ারোলোনে যে এক হাজার আটশো তেতাল্লিশ জন নৌসেনা মোতায়েন ছিল তাঁদের মধ্যে আটশো জন বা ৪৮.৩ শতাংশ মারা যান অজানা ব্যাধিতে। ক্রমাগত লোক পাঠিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না কিছুতেই। প্রতি বছর গড়ে মারা যাচ্ছিলেন একশো জন সৈন্য। গোল্ডকোস্টেও একই পরিস্থিতি। ১৮২৩ থেকে ২৭ এর মধ্যে যে সব ইওরোপিয়ান সেখানে নেমেছেন, তাদের তিনভাগের দু'ভাগই দেশে ফিরতে পারেননি কোনওদিন। ১৮২৪ সালে আফ্রিকার এই এলাকার মাটিতে পা রেখেছিলেন নাকি দু'শো চব্বিশ জন। তাঁদের মধ্যে দুশো একুশ জনই প্রাণ দেন সেই প্রায় অজানা এই মহাদেশে। অন্যত্রও একই কাহিনী। কেন এঁরা মারা যাচ্ছেন, কী এই ব্যাধি, কেউ তা সঠিক জানেন না। অদৃশ্য অচেনা শত্রু ঝাঁকে ঝাঁকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য মানুষের প্রাণ। কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথ নেই।

কালান্তক ব্যাধি আরও অনেক ছিল আফ্রিকায়। ইয়োলো ফিভার, টাইফয়েড এবং অন্যান্য রোগ। কিন্তু, সবচেয়ে ভয়াবহ যে ব্যাধি, সে এই ম্যালেরিয়া। পৃথিবীব্যাপী এই রোগ যে কত মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তার লেখাজোখা নেই। অনেকের মতে মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংস ঘাতক এই ম্যালেরিয়া। তার তুল্য খুনি অন্য কোনও ব্যাধি নয়। অথচ এই ব্যাধির কার্যকারণ নিশ্চিতভাবে জানতে, আমরা দেখেছি উনিশ শতক প্রায় শেষ হয়ে যায়। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় ল্যাভেরান এবং রোনাল্ড রস-দের জন্য। আশ্চর্য এই, ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষ কিন্তু শত বৎসর ধরে চালিয়ে যাচ্ছিলেন এই রোগের

চিকিৎসা। এমনকী ইউরোপেও একেবারে অজানা ছিল না ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় লোকায়ত পদ্ধতি। সতেরো শতকে জেসুইট যাজকেরা সিঙ্কোনা গাছের বাকল বা ছালকে ম্যালেরিয়া বা নাম না জানা ওই বিশেষ জ্বরের চিকিৎসায় ব্যবহার করছিলেন। তার অর্থ, ওইরোপে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও তার চিকিৎসা সম্পর্কে অন্যত্র প্রচলিত লৌকিক ধারণাকে কেউ কেউ কাজে লাগাচ্ছিলেন। তবে সিঙ্কোনা গাছের বাকল সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ছিল না। তৎকালে পৃথিবীতে একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার অ্যান্ডিজ অঞ্চলেই জন্মাত বন্য সিঙ্কোনা গাছ। তার বাকল সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। ইউরোপে সে-বস্তুর দামও পড়ত খুবই বেশি। তা ছাড়া, ঔষধ হিসাবে সিঙ্কোনার বাকলের রস বা অন্য কোনও রকমফের সবাই খেতে পারতেন না।

সে জিনিস বড়ই বিস্বাদ এবং রীতিমতো তেতো। অনেকে আবার নীতিগতভাবে সিঙ্কোনা-বিরোধী ছিলেন। কারণ, সে-নিরাময় চালু করার চেষ্টা করছিলেন জেসুইট পাদ্রিরা। অলিভার ক্রমওয়েল ম্যালেরিয়ার কবলে পড়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি সিঙ্কোনায় তৈরি ঔষধ খেতে রাজি হননি। বলেছিলেন,—ওই 'পোপিস মেডিসিন' আমার চাই না। ইংলন্ডের চার্চ স্বতন্ত্র। রোমের পোপের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই। জেসুইটরা পোপকে মান্য করেন। তাই এই মন্তব্য।

অন্যভাবেও চেষ্টা চলেছে এই ব্যাধিটিতে আক্রান্তদের আরোগ্য করার জন্য। অনেক উদ্ভট কাণ্ডই করা হয়েছে সেদিন। অন্যতম চিকিৎসা বলতে ছিল রক্তপাত। শেষ পর্যন্ত সিঙ্কোনা গাছের বাকলই হয়ে দাঁড়ায় মুশকিল-আসান। সেটা ১৮২০ সালের কথা। দুজন ফরাসি রসায়নবিদ পিয়ারি যোশেফ পেলিটিয়ার (Pherre Joseph Pelletier) এবং যোশেফ বিনমিয়ে (Joseph Bienaime) সিঙ্কোনা গাছের বাকল থেকে সারটুকু বের করে তৈরি করেন কুইনিন। ম্যালিরিয়ায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে রীতিমতো যুগান্তকারী ঘটনা সেটা। ঔষধ হিসাবে কুইনিন ইউরোপের বাজারে চালু হয় ১৮২৭ সালে। ১৮৩০ সাল থেকে কুইনিন ঔষধ প্রস্তুতকারকদের হাতে অন্যতম উৎপাদন।

আফ্রিকায় কুইনিনের ব্যবহার ১৮২০ সালেই শুরু হয়ে যায়। তবে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় ১৮৩০ সালে ফরাসিদের আলজেরিয়া অভিযানের পর। ১৮৩২ সালে আলজেরিয়ায় মোতায়েন করা হয়েছিল দু হাজার সাতশো অষ্টআশি জন সৈন্য, তাঁদের মধ্যে এক হাজার ছ'শো ছাব্বিশ জনই ছিলেন ব্যারাকে নয়, হাসপাতালে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে। তার অর্থ প্রতি সাত জনের এক জনেরই কম্প জ্বর। আক্রান্তদের অনেকেই বেঘোরে মারা যান। মৃত্যুর প্রধান কারণ পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতি। এমনকী ফরাসিরাও প্রথম দিকে ঠিকমতো কুইনিন ব্যবহার করতে পারেননি। নতুনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে চিকিৎসকদের অনেকেরই দ্বিধা ছিল। এই নতুন ওষুধের দামও খুব চড়া। এক আউন্স কুইনিনের দাম তখন পঁচিশ পাউন্ড। আজকের টাকার হিসাবে এক হাজার দু'শো পঞ্চাশ টাকা, ক্রমে ফরাসি চিকিৎসকরা অবশ্য কুইনিন ব্যবহারে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তবে ফ্রান্সের মেডিকেল সার্ভিসে নতুন চিকিৎসা পুরোপুরি গ্রহণ করতে বেশ কিছুকাল কেটে যায়। শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৮১ সাল নাগাদ আলজেরিয়ায় বন্দিত হয় কুইনিন। অপরাজিত শত্রু ম্যালেরিয়া হার মানছে এই কুইনিনের কাছে। যে চিকিৎসক কুইনিনের এই বিজয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন আলজেরিয়ার মাটিতে, বলা হয়, তাঁর দৌলতে আলজেরিয়া পরিণত হয়, ফ্রান্সের উপনিবেশ-এ। তার জন্যই আলজেরিয়া তথা আফ্রিকা 'খ্রিস্টানদের গোরস্থান' না হয়ে রূপান্তরিত হয় ইওরোপের উপনিবেশে!

পশ্চিম আফ্রিকা এবং গোল্ড কোস্টেও ক্রমে ক্রমে চালু হয়ে যায় কুইনিন। ১৮৪০-এর দশকে গোল্ড কোস্টের ইওরোপিয়ানরা হাতের কাছে কুইনিনের বড়ি রাখতেন, জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া মাত্র বড়ির ব্যবহার শুরু করে দিতেন। বিস্ময়করভাবে কমতে থাকে ইওরোপিয়ান সেনা বাহিনীতে মৃতের সংখ্যা। কুইনিন শুধু মড়ককেই ঠেকিয়ে রাখেনি, ইউরোপিয়ানদের মানসিক স্বাস্থ্যকেও চাঙ্গা করে দিয়েছে যেন। তখন আর আফ্রিকার দিকে তাকিয়ে পশ্চিমি অভিযাত্রীরা ভাবেন না, ওই

মহাদেশ সাদা মানুষদের কবরখানা। কুইনিন তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। পশ্চিমি অভিযাত্রীরা তখন আর আফ্রিকার নামে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যান না, তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস একদিন জীবিত অবস্থাতেই ফিরে আসতে পারবেন নিজের দেশে। ফলে দেখতে দেখতে শুরু হয়ে যায় আফ্রিকায় ইওরোপিয়ানদের অভিযান। একের পর এক দেশ ইউরোপের হাতের মুঠোয়। কারণ সাদা-মানুষদের পক্ষে রয়েছে এখন মৃত সঞ্জীবনী কুইনিন। এমনকী লিভিংস্টোনও তার ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত। ১৮৫০-৫৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা অতিক্রমের সময় তিনি নিয়মিত কুইনিন খেতেন। তাঁর ধারণা ছিল কুইনিন প্রতিষেধকেরও কাজ করে। ক' বছর পরে আর এক অভিযানের সময় তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়মিত দুই-গ্রেন করে কুইনিন দিতেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন পঁচিশ জন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন বটে, কিন্তু মারা যান মাত্র তিনজন। ডেভিড লিভিংস্টোন ছিলেন অভিযাত্রী। এই অভিযাত্রীদের পিছু পিছু হাজির হয় সাম্রাজ্যবাদী দল। কামান নয়, বন্দুক নয়, আফ্রিকাকে যেন তারা জয় করে নিল, কুইনিনের সাহায্যে। সিংহ ও মশক নিয়ে মাইকেলের একটি কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। অন্যান্য আগ্রাসী উপনিবেশিকদের মতো আফ্রিকার উপকূলে ব্রিটিশ সিংহ হার মেনেছিল মশার কাছে। কুইনিন সেই মশাকে হার মানাল।

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের। বিজিত দেশগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতে রয়েছে মশা এবং ম্যালেরিয়া। দখল কায়েম রাখতে হলে কুইনিন চাই। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিপুল সংখ্যক মানুষের চাহিদা মেটানোর মতো কুইনিন কোথায়? ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ইওরোপে সিঙ্কোনা গাছের বাকল আসত পেরু, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া থেকে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় ওইসব দেশ থেকে রপ্তানিও। ১৮৬০ সালে যদি দক্ষিণ আমেরিকা রপ্তানি করে থাকে কুড়ি পাউন্ড সিঙ্কোনা গাছের ছাল, তবে ১৮৮১ সালে তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় দু' কোটি পাউন্ড। কিন্তু তাদের সৌভাগ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৮০ সালেই দেখা যায় বাজার থেকে দক্ষিণ আমেরিকার সিঙ্কোনা গাছের বাকলকে হটিয়ে দিয়েছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সিঙ্কোনা। কুইনিন আবিষ্কারের মতো সেও এক বিচিত্র এবং বিস্ময়কর উপাখ্যান। ইন্দোনেশিয়া তখন ডাচদের অধীনে। সেখানে জাতীয় সরকারি বাগান রয়েছে। সেখানে রয়েছেন অভিজাত ডাচ উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা হল্যান্ডে আর্জি পেশ করলেন অ্যান্ডিজ থেকে সিঙ্কোনা বীজ অথবা চারা সংগ্রহের জন্য সরকারের তরফে উদ্যোগ চাই। মন্ত্রণা শুরু হল। ১৮৫৩-৫৫ সালে জাভার বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিনটেন্ডেন্ট যাত্রা করলেন দক্ষিণ আমেরিকা। তিনি ছদ্মনাম নিয়ে ওই এলাকায় ঘুরে বেড়ালেন এবং গোপনে বেশ কিছু সিঙ্কোনার বীজ সংগ্রহ করেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত পথেই অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায়। ইংরেজরাও চুপ করে বসে নেই। ১৮৫৮-৬০ সালে ইন্ডিয়া অফিসের একজন কর্মী বিখ্যাত কিউ উদ্যানের আরেকজন কর্মীর সাহায্য নিয়ে গোপনে বলিভিয়া ও পেরু ভ্রমণ করেন। উদ্দেশ্য একটাই, সিঙ্কোনা গাছের বীজ সংগ্রহ করা। আরও একজন ইংরেজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী কিউ বাগানের এক কর্মীকে নিয়ে বের হন অভিযানে। তাঁরা সফল হন। এই ইংরেজ দলটি এক লক্ষ বীজ এবং ছ'শো সাঁইত্রিশটি সিঙ্কোনার চারা নিয়ে দেশে ফেরেন। তার মধ্য থেকে চারশো তেষট্টিটি চারা পাঠানো হয় ভারতে। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ের উৎকামন্ড-এ শুরু হয় সিঙ্কোনা চাষ। শিবপুরের বাগানেও চর্চা চলে। কালিম্পঙে সিঙ্কোনা চাষ শুরু হয়। তা ছাড়া সিংহল এবং জাভায়ও দেখতে দেখতে গড়ে তোলা হল সিঙ্কোনা বাগান। ডাচ আর ইংরেজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অভিজ্ঞতার লেনদেন চলতে থাকে পাশাপাশি। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় অনেক উন্নত সিঙ্কোনা গাছ জন্মাচ্ছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে। সুতরাং বাজার থেকে ক্রমে পুরোপুরি হটে গেল দক্ষিণ আমেরিকার একচেটিয়া রপ্তানি পণ্য—সিঙ্কোনা।

বাজার তখন ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার দখলে। বলা উচিত ইন্দোনেশিয়ার দখলে কারণ জাভার

সিঙ্কোনা গুণেমানে ভারতের সিঙ্কোনার চেয়ে উন্নত। স্বভাবতই এই শতকের গোড়ায় বিশ্বের কুইনিন বাজারের দশ ভাগের নয় ভাগই ছিল ডাচদের কবলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তারাই নিয়ন্ত্রণ করতেন কুইনিনের বাজার। আর, ভারতীয় কুইনিন? তার সবটুকুই চলে যেত এদেশের এবং পৃথিবীর নানা দেশে মোতায়েন ব্রিটিশ সৈন্য ও প্রশাসকদের খাতে। ছিটেফোঁটা যা অবশিষ্ট থাকত ভারতের মানুষের ভাগ্যে অনেকদিন পর্যন্ত সেটুকুই জুটত। সেদিক থেকে বিচার করলে শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নয়, সাম্রাজ্য রক্ষার কাজেও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এই কুইনিন। 'দ্য টুলস অব এম্পায়ার' বইয়ে ডানিয়েল আর হেড্রিক সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সিঙ্কোনার উৎপাদন নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদী যান্ত্রিক কুশলতার এক চূড়ান্ত নিদর্শন।

অচেনা মুলুকে অভিযান, নব নব উন্মোচন প্রসারিত বাজার ও বাণিজ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার, শেষ পর্যন্ত অন্য দেশকে নিজেদের তাঁবে এনে শাসন ও শোষনের অধিকার পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকায় এভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছিল সাড়ে তিনশো বছরের চেষ্টায়, তার পেছনে বিশেষ ভূমিকা ছিল তিনটি হাতিয়ারের। এক, নদী পথে চলাচলে উপযোগী বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত জলযান বা স্টিমার, দ্বিতীয় গাদা বন্দুকের বদলে দ্রুত চালনা করা যায় এমন বন্দুক তৈরি, আর এই—কুইনিন। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে তার স্থান তৃতীয় নয়,—প্রথম।

১৮৫৬ সালের কথা। অসুস্থ গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি তখন নীলগিরিতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর মেয়াদ ফুরিয়ে এল (১৮৪৮-১৮৫৬)। এবার দেশে ফেরার পালা। তার আগে হাতের কাজটুকু শেষ করা দরকার। ভারতে স্মরণযোগ্য অনেক কাজই করেছেন তিনি। দিকে দিকে ব্রিটিশ অধিকারের এলাকাকে প্রসারিত করেছেন। সাম্রাজ্যের আয়তন বেড়ে গেছে বলতে গেলে সাড়ে তিন ভাগ। মানচিত্রে লাল রঙের ছড়াছড়ি। তিনি শাসনযন্ত্রকে সংস্কার করেছেন, তাকে আরও সচল করেছেন। ডাক বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, পূর্ত বিভাগ—সর্বত্র তাঁর দক্ষ হাতের স্পর্শ। তিনি রাস্তা গড়েছেন, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছেন। তাঁর আমলেই ভারতে পৌঁছায় শিল্প বিপ্লবের আশ্চর্য অবদান—স্টিম ইঞ্জিন। ডালহৌসির শাসনকালেই পবিত্র গঙ্গার ধারায় নতুন কালের রাজহংস—স্টিম বোট বা বাষ্পীয় স্টিমার। তাঁর কালেই 'লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ'—রেলগাড়ি। তিনি কি তাঁর শেষ ঐতিহাসিক ভূমিকাটি পালন করতে পারবেন না? নীলগিরিতে অসুস্থ গভর্নর জেনারেলের সামনে মেলে ধরা হল ভারতের মানচিত্র। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না ডালহৌসি। ১৮৫৩ সালের নভেম্বরে শুরু। একসঙ্গে অবশ্য কুড়িটি কেন্দ্রে কাজ শুরু করা হয়েছিল। এটা ১৮৫৬ সালের শেষ প্রহর। দূর নীলগিরিতে বসে গর্বিত গভর্নর জেনারেলের চোখে মুখে সাফল্যের স্মিত হাসি। বিশাল এই দেশকে তিনি তারের বন্ধনে বেঁধেছেন, টেলিগ্রাফের দৌলতে দেশের সব ফৌজি ছাউনি তাঁর হাতের নাগালে। ইচ্ছা করলে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি দেড়লক্ষ সৈন্যকে সচল করে তুলতে পারেন। তিনি সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িয়েছেন, সাম্রাজ্য রক্ষার চাবিকাঠিও তাঁর হাতে।

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মতোই টেলিগ্রাম ভিক্টরীয় ইংলন্ডে এক পাগল করা প্রযুক্তি যেন। মার্কিন উদ্ভাবক স্যামুয়েল ফিনলে ব্রিস মর্স সাফল্যের সঙ্গে তাঁর টেলিগ্রামের সাহায্যে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোরে বার্তা পাঠান ১৮৪৪ সালের ২৪ মে। তারপর দেখতে দেখতে আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে টেলিগ্রামের নেশা। রেলের পাশাপাশি টেলিগ্রামের জন্য তারের লাইন। এ ব্যাপারে প্রধানত উদ্যোগী হন ব্যাঙ্ক পরিচালক, ব্যবসায়ী এবং শেয়ার বাজারের লোকেরা। রেলের মতো টেলিগ্রাফও তাঁদের বিচারে পরিণত হবে লাভজনক ব্যবসায়। ভারতে আমেরিকার মতো রেল ছিল প্রথম দিকে

প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগ। রেল এবং স্টিমার দুই-ই বেসরকারি হাতে। টেলিগ্রাফের চিন্তা এদেশে প্রথম উদিত হয় সরকারি চিন্তায়। আরও স্পষ্ট করে বললে সাম্রাজ্যের অতি দূরদর্শী ডালহৌসির মাথায়। তিনি টেলিগ্রাফকে পুরোপুরি সরকারি হাতেই রাখতে চান।

১৮৪৯ সাল। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের পর কোম্পানির হাতে আসে পঞ্জাব। সেইসঙ্গে খাইবার পাস পর্যন্ত সমুদয় অঞ্চল। ডালহৌসি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দুর্ধর্ষ দুর্বিনত আফগানরা। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কোথায় কলকাতা, আর কোথায় পেশোয়ার কিংবা কাবুল। টেলিগ্রাফের তার ছাড়া কেমন করে সম্ভব এই প্রত্যন্ত প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। সে বছর একে একে অনেক দেশীয় রাজ্য জয় করেছেন তিনি ইংরেজের তরফে। ওদিকে ব্রহ্মদেশও সাম্রাজ্যের তালিকায়। ডালহৌসি নতুন কালের নতুন সাম্রাজ্যের রক্ষয়িত্রী দেবী বলে গ্রহণ করলেন টেলিগ্রাফকে। রেলপথের কাজ শুরু হয়ে গেছে। বেসরকারি কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পাশাপাশি টেলিগ্রাফের লাইন বসাবার জন্য। তাঁরা রাজি হয়েছিলেন বাণিজ্য হেতু, মুনাফার লোভে। কিন্তু ডালহৌসি লাভ লোকসান খতিয়ে দেখার জন্য ব্যস্ত নন, সাম্রাজ্য গড়ার কারিগর তিনি, তিনি টেলিগ্রাফ চান রাজনৈতিক কারণে। এবং চান যথা সম্ভব দ্রুত।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর সওয়াল শুনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনে সরকারি উদ্যোগে টেলিগ্রাফ বসাতে তাঁদের আপত্তি নেই। বস্তুত, তাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কলকাতায় একজন কুশলী যন্ত্রবিদকে পাওয়া গেল। তিনি কলকাতা টাকশালের সহকারি অধ্যক্ষ ডঃ উইলিয়াম ব্রুক ও'সাউগনোসি। সাড়া দিলেন আর এক দক্ষ কারিগর। তিনি ফ্রান্সিস লুইস। দু'জনেই একমত যে, যদিও ডাঙায় টেলিগ্রাফের তার বসানো তুলনায় সহজ কাজ, তবু বসানো উচিত জলের তলা দিয়ে। মাটির উপরে ঝক্কি বিস্তর। পাখি আছে, বাঁদর আছে, দুষ্ট প্রজা থাকাও অসম্ভব নয়। ডালহৌসি দুটি প্রস্তাবই বিবেচনার জন্য মিলিটারি বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতা টাকশালের বড় কর্তার অভিমতও জানতে চাওয়া হল । নাম তাঁর উইলিয়াম নাইরান ফর্বস। তিনি সুখ্যাত যন্ত্রবিদ। টাকশালে তিনি বাষ্পীয় ইঞ্জিন বসিয়েছেন, গঙ্গায় বাষ্পীয় পোত ভাসিয়েছেন, আবার সেন্টপল গির্জাও তাঁর কীর্তি। ফর্বস সব প্রস্তাব পরখ করে সব দিক বিবেচনা করে বললেন— টেলিগ্রাফের লাইন ডাঙায় বসানোই সঙ্গত। এবং সে কাজের দায়িত্ব তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী উইলিয়াম ব্রুককে দিতে কোনও অসুবিধা নেই। প্রশ্ন হল: লাইন উত্তরমুখো পাতা হবে না দক্ষিণমুখো। প্রথম লাইন চুঁচুড়ার দিকে যাবে না ডায়মন্ডহারবারের দিকে। সবদিক ভেবে চিন্তে তাঁরা প্রথম লাইনটিকে ডায়মন্ড হারবারের দিকে বসানোই যুক্তিযুক্ত বলে স্থির করলেন। কলকাতার সঙ্গে ছাব্বিশ মাইল দূরের ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে যোগসূত্র হিসাবে টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হল। সেই তার যদি লক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়ে থাকে মাথার উপর দিয়ে, অর্ধেক আত্মগোপন করে থাকে মাটির তলায়। ৪ অক্টোবর, ১৮১৫ সাল। টেলিগ্রাফের যাত্রারম্ভ হল ভারতের মানচিত্রে। এই প্রাচীন দেশের অঙ্গে নতুন কালের নতুন উপবীত। এই উপবীত ধাতব, এই যা। সরকারি নৌ-বিভাগ, বাণিজ্যিক জাহাজ মালিক, প্রশাসক, সবাই খুশি। খুশি লর্ড ডালহৌসিও। তাঁর স্বপ্ন এতদিনে সফল হতে চলল।

ব্যবসা বাণিজ্য নয়, ডালহৌসির কাছে তার চেয়েও জরুরি চিন্তা ছিল সাম্রাজ্য রক্ষা। কাজ চলল বলতে গেলে তারের গতিতে। যন্ত্রবিদ্‌দের ব্রিটেনে পাঠানো হল সর্বশেষ এবং নবতম প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের জন্য। ইউরোপ এবং আমেরিকায় টেলিগ্রামের জন্য তখন যে সব যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে সে সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁরা আতলান্তিকের দুই তীরেই ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও কেনা হল। সেগুলো যাতে দ্রুত ভারতে পৌঁছায় এবং বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে গুদামজাত করা হয় তার ব্যবস্থা হল। কোম্পানির বড়

কর্তারা রাজধানী কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করলেন বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারকেও। তখনকার মতো লক্ষ্য স্থির হল—৩১৫০ মাইল তারের যোগাযোগের বন্দোবস্ত।

প্রথম কাজ তিনটি প্রেসিডেন্সিকে তারসূত্রে বাঁধা। তারপর সামরিক ঘাঁটিগুলির সঙ্গে তার-বন্ধন। ১৮৫৪ সালের মার্চের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল কলকাতা থেকে আগ্রা পর্যন্ত লাইন। পাঁচ মাসে আটশো মাইল। বছর শেষ হওয়ার আগেই দেখতে দেখতে সাগরদ্বীপ যুক্ত হল পেশোয়ারের সঙ্গে, আগ্রা হাত মেলাল বোম্বাইয়ের সঙ্গে, এবং বোম্বাই মাদ্রাজের সঙ্গে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশে পেগুর যুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হয়েছে। ভারতেও কর্ণাটকসহ আরও বেশ কয়টি দেশীয় রাজ্যে ডালহৌসি ইংরেজ আধিপত্য কায়েম করেছেন। সুতরাং সামরিক-প্রশাসনিক দায়িত্ব বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে নতুন নতুন টেলিগ্রাম লাইনের জন্য ব্যস্ততা। ১৮৫৬ সালের মধ্যে ভারতের অধিকাংশ শহর, শাসনকেন্দ্র এবং সামরিক ছাউনি ধরা পড়ে গেছে তারের জালে। ডাঙায় তারের জালের প্রায় দুই দশক পর জলের তলায় টেলিগ্রাফের প্রবেশ। ভারতে জলের তলায় প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন ভাগীরথীর দুই তীরের মধ্যে বন্ধন। ১৮৩৯ সালের কথা। ইংল্যান্ড আর আয়ারল্যান্ডের মধ্যে সমুদ্রতল দিয়ে তারের সংযোগ ১৮৫২ সালে। ওদিকে অতলান্তিকের দুই কুলের মধ্যে সুমদ্রতল দিয়ে তারের যোগসূত্র রচনার জন্য কত না উদ্যোগ। রীতিমতো লোমহর্ষক সে সব কাহিনী। উৎসাহী উদ্যোগীর অভাব ছিল না, কার্পণ্য ছিল না অর্থ ব্যয়েও। কিন্তু একের পর এক চেষ্টা বিফলে যায়। আক্ষরিক অর্থেই রাশিরাশি টাকা জলাঞ্জলি দিতে হয়। কারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এব্যাপারে তখনও যথেষ্ট অগ্রসর হয়নি। তার সাফল্য কাহিনীও রীতিমতো এক চাঞ্চল্যকর উপাখ্যান। এখানে তা শোনাবার সুযোগ নেই, প্রয়োজনও নেই। আমরা আপাতত ভারতের কথাই বরং শুনি। ইংল্যান্ড থেকে তার আমেরিকায় পৌঁছায় ১৮৬৫ সালে। তার এক বছর আগেই কিন্তু ব্রিটেনের সঙ্গে তারের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে ভারতের। ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের এই যোগাযোগ স্থাপিত হয় দুটি স্বতন্ত্র রেখা ধরে। একদিকে ভারতের লক্ষে অভিযাত্রীর মতো তার এগিয়ে চলেছে স্থলপথে বেলজিয়াম, জার্মানি, রাশিয়া, পারস্য হয়ে উপসাগরের দিকে, সেখানে যোগ দিয়েছে জলের তলায় তারের সঙ্গে। সেখান থেকে করাচিতে। অন্যদিকে জলপথে জিব্রাল্টর, মাল্টা, আলেকজান্দ্রিয়া, সুয়েজ, এডেন হয়ে বোম্বাই। এভাবেই ভারতের মতো ক্রমে বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দূরতম বিন্দুটিও ধরা পড়ে তারের ফাঁসে। ভারতের ক্ষেত্রে এই তারের ভূমিকা রীতিমতো ঐতিহাসিক।

অপু আর দুর্গা রেল লাইনের ধারে টেলিগ্রাফের খুঁটিতে কান রেখে বিস্ময়ে অভিভূত। শৈশবে বা কৈশোরে অনেকের জীবনেই রয়েছে এ ধরনের অভিজ্ঞতা। রেললাইন বরাবর চলেছে ঝকঝকে তারের সটান লাইন। থামের মাথায় সাদা চিনেমাটির বাটি। তারে বসে লেজ দোলাচ্ছে বুলবুলি কি ফিঙ্গে। রেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কে জানে কোথায় চলেছে এই সব সরু তারের ঝাঁক। ছোট, শহরের ছোট স্টেশনে স্টেশনবাবু অনবরত আঙুলে একটি যন্ত্র বাজান,—টরে টক্কা, টরে টক্কা। ডাক ঘরেও একই যন্ত্র, একই অনুচ্চ ধ্বনি—টরে টক্কা। কে তখন জানত এই হচ্ছে টেলিগ্রাফ। এই শব্দ দুটি 'ডট' আর 'ড্যাস'-এর প্রতীক, তার সাহায্যেই রচিত হচ্ছে বাক্য,—বার্তা। গ্রামে টেলিগ্রাম এলে সারা গাঁ হুমরি খেয়ে পড়ত—নিশ্চয় কোনও অমঙ্গল বার্তা। তখনও জন্মদিন, বিবাহ, কিংবা বিবাহ বার্ষিকীতে টেলিগ্রাম পাঠাবার রেওয়াজ চালু হয়নি। টেলিগ্রাম মানে তৎকালে-বার্তা। দ্রুতগামী বার্তা। প্রাণের মানুষের কাছে অমঙ্গল বার্তা। কিন্তু সকলের কাছে নয়। খবরের কাগজের নাম—'দ্যা টেলিগ্রাফ', 'দ্যা ডেইলি টেলিগ্রাফ', জরুরি কোনও খবর থাকলে বিশেষ সংখ্যা নিয়ে হকার এখনও হাঁকেন—'টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম'। সংবাদসংস্থাগুলির কাছে এই টেলিগ্রাফ ছিল একদিন প্রাণবায়ুস্বরূপ। অ্যাসোসিয়েটে প্রেস (১৮৪৮), রয়টার (১৮৫১) ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি বলতে গেলে টেলিগ্রাফেরই অবদান। এখন অবশ্য যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তর ঘটে গেছে। মহাকাশে উপগ্রহ।

ডাঙায় টেলিফোন, মোবাইল টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট—কত কী। টেলিগ্রাফ স্পষ্টতই অন্তিমপর্বে। এক সময় নৌচলাচল ব্যবস্থায় অকূল দরিয়ায় যে টেলিগ্রাম রেডিয়ো বার্তা ছিল ত্রাণকর্তা বিশেষ, ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আর কখনও তার আর্ত আহ্বান শোনা যাবে না।—'এস ও এস' শব্দ তিনটি নাবিকের কান থেকে হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো। কারণ, বিকল্প ব্যবস্থাদি আজ মানুষের করায়ত্ত। অথচ আজ অবান্তর এবং গতকালের প্রযুক্তি হিসাবে গণ্য-প্রায়, এই টেলিগ্রাফ একদিন ভারতের ভাগ্য নিয়ে কী রক্তাক্ত খেলাই না খেলেছে। ভারতের নিয়তি সেদিন ঝুলছে তারে।

ভারতে লর্ড ডালহৌসির শেষ কীর্তি বা অপকীর্তি অযোধ্যার শাসককে গদিচ্যুত করে তাঁর রাজত্বে ছেদ টানা, সমৃদ্ধ অযোধ্যাকে দখল করা। ভারত ত্যাগের মাত্র তিন সপ্তাহ আগে ১৮৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি ইংরেজের বিজয় পতাকা উড়ানো হয় লখনৌর আকাশে। তার আঠারো দিন আগে লখনৌর সঙ্গে কানপুরের তারের বন্ধন। যাত্রার আগের মুহূর্তে টেলিগ্রাফেরই বিদায়ী গভর্নর জেনারেল খবর পেলেন—অযোধ্যা শান্ত। দু'বছরের মধ্যেই বিস্ফোরণ। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল এলাহাবাদে বসে শুনলেন—দাউ দাউ জ্বলছে লখনৌসহ তামাম অযোধ্যা। জ্বলছে ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা। এই বিদ্রোহে টেলিগ্রাফের ঐতিহাসিক ভূমিকা সব ঐতিহাসিকরাই স্বীকার করেছেন। দেশি বিদেশি প্রত্যক্ষদর্শী এবং পরবর্তী গবেষকরা সকলেই এব্যাপারে একমত যে, টেলিগ্রাফ সেদিন ইংরেজের ত্রাণকর্তার ভূমিকায়। এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত এবং তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন 'সায়েন্স মিউজিয়াম' বা বিজ্ঞান-জাদুঘর সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ সরোজ ঘোষ মশাই। (দ্রষ্টব্য: কমার্শিয়াল নিড্‌স অ্যান্ড মিলিটারি নেসেসিটিজ, দ্য টেলিগ্রাফ ইন ইন্ডিয়া। প্রবন্ধটি সংকলিত 'টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য রাজ', সম্পাদক রয় মেকড এবং দীপক কুমার, নামক বইয়ে।) অত্যন্ত মূল্যবান এই রচনায় সরোজ ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন ডালহৌসি কি ভবিষ্যত ঝড়ের সঙ্কেত পেয়েছিলেন? ১৮৪৯-৫৫ সালে মোপলা বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ,—ভারতে ইংরেজ অধিকার কি তারপরও নিশ্চিন্ত? সে কারণেই হয়তো ডালহৌসির টেলিগ্রাফ লাইন নিয়ে এই ব্যস্ততা। হয়তো বা। তা না হলে লাভ লোকসানের অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি সামরিক প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিতেন না। তাঁর দুঃস্বপ্ন যেমন সত্য প্রমাণিত হয় সেদিন, টেলিগ্রাফ ঘিরে সুখ স্বপ্নও পরিণত হয় সত্যে।

উত্তর ভারতে আগুনের প্রথম খবর আসে টেলিগ্রাফের তার বেয়ে। বেসরকারি সূত্রে। সরকারি বার্তা নয়, টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জানান—সিপাইরা আগুন নিয়ে মেতেছে। সঙ্গে সঙ্গে লাইনটি স্তব্ধ হয়ে যায়। এদিকে দিল্লি থেকে আম্বালায় দুটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বলা হয় গোটা ভারতে বার্তা ছড়িয়ে দিতে। ততক্ষণে মিরাটের বিদ্রোহীরা দিল্লির দক্ষিণে সব লাইনই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং উত্তর দিকে 'টরে টক্কা' বাজানো ছাড়া দিল্লির কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং, আম্বালায় ভারতীয় সৈন্যদের সশস্ত্র বিদ্রোহ, ইংরেজদের হত্যা, কোম্পানির ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া আতঙ্ককর সব সংবাদই ছিল ওই টেলিগ্রাম দুটিতে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই স্তব্ধ দিল্লি, আগ্রা ও পঞ্জাবের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন। আম্বালা থেকে পাঠানো ওই দুটি বার্তা ইংরেজদের তৎপর করে তোলে সর্বত্র। পঞ্জাবে সময়মতো খবর পাওয়ার ফলে বিদ্রোহের আগেই সিপাহিদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়। তাই সেখানে বিদ্রোহের আগুন বিশেষ ছড়াতে পারেনি। কলকাতায় বিদ্রোহের খবর পৌঁছায় দিল্লির পতনের পর। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং তখন সিমলায়। তবু দ্রুত শুরু হয় প্রস্তুতিপর্ব। ওই বিশেষ দিনগুলিকে ঐতিহাসিক বলেছেন 'আ উইক অব টেলিগ্রাফ।' টেলিগ্রাফের তার দিকে দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বার্তা, আদেশ, নির্দেশ, হুকুমনামা। টেলিগ্রাফ যুদ্ধ চালাচ্ছে যেন। সাম্রাজ্য তারের বন্ধনে বাঁধা। সুতরাং নানা দেশ থেকে ডেকে আনা হচ্ছে ফৌজ। পারস্য, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর। সাম্রাজ্যের হৃদয়পুর ভারতে আগুন, সুতরাং দমকলের মতো ছুটে আসতে লাগল ইংরেজ বাহিনী।

এ ব্যাপারে আর এক সহায় বাষ্পীয় পোত। কলের জাহাজ। বিদেশ থেকে ডেকে আনা এবং ভারতের নানা ছাউনিতে মোতায়েন সৈন্যরা বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় যখন রণভূমিতে, তখনও তাদের অন্যতম সহায়—টেলিগ্রাফ, যাকে বলে 'ফিল্ড টেলিগ্রাফ'। অগ্রবর্তী বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলে অস্থায়ী খুঁটি ভর করে তার! এই তারের খেলার সঙ্গে পাল্লা দেয় বিদ্রোহীদের সাধ্য কী!

টেলিগ্রাফ নতুন কালের নতুন যন্ত্র। বিদেশি যন্ত্র। ভারতীয়রা ও যন্ত্রের সাহায্য নিতে অনীহা দেখিয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু সিপাহির কাছে এই যন্ত্র কার্যত অপরিচিত এক দুশমন বিশেষ। টেলিগ্রাফ নিয়ে যে সরকারি কর্মী-বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল তখন তার অধিকাংশ কর্মীই ছিলেন ইংরেজ কিংবা অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান। অর্থাৎ বিশ্বস্ত সেবায়েতের দল। কোড-নির্ভর এই বার্তার ভাষা—ইংরেজি। ক'জন ভারতীয় ফৌজি কিংবা তাদের দলপতি ইংরেজি কোড ব্যবহার করতে পারবেন? সুতরাং, অন্ধ আক্রোশে উন্মত্ত ক্রোধে এই শত্রুকে ধ্বংস করা ছাড়া সিপাহিদের আর করণীয় ছিল না। শত শত মাইল তার তারা ছিন্নভিন্ন করেছে, অসংখ্য টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করেছে, কর্মীদের হত্যা করেছে, এমনই টেলিগ্রাফের থাম উপড়ে তা দিয়ে কামান পর্যন্ত তৈরি করেছে, কিন্তু যন্ত্রটিকে কাজে লাগাতে পারেনি।

অন্যদিকে ইংরেজ পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছে লর্ড ডালহৌসির এই ধাতব মঙ্গলসূত্রকে। সিপাহিরা সব নয় ছয় করে দেওয়ার পর যোগসূত্র অবশ্য অনেক এলাকায় নষ্ট হয়ে যায়। নানা কেন্দ্রে ফের ইংরেজ রাজ কায়েম হওয়ার পরও সঙ্গে সঙ্গে তারে প্রাণসঞ্চার সম্ভব হয়নি। ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমস্যাও দেখা দেয়। দিল্লি পুনরাধিকারের পর পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ বলেন—তিনি এই শর্তে আত্মসমর্পনে সম্মত যদি তাঁর প্রাণ নাশ না করা হয়। বিজয়ী সেনাপতি বললেন—তথাস্তু। দিল্লিতে তখন টেলিগ্রাফ নেই, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আঁকাবাঁকা পথে কলকাতায় খবর পৌঁছাল তিন সপ্তাহ পর। রাজধানী থেকে নির্দেশ গেল কমিশন বানিয়ে বিচার করতে হবে বিদ্রোহী সম্রাটকে এবং রায় যাই হোক না কেন, তখনই কার্যকর করতে হবে। এই নির্দেশ গেল আগ্রায়। তা ছাড়া পথ নেই। কলকাতা-আগ্রা লাইন সবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। সুতরাং পথে দেরি। দিল্লি থেকে সবিনয়ে উত্তর এল—কমিশন বসবে, রিপোর্টও দেবে, কিন্তু কোনও রায় কার্যকর করা যাবে না। কারণ, সম্রাটকে আমরা প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

এ-ধরনের আরও নানা কাণ্ডই ঘটেছে ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহে ভারতের মাটিতে। কিন্তু তাতে টেলিগ্রাফের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র লাঘব হয় না। বরং বলা যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাতে উন্নত কামান, যুদ্ধ জাহাজ, স্টিমইঞ্জিন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবিধ আয়ুধের মতো অন্যতম হাতিয়ার ছিল এই টেলিগ্রাফিক তারবাহী টরে টক্কা মন্ত্র। একজন ইংরেজ রাজপুরুষ ভারতীয় মহাবিদ্রোহে টেলিগ্রাফের অবিশ্বাস্য শক্তি দেখে মন্তব্য করেছিলেন—'Under providence, the electric telegraph saved us'। ঈশ্বরের অসীম করুণায় আমরা বেঁচে গিয়েছি বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের জন্য। অন্যদিকে ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একজন বিধ্বস্ত পরাজিত ভারতীয় বিদ্রোহী ওই তারের দিকে আঙুল তুলে নাকি বলেছিলেন—'এই তারই গলায় ফাঁস হয়ে আমাকে মারল!'

প্রাসঙ্গিক কিছু বই:

Man and Microbes, Arnold Karlen, Newyork, 1995.
Diesease and History, Frederic Cartwright, Newyork, 1974.
Diesease, Medicine and Empire, (Ed.) R Macleod and M Lewis, London, 1989.
Imperial Medicine and Indigenous Societies, (Ed.) David Arnold, New Delhi, 1988.

The Image of Africa : British Ideas and Actions 1780-1850, Philip D Curtin, Madison, wis, 1964.

Rivers of Death in Africs, Michael Getfand, London, 1964.

The Tools of Empire, Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century, Daniel R. Headric, London, 1981.

Mosquito Brigads And How to Organise them, Ronald Ross, London, 1902.

Empire and Communication, Harold A Innis, London, 1950.

The Marquess of Dalhousie (Rulers of India), Ed. W.W. Hunter, Oxford, 1904.

Imperialism and Technology, Rondo Cameron (in Technology in Western Civilization, Ed. Melerin Kranzberg and Carroll Prursell), London, 1967.

Commercial Needs and Mlilitary Necessities: The Telegraph in India, Saroj Ghose, *(in Technology and the Raj, Western Technology and Technical Transfers to India (1700-1947)* (Ed.) Roy Macleod and Deepak Kumar, New Delhi, 1995.

British Routes to India, Halford Lancaster Hoskins, London, 1928, N. Ed. 1960.
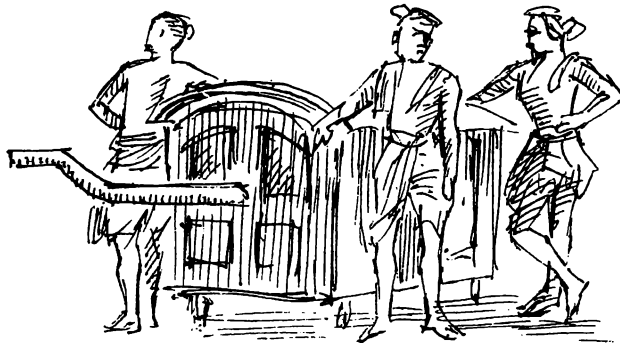
সাহেব ধরা

আমাদের জাহাজ নোঙর করল শহর থেকে কিছুটা দূরে। ক্যাপ্টেন গ্রগওয়েল-এর সঙ্গে করমর্দন করে আমি মালপত্র নিয়ে একটা পানসিতে উঠে পড়লাম। নৌকো ছাড়ার সময় ক্যাপ্টেন হাঁক দিয়ে বললেন—ডাঙায় হাঙর আছে, সাবধান!

ঘাটে নানা ধরনের নৌকোর ভিড়। আমার নৌকোর মাঝিরা তারই মধ্যে ঠেলেঠুলে পথ করে তরী তীরে ভিড়াল। ডাঙায় সে-এক দৃশ্য। পুরুষ, রমণী, কাচ্চাবাচ্চা। ঘোড়া, সহিস, পালকি, বেহারা। ছাতা বরদার। হল্লার চূড়ান্ত। আমি ঘাটের সিঁড়িতে পা রেখেছি কি না রেখেছি আমাকে ঘিরে ধরল একদল বাবু।—গুড মর্নিং সার। (তখন সন্ধ্যা হয় হয়)। ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে মাথা নুইয়ে আমাকে অভিবাদন জানাল একজন। মাস্টার, আমার মনে হয় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে আপনি এই প্রথম এলেন।—ঠিক কথা। আমি উত্তর দিলাম।—তুমি কি আমাকে কাস্টমস হাউসের পথটা দেখিয়ে দিতে পার?—তারপর কোনও ভাল হোটেল কিংবা ট্যাভার্ন? —ওহ সারটানলি সার। এভরিথিং মাস্টার রিকোয়ার দ্যাট আই ক্যান ডু। মুহূর্তে সে কুলিদের মিটিয়ে দিয়ে আমার মালপত্রের দায়িত্ব নিয়ে নিল। ততক্ষণে আরও একজন অভিবাদন করে আমার সামনে মোতায়েন। সে বিনতভাবে বলল—জেন্টলম্যান, ইউ রিকোয়ার স্পেক্টবল সিরকার। আই গট হাইয়েস্ট টেসটিমনিয়াল অব ক্যারেক্টার : ইউ প্লিজ রিড দিস সার, দিস ইজ ফ্রম জিনরিল উইলকিনস সাহিব, দিস ওয়াকিল ইস্তিভিয়াল সাহিব। সে বিড় বিড় করে নানা সাহেবের নাম আউড়ে চলল। ইতিমধ্যে তৃতীয় একজন সামিল হয়ে গেছে। সে বয়স্ক। চুলে পাক ধরেছে। নাকে চশমা। সেও বকবক করে অনেক কথাই বলছে। ট্যাঁক থেকে ভাঁজ করা 'ক্যারেকটার' বের করে দেখাচ্ছে। আমি বললাম—দেখ, এখানে সুবিধা হবে না। একবার একজনকে যখন কথা দিয়ে ফেলেছি তখন সে-ই থাকবে। আমি ভিড় ঠেলে আমার সদ্য নিযুক্ত কর্মচারীর পিছু পিছু এগিয়ে চললাম।...

আমার সরকারের নাম ছত্তরমোহন গোস। (অর্থাৎ, ছত্রমোহন ঘোষ)। সে কথা জুড়ল—আমার মনে হয় প্রভুর নাম মিঃ গেরনন। আমি মনে মনে ভাবলাম লোকটি তো বেশ ধূর্ত, বাক্সের ওপর আমার নাম লেখা রয়েছে তা খেয়াল করে কাজে লাগাতে চাইছে।—তা, আপনিই বোধ হয় সেই সাহেব যাঁর 'রটেনবিম' জাহাজে আসার কথা। ছত্তরমোহন এবার সত্যই চমকে দিল আমাকে।—

তুমি এসব জানলে কী করে? আমি কিছু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।...ওহ—ছত্তরমোহন জবাব দিল,—এসব আমাদের জানতে হয়। কখন কোন জাহাজ আসছে , জাহাজে সিবিলিয়ান, মিলিটারি কারা আসছেন, সব আমাদের জানা। কিছু মনে করবেন না প্রভু, আমি ঠিক বলতে পারছি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে প্রভুর এদেশে কোনও আত্মীয় রয়েছেন, ফেস অল সেম,—ওয়ান জেন্টলম্যান আই নিউ অনলি মোর ইয়ং—লিটল মোর হ্যান্ডসাম। আমি বললাম—তুমি হয়তো আমার আঙ্কল কর্নেল গেরনন-এর কথা বলছ—সে কী? ছত্তরমোহন লাফিয়ে উঠল—কর্নেল ভেরি গুড জেন্টিলম্যান, মাই বিস্ট ফ্রেন্ড—অলওয়েজ হি ইমপ্লয়স মি হোয়েন হি কাম ক্যালকাটা।—কর্নেল কমান্ড ইউরোপিয়ান রিজিমেন্ট আই থিঙ্ক অ্যাট দানাপুর।

আমি বললাম—না না, তুমি ভুল করছ, আমার আঙ্কল কিছুদিন আগে মারা গেছেন, আর তিনি ইউরোপিয়ান রেজিমেন্টেও ছিলেন না।—দ্যাট আই নো সার ভেরি ওয়েল, ছত্তরমোহন বিন্দুমাত্র দমিত হল না,—বাট হোয়েন এলিভ আই মিন, বিলং নেটিভ রিজিমেন্ট দ্যাট সাম টাইম ওয়াজ ট্যাট প্লেস। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়েই ছত্তরমোহন কর্তৃক রমজান খানকে খিদমদগার হিসাবে নিয়োগ (তার ট্যাঁকেও বেশ কয়েকটি বিবর্ণ 'ক্যারেকটার' বা প্রশংসাপত্র ছিল), কাস্টমস হাউস-হয়ে রানিমুদির লেনের ট্যাভার্ন এবং সেখানে তেরাত্তির বাস করার পর ফোর্টউইলিয়াম-এর সাউথ ব্যারাকে। সেখানেও দেখি ছত্তরমোহন ত্রস্ত হাতে সাহেবের ঘর সাজাচ্ছে, চিনাবাজার থেকে মুটের মাথায় রাশি রাশি মাল চাপিয়ে ঘরে ঢুকছে, সাহেবের ফৌজী পোশাক তৈরির জন্য ঘরেই ওস্তাগর ডেকে আনছে। চার পাঁচ পাতা পড়তে না পড়তে বোঝা যায়—ছত্রমোহন সাহেব ধরেছে। টিকটিকি যেমন করে আরশুলা ধরে অনেকটা সেই ঢঙে। এখন শুধু গিলবার অপেক্ষায়।

বাবু ছত্রমোহন ঘোষের সাহেব-ধরার এ-বিবরণ যিনি দিয়েছেন তাঁর নাম ক্যাপ্টেন বেলিউ। তাঁর 'মেমোয়ারস অব এ গ্রিফিন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৫ সালে। তার আগে এবং পরে সেকালের আরও অনেক বিদেশি লেখকই শুনিয়ে গেছেন বাঙালির সাহেব ধরার কাহিনী।

একই স্টাইলে গঙ্গার ঘাটে ধরা পড়েছেন আর এক ফৌজী সাহেব। সরকার বাবু বললেন—মি লারড, ফলো মি। ঘোড়া, পালকি সব রেডি। তারই একটায় সাহেবকে চাপিয়ে দিলেন বাবু। মালপত্র সব বোঝাই করা হল। তারপর সরকার ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে জানতে চাইল—ক্যারিয়িং অ্যানি লেটার?—নো। —দেন লেট আস স্টার্ট ফর ইওর কুঠি। সত্যি সত্যি একটা বিরাট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। সরকার সসম্ভ্রমে বলল—মি লারড, দিস ইওর বাংলো। তারপর চারপাশের লোকগুলোকে দেখিয়ে বলল—দে আর ইওর স্লেভস—ইওর সারভেন্টস। আই অ্যাম অলসো ইওর স্লেভ মি লারড। বাবু এবার ফিরিস্তি দিলেন কার কী কাজ, আর সে বাবদে কার কত প্রাপ্য।—কিন্তু তোমার মাইনে বাবু? সেটা তো বললে না,—হাউ মাচ?—মি লারড আই নিড নো সেলারি, অনলি দস্তুরি উইল ডু। টাকার ওপর দুপয়সা দস্তুরি দিলেই বান্দার চলে যাবে।

অষ্টাদশ-উনিশ শতকে কলকাতার বাঙালিটোলায় এক শ্লোগান—সাহেব ধর। সকলের এক ধ্যান—কেমন করে সাহেব ধরা যায়। রোগা হোক, মোটা হোক, বড় হোক, ছোট হোক, সাহেব হলেই হল।সিভিল, মিলিটারি, ব্যবসায়ী কি বেকার—যে কোনও সাহেব। কেননা সাহেব মানে দস্তুরি। সাহেব মানে টাকায় দুপয়সা। সাহেব মানে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। সুতরাং সাহেব ধর। কিন্তু সাহেব ধরা সহজ কম্ম নয়। তার জন্য বিদ্যা চাই, ঝুঁকি চাই। জোগাড়যন্ত্র চাই। প্রথমে চাই ইংরেজি বুলি। যাদের ঝুলিতে তা ছিল সেদিন তাদের পোয়াবারো। অন্যরা তাদের পিছু পিছু ঘুর ঘুর করে। যদি ছিঁটে ফোটা পাওয়া যায়। তারপর অন্য ধরাধরিও আছে। হোটেল ট্যাভার্ন অফিস আদালতের দরোয়ান চৌকিদারদের হাত করতে হবে। নয়তো কবে কোন জাহাজ আসবে তার শুলুক সন্ধান করা যাবে

কেমন করে? তাছাড়া উদ্যোগ আয়োজনও ঘাটতি রাখা চলবে না, ফাঁদটি নিখুঁত হওয়া চাই, নইলে ধরা পড়েও সাহেব ফসকে যেতে পারে। হাতে বাটলার, খিদমদগার থেকে শুরু করে আয়া, আবদার (যে জল ঠাণ্ডা করে), ডুরিয়া (কুকুরের সেবায়েত) সব মজুত রাখা চাই, নানা ধরনের হোটেল-ট্যাভার্ন-এর সন্ধান চাই, চিনা বাজারের দোকানিদের সঙ্গে দহরম মহরম থাকা চাই। এককথায় ছিপে মাছ ধরতে গেলে যেমন মাছের মনের মতো চার চাই, টোপ চাই—সাহেব ধরতেও তেমনই অনেক মাল মশলা চাই। সবচেয়ে বড় কথা সাহেব ধরতে হলে মুখোশ চাই। সে মুখোশে সর্বাবস্থায় একটা কাঁদ কাঁদ নম্র ভাব ফুটে থাকবে। দরকার হলেই চোখ দিয়ে জলের ধারা নামবে।

সাহেব হয়তো রেগে আগুন, তেলে বেগুন। সরকারকে আজ খুনই করে ফেলবেন তিনি। নিরুপায় বাবু চিৎকার করে ওঠেন—মাস্টার ক্যান ডাই, মাস্টার ক্যান লিভ। কথা শুনে সাহেব আরও চটে গেলেন,—কি, মাস্টার ক্যান ডাই? দেখাচ্ছি তোমাকে। প্রাণভয়ে বাবু আর্তনাদ করে উঠলেন—স্টপ দেয়ার। স্টপ দেয়ার। ডাই মি। (কেননা) ইফ মাস্টার ডাই, দেন আই ডাই, মাই কাউ ডাই, মাই ব্ল্যাকস্টোন (শালগ্রাম শিলা) ডাই, মাই ফোরটিন জেনারেশন ডাই। সাহেবের সাধ্য কী, অতঃপর এই সরকারকে বরখাস্ত করেন।

আর এক সাহেব লিখছেন লোকটা শুধুমাত্র হিসাবে হেরফের করে এক্ষুনি আমাদের প্রায় দেড়শো পাউণ্ড ঠকাচ্ছিল। আমি ধরে ফেললাম দেখে কী বলল জান? বলল— ওহো, সাহেব তাহলে ধরে ফেলেছেন? —তুমি স্বীকার করছ তাহলে?—নিশ্চয়ই। আলবৎ স্বীকার করব। একশোবার স্বীকার করব। হুজুর যেখানে বলছেন আমি কি সেখানে অস্বীকার করতে পারি? তবে?—আর তবে, হুজুরের হিসাবই ঠিক হিসাব, ভেরি রাইট হোয়াট মাই মাস্টার সে। মাই ওয়ে ব্যাড ওয়ে, মাস্টারস অ্যাকাউন্ট রাইট। ওই সাহেবও বলাই বাহুল্য এমন বিনয়ী সরকারকে তখুনি বিদায় দিয়ে দিতে পারেননি।

প্রাইস নামে এক সাহেব লিখছেন (১৭৭৭) পৃথিবীর যেসব দেশ সম্পর্কে আমি জানি, সেখানে মানুষের বেশে এমন রক্তচোষা দেখা যায় না। আমি বাংলা মুলুকে সরকার নামক লোকগুলোর কথা বলছি। 'দে আর এডুকেটেড অ্যান্ড ট্রেইনড টু ডিসিভ'। ১৮১০ সালে উইলিয়ামসন সরকার সম্পর্কে লিখছেন—সরকার জিনিয়াস। তার বিদ্যাবুদ্ধির লক্ষ্য একটাই—কী করে টাকা পয়সা আরও দক্ষতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করা যায়। হিসাব গোলমাল করতে তার মতো সেয়ানা আর হয় না। সে ধাঁধা সৃষ্টি করে। অসুবিধা হলে এমনভাবে হিসাব লেখে যে কারও বাপের সাধ্যি নেই তা ধরে। ফেনি পার্কস-এর কথা : একদিন সকালে সরকারকে ডেকে বললাম—দেখ বাছা, বাজার দরের চেয়ে সব জিনিসের দামই তো দেখছি তুমি বেশি করে ধরেছ। কী ব্যাপার? সে মাথা চুলকে বলল ইউ আর মাই ফাদার অ্যান্ড মাদার অ্যান্ড আই অ্যাম ইওর পুত্তর লিটল চাইল্ড। আই হ্যাভ অনলি টেকেন টু আনাস ইন দি রুপি দস্তুরি।

দস্তুরি আর দস্তুরি। একজন সাহেব লিখেছেন—দস্তুরি কলকাতার বাবুদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। সত্যিই তা-ই। সরকার বাবু মেম সাহেবের কাছ থেকেই টাকায় দু'আনা দস্তুরি আদায় করেছেন এমন নয়, যে দোকান থেকে জিনিসগুলো কিনেছেন সেই দোকানিকেও দস্তুরি দিতে হয়েছে। সাহেব কুঠিতে তিনি যাদের কাজ দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রথমে আদায় করেছেন নজরানা, তারপর মাইনের ওপর রয়েছে আবার দস্তুরি—সব মিলিয়ে সাহেব-বাড়ি একটি ইঁট-কাঠ পাথরের অট্টালিকা, নয়তো বলা যেত যেন এক একটি সোনার খনি। সুতরাং সাহেব ধর। সবাই এখানে সাহেব ধরতে চায়। সেজে গুজে প্রত্যেকে তৈয়ার। সুতরাং কেউ কেউ চলে যেতেন আরও ভাটিতে। একেবারে মোহনার দিকে। আজকাল যাঁরা কথায় কথায় পার্টিতে বা পথের বাঁকে কথাচ্ছলে সাহেব ধরেন তাঁরা সেদিনের সাহেব-ধরার ঝক্কি ঝামেলার কথা শুনলে হয়তো হাত পা ছেড়ে বসে পড়বেন। হাঁটতে

হাঁটতে সেই কুলপি। সেখানে হা করে বসে থাক কবে জাহাজের মাস্তুল দেখা যাবে, সেই আশায়। তারপর নৌকো নিয়ে চলো পিছু পিছু। অনেকটা তীর্থের পাণ্ডাদের মতো কাণ্ড কারখানা। কেউ কেউ কয়েক স্টেশন আগেই দুড়দাড় করে ট্রেনে চেপে বসেন, ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলেন, নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করেন, তারপর অন্যদের নাকের সামনে বামালসমেত সগর্বে নেমে বলেন—আসুন বাবু আমার সঙ্গে। সাহেব ধরাও তেমনই তীর্থযাত্রী ধরার মতো। টোপ খাওয়ানো হল হয়তো সাগরদ্বীপের কাছাকাছি কোনও বিন্দুতে, তারপর খেলাতে খেলাতে টেনে তোলা হল কলকাতার ডাঙায়। চতুর্থ দিনে পরিচিত অন্য এক সাহেব নবাগতকে দেখতে এসে বিস্ময়ে হতবাক। সাজানো গোছানো বাড়ি। চারদিকে লোকলস্কর। আস্তাবলে ঘোড়া। দুয়ারে ধাঁধা গাড়ি। কী করে এসব ম্যানেজ করলে? জিজ্ঞাসা করলেন আগন্তুক। গৃহপতির চটপট জবাব—নাথিং সো ইজি আই সে টু মাই সিরকার বাবু, গো পে ফর দ্যাট হর্স টু হানড্রেড রুপিজ, অ্যান্ড ইট ইজ ডান।

এটা সাহেব ধরার অন্যতম কৌশল। তবে অন্য কৌশলও আছে। অনেক কৌশল। তার একটা শিকারিকে দিয়ে শিকার-ধরা। যে একবার সাহেব ধরেছে তাকে ধরে সাহেব ধরা। হুতোমের পদ্মলোচনের কথা মনে আছে? পদ্মলোচন ছিল 'মেকার' লুচি গড়ার কারিগর। তার মাথায় চাপল সেও সাহেব ধরবে। কিন্তু উপায়?

> '...ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গরুড়ের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটাহাঁটি ও হাজ্‌রের পর দু চারখানা সই সুপারিস্‌ও হস্তগত হলো; শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন...পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফল্‌তে আরম্ভ হলো—মুচ্ছুদ্দী অনুগ্রহ করে সিপসরকারী কর্ম্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকি ও কাজের হুঁসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন... ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল করবার চেষ্টায় রইলেন; এক দিন হউসের সদরমেট কর্ম্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দীকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্ম্মে ভর্ত্তি কল্লেন।...ক্রমে মুচ্ছুদ্দীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদ্দী কর্ম্ম ছেড়ে দিলেন, সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দী হলেন।'

বিনা টাকায় সংবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, মুচ্ছুদ্দি বড় কাজ। বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দি হতে পারেন একমাত্র ভাগ্যবানেরাই। অথবা সাহেব-ধরায় যাঁরা খুবই হাত পাকিয়ে ফেলেছেন তাঁরাই। ১৮৩৯ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' খেদ করে লিখছে—আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছুদ্দি পদ প্রাপ্তার্থ আর সি জ্যানকিন কোম্পানিকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি যে এই কর্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত নহে, কেবল দস্তুরি লাভ মাত্র।'...

কেরি সাহেবের কথোপকথনে আছে খানসামাকে ধরে মুনশি হওয়ার খবর। সাহেব খানসামাকে ডেকে বললেন—

> "খানসামা আমি এদেশের কথা কিছুই বুঝিতে পারি না, ইহার কি হবেক। সাহেব একজন মাকুল লোক মুনসি চাকর রাখিতে হবেক।—মুনসি চাকর কোথায় পাওয়া যাবেক।—সাহেব মুনসি এইখানে মিলে আপনি হুকুম করিলে আমি একজন যোগ্য লোক আনিয়া দিতে পারি।...তারপর একদিন তুমি কে হও ও এ টাকা কেন।—সাহেব আমি মুনসি, আমি এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করাই এটাকা নজর, এদেশের দস্তুর এই। তুমি মুনসি তুমি কি লোক। সাহেব আমি এদেশীয় কায়স্থ।...তুমি কোন২ ভাষা জানহ।—সাহেব আমি তিন চারি প্রকার ভিন্ন২ ভাষা জানি।—তবে তো তুমি অনেক জানহ, কিন্তু কি২ জানহ বিশেষিয়া কহ।—সাহেব আমি পারসি ও আরবি ও হেন্দোস্থানি ও বাংগালা এবং ইংরাজীও কতক ২ এই সকল পৃথক ২ ভাষা জানি। তুমি আমার চাকর থাকিয়া শিক্ষা করাইবা আমাকে।"

ব্যাস সাহেব কুঠিতে বহাল হয়ে গেল মুনশি। মাস মাহিনা, কমপক্ষে তিরিশ টাকা। কপাল ভাল তো, বেশিও মিলতে পারে। সাহেব মুনশিকে জিজ্ঞসা করছেন—তোমায় মাহিনা কি হবে। মুনশি জবাব দিলেন—সাহেব আমারদের মাহিনার বরাওর্দ্দ একটা ঠেকনা নাই ত্রিশ টাকা চলন তবে মনিবে মেহেরবানি করিয়া জেয়াদাও দিতেছেন। সাহেব বললেন ভাল তোমার মাহিনা যাহা আমি প্রকৃত বুঝিব তাহা দিব তোমাকে।

শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ 'মহারাজ বাহাদুর' হওয়ার আগে ঠিক এই পদ্ধতিতে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর মুনশি হয়েছিলেন নাকি অন্য কোনও উপায়ে সঠিক বলা শক্ত। একজন সাহেবের মতে ১৭৫০ সালের ৮ অক্টোবর আরও সাতজন তরুণ ইংরেজসহ হেস্টিংস যেদিন কলকাতায় পা দেন নবকৃষ্ণ ঠিক সেদিনই গঙ্গার ঘাটে তাঁকে পাকড়াও করেছিলেন। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, সবাই জানেন তাঁর মতো ভাগ্যবান প্রাইভেট টিউটার অন্তত এ-শহরে আজ অবধি আর কেউ জন্মায়নি। আমরা জানি, একালেও প্রাইভেট টিউটারের সামনেও নানা সম্ভাবনা থাকে। কখনও কখনও কারও ভাগ্য কোনও না কোনও দিকে খুলে যায়। কিন্তু মুনশি নবকৃষ্ণের সঙ্গে সে সব টুকিটাকি প্রাপ্তি যোগের কোনও তুলনাই হয় না। ছ বছরের মধ্যেই দেখি নবকৃষ্ণ হেস্টিংস-এর প্রাইভেট টিউটারের পদ থেকে কোম্পানির প্রাইভেট টিউটারের পদে প্রমোশন পেয়ে গেছেন। ১৭৫৬ সালে তাঁর পরিচয় তিনি কোম্পানির পারশিয়ান ক্লার্ক বা মুনশি। ১৭৫৬-৫৭র সেই যুগান্তকারী দিনগুলোতে নবকৃষ্ণ আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে নেওয়ার পর শহরের ইংরাজরা যখন ফলতায় উদ্বাস্তু নবকৃষ্ণ তখন তাঁদের সহায়। মুনশিগিরি কার্যে নবকৃষ্ণ এতাদৃষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন যে, মুনশি দপ্তরের কার্য ব্যতীত ক্লাইভ সাহেব তাঁকে মধ্যে মধ্যে দুরূহ দৌত্য কার্যেরও ভার প্রদান করতেন। ১৭৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি কলকাতা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার সংকল্প নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন হালসীবাগানে উমিচাঁদের উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন তখন উপঢৌকন সহ মুনশি নবকৃষ্ণ সন্ধি প্রার্থনায় তাঁর নিকট দূতের স্বরূপ প্রেরিত হন। সুচতুর নবকৃষ্ণ ফিরে এসে নিজের প্রভুকে নবাবের শিবিরের এবং সেনানীর যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন, তাতেই সাহসী হয়ে ক্লাইভ পরদিন প্রত্যুষে (যখন দিঙমণ্ডল নিবিড় কুজ্ঝটিকায় আবৃত ছিল) শত্রুকে আক্রমণ করেন। পলাশির উদ্যোগ এবং শান্তিপর্বেও দেখি নবকৃষ্ণ প্রভুদের এবং সেই সঙ্গে নিজের আখের গোছাবার কাজে অতিশয় তৎপর। ১৭৬৭ সালে অতএব তিনি মুনশি মাত্র নন, কোম্পানির বেনিয়ান। দেশীয় নবাব বাদশাদের সঙ্গে কোম্পানির হয়ে কথাবার্তা বলার দায়-দায়িত্ব তাঁর। তাছাড়া, আরও নানা কর্তব্য শোভাবাজারের মহারাজা বাহাদুরের। তাঁর জীবনীকার (বিপিনবিহারী মিত্র) লিখছেন—"নবকৃষ্ণের উপর মুনশি দপ্তর ব্যতীত, আরজবেগী দপ্তর, জাতিমালা কাছারি, ধনাগার, ২৪ পরগণার মাল আদালত এবং তহশীল দপ্তরের ভার ছিল। তিনি নিজালয়ে বসিয়া এই সকল কার্য করিতেন এবং সৈনিক পুরুষরা তাঁহার দ্বার রক্ষা করিত।" মনে রাখা দরকার নবকৃষ্ণ নামক আশ্চর্য প্রতিভা তখনও পূর্ণ বিকশিত নয়, সবে তিনি পাপড়ি মেলতে শুরু করেছেন।

তেমন করে সাহেব ধরতে পারলে কত দূর এগোন সম্ভব তা দেখিয়েছেন মুনশি নবকৃষ্ণ। এবং আরও কেউ কেউ তাঁদের কথা পরে তার আগে সাহেব ধরায় আর একটু কৌশল রপ্ত করে নেওয়া ভাল। সেটি হাতি দিয়ে হাতি ধরার মতো সাহেব দিয়ে সাহেব ধরা। এক সাহেববাবু সেবা-যত্নে খুশি হলেন তো তিনি ফসফস করে লিখে দিলেন ক্যারেকটার সার্টিফিকেট আর টেসটিমনিয়াল। তখনকার সাহেবিহাটে তার মূল্য আজকের পাসপোর্ট ভিসার সামিল। বেহারা বরকন্দাজরা অনেক সময় একজন আর একজনের কাছ থেকে ক্যারেকটার ধার করত। খুব সেয়ানা সাহেব হলে অবশ্য কখনও

কখনও সন্দেহ করতেন, কত আর বয়স, এর মধ্যে এত ক্যারেকটার! কোনও বাড়িতে বুঝি বেশিদিন টিঁকে থাকার ক্ষমতা নেই? কেউ কেউ অন্য কারণেও ভ্রূ কুঁচকাতেন,—টেসটিমনিয়াল এত পুরানো কেন? এতই যদি কাজের লোক, তবে এতদিন কাজ জোটেনি কেন? নানা রকম প্রশ্ন। নিঃশব্দে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। বাবুদের ক্ষেত্রে এসব ঝামেলা নেই। কারণ সরকার কিংবা মুচ্ছুদ্দির পকেটে শুধু ক্যারেকটারই থাকে না, রাশি রাশি টাকাও থাকে। সুতরাং কোনও সাহেবই তাঁকে পত্রপাঠ বিদায় করে দেওয়ার সাহস পান না। তাছাড়া অনেকেই কানাঘুসায় শুনেছেন ওদের জোট আছে। শেষে হয়তো কেউ মোটে তাঁর কাছে ঘেঁষতেই চাইবেন না। সাহেবরা অতএব অন্য সাহেবদের প্রশংসাপত্রগুলো একবার হাতে নিলে চট করে ফিরিয়ে দিতেন না।

নবকৃষ্ণের কথাই ধরা যাক। ক্লাইভ, হেস্টিংস-এর পরেও তাঁর কিন্তু মনিবের অভাব হয়নি। তাঁদের কাজ তিনি নিলেন কি নিলেন না সে অন্য কথা। রবার্ট চেম্বারস্ যখন সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে কলকাতায় আসছেন তখন হঠাৎ বিলাত থেকে একখানা অনুরোধপত্র পেলেন নবকৃষ্ণ। পরিচিত কোনও বিশিষ্ট সাহেব লিখছেন—চেম্বারস সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন কলকাতায় থাকা কালে তিনি ফার্সি এবং বাংলা শিখতে চান। স্বভাবতই তোমার কথা মনে পড়ে গেল। বললামও। তুমি ক্লাইভের ফার্সি চিঠিপত্রের দায়িত্ব নিয়েছিলে, ভেরেলস্ট-এর সময়ও অনেকখানিই করেছ তুমি, তাছাড়া তুমি কোম্পানির বেনিয়ান, তোমার মতো যোগ্য লোক আর কে আছে? চিঠির শেষ দিকে একটি লোভনীয় ইশারা,—তোমাকে কাজটি নিতে বলছি কারণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এবং বন্ধুত্ব তোমারও কাজে লাগতে পারে।

'নববাবু বিলাস'-এ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "...ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্ম্মকার চর্ম্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমণীসংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন...।

ভবানীচরণ কিন্তু ধনী হওয়ার পন্থা হিসাবে সাহেব-ধরা নামক কৌশলটি উল্লেখ করতে বিলকুল ভুলে গেলেন। বিশেষত সাহেব যোগে সাহেব ধরা। অথচ তাঁর নিজের জীবনেই রয়েছে সাহেব দিয়ে সাহেবধরার বিচিত্র কাহিনী। কাহিনীটি শোনার মতো।

> "বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত ডকেট কোম্পানির কার্য্যালয়ে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যে স্বীয় পরিশ্রমে কার্য্য ও পারদর্শিতা ও কৃতজ্ঞতা গুণদ্বারা সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করত সদর মেটের কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাহার এক বৎসর অন্তর ওই হোসের মুৎসদ্দি হইলেন, এইরূপে কিয়ৎকালযাপন পরে শুভকালের উদয়ে তাঁহার হৃদয়ে দিগদর্শনের প্রবৃত্তি উদয় পাইল...তিনি পিত্রাদির প্রবোধনায়ার্থ প্রচুরার্থ উপার্জনের প্রয়োজনে জানাইয়া ১২২১ সালে স্যার উইলিয়ম ক্যার সাহেবের সহিত পশ্চিমপ্রদেশে যাত্রা করিলেন...অনন্তর স্যার উইলিয়ম ক্যার সাহেব মিরাট হইতে পশ্চিমপ্রদেশে যাত্রা হইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের জেনারেলী পদাভিষিক্ত হইলে উক্ত মহাত্মা তাঁহার নিজের মুৎসুদ্দি হন, কিয়ৎকালান্তরে তাঁহার বিলাত গমন প্রযুক্ত কৌন্সেলী কেম্পটন সাহেবের বাটিতে কার্যাভিষিক্ত হইলেন, কলকাতায়ে ওই সাহেব বোম্বাই গমন করিলে তিনি স্যার চারলস ডাইলি সাহেবের নিকট কিলকাতা পারমিটের দারোগাগিরি কর্মে নিযুক্ত হইয়া কার্যদ্বারা সরকার বাহাদুরের অনেক অনেক লাভের সোপান দর্শন করাইলে সাহেব

তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রধান কলকিউলেটারের কর্মে নিযুক্ত করিলেন।...

অথচ এই ভবানীচরণই ধর্মসভা করেন, সতীর বিরুদ্ধে আর্জি মুশাবিদা করেন, শাণিত কলমে বাবুদের অস্থির ক'রে তোলেন, বই ছাপেন তুলট কাগজে গঙ্গাজলে কালি গুলে।

এসব সাধন মার্গের কথা। সাহেব ধরতে সেখানে অনেক সাধ্য সাধনা করতে হয়। সাধন, ভজন—অনেক কৃত্য। আর একরকম ছিল ঠাঁয় বসে থেকে একদম হুটপাট না করে নিঃশব্দে সাহেবধরা। সেভাবে সাহেব ধরতে পারতেন অবশ্য খুব অল্প জনই। তাঁরা জন্মসিদ্ধ। সাহেব তাঁদের কাছে নিজে এসে ধরা দেন। যেমন নকুল ধর ওরফে লক্ষ্মীকান্ত ধর।

"নকু ধর বিখ্যাত ধনী তিনি এতদ্দেশে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রভুত্ব স্থাপনের মূলীভূত ছিলেন, প্রথম সময়ে ইংরাজরা যখন দীনভাবে বণিকবৃত্তি করিতে আইসেন তখন এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগের কথা বুঝিতে পারিতেন না, সে সময়ে গঙ্গার মধ্যে ইংরাজদিগের একখানি নৌকা ডুবিয়া যায়, সে নৌকাতে লোক এবং দ্রব্যাদি যত ছিল সমস্ত ডুবিয়া গেল কেবল এক মহাবল একজন গোরা খালাসি ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গার পূর্বকূলে বসিয়া জপ করিতেছিলেন, মৃতপ্রায় গোরাকে ভৃত্যদিগের দ্বারা উপরে উঠাইয়া বস্ত্র দিলেন এবং আপন বাটীতে আনিয়া চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইলেন, তাহাতেই ওই গোরা বহুদিন নকু ধরের বাটিতে থাকে এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে নকু ধর ইংরেজি ভাষার কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, সেই ইংরাজিতে ইংরাজরা নকু ধরকে দোভাষী করিলেন...।"

তারপর দেখতে দেখতে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। পোস্তায় প্রতিষ্ঠিত হল রাজবংশ। বিখ্যাত রাজা সুখময় এই বংশেরই সন্তান।

এভাবেই নিজের অজান্তে আচমকা সাহেব ধরে ফেলেছিলেন রতু সরকার। পেশায় তিনি ছিলেন রজক। ১৬৭৯ সালের কথা। ব্রিটিশ জাহাজ এসে পৌঁছেছে আজকের গার্ডেনরিচ-এ। শেঠ বসাকরা ছুটোছুটি করছেন সাহেবদের অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু সাহেবরা তাঁদের কথা মোটে বুঝতে পারছেন না। তাঁরাও বুঝতে পারছেন না সাহেবদের কথা। ক্যাপ্টেন স্ট্যাফোর্ড বললেন—একজন দোভাষী সংগ্রহ করতে। মাদ্রাজ এলাকায় তখন দোভাষের চল ছিল। দোভাষ, দোভাষ শুনে শেঠ বসাকরা ভাবলেন সাহেবদের বুঝিবা একজন ধোপা চাই। তারা বুঝিয়ে সুঝিয়ে রতুকে পাঠিয়ে দিলেন। রতন বেশ চালাকচতুর ছিল। সে ভাবে ভঙ্গীতে কোনও মতে কাজ চালিয়ে দিতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সত্যি সে দোভাষী হয়ে গেল। আবার আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। আজ রতন সরকারের নামে বড়বাজার এলাকায় চার চারটে রাস্তা। একটা রাস্তার নাম বলছে তাঁর শুধু বাড়ি নয়, বাগানবাড়িও ছিল। সম্প্রতি একজন গবেষক প্রদীপ সিংহ—'ক্যালকাটা ইন আরবান হিস্টরি' পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে সেকালের কিছু ধনী বাঙালির বিষয় আশয়ের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। হিসাবটা ১৭৮৪ সালের। রতনের সম্পত্তির তালিকায় আছে:

পিতল এবং রূপার বাসনপত্র, লোহা ৪৩ মন, তামা ২৫ সের...নগদ টাকা, সোনা রূপা, (অঙ্ক অস্পষ্ট), কাপড় ৫১ টি শান্তিপুরী নয়নসুখ, ৬৫ টি হরিপালের নয়নসুখ, ১৪২ খণ্ড কুসেনদিঘা, ৪৮ খণ্ড রুমাল (সাদা, বর্ডার দেওয়া)...৩টি ঘোড়া, ৮টা বলদ, ৩টি বড় নৌকো, ১টি ডিঙ্গি, ৩টি পালকি। তারপর ঘরবাড়ি ঃ বড়বাজারে সামুম বাগান নামে একটি বাগান, বড়বাজারে রউস বাগান নামে একটি বাগান, সুতানুটিতে শোভানগর নামে একটি বাগান, বড়বাজারে বসতবাড়ি, বাড়ি সংলগ্ন গোয়াল, আস্তাবল, বাড়ি সংলগ্ন বড়বাজারে দামোদর বসাকের বাড়ি নামে একটি বাড়ি, বড়বাজারে দাসু

দোভাষীর বাড়ি নামে একটি বাড়ি, বড়বাজারে আরও দুটি বাড়ি (নাম অস্পষ্ট), পারগুন দোভাষীর বাড়ি নামে আর একটি বাড়ি, বড়বাজারে কৃষ্ণ ঘটকের বাড়ি, বড়বাজারে ব্রিজো দোভাষীর নামে একটি বাড়ি, সুতানুটিতে গুদাম ঘর, মি. ডানডাস বাস করেন যে ইঁটের একতলা বাড়ি, ওই বাড়ির সংলগ্ন কয়েকটি দোকান ঘর, একটি দোতলা বাড়ি যেখানে মি. সেল বাস করেন, আর একটিতে বাস করেন আওসি (?), অন্য আর একটিতে ক্যাপ্টেন ক্যাম্বেল। আর একটিতে আছেন ক্যাপ্টেন...(অস্পষ্ট), বড়বাজারে আরও একটি বাড়ি এবং দোকান, অন্য একজন যে বাড়িতে বাস করেন তার সংলগ্ন আরও দুটি দোকান ঘর। এছাড়া নানা জনের কাছে রতন সরকারের প্রাপ্য—৯৮৫৬৩ টা ৪ আনা ৩ পাই। আদায় হওয়ার সম্ভাবনা কম এমন পাওনা—৬৫২১৪ টা ৩ আনা ৬ পাই।...

রতন সরকারের খাতা এখানেই বন্ধ করছি। লক্ষণীয় কাপ্তান-ধরা বাঙালি রতু সরকারের ভাড়াটিয়াদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ক্যাপ্টেন রয়েছেন। তাছাড়া আদি দোভাষীদের অন্যতম রতন সরকারের বাড়িতে আস্তানা পেতেছেন কম পক্ষে আরও তিনজন দোভাষী। তারা কি রতনের মাইনে করা? তারাই কি গঙ্গার ঘাট থেকে ভাষার জাদুতে ভুলিয়ে কাপ্তানদের ধরে এনেছে মনিবের বাড়িতে? নাকি মহাজন যেন গতাঃ। বাড়ি-ওয়ালার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারাও কি মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াত সাহেব ধরার আশায়?

এবার যাদের কাছে সাহেবরা এসে সুড় সুড় করে নিজেরাই ধরা দিত সেই বেনিয়ান আর দেওয়ানদের কথা। ভিনদেশী ভাগ্যান্বেষী সওদাগরদের স্বভাবতই অনেক ব্যাপারেই স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতা চাইতে হত। কেউ কেউ সেই আদ্যিকালেই সরাসরি কোম্পানির কর্মচারী হয়ে যেত। যেমন—কালা জমিদার নন্দরাম, জগৎ দাস, রাম ভদ্র, গোবিন্দরাম মিত্র এঁরা সব কলকাতার সাদা জমিদারদের মাইনে করা সহকারি। অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় সাহেবরা ব্ল্যাক টাউন বা আমাদের কৃষ্ণনগর শাসন করতেন এঁদের হাত দিয়ে। এঁদের মধ্যে কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্র স্বনামধন্য। হলওয়েল-এর আমলে গোবিন্দরাম তাঁর কালা-ডেপুটি। বনমালী সরকারের বাড়ি বা উমিচাঁদের দাড়ির মতো তাঁর ছড়ি—তখন কলকাতায় প্রবাদ। চিৎপুরের বিখ্যাত নবরত্ন মন্দির তাঁর কীর্তি। সে মন্দির নাকি ছিল অক্টরলনি মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু। ঘটা করে শহরে দুর্গোৎসব করতেন তিনি। গোবিন্দরাম কেমন করে এত টাকা করেছিলেন সে-রহস্য ভেদের চেষ্টা করে লাভ নেই। তিনি চুনের কারবারী ছিলেন, অনেকের অনুমান নুনেও হাত খেলিয়েছিলেন। তবে বলাই বাহুল্য, সব কিছুর মূলে ছিল সাহেব সংসর্গ। গোবিন্দরাম প্রথম কবে ধরেন তা নিয়ে মতান্তর আছে। বলা হয় তিনি জোব চার্নকের আমলের সাহেব-ধরা। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। তবে এটা ঠিক অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কলকাতার অন্যতম জাঁদরেল সাহেব-ধরা। সাহেবদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য কত কাণ্ডই না করেছেন তিনি। কলকাতা যখন আলিনগর, শহরের সাহেব বিবিরা যখন ফলতার উদ্বাস্তু শিবিরে, তখন মানিকচাঁদের সৈন্যসামন্তের গোপন খবরাখবর তিনিই পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁদের। পলাশির পরে ব্ল্যাক টাউনের বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিপূরণ আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন এই গোবিন্দরামই। নিজের খাতে আর ছেলের নামে তাঁর দাবি ছিল ৪ লক্ষ ১২ হাজার ২৮০ টাকা ৫ আনা। কোম্পানির কর্তারা ৩৭ হাজার ২৮০ টাকা ৫ আনার দাবি খারিজ করে দেন, ফলে হাতে আসে নগদ ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। তাছাড়া নিজের আশ্রিতদের নামেও বেশ কয়েক হাজার টাকা আদায় করেছিলেন তিনি। তাদের মধ্যে ছিল তাঁর তিন রক্ষিতা—রতন, ললিতা আর হরতনবিবি।

কোম্পানির অন্য কর্মচারীদের মধ্যে একদল ছিল ভকিল। তাঁরা এখানে ওখানে দেশীয় নবাব

বাদশা ফৌজদারের কাজে কোম্পানির হয়ে ওকালতি করতেন, চিঠি-পত্র উপঢৌকন নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেন। তাছাড়া ছিল দালাল, পাইকার ইত্যাদি। দালালরা সাধারণত বেতন পেতেন না। পেলেও নাম মাত্র। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতায় কোম্পানির বিখ্যাত দালাল জনার্দন শেঠের মাইনে ছিল মাত্র তিন টাকা। এই সব দেশীয় মধ্যস্থদের নিয়েই সেদিন কোম্পানির ফলাও কারবার। এঁরা সাহেব খুঁজে বেড়াতেন, সাহেবরা আবার খুঁজে বেড়াতেন এঁদের। ব্যবসায়ীরা দালালদের কাছে মালের অর্ডার দিতেন, সেই সঙ্গে আগাম। দালালরা আবার নিয়োগ করতেন পাইকারদের। পাইকাররা বন্দোবস্ত করতেন তাঁতীদের সঙ্গে । কখনও কখনও কোম্পানি সরাসরি মাল কিনত। সে-কাজে নিয়োগ করা হত এক শ্রেণীর মাইনে করা কর্মচারী। তাদের বলা হত গোমস্তা। পদ্ধতি যাই হোক না কেন, টাকা চাই। ব্যবসায়ীদের হাত দিয়ে মাল কিনলে যেমন দাদন দিতে হয়, তেমনই গোমস্তা দিয়ে কারবার করতে গেলেও আগাম দেওয়ার প্রশ্ন আছে। ১৭২২ সাল পর্যন্ত কেতা ছিল কোম্পানি দাদন দেবে শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা, তারপর অবশ্য বন্দোবস্ত হয় টাকায় আট আনা বা শতকরা ৫০ ভাগ। তাও অনেক টাকা। তাছাড়া, আমদানি করা জিনিসপত্র যা এদেশের বাজারে ছাড়া হয় তার টাকাও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না, সময় লাগে। সুতরাং, মূলধন সেদিন বিদেশি সওদাগরদের কাছে বৃহৎ প্রশ্ন চিহ্ন।

যাঁরা কোম্পানির আওতার বাইরে থেকে বেআইনিভাবে স্বাধীন ব্যবসা করতেন তাঁরা কখনও কখনও দেশ থেকে টাকা নিয়ে আসতেন। টাকা মানে যৎ সামান্য সোনা রূপা। কেউ কেউ অবশ্য স্থানীয় সাহেবদের থেকে ধার করতেন, ধার মিটিয়ে দেওয়া হত দেশে। কিন্তু এভাবে খুব বেশি টাকার জোগাড় সম্ভব নয়। পি জে মার্শাল লিখেছেন (ইস্ট ইন্ডিয়ান ফরচুনস) অষ্টাদশ শতকে দশ হাজার পাউন্ড পকেটে নিয়ে এদেশে ব্যবসা করতে এসেছেন এমন ব্রিটিশ সওদাগর কমই ছিলেন। অধিকাংশেরই মূলধন ছিল বড়জোর হাজার পাউন্ড। হাজার পাউন্ড পকেটে গুঁজে দিয়ে ছেলেকে জাহাজে তুলে দিয়ে বাবা মা স্বপ্ন দেখতেন লক্ষ লক্ষ পাউন্ড নিয়ে একদিন ঘরে ফিরবে সে। সে-স্বপ্ন ছেলের চোখেও। কিন্তু মূলধন কোথায়?

বাধ্য হয়েই তাঁরা গুটি গুটি এগিয়ে আসতেন ভারতীয় শ্রেষ্ঠীদের দিকে। একমাত্র মুশকিল আসান ওঁরাই। ফলে, ঘরে বসে অবলীলায় সাহেব ধরতেন তাঁরা। জগৎ শেঠদের কথা বাদই দিচ্ছি। তাঁরা যথার্থই জগতের শেঠ,—ব্যাঙ্কার। নবাব বাদশা থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ফরাসি ডাচ—বিদেশী বণিকদের প্রায় সবাইকে হাত পাততে হয়েছে তাঁদের কাছে। নবাবী টাঁকশাল তখন তাঁদের হেফাজতে। টাকা ধার করেছেন নবাবরা নিজেরাও। তারপর বেনারসের মনোহর দাস, গোপাল দাস। তারপর ধাপে ধাপে নীচের দিকে আরও মহাজন। তাঁরা যাকে বলে দাদনী মহাজন। নিঃশব্দে সাহেবরা এসে ধরা দেন তাঁদের কাছেও। সুদের হার অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে যদি শতকরা নয় টাকা, তবে শেষ দিকে শতকরা ১২ থেকে ১৮ টাকা। তিলকে তাল করা সেদিন অতএব নিছক গুজব মাত্র নয়।

কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বার বার চেষ্টা করেছেন দেশীয় মহাজনদের কাছে সাহেবদের দৌড়াদৌড়ি বন্ধ করতে। বার বার জারি হয়েছে ফতোয়া। কেননা, বিদেশির কাছে টাকা মার গেলে দেশি মহাজনেরা কোম্পানিকেই দায়ী করেন। বাজে সায়েব ধার করে নয় ছয় করেন, কাজের সাহেব সময়ে ধার পান না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? গবেষকরা জানাচ্ছেন ১৭৫৮ সাল থেকে কলকাতার মেয়রস কোর্ট-এ মৃত বাঙালি ধনীদের বিষয় আশয়ের যে সব তালিকা রয়েছে তার ওপর চোখ বুলালে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি ইংরাজ বাঙালির হাতে তামাক খেয়েছেন। এমনকী কোম্পানির বড় কর্তারা পর্যন্ত। মার্শাল তার কিছু নমুনাও শুনিয়েছেন। বেঙ্গল কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফ্রান্সিস

হেয়ার দেহরক্ষা করেন ১৭৭১ সালে। বাজারে তাঁর ধার ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। অধিকাংশ মহাজন কলকাতার বাঙালি। স্যামুয়েল মিডলটন নামে আর এক সাহেব মারা যান ১৭৭৫ সালে। তাঁর ধার ছিল—১৫ লক্ষ টাকা। বারো জন টাকা পেতেন তাঁর কাছে, তাঁদের মধ্যে নয়জন ভারতীয়।

এবার তাকিয়ে দেখা যাক ভারতীয়দের কাগজপত্রের দিকে। রতু সরকারের কথা আগে বলা হয়েছে। তিনি টাকা পেতেন দশ জন ইংরাজের কাছে। মাত্র দু'জনের কাছে ১০ হাজার টাকার বেশি। ১৭৮২ সালে প্রভুরাম মল্লিক সাহেবদের কাছে পেতেন ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। মার্শাল লিখছেন—১৭৬০ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে কলকাতায় এমন সাহেব খুঁজে পাওয়া ভার যিনি স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে কিছু না কিছু টাকা ধার করেছেন। হুজরিমল, নবকৃষ্ণ, গোকুল ঘোষাল, কান্তবাবু—এঁদের কাগজপত্রে সাহেবদের নামের ছড়াছড়ি। রাইটার থেকে গভর্নর কে না ধারেন ওঁদের কাছে? গোকুল ঘোষালের মৃত্যুর চার বছর পরেও দেখা যাচ্ছে তাঁর খাতকদের মধ্যে ৪৮ জন ইউরোপিয়ান।

দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে আসার পরও এঁদের সঙ্গে স্বভাবতই মাথা উঁচু করে কথা বলা যায় না। এঁরা সাহেবদের চেয়ে উঁচু না হোন, সমান সমান তো নিশ্চয়ই। কেউ কেউ সাহেবদের ব্যবসায়ের অংশীদারও বটে। একদল যদি মাস্টার, অন্যদল তবে বেনিয়ান। নয়তো দেওয়ান।

বেনিয়ান শব্দটির আদি নাকি বানিয়া। তবে গুজরাটের বানিয়াদের সঙ্গে বাংলায় বেনিয়ানদের কিছু ফারাক আছে। সেখানে বানিয়া পরিচয় কুলগত। এখানে জাতিপাতির বালাই নেই। যে কেউ ইচ্ছা করলে এবং সাহেব ধরার ক্ষমতা থাকলে বেনিয়ান হতে পারেন। বেনিয়ান সরকারেরই রকমফের। তবে এককাঠি দু'কাঠি ওপরে এই যা। কলকাতায় তাঁরা ছিলেন সাহেব-কুঠির দালাল, কিংবা সাহেবদের ব্যক্তিগত ম্যানেজার। তাঁর তরফে ব্যবসা পরিচালনা থেকে শুরু করে গৃহস্থালির বন্দোবস্ত তদারকি—বেনিয়ান সবই করতে পারেন। সরকারের মতো বেনিয়ানও অনেক সাহেবের চোখে ত্রাস। কিন্তু তাঁদের এড়িয়ে চলা দায়। তবু বেনিয়ান অপরিহার্য, অপ্রতিরোধ্য। কারণ তাঁর 'বেনিয়ানের' পকেটে রয়েছে টাকা, এবং মাথায় রয়েছে সাহেবের ব্যবসায়ের পক্ষে অতি জরুরি নো-হাউ।

১৭৬১ সালে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করছেন : কোম্পানির কোনও কর্মচারী যেন বেনিয়ান বা কৃষ্ণকায় ওই মানুষগুলোকে নিয়োগ না করে। এটা আমাদের প্রত্যাশা এবং নির্দেশ। করলে এই আচরণের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। ১৭৬৪ সালের হুকুম—কমান্ডার-ইন-চিফ ছাড়া কোম্পানির কোনও অফিসার বেনিয়ান, মুনশি, ভাষাবিদ, কিংবা কলমচি রাখতে পারবেন না। ১৭৮০ সালে হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' ব্যঙ্গ করে লিখছে—শহরের জুতো কারিগররা সুপ্রিম কাউন্সিলে দরবার করবে বলে ঠিক করেছে। কারণ কেউ আর জুতো পরে না। বিশেষত, বেনিয়ান আর সরকাররা। তাদের মধ্যে এমন মানুষ খুব কমই দেখা যায় যার চ্যারিয়ট, ফিটন, বগী বা পালকি নেই। কারও কারও চারটেই আছে। বিস্ময় বিস্ফারিত পার্লামেন্ট সদস্যদের চমকে দিয়ে বার্ক ঘোষণা করলেন—হেস্টিংস-এর বেনিয়ান একটি নিলামের পরে সানন্দে আবিষ্কার করলেন তিনি এমন জমিদারির মালিক যার বার্ষিক আয় ১লক্ষ ৪০ হাজার পাউন্ড। ১৭৮৬-র খবর কলকাতার অনেক বেনিয়ান তাদের ভৃত্যদের কোম্পানির সিপাই এবং লস্করদের পোশাকে সাজাচ্ছে। তারপরও ১৭৮৮ সালে বলা হচ্ছে—বেনিয়ান ছাড়া চলে না। বেনিয়ান সাহেবের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাদির তদারকি করেন। বাংলায় প্রত্যেক ইউরোপিয়ানের একজন বেনিয়ান আছেন। তিনি হয় নিজেই বেনিয়ান, না হয় অন্য কোনও বড় নেটিভ ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি বেনিয়ান। ১৮১৭ সালে সাহেবরা নিজেরাই কবুল করলেন—বেনিয়ান ছাড়া কাজ চালানো অসম্ভব। মিল লিখেছেন—বেনিয়ান ইউরোপিয়ানের প্রথম

এবং প্রধান কর্মকর্তা। সরকারী বেনিয়ান না থাকলে যে কোনও সাহেবের চোখের সামনে দুনিয়া বুঝিবা অন্ধকার। এমনকী কলেজের ছাত্রদেরও পাকড়াও করতেন ওঁরা। কলেজ মানে ওয়েলেসলির সেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ভাল করে শিকড় গাড়তে না গাড়তে সে কলেজ তুলে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তার এক কারণ ছাত্রদের মধ্যে ধার করার বর্ধমান প্রবণতা। অভিযোগ—তারা দেশীয় বেনিয়ান-সরকারদের কাছ থেকে যদৃচ্ছ টাকা ধার করছে আর ওড়াচ্ছে। কত সাহেবকে যে উড়তে শিখিয়েছেন বাঙালি বেনিয়ান-সরকাররা তার লেখাজোখা নেই।

তারপর দেওয়ান। সুরেন্দ্রনাথ সেন সংগৃহীত সেকালের সম্ভ্রান্ত পরিবারের তালিকাটি অনেকেই হয়তো দেখেছেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এটি রচনা করেছিলেন ১৮৩৯ সালে। এই তালিকায় যে প্রধান তেইশটি বাঙালি পরিবারের কথা আছে তাঁদের প্রত্যেকটিরই লক্ষ্মী লাভ সাহেব সংসর্গে। প্রায় প্রতিটি বংশেরই আদি পুরুষ সাহেবদের দেওয়ান। তখন পল্লীতে পল্লীতে যত সম্পন্ন বাঙালি গৃহস্থ তাঁরাও কিন্তু সাহেব ধরেই বড়মানুষ। লর্ড ক্লাইভ সাহেবের দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ তেঁই নবাব সেরাজদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে উদ্যোগী সুবাজাতের বন্দোবস্তর কর্ত্তা। গবরনর বেন্সীডর সাহেবের দেওয়ান রামচরণ রায়। গবরনর বেরল্স সাহেবের দেওয়ান কান্তুবাবু রায়রায়া রাজা গুরুদাস পরে মহারাজ রাজবল্লভ এবং খালিসার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।...

দেওয়ানি ইতিবৃত্ত এখানেই ফুরিয়ে যায়নি। ঠাকুররা আদিতে ছিলেন গোবিন্দপুরের জেলেদের পুরোহিত। তারপর কাপ্তেন ধরে জাহাজে এবং কেল্লায় মাল সরবরাহকারী। পলাশির পরে কেল্লার ঠিকাদারি। জয়রাম ঠাকুর ছিলেন ঠিকাদার। তাঁর চার ছেলে। বড় ছেলে আনন্দরাম ইংরেজি শেখেন। ছোট ছেলে গোবিন্দরাম। কনট্রাকটার। মাঝখানে আর দুই ছেলের একজন দর্পনারায়ণ ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান। পরে কাউন্সিলের সদস্য হুইলার সাহেবের দেওয়ান। জয়রামের আর এক ছেলে নীলমণি চট্টগ্রামে সেরেস্তাদার। এই বংশেরই সন্তান অদ্ভুতকর্মী দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৭৯৪—১৮৪৬) তিনি কোম্পানির কমার্শিয়াল এজেন্ট, ২৪ পরগণায় কালেকটার, নিমক এজেন্টের সেরেস্তাদার, নিমক মহলের দেওয়ান। এক সময় তিনি কাস্টমস, সল্ট, ওপিয়াম বোর্ডেরও দেওয়ানি করেন। ধনকুবের রামদুলাল দের ধনের আর এক উৎস ছিল ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ানি। জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ শান্তিরাম সিংহ ছিলেন পাটনার চিফ মি. মিডলটন ও সার টমাস রামবোল্ড সাহেবের দেওয়ান। মতিলাল শীলের অন্যান্য পরিচয়ের মধ্যে আর এক পরিচয় তিনি স্মিথসন এবং অন্যান্য প্রায় সাত আটজন ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীর বেনিয়ান ছিলেন। শ্যামবাজারের বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু। গঙ্গানারায়ণ সরকার পামার কোম্পানির খাজাঞ্চি। রাধামাধব ব্যানার্জির পরিবার সম্পর্কেও বলা হয়েছে পটুয়ার আফিমের এজেন্সির দেওয়ানি চাকুরিতে এই পরিবারের সমৃদ্ধি লাভ হয়। তাই বলছিলাম সাহেব তখন পরশ পাথর, তাকে ধরতে পারলে যা ছোঁবে তাই সোনা। অন্যদিকে সাহেবদেরও একই ধ্যান—বেনিয়ান ধর, দেওয়ান কর। ওদের হাতেই চাবিকাঠি, ওরাই জানে কোন গাছেতে ফলে হিরে মাণিক।

প্রসঙ্গত, সাহেব ধরে কিছু বাঙালির সেদিন কেমন লক্ষ্মীলাভ হয়েছিল সে-সম্পর্কে কিছু খবর। এসব খবর প্রদীপ সিংহ প্রধানত সংগ্রহ করেছিলেন হাইকোর্টের মহাফেজখানা ঘাটাঘাটি করে (দ্রষ্টব্য, "ক্যালকাটা ইন আরবান হিস্ট্রি", কলকাতা, ১৯৭৮)

প্রথমে ধরা যাক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদি সহযোগীদের অন্যতম শোভারাম বসাকের কথা। (মৃত্যু ১৭৮০)। তাঁর সম্পত্তির তালিকায় ছিল প্রধানত বড়বাজার অঞ্চলে ৩৭ টি বাড়ি, কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ৩টি বাগান ও পুকুর। মৃত্যুকালে তাঁর গুদামে মজুত ছিল রপ্তানিযোগ্য নানা ধরনের

বিপুল পরিমাণ কাপড়, ৫ মণ রকমারি মশলা, ১৮ মণ আফিং, এবং পরিমাণ মতো চন্দনকাঠ, তামা, সিসা, লবঙ্গ, ফিটকারি, ইত্যাদি। সিন্দুকে ছিল ৮৯১ টি মুক্তা (৬১টি বড়), ৪১৩ টি হিরা, ৩৫ টি পদ্মরাগ মণি। তাছাড়া অনেক মোহর, সোনার ছড়া ইত্যাদি। সাহেব উত্তমর্ণদের কাছে তখন প্রাপ্য ছিল তাঁর ৫ লক্ষ ২৭ হাজার ১১২ টাকা, আর দেশীয়দের কাছে, আরও ৫৩ হাজার ৮৩ টাকা। সুয়েজ, বোম্বাই এবং বসরার বণিকদের কাছে পাওনা ছিল ৭৫ হাজার ৭৫১ টাকা। বলা হচ্ছে শোভারাম বসাকের সমুদয় সম্পত্তির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়, কারণ সমুদয় সম্পত্তি এবং সঞ্চিত ধনদৌলতের হিসাব জানা যায় না। তবে এটা জানা গেছে মালদা, কাশিমবাজার, হরিয়াল, ক্ষীরপাই ও ঘাটালে শোভারাম বসাকের নিজস্ব আড়ং ছিল।

রামদুলাল দে তো বলতে গেলে প্রবাদ পুরুষ। কী করে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক কালক্রমে ধন-কুবেরে পরিণত হন, আজ তা কল্পকাহিনী বলে মনে হয়। অথচ ঘটনা এই, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যের বলতে গেলে প্রথম উদ্যোক্তা রামদুলালের নামে। একটি জাহাজ পর্যন্ত দরিয়ায় ভেসেছিল একদিন। তাঁর নিজের বেশ কয়েকটি বাণিজ্যতরী ছিল। আমেরিকার সওদাগরেরা তাঁকে এমনকী জর্জ ওয়াশিংটনের একটি পূর্ণাবয়ব তৈল চিত্র পর্যন্ত উপহার দিয়েছিলেন। বোস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, সালেম প্রভৃতি আমেরিকান বন্দরের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে জড়িত ছিলেন। আরও কিছু কিছু বিদেশি কোম্পানিরও বেনিয়ান ছিলেন তিনি। সে বাবদে তিনি নাকি দস্তুরি নিতেন টাকায় মাত্র দু'পয়সা। তবু এই রামদুলাল সমাজপতিদের মুখের উপর তাঁর হাতবাক্সে কিল মেরে সদর্পে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, "জাত আমার বাক্সের মধ্যে!" কালীপ্রসাদী হেঙ্গামা উপলক্ষে সবাই জানেন, তিনি তা প্রমাণও করেছিলেন। স্বভাবতই বোঝা যায় রামদুলালকে বেঙ্গলি মিলিওনার আখ্যা দেওয়া মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। মলঙ্গা এলাকার দত্ত পরিবার, অর্থাৎ অক্রুর দত্ত ও তাঁর উত্তরাধিকারীরাও (অক্রুর দত্তের মৃত্যু ১৮০৯) যথেষ্ট ধনদৌলত অর্জন করেছিলেন। এই পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত ও কালিদাস দত্ত মশাইও আমেরিকার শ্রেষ্ঠীদের সঙ্গে ব্যবসা করেছিলেন। কিন্তু রামদুলালের মতো লক্ষ্মীর কৃপালাভ খুব কম বণিকের ভাগ্যেই জুটেছে। রামদুলালের উইলে (মৃত্যু ১৮২৫) অনুসারে মৃত্যুকালে তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল—বসতবাড়ি সহ কলকাতা ও আশেপাশে কুড়িটি বাড়ি বর্ধমানের মেমারি, মেদিনীপুরের দুর্গাপুর, হাওড়ার শালকিয়া এবং বারাণসীতে জমি। তৎকালে ওই সব সম্পত্তির দাম, বলাবাহুল্য, সামান্য নয়। তাঁর এস্টেটের মূল্যায়ন করা হয়েছিল ৩৩ লক্ষ ১ হাজার ৪২৪ টাকা, কলকাতা ও আশপাশের সম্পত্তির দাম—৬ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৫০ টাকা। এসব থেকে বার্ষিক আয় ২৫ হাজার ৩১৪ টাকা। কলকাতার বাইরের সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয়েছে ৫৮ হাজার ৫০০ টাকা। অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে ছিল অনেক কোম্পানির কাগজ, নানা ইনসিওরেন্সের দলিল, ইউরোপিয়ান উত্তমর্ণদের বন্ড, বন্ধকী বন্ড, এবং অনাদায়ী দাবিপত্র ইত্যাদি। হ্যাঁ, "ডেভিড ক্লার্ক" নামে একখানা জাহাজও ছিল বটে। ১৮৫৪ সালে রামদুলালের এক পুত্রের মৃত্যুর সময় তাঁর এস্টেটের মধ্যে কলকাতার সম্পত্তির দাম ধার্য হয় ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৬২ টাকা, বাইরের জমিদারির দাম—২ লক্ষ টাকা।

সবই কিন্তু সাহেব-ধরার ফল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ রামদুলালের নাটকীয় জীবন কাহিনী শোনাতে গিয়ে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সততা, নিষ্ঠা, উদারতা, উপচিকীর্ষা, মানবতা, দানশীলতার অনেক কাহিনীই শুনিয়েছেন সাহিত্যের ভাষায়, নাটকীয় ভঙ্গিতে। প্রসঙ্গত তিনি কিন্তু জানাতে ভোলেননি যে, রামদুলালের পয়মন্ত ছিল একজন সাহেবের নাম। তিনি জনৈক পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন হানা। তাঁর সূত্রেই নাকি জীবনে প্রথম লাভের মুখ দেখেন তিনি। ফলে ক্যাপ্টেন হানার মৃত্যুর পর কৃতজ্ঞ রামদুলাল নিয়মিত পেন্সান দিয়ে গেছেন তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাকে।

এবার আর একজন ধনকুবের মতিলাল শীলের দিকে তাকানো যাক। (মৃত্যু ১৮৫৪)। কিশোরীচাঁদ

মিত্র তাঁর বণিক-জীবনের কাহিনী শুনিয়ে গেছেন। বইটির নতুন সংস্করণে (১৯৯৩) সম্পাদক শ্যামল দাস তাঁর বিষয় আশয়ের তালিকা সংযোজন করেছেন। তাতে দেখা যায় কলকাতা ও শহরতলিতে তাঁর বাড়ি, বাগানবাড়ি এবং জমি ছিল ৭৪টি বিভিন্ন ঠিকানায়। এক কাশীপুরেই বাড়িসংলগ্ন জমি ছিল ২৩৭ বিঘা ৬ কাঠা ৭ ছটাক, গার্ডেনরিচে ৪২ বিঘা ১ কাঠা ১০ ছটাক এবং অন্য আরও ৪২ বিঘা। এই গার্ডনরিচে নদীর ধারে ছিল আরও ৩৩ বিঘা। বেলেঘাটায় ছিল ৩০ বিঘা জুড়ে বাগান, জানবাজারে ৫ বিঘা ১৪ কাঠা, কাশীপুরে আরও ৩২৭ বিঘা ৬ কাঠা ৭ ছটাক, চিৎপুরে ৭ বিঘা ১৪ কাঠা, ১৩ ছটাক, মির্জাপুরে ৬ বিঘা ৫ কাঠা ১২ ছটাক। মির্জাপুরে আরও ১৫ বিঘা ৪ কাঠা, ডিহি চিৎপুর (বারাকপুর রোড) ৩১ বিঘা ৪ কাঠা, ভবানীপুর ও চক্রবেরিয়ায় ২১ বিঘা ৬ কাঠা ৬ ছটাক, বেলঘরিয়ায় ৪২ বিঘা, তিলজলায় ২৮ বিঘা, এন্টালিতে ৮ বিঘা, কলিঙ্গায় ১৪ বিঘা, বেলেঘাটায় আরও ৩০ বিঘা, দমদমে ৩৫ বিঘা ৬কাঠা ১৩ ছটাক, আলিপুরে ২১ বিঘা ১৩ কাঠা, পাইকপাড়ায় ৩০ বিঘা, ডালহৌসি স্কোয়ারে ১৩ বিঘা ৪ কাঠা ইত্যাদি ইত্যাদি। অধিকাংশ জমিতেই কিন্তু বাড়ি ছিল।

তাঁর ৬৬ নম্বর কলুটোলার বাড়িতে বিগ্রহের গহনার তালিকাও অবিশ্বাস্য। সোনার সিংহাসন থেকে শুরু করে কী না ছিল দেবদেবীর। গুদামে ছিল বেশ কিছু রকমারি ঝাড়, ফানুস, দেওয়ালগিরি, লণ্ঠন, এবং বিবিধ বিদেশি কাচের গৃহসজ্জার জিনিস। বেলঘরিয়ায় পূজারীদের হেফাজতে ছিল অসংখ্য পিতলকাঁসার বাসনপত্র। ১ নম্বর কাশীপুরের বাড়িতে ছিল ঘরে ঘরে দুর্মূল্য আসবাবপত্র,—কাঠের, লোহার, মার্বেলের। তাছাড়া বিশাল বিশাল আয়না, দর্শনীয় সব ঘড়ি, চিনের অলঙ্কৃত ভাস, পাথর, ব্রোঞ্জ এবং হাড়ের বিবিধ অলঙ্করণ ঘরে ঘরে ইউরোপিয়ান স্টাইলের সজ্জা। স্নানের ঘরে এমনকী কমোড পর্যন্ত। তাছাড়া বাহারি টানা পাখা। বাড়িতে বিলিয়ার্ড রুমও ছিল। ছিল বেশ কিছু তৈল চিত্র, রকমারি ভাস্কর্য। বাড়িতে বিশাল অর্গান ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জামও ছিল। সব মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার। পাতার পর পাতা জুড়ে তালিকা, তবু যেন ফুরাতে চায় না। উল্লেখ্য, মতিলাল শীলের বাড়িতে সুসজ্জিত লাইব্রেরিও ছিল। সেখানেও অনেক তৈলচিত্র ও নানা ধরনের আসবাবপত্র। বইয়ের শেলফ অবশ্য একটি। তাতে বই রয়েছে ১৮৪ টি। বিশেষ সঞ্চয়—লন্ডন নিউজ। এ-ধরনের গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায় কালীপ্রসন্ন সিংহদের পরিবারের বিপুল সম্পত্তির তালিকায়। সেখানে বিস্তর ফার্সি পুঁথিও ছিল।

যাহোক, মতিলাল শীলের প্রসঙ্গেই ফেরা যাক। মতিলালের অর্থের উৎস আজ প্রবাদ। মুখে মুখে এখনও শোনা যায়, মতি শীল টাকা রোজগার করেছিলেন খালি মদের বোতল বিক্রি করে। কত বড় মানুষ উৎসন্নে চলে গেল মদ খেয়ে খেয়ে, আর ভাগ্যের এমনই খেলা যে, মতি শীল বড়লোক হয়ে গেলেন খালি বোতল বিক্রি করে! কথাটা মিথ্যা নয়। কিশোরী চাঁদ মিত্র লিখেছেন—প্রায় নামমাত্র দামে বিয়ারের খালি বোতল আর কর্ক বা ছিপির বিপুল ভান্ডার গড়ে তুলেছিলেন মতিলাল। কলকাতায় পানীয় হিসাবে বিয়ারের তখন খুব চল। তার অন্যতম আমদানি-কারক ছিলেন মি. হাডসন নামে এক ইংরেজ। মতি শীল ছিলেন তাঁর বোতল সরবরাহকারী। তার আগেও কিন্তু সাহেব ধরেছিলেন তরুণ মতি শীল। জীবনীকার লিখেছেন কেল্লার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে মতি শীল কয়েকজন গোরা সৈনিকের সঙ্গে ভাব করে ফেলেন। তিনি তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতেন। তাতেই এই ভাগ্যান্বেষী জীবনে প্রথম দু'পয়সার মুখ দেখেন। তার মানে, সৌভাগ্য, আরও অনেকের মতো তাঁর ভাগ্যে উদিত হয়েছিল গৌরাঙ্গ রূপে!

সাহেব বেনিয়ান খুঁজতেন, বেনিয়ান ঘরে বসে সাহেব ধরতেন। এই ধরাধরি কখনও কখনও নাটকীয় হয়ে উঠত।

মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়
হেস্টিংসকে কী খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?
ঘরে ছিল পান্তা ভাত, আর চিংড়ি মাছ,
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া,—কাছে কলা গাছ।
কাটিয়া আনিল শীঘ্র কান্ত কলাপাত
বিরাজ করিল তাহে পচা পান্তাভাত
পেটের জ্বালায় হায় হেস্টিংস তখন
চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় করেন ভোজন।...

লোকশ্রুতি কান্তবাবুর সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সৌহার্দ্যের সূচনা এমনি নাটকীয় পরিবেশে। এটা হয়তো বাড়াবাড়ি। সম্প্রতি কান্তবাবুর একজন উত্তরপুরুষ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী কান্তবাবুকে নিয়ে এক বিশাল গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেছেন লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব কান্তবাবু দি বেনিয়ান অব ওয়ারেন হেস্টিংস। তাতে দেখা যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠী আক্রমণ করেন ১৭৫৬ সালের ২ জুন। ৫ জুন ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করেন। হেস্টিংস একটি আরঙে বন্দি হন ৯ জুন। তাঁকে সেই বন্দি দশা থেকে কিন্তু কান্তবাবুই মুক্ত করেছিলেন। কান্ত ১৭৫৪ থেকে হেস্টিংস-এর অনুচর। মুক্তির পর তাঁদের খাতির প্রণয় আরও বেড়ে গিয়েছিল এই যা।

সাহেবের সঙ্গে প্রণয়ে কী ফল লাভ হতে পারে তার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুরশিদাবাদ রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী। তাঁর পূর্বপুরুষ কালী নন্দী বর্ধমান থেকে কাশিমবাজার এসেছিলেন ভাগ্যের সন্ধানে। তাঁর দুই পুত্র জ্যেষ্ঠের নাম সীতারাম। সীতারামের পুত্র রাধাকৃষ্ণ। কান্তবাবু তাঁর পুত্র। রাধাকৃষ্ণের সামান্য ব্যবসা ছিল। একটি মুদিখানাও ছিল। জমি ছিল মাত্র ১৪ কাঠা। সেখানেই কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন তিনি। সেখানেই ১৭২০ সাল নাগাদ কান্তবাবুর জন্ম। (মৃত্যু—১৭৯৪)। তিনি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাননি। এমনকী বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে নিজের জন্য একটু নামও স্থির করতে পারেননি। সোমেনবাবু লিখেছেন পলাশির আগে কাগজপত্রে কখনও তাঁর নাম কৃষ্ণকান্ত তিলি, কখনও কৃষ্ণকান্ত দাস, কখনও শ্রীকৃষ্ণ কান্ত তিলি, কখনও শ্রীকান্ত তিলি। তারপর একদিন সগর্ব স্বাক্ষর —শ্রীকৃষ্ণকান্ত নন্দী। তারপর আরও এক ধাপ—মহামহিম শ্রীকৃষ্ণ কান্ত বাবুজী। অথচ এই ছদ্মনামা ভাগ্যান্বেষী সাহেব সংসর্গ শুরু করেছিলেন নাকি ৮ টাকা মাইনেয়। ভাল করে বাবার শ্রাদ্ধ (১৭৫৪) করবেন এমন ক্ষমতা ছিল না তখন কান্তবাবুর। কিন্তু তারপরই দেখি তিনি একের পর এক জমি কিনছেন। অবশ্য অধিকাংশই বেনামীতে। বাংলা ১১৬৩ সালের বৈশাখে কিনলেন প্রথম জমিদারী। মূল্য ৪৫০১ টাকা। তারপর তিনি কোনওদিন আর পেছনে ফিরেননি। বন্দর কাশিমবাজার-এ সোমেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন—১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের আগেই কৃষ্ণকান্ত নন্দী বেশ গুছিয়ে বসেছেন।...বাড়ি কিনেছেন, জমিদারী কিনেছেন, সম্পত্তি করেছেন। আবার বিবাহ করেছেন, পুত্র সন্তান জন্মেছে। তিনি হেস্টিংস সাহেবের বেনিয়ান ছিলেন ১৭৫৪ থেকে ১৭৬৪ পর্যন্ত, তারপর সাইকস সাহেবের বেনিয়ান ১৭৬৫ থেকে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর এক বছর কেন্ডির ট্রেজারির দরোয়ান হলেন।...ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে প্রথম কারবার শুরু করলেন কান্তবাবু নিজেই ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে।...প্রথমে তিনি রেশমের পলু বিক্রি করলেন। প্রথম বছরকার ব্যবসার পরিমাণ মাত্র ১৩ মণ ১৭ সের ১৩ ছটাক। পরের বছর অর্থাৎ ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে পলু বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে হল—২১১ মণ ৮ সের ৪ ছটাক। আবার লাফে লাফে সামনের দিকে। জমিদারী রেশম নুন দাদনি, সাহেবদের বেনামদারি সাহেবদের সঙ্গে কারবারি—কান্তবাবুর জীবনকাব্য ছশো পাতায়ও ফুরোয় না।

সাহেব-সংসর্গে কী হয়, হতে পারে তার আর একটা নমুনা শোনাচ্ছি। কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ দেওয়ান শান্তিরামের পুত্র জয়কৃষ্ণ সিংহের বিষয় আশয়ের সামান্য রূপরেখা। জয়কৃষ্ণ মারা যান ১৮২০ সালে। তিনি নাকি বাবার সম্পত্তি চারগুণ বাড়িয়েছিলেন। তিনিও ছিলেন বেনিয়ান। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল ঃ

কোম্পানির কাগজ, শেয়ার, বন্ড এবং নগদ—১৮,৮১,৫১১ টাকা, কলকাতায় স্থাবর সম্পত্তি—৭,৪০,৪৩০ টা, কলকাতার বাইরে স্থাবর সম্পত্তি—২,৪১,৩৮৪ টা, কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে খাজনাহীন সম্পত্তি ৮৯,৯৫০টা, জিনিসপত্র—৫৫,১০০টা, লোকের কাছে প্রাপ্য ৩,১৮,৩৮২ টা, মদন মোহন বসুর অফিসের বাক্সে আছে—১,৫৫৮ টা, জয়কৃষ্ণ সিংহের বাক্সে—৪,৮৪৫ টাকা। এজমালি সম্পত্তির মোট দাম—৩৩,৩৩,১৬০ টাকা।

এজমালি সম্পত্তির মধ্যে যেসব জিনিসপত্র ছিল—গরম কাপড় এবং শাল—৫০০০টা, শাড়ি—৩০০০টা, ইংরাজি বাংলা এবং ফার্সি বই—৩০০০টা, কাপড়— ৫০০০টা, লণ্ঠন বেলোয়ারি ঝাড় ইত্যাদি—৭০০০টা, ছবি আয়না ইত্যাদি—২০০০ টা, পর্দা তাঁবু সামিয়ানা—১৫০০টা। তারপর কলকাতা এবং বাইরে অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা। কলকাতায় তখন ওঁদের প্রায় ২০ খানা বাড়ি। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সাহেব পাড়ায়। ৬টি বাড়ির দাম ধরা হয়েছে ১ লক্ষ টাকার ওপরে। বলা হচ্ছে কলকাতায় ওঁদের ভূসম্পত্তির দাম একুনে— ৮, ২৫,৫৫০ টাকা। শালকিয়া, মানিকতলা, চিৎপুর—সেখানেও বিস্তর সম্পত্তি।

সেগুলি ধরা হয়েছে কলকাতার বাইরে সম্পত্তির তালিকায়। তাও বলা হচ্ছে তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়,—বাছাই করা। দু দশখানা বাড়ি, কিংবা দু চারশো বিঘা জমি যদি এদিক ওদিক বাদ পড়ে গিয়ে থাকে তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সাহেব ধরার নানা রকম ছলাকলার বিবরণ এখানেই শেষ করা যাক। একালে যেমন এক এক জন এক এক স্টাইলে সাহেব ধরেন সেকালেও তাই। একালে যদি রাজনীতিকদের এক স্টাইল, বক্সওয়ালাদের এক স্টাইল, গবেষক অধ্যাপক শিল্পী সাংবাদিক কিংবা লেখকদের অন্য স্টাইল, সেকালেও তেমনই বাটলার খিদমদগার, কিংবা বেনিয়ান সরকার, অথবা দেওয়ানজিদের স্টাইল ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যে যত নিঃশব্দে বুদ্ধি খাটিয়ে সাহেব ধরতে পারেন তাঁর তত হাত যশ। তত বাহাদুরি।

সাহেব-ধরার মতো সেকালে কিন্তু সমান জরুরি সাহেবকে ধরে রাখা। হয়তো একালেও বিষয়টা সমান গুরুতর। লক্ষ রাখা চাই সাহেব যেন কিছুতেই ফস্কে যেতে না পারেন। মোটা মিহি সহস্র ডোরে তাঁকে বেঁধে রাখা চাই।

সাহেবকে হাতে রাখতে হলে কী কী করতে হবে বাঙালি বাবুদের তা মুখস্থ। প্রথমত, হাঁউ মাউ গন্ধ পাঁউ বলে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে সাহেব যে বস্তুটির সন্ধানে এই বিধর্মীদের দেশে ছুটে এসেছেন তার সন্ধান দিতে হবে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে এই বিশাল অরণ্যের কোথায় রয়েছে সাহেবের পক্ষে সর্বরোগহর বিশল্যকরণী,—প্যাগোডা ট্রি বা টাকার গাছটি। কীভাবে তাতে জলসেচন করতে হবে, কেমন করে সংগ্রহ করতে হবে ফল, তার ব্যবস্থাপত্রও তুলে দিতে হবে হাতে। দ্বিতীয়ত, এদেশের জল হাওয়ায় ম্রিয়মাণ সাহেবকে আন্তরিক সেবা যত্নে চাঙ্গা রাখতে হবে। সর্বক্ষণ তাঁর এবং সাহেব জাতির জয়গান গাইতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে স্বজাতির নিন্দা। তাছাড়াও মুষ্টিযোগ আছে, টোটকা আছে। সাহেবকে পালা পার্বণে ডলি অর্থাৎ ডালি দিতে হবে। কেননা, সাহেবরা মনে করেন বৈভবে ভরা পূর্ব দেশে ডলি হচ্ছে পশ্চিমের কাছে পূর্বের ভিজিটিং কার্ড। ডলি সাজাবার সময় মেমসাহেবের কথাও মনে মনে রাখতে হবে। (সম্ভব হলে মেমসাহেবের কুকুরের কথাও!) কাশ্মিরী শাল, মোতির মালা, হিরের আংটি—ডালে কী ধরনের ফল

ধরতে পারে ভবিষ্যতে তার কথা মনে রেখে ডালিতে অনেক কিছুই তুলে নিতে হবে। ডালিতে এমনকী সম্পূর্ণ অন্য ধরনের উপহারও চলে। নবকৃষ্ণ যেমন, গির্জা গড়ার জন্য জমি কিনে দিলেন। সে ভূমিখণ্ডের দাম তৎকালে ৪৫ হাজার টাকা।

তারপর নাচ, গান, খানাপিনা। কাগজে হেড লাইন:

> শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যানে মহাভোজ ও তামাসা। —গত সোমবার রজনীতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অত্যুত্তম উদ্যানে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ও অন্যান্য ন্যূনাধিক তিন শত সাহেব ও বিবি সাহেব লোককে মহাভোজন করাইয়া পরমসন্তোষক তামাসা দর্শাইলেন।...”

সেকালের খবরের কাগজের পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে এ ধরনের রাশি রাশি বিবরণ। ছড়িয়ে রয়েছে বিদেশিদের ভ্রমণ-কাহিনী এবং স্মৃতিকথায়ও। ফেনি পার্কস ১৮২৩ সালে বাবুদের বাড়ির দুর্গোৎসবের বিবরণ দিচ্ছেন, পূজা মণ্ডপের পাশের একটা বড় ঘরে নানা রকমের উপাদেয় সব খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিল। সবই বাবুর ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য বিদেশি পরিবেশক ‘মেসার্স গান্টার অ্যান্ড হুপার’ সরবরাহ করেছিলেন। খাদ্যের সঙ্গে বরফ এবং ফরাসি মদ্যও ছিল প্রচুর। মন্ডপের অন্য দিকে বড় একটি হল ঘরে সুন্দরী সব পশ্চিমা বাঈজিদের নাচগান হচ্ছিল, এবং ইউরোপীয় ও এদেশি ভদ্রলোকেরা সোফায় হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে সুরাসহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।...(অনুবাদ—বিনয় ঘোষ)। যাকে বলে উদরের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে পৌঁছবার চেষ্টা।

সাহেবকে হাতে রাখতে হলে এসব চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে। তার মানে এই নয় সাহেব নিয়মিত পুজো পেলেই তুষ্ট থাকবে। এত মেলামেশা, এত মাখামাখি, তা সত্ত্বেও কেউ কি সত্যই হলপ করে বলতে পারেন সাহেব অচল হয়ে বাবুর বৈঠকখানায়ই বসে থাকবেন? লক্ষ্মী চঞ্চলা, সাহেবরাও তা-ই। এদেশের মানুষ সম্পর্কে তাঁরা মনে মনে কী ভাবেন তাঁরাই জানেন। কিছু মতামত সংকলন করেছেন পার্সিভ্যাল স্পিয়ার (‘দ্য নাববস’)। তাতে দু তরফের মন্তব্যই উদ্ধৃত। দু চারটি শোনাচ্ছি ঃ

মিসেস গ্রাহাম (১৮০৯) বলছেন— এই লোকগুলোর দাসদের মতো ধৈর্য নম্রতা ভদ্রতা এসব সদগুণ যেমন আছে তেমনই আছে নানা বদগুণ। এরা এত ধূর্ত যে ওরা সত্য বলতে জানে না।...লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩) মনে করেন—“দি হিন্দুস এপিয়ারস এ বিয়িং নিয়ারলি লিমিটেড টু মিয়ার অ্যানিমাল ফাংসান অ্যানড ইভেন ইন দেম ইনডিফারেন্ট।” “আই উইশ দিজ পিপল উড নট ভেকস মি উইথ দেয়ার ট্রিকস” আর একজনের বক্তব্য। বলা-বাহুল্য-প্রশংসা বচনেরও অভাব নেই কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে বিষাক্ত মন্তব্যের তির। এতরফ থেকেও মাঝে মাঝে নিক্ষিপ্ত হত তা। আমোদ-উৎসবে সাহেব-মেমদের মনোরঞ্জনের জন্য সঙরা যেমন কখনও কখনও গরু ভেড়া সেজে বিচালি চিবোত, তেমনি বিদেশি অতিথিরা চলে গেলে সাহেব-মেম সেজে তাদের নকল ভঙ্গি করে তামাশা লুটত। বাবুরা দরকার হলে নিঃসঙ্কোচে মামলা ঠুকতেন সাহেবদের নামে। ইংরাজের আইন দিয়েই সেদিন অনেক বাবু কাবু করেছেন ইংরাজ অধমর্ণকে। সাহেব সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব সব সময় ভক্তের নয়। একজন পশ্চিমী ইউরোপীয়দের সম্পর্কে হিন্দুর মনোভঙ্গি শোনাচ্ছেন,—ওরা মনে করে আমরা ভদ্রতা জানি না, আমরা অজ্ঞ, আমরা সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অসমর্থ, আমরা অপরিচ্ছন্ন। গোলাম হুসেন খান সাহেব সাহেবদের মনোভাব এবং চালচলন দেখে লিখেছেন—বিজয়ী এবং বিজিতের মধ্যে কখনও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। তার অনেক দৃষ্টান্তই রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে আঠারো-উনিশ শতকে সে-সম্পর্ক কদাচিৎ অন্যরকম দেখা গেছে।

সে-সময়ের অজস্র ভ্রমণকারীরা কলকাতা শহরে তাঁদের গার্হস্থ্যজীবনের বিবরণ রেখে গেছেন তাতে দেখা যায় নামমাত্র পারিশ্রমিকে অগণিত ভৃত্যের সেবা পেলেও তাঁরা প্রায়শ অনুগত ওই সব আশ্রিতের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ আগন্তুকই তাঁদের নিন্দায় মুখর; ওরা নীচ, ওরা মিথ্যাবাদী, ওরা অলস, ওরা প্রতারক,—কী নয়? তার চেয়ে লজ্জার কথা যখন তখন তাঁর ভৃত্যদের শারীরিক ভাবেও নিগ্রহ করেছেন। ঘুসি, লাথি, চপেটাঘাত ছিল বলতে গেলে অনেক হতভাগ্যের নিয়মিত প্রাপ্য। লর্ড অকল্যান্ডের বোন এমিলি ইডেন (কলকাতায় ১৮৩৬-৩৭—) লিখেছেন, রাজভবনের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে ভৃত্যরা বেশি পছন্দ করে। কারণ, অন্যত্র অধিকাংশ বাড়িতেই তাদের শারীরিক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। তিনি লিখেছেন, "Government House is one of the few houses in Calcutta where they are not beaten. It is quite disgusting to see how people quietly let out that they are in the habit of beating these timid, weak creatures." তিনি সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে ভোলেননি যে, ইচ্ছা করলে তার প্রতিবিধানের জন্য নেটিভরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করতে পারে, কিন্তু কজন নেটিভ আর তা জানে! "বেঙ্গলি" ছদ্মনামে ১৮৩০ সালে একজন সাহেবও একই কথা বলেছিলেন, তিনি লিখেছেন, যে ভৃত্য মনিবের ঘুষি হজম করার পরে কাজে বহাল থাকে, তাকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। উচ্চবর্ণের কর্মচারীরা এমন ব্যবহার পেলে অবশ্যই কাজ ছেড়ে যাবে। আমি নিশ্চিত জানি এমন অনেক প্রভু আছেন যাঁরা সাধারণত আশ্রিতদের প্রতি বলপ্রয়োগ করতে অভ্যস্ত। কখনও কখনও যথেষ্ট সাহসের অভাবে নিজেদের সংযত রাখেন। অনেক জায়গায় অবশ্য আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে কোনও ভারতীয় কর্মী মনিবের বিরুদ্ধে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ পেশ করলে এবং তা সত্য বলে প্রমাণিত হলে বিচারক তখন মনিবকে সাজা দিতে পারেন। সাজা মানে—জরিমানা করতে পারেন। কয়জনের আর সাহস বা ক্ষমতা ছিল সেসব আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার? বিচারের বাণী, অতএব তাদের ক্ষেত্রে শতকের পর শতক জুড়ে নিভৃতেই কেঁদেছে।

কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে দেখা যায়নি এমন নয়। তাঁরা শুধু উচ্চবর্ণের নন, অর্থকৌলীন্যেও উচ্চবর্গের। যথা : বেনিয়ান দুর্গাচরণ মুখার্জী। তিনি ছিলেন অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকির বেনিয়ান। ১৭৮৩ সালে দ্বিতীয়বার কলকাতায় ফিরে এলে দুর্গাচরণ তাঁকে একখানা সুন্দর পালকি কিনে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ভৃত্যকুল দিয়ে তাঁর গার্হস্থ্য জীবনকেও সাজিয়ে দিয়েছিলেন। হিকির স্মৃতিকথায় সুখ্যাত নিমাইচরণ মল্লিক ছাড়াও হিদারাম ও রঘুনাথ ব্যানার্জী নামে দুই বেনিয়ান ঋণের দায়ে হিকিকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুর্গাচরণ যেভাবে তাঁকে জব্দ করেছিলেন তার তুলনা নেই। হিকির কথায় সে-কাহিনী:

> "আমার প্রাতঃস্মরণীয় বেনিয়ান দুর্গাচরণ মুখুজ্যে সশরীরে এসে হাজির হলেন। আমি বিলেত যাবার আগে টাকার জন্য তাঁকে যে বন্ড দিয়েছিলাম, তিনি বললেন যে, সুদে আসলে মিলে তা প্রায় আট হাজার টাকা হয়েছে। টাকাটা যত শীঘ্র সম্ভব তাঁকে ফেরত দিলে তিনি খুশি হবেন। মুখুজ্যে মশায় আর কখনও কোনও অ্যাটর্নির কাছে বেনিয়ানের কাজ করবেন না বলে জানিয়ে দিলেন, এবং অন্য একজন বেনিয়ান দেখে নিতে আমাকে অনুরোধ করলেন। মুখুজ্যের কথাবার্তার মধ্যে বেশ একটু ঝাঁজ ছিল বলে মনে হল। আমি জীবনে কখনও কারও উদ্ধত কথাবার্তা সহ্য করিনি, এদেশের নেটিভদের তো নয়ই। বেনিয়ানের কথা শুনে আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। আমি তাঁকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললাম, আর তা না হলে তৎক্ষণাৎ চাকর ডেকে পদাঘাত করে বার করে দেব বলে শাসালাম। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি আমার সামনা থেকে প্রস্থান করলেন, এবং সোজা অ্যাটর্নির কাছে গিয়ে টাকার জন্য আমাকে নোটিশ দিলেন। কী আর করব! অত টাকা তখন আমার দেবার সাধ্য ছিল না, বাধ্য হয়ে, তাই অন্যের কাছ থেকে ধার করে আমার টাকা শোধ করতে হল।" (অনুবাদ—বিনয় ঘোষ। কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৮।)

টাকা হোক, আর মানসম্মানই হোক, অনুগত দুর্বল আশ্রিতদের কজনের পক্ষে বিদেশি প্রভুদের কাছ থেকে তা আদায় করা সম্ভব? কথায় কথায় অপমান সেদিন এদেশীয় অভাজনদের নিত্য পাওনা। কেউ কেউ এভাবে এমনকী গুরুদক্ষিণা মিটিয়ে দিতেন। দৃষ্টান্ত, মুনশিদের অভিজ্ঞতা।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতার কোনও কোনও মুসলিম প্রধান মহল্লায় বেশ কজন মুনশির নামে রাস্তা ছিল। তাঁদের কারও কারও জমিদারিও ছিল। যেমন, মুনশি দেদার বক্স লেন, মুনশি আলিমউল্লা লেন, মুনশি সদরউদ্দীন স্ট্রিট, ইত্যাদি। মুনশি ইমাম আলি ছিলেন জমিদার। আরও কোনও কোনও মুনশি অফিস আদালতে বিশিষ্ট পদাধিকারী। কিন্তু সাহেব পড়ুয়াদের কাছ থেকে তাঁরা সবাই কি প্রাপ্য সম্মান পেয়েছিলেন? একালের একজন গবেষক মহাফেজখানায় রচিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে জানাচ্ছেন,—না, পাননি। (দ্রষ্টব্য ঃ "দ্য সাহিব অ্যান্ড দ্য মুনসি, শিশিরকুমার দাশ)

গবেষক আনন্দচন্দ্র শর্মা নামে কলেজের বাংলা বিভাগের সেকেন্ড মুনশির একটি অভিযোগপত্র খুঁজে পেয়েছেন—

> "মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌনসিলার সাহেবাজ বরাবরেষু" ...কেনেডি সাহেবের নিকট দুই বৎসর হইল আমি হাজির আছি। ২৫ নম্বর শনিবার নিরপরাধ আমাকে অনেক ঘুষা ও থাবড়া এমন মারিয়াছেন যে আমি দুই দিবস শয্যাগত ছিলাম।...লোকে চাকরি করে আপনার প্রাণ রক্ষার্থে এঁহার নিকট যাওয়াতে কখন কি হইবে ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া যথেষ্ট ভীত হইয়াছি অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক হুকুম হয় আমি অন্য সাহেবের নিকট হাজির থাকি। ইতি—তারিখ ২৮ নবম্বর (১৮১০)।"

কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রটি জবাব দিয়েছিলেন,—মুনশি তাঁকে ভুল অর্থ শিখিয়েছিলেন, তাই তাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন!

ইংলিশ নামে আর এক ইংরাজ পড়ুয়া মুনশি নজরউল্লাকে চাবুক মারেন। অপরাধ তিনি ছাত্রের সামনে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন। উর্দু বিভাগের মুনশি গোলাম হোসেনও একবার তাঁর ছাত্রের হাতে প্রহৃত হন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিলেন। ছাত্র উত্তর দেন, তাঁর জানা ছিল না এদেশে মুনশি বা পণ্ডিতদের ভদ্রলোক বলে গণ্য করা হয়!

ভাগ্য অনিশ্চিত। সাহেবদের পক্ষে যেমন, তেমনই উমেদার বাঙালির পক্ষেও। সুতরাং সতর্ক হতে হবে। নয়তো সাহেব যখন তখন বিগড়ে যেতে পারে। সে রোষকে সামাল দিতে হলে হাতে অন্য সাহেব রাখা চাই। অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। তার অর্থ কখনও এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখা চলবে না। এ নীতির সফল প্রয়োগ দেখিয়েছেন কালা জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র। দেখিয়েছেন মহারাজা নবকৃষ্ণও । গোবিন্দরামকে দুর্নীতির দায়ে চেপে ধরেছিলেন তাঁর ওপরওয়ালা শহরের জমিদার হলওয়েল সাহেব। তিনি বললেন, হিসাবের খাতাপত্র সব দাখিল করা চাই। এক বছর টালবাহানার পরে গোবিন্দরাম জবাব দিয়েছিলেন কিছু হিসাব ঝড়ে উড়ে গেছে, বাকি হিসাব খেয়েছে উইয়ে। তবুও গোবিন্দরামকে কিছু করা গেল না। কেননা, এক সাহেব যদি তাঁর শত্রু তবে কাউন্সিলে তাঁর মিত্র সাহেব একাধিক। বছরের পর বছর গোবিন্দরাম তাঁদের সেবাযত্ন করে আসছেন।

নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল (১৭৬৭) তিনি উৎকোচ গ্রহণ করেছেন, বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করেছেন, তার চেয়ে গুরুতর অভিযোগ তিনি বলপূর্বক এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করেছেন। অভিযোগকারী রামনাথ দাস, রামসোনার ঘোষ, আর নিমু গাঙ্গুলি। সরকার তদন্তের ভার দিলেন চার্লস ফ্লয়ার সাহেবের উপর। অভিযোগকারীরাও কেউ তুচ্ছ করার মতো লোক নন। রামনাথ জর্জ গ্রে নামে এক সাহেবের বেনিয়ান। তদন্ত হল। সব পক্ষের বক্তব্য শোনা গেল। এমনকী ব্রাহ্মণীরও।

তিনি বললেন—রামসোনার ঘোষ আর নিমু গাঙ্গুলী তাঁকে টাকার লোভ দেখিয়েছে। ওঁরা নাকি বলেছিলেন—মুনশি নবকৃষ্ণকে সাফল্যের সঙ্গে অপবাদ দিতে পারলে দুশো টাকার গয়না, আর নগদ দু হাজার টাকা দেওয়া হবে। মেয়েটির স্বামী জনৈক কানাই ঠাকুর সাক্ষী দিলেন—আড়ালে থেকে নন্দকুমার প্ররোচনা দিয়েছে। তাঁকে লোভ দেখানো হয়েছে স্ত্রীর বদনাম হলে কী আসে যায়? জাত খোয়ানোর ক্ষতি পূরণ করার জন্য নগদ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে!

প্রমাণ হয়ে গেল অভিযোগ সাজানো। আরও প্রমাণ হল এই সাজানো মামলার পেছনে শুধু নন্দকুমার নন রয়েছেন অল্ডার ম্যান উইলিয়াম বোল্টস-এর মতো দুর্দান্ত সাহেব, তবু হার মানতে হল তাঁদের। কারণ, নবকৃষ্ণের মিত্রপক্ষের যেসব সাহেব রয়েছেন তাঁরা অনেক বেশি বলবান। সুতরাং

> "রামনাথ দাসকে কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত এবং রামসোনার ঘোষ প্রভৃতি অন্যান্য ফরিয়াদিকে বেত্রাঘাত করা হয়। ষড় যন্ত্রকারীদ্বয়ের মধ্যে উইলিয়াম বোল্টস বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইংলন্ড যাত্রা করণের আদেশ প্রাপ্ত হন এবং মহারাজ নন্দকুমারকে উপদেশ দেওয়া হয় যে তিনি কেবল নিজ ভবনে অবস্থিতি করেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত না হন।"

একেই বলে সাফল্যের সঙ্গে সাহেব ধরা।

সাহেব-ধরার পর বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে অন্য কেউ যেন চট করে সেই সাহেবের কাছে ঘেঁষতে না পারেন। সাহেব-ধরায় এটাও একটা বিশেষ জরুরি কথা। বিদ্যাসাগর মশাই সম্পর্কে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছিলেন—তাঁর ওই খ্যাতির মূলে নিশ্চয়ই অনেক কারণ ছিল। তবে এক কারণ সাহেবদের মুখে তাঁর সুখ্যাতি। "সে সময়ে বেশ বোঝা যাইত সাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খাতির পাইয়াছিলেন।" সেকালে এমনকী একালেও বোধ হয়, অনেক বাঙালি তথা ভারতীয়ের যশ প্রতিপত্তি সম্পর্কে একথা কমবেশি খেটে যায়। তারপরই কৃষ্ণকমল আরও একটু তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন যা এ প্রসঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন—"আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙালির সাহেবদের কাছে তাঁহার চেয়ে বেশি প্রতিপত্তি হয়।"...(পুরাতন প্রসঙ্গ)।

বিদ্যাসাগরের মতো মহান চরিত্র এবং সত্যকারের প্রতিভাধর পুরুষ যখন এসব বিষয়ে কিঞ্চিৎ সতর্ক ছিলেন বলে অভিযোগ তখন সেকালের উচ্চাভিলাষী সাধারণ দালাল বেনিয়ান মুৎসুদ্দি আর দেওয়ান যে নিজেদের সুবিধার জন্য সাহেব আর তার কুঠির দরজায় প্রবেশ নিষেধ ঝুলিয়ে দেবেন তাতে আর বিস্ময় কী। ১৭৪৮ সালের ২৩ মে কোম্পানির কনসালটেশন বুক-এর পাতা ওলটালে দেখা যাবে শেঠরা বলছেন—সাহেব, তোমরা আর কাউকে দাদন দিতে পারবে না। তা হলে আমরা চললাম। ওদের সঙ্গে আমরা কাজ করব না। কারণ ওরা ভিন্ন জাতের।

নানাভাবে এই রণকৌশল চালিয়ে গেছেন অষ্টাদশ-ঊনিশ শতকের সফল সাহেব-ধরারা। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে, এই যা। কৌশলটা সেকেলে বলে আজ পরিত্যক্ত এমন কথা বোধ হয় হলফ করে বলা যায় না।

ছেলে-ধরারা 'ছেলে ধরেছি' 'ছেলে ধরেছি' বলে রটিয়ে বেড়ায় না। কিন্তু সাহেব-ধরাদের অবশ্য কর্তব্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের সৌভাগ্যের খবর সকলকে দেখানো। কেননা, প্রকারান্তরে তা নিজের সৌভাগ্যের কথা রটানো। একালের বাঙালি সাহেব-ধরার পর কী করে তার একটা নমুনা শুনিয়েছেন জেফ্রি মুরহাউস। নিজের নয়, অন্য আর একজনের অভিজ্ঞতা। বাঙালি পথপ্রদর্শক বা বন্ধু কয়েক পা চলেই পরিচিত কারও সামনে থমকে দাঁড়াবেন। তারপর বলে যাবেন—ইনি ড. জন রোজেল্লি। ইনি হাফ ইতালিয়ান। ওর স্ত্রী আছেন, দুটি ছেলে আছে। ওঁরা ইংলন্ডে থাকেন। ইনি সাসেকস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। ইতিহাস পড়ান। ইনি বাংলা চর্চা করছেন। লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল

স্টাডিজে বাংলা শিখেছেন। ইনি বাঙালির মতো মেঝেয় বসে খান। (সকলের মুখমন্ডল স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত)। ইনি ডান হাত দিয়ে খান, হ্যাঁ খিচুড়ি খেয়েছেন, এবং ইলিশ মাছও, অবশ্য কাঁটা ছাড়াতে কিছুটা অসুবিধা হয়। হ্যাঁ, পায়েসও খেয়েছেন বই কি! (অন্যরা—আ, পায়েস! পায়েস!)।

সেকালেও এই প্রদর্শনীর রেওয়াজ ছিল। কেননা, বাড়িতে সাহেবের পদধূলি পড়লে মহল্লায় খাতির বেড়ে যায়। আত্মীয় বন্ধুরা ঈর্ষা যেমন করেন, তেমনই সম্ভ্রম দেখান। সাহেব ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিজয় পতাকা। সে-সংবাদ রটানোর আর একটি পদ্ধতি ছিল সাহেবদের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ এবং সযত্নে সেগুলি বাঁধিয়ে রাখা। কেউ কেউ পুঁথির আকারে সেগুলি ছাপিয়ে নিতেন। তাতে হাতফিরির সুবিধা হয়, তাছাড়া পরবর্তী পুরুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় পারিবারিক ঐতিহ্যের দলিল। কোম্পানির কাগজের চেয়েও মূল্যবান সেসব টেসটিমনিয়ালস। ইচ্ছা করলে যখন তখন সাহেবদের কাছে তা ভাঙ্গানো যায়। কারণ সাহেব-সংসর্গের সৌরভ শস্তা আতরের মতো রাতারাতি মিলিয়ে যায় না, কয়েক পুরুষ দিব্য টিঁকে থাকে। একটা নমুনা দিচ্ছি। নমুনাটি বাবু কৈলাস চন্দর ডাট নামে একজন বাঙালিবাবুর মুদ্রিত টেসটিমনিয়ালস সংগ্রহের ভিত্তিতে রচিত। কৈলাসচন্দ্র মাত্র ক বছরের মধ্যে এত টেসটিমনিয়াল সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, দশ পয়েন্ট হরফে কুড়ি পৃষ্ঠায় তা ধরানো শক্ত!

এসব উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকের কথা। অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের আগেকার উপাখ্যান। একদফা প্রশংসাপত্র থেকে জানা যাচ্ছে কৈলাস চন্দর ডাট হিন্দু কলেজের বাঘা ছাত্র। তাঁর তুল্য ছাত্র তাঁর আমলে কলেজে আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। কৈলাস কলেজে যেমন নিয়মিত হাজিরা দিতেন, তেমনই মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করতেন। তিনি পর পর তিন বছর কলেজে ফার্স্ট হয়েছেন। তার একটি ইংরেজি রচনা সম্পর্কে বলা হয়েছে এমন রচনা ইংরাজ ছাত্ররাও লিখতে পারবে কিনা বলা শক্ত। সাহিত্য, ভূমিবিদ্যা, গণিত—সর্ব বিষয়েই কৈলাস অতিশয় পণ্ডিত। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে এইসব প্রশংসা-পত্রগুলোর তলায় যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডেভিড হেয়ার, ডি এল রিচার্ডসন, জে রাউ, জন কারনিন, জে সি সি সাদারল্যান্ড, জন টাইলার প্রভৃতি বিশিষ্টজনেরা। তারপর কৈলাসচন্দ্র প্রবেশ করলেন কর্মজীবনে। প্রথমে দেখছি তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেকটর। কালেকটর সাহেবরা তাঁর প্রশংসায় মুখর। বাবু কৈলাস চন্দ্রের মতো রাজকর্মচারী দৈবাৎ দেখা যায়। তাঁর দক্ষতা, সততা, কর্মনিষ্ঠা অতুলনীয়। সেখান থেকে কৈলাস এলেন আবগারী বিভাগে। তিনি পঞ্চান্ন গ্রাম এবং চব্বিশ পরগণার আবগারী সুপারিনটেনডেনট। এখানেও সাহেব সুপারের মুখে ধন্যি ধন্যি। কৈলাস বিভাগের আয় বাড়িয়ে ফেলেছেন। তাঁর বাহাদুরির কোনও তুলনা হয় না। একের পর এক বড় সাহেব লিখছেন—কৈলাস রাজ সরকারের পক্ষে গর্বের বিষয়। একজন লিখছেন—অবিলম্বে কৈলাসের মাইনে মাসিক তিনশো থেকে বাড়িয়ে চারশো টাকা করা প্রয়োজন। মাইনে বাড়ার খবরও আছে পুঁথিটিতে। আছে রাজ সরকারের কর্মচারী হিসাবে কৈলাসের সাফল্যের আরও নানা খবর। সম্ভবত তাঁকে 'জাস্টিস অব দি পিস'ও করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষেও ধরাধরি করে আরও একগুচ্ছ প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন কৈলাসচন্দ্র। কিন্তু একটু যত্ন সহকারে প্রশংসাপত্রগুলো পড়লে আসল কাগজটি কিন্তু বেছে নিতে কোনও অসুবিধা হয় না। ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই ছোট্ট চিরকুটটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারা শক্ত। এক সাহেব আর এক সাহেবকে লিখছেন ঃ

''My dear Dunbar,

I hope you will excuse the liberty, I take in venturing to introduce to you, the bearer of this note, Kylas Chunder Dutt, the grandson and son of my old and worthy friends, Neeloo and Russomoy Dutt, the later of whom is not altogether unknown to you; the

said Kylas is an omedwar at the Board, and I believe the result of his hopes, is in a great measure in your hands, by consent of Mr. Pattle. See what you can do, and you will very much oblige me, & C. J. Cullen."

এই চিরকুটটুকু পকেটে নিয়েই একদিন দুরুদুরু বুকে ডানবার সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কৈলাসচন্দ্র। তিনি নীলু দত্তের নাতি, স্বনামধন্য রসময় দত্ত তাঁর পিতা। ওঁরা রামবাগানের দত্ত। রসময় ডেভিডসন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া স্মল কজেস কোর্টের তিনি প্রথম দেশীয় বিচারপতি। ওঁদের পরিবারে সাহেব-ধরা শুরু হয়েছিল ঠাকুর্দার আমলে। হয়তো তারও আগে। সাহেবদের দরবারে অন্তত তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অন্য প্রার্থীরা পারবেন কেন? বলাবাহুল্য, তিন পুরুষের সাহেব-ধরার কারবার বিফলে গেল না, কৈলাস চাকুরিটি পেয়ে গেলেন। তারপর সামনে তাঁর শুধুই উন্নতির সিঁড়ি। বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলেন। বাপ-ঠাকুর্দার সুনাম যেন তিনি রাখতে পারেন।

প্রশ্ন উঠবে—পুরুষানুক্রমে সাহেব ধরার এই কি পরিণতি? এত কাণ্ড করে কাপ্তান ধরা, বেনিয়ান হওয়া, ইংরেজি শেখা, লেখা, ঘটা করে ষোড়শ উপচারে সাহেব-পুজো করা; সব কি তবে বিফলে গেল? তা নাহলে নীলু দত্তের পৌত্র বাবু রসময় দত্তের পুত্র কৈলাস চাকুরির উমেদার হবে কেন? হয়, এ-কেমন নিয়তি।

বাঙালির সাহেব-ধরার ট্রাজেডি এখানেই। সাহেব-ধরা চলছিল সেই জোব চার্ণকের আমল থেকে। ক্লাইভ হেস্টিংস-এর আমলেও খপাখপ সাহেব ধরেছে বাঙালি। রাশি রাশি সাহেব। রাশি রাশি টাকা। তবু উনিশ শতকের মাঝামাঝি পৌঁছে দেখা গেল সব যেন মায়া। ব্যবসা বাণিজ্য সব মিলিয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। এবার যদি বাপ-ঠাকুর্দার নাম ভাঙিয়ে কোনও মতে দিন কাটানো যায়। 'বাবু ইংলিশ'-এ দরখাস্ত লিখতে বসেছেন বেনিয়ান দেওয়ানদের উত্তরপুরুষরা ঃ

"Hond's Sir, In the Holy Bible of your honours religion it is said that knock and it shall open to you therefore I am humbly knocking at the door of your honour. ..."

"Further I beg to state that my need of employment is most urgent at this time as I am compelled to support of my families which consist of many souls, viz,-four female wife, two male ditto and children innumerable, all of which depending their future lives on my sole help, and without which they remain with empty stomick. ...etc."

অথচ কয়েক পুরুষ আগে অবিশ্বাস্য সব কাহিনী।

"লবণের কারবারে পান্তির (কৃষ্ণ) আধিপত্য এরূপ হইল যে এখন লবণ বিভাগের শ্বেতাঙ্গ সচিব পান্তি মহাশয়ের সহিত সসম্ভ্রমে কথা কহেন। সমস্ত ক্রেতাগণ নিলামের সময় সেই স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু পান্তির অনাগমন পর্যন্ত সচিব নিলাম আরম্ভ করেন না।... এমনকি পান্তি মহাশয় নিলাম গৃহে উপস্থিত হইলে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীগণ যত্নপূর্ব্বক তাহাকে সঙ্গে করিয়া সচিবের সমীপে লইয়া যায় এবং সচিবও তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দন্ডায়মান হইয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক নিজ পার্শ্বে তাঁহাকে আসন দেন।" (কৃষ্ণ পান্তি—প্রিয়নাথ সিংহ প্রণীত।)

কোথায় সেই সম্মান, আর কোথায় এই উমেদারি!

অষ্টাদশ শতক তো বটেই, উনিশ শতকের প্রথম দিককার দশকগুলোও ছিল দালাল, পাইকার, বেনিয়ান, সরকার এবং দেওয়ানদের সুবর্ণ-যুগ। বাঙালি যখন সাহেব মারার জন্য বোমা পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা সাহেবের হ্যাঁ কে না করবার জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করছে এসব তার অনেক অনেক আগেকার ব্যাপার। সেটা যাকে বলে 'কম্প্রাডর'দের আমল। অভিধানে কম্প্রাডর (Comprador) অর্থ বিদেশি শক্তির অনুচর। বিদেশি বণিকদের ছায়া সহচর একশ্রেণীর স্বদেশি বণিক সেদিন শুধু কাশিমবাজার-কলকাতা বা মুরশিদাবাদ-ঢাকায় নয় অন্যত্রও দেখা গেছে। দেখা গেছে অন্যান্য দেশের উপকূলেও। যেমন পরবর্তী কালে সাংহাইয়ে। এদেশে শ্রেষ্ঠীরা অতি তৎপর ছিলেন সুরাটে, বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে এবং কলকাতায়। কেননা, সাহেবরা শুধু সম্পত্তি অর্জনের এবং রক্ষার অধিকারকেই স্বীকার করেন না, তাঁরা কখনও ব্যবসায়িক চুক্তি ভঙ্গ করেন না, তাঁরা আইন মানেন, কথা রাখেন। তাঁদের সঙ্গে কারবার করে সুখ আছে। ফলে বোম্বাইয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন গুজরাতি সওদাগররা, পার্সি, জৈন এবং বোরারা, মাদ্রাজে চেট্টিয়ার এবং অন্ধ্রের কোমাতিরা। কলকাতায় তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন অবশ্য মাড়োয়ারিরা। অর্থাৎ জগৎ শেঠরা। আর তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন আমাদের দালাল বেনিয়ান মুৎসুদ্দি এবং দেওয়ানরা। মিলেমিশে তাঁরা সাহেব ধরেছেন। নিজেদের স্বার্থে সাহেবদের কাজে লাগিয়েছেন। সেই সঙ্গে নিজেদের প্রাণমন সমর্পণ করেছেন সাহেবদের কাজে। সর্দার পানিক্কর লিখেছেন—পলাশি যুদ্ধ নয়, একটা বন্দোবস্ত মাত্র। এক ধরনের লেন দেন। জগৎ শেঠদের নেতৃত্বে বাংলার 'কম্প্রাডর'রা সেদিন বাংলার নবাবকে বেচে দিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে।

একালের রাজনৈতিক অভিধান অনুসারে ওঁদের 'কম্প্রাডোর' বলা যায় কিনা, তা নিয়ে হয়তো তর্ক থাকতে পারে। এখানে তা অবান্তর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আঠারো শতকের কলকাতায় বিদেশি ভ্রমণকারীদের মধ্যে অন্তত দুজন বিদেশি-কুঠির ভারতীয় সেবকদের 'কম্প্রাডোর' শিরোপায় ভূষিত করেন। তাঁদের একজন মিসেস ফে (১৭৮০—), অন্যজন মিসেস কিন্ডার্সলে। ফে তাঁর বাজার সরকারকে বলেছেন—"মাই কম্প্রাডোর"। মিসেস কিন্ডার্সলে বলেছেন, তাঁর গৃহস্থালির দায়িত্ব যার হাতে সেই খানসামার নীচে রয়েছে একজন 'কম্প্রাডোর', যে দৈনন্দিন বাজার করে। স্থানীয় ভৃত্য মাত্রই সেদিন ওঁদের কাছে 'কম্প্রাডোর'! এশিয়া অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন গেমিন্যান্স।

সাহেব-ধরা বাঙালি ধনীরা সেদিন শুধু মাত্র সাহেবদের সহচর অনুচর নয়; কখনও কখনও এমনকী বিশুদ্ধ চরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। হয়তো তাদের মধ্যেও রকমফের ছিল। সকলকে একসঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করা ঠিক নয়। যাঁরা বংশানুক্রমে ব্যবসায়ী তাঁরা একরকম। আবার নবকৃষ্ণ বা গোকুল ঘোষালরা অন্যরকম। সম্ভবত কান্তবাবুকেও তাদের দলে ফেলা যায়। এঁরা সরাসরি রাজনীতিতেও সাহেবদের পদসেবা করেছেন। নানা আঁকাবাঁকা পথে চলতে হয়েছে তাঁদের। সাহেবদের স্বার্থে, সেই সঙ্গে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবার জন্য ঝুঁকি নিতে হয়েছে বিস্তর। অন্যদিকে নব্য ধনী ঠাকুরদের চরিত্র আবার কিছুটা অন্যরকম। সেই সন্ধিক্ষণে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব। হরেদরে অন্যদের মতো তিনিও নিশ্চয় 'কম্প্রাডোর', অন্তত একজন জীবনীকারের মতে (ব্লেয়ার বি ক্লিং: পার্টনার ইন এম্পায়ার।) তবে দ্বারকানাথ স্পষ্টতই অন্য ধরনের সহযোগী। কলকাতায় শুধু মাড়োয়ারি আর বাঙালি নন, সাহেব-ধরার খেলায় মেতেছিলেন পাঞ্জাবি, আরমেনিয়ান, ইহুদি এবং আরও অনেকেই। উনিশ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশকে দেখি দ্বারকানাথ সেই ভিড়ে উজ্জ্বলতম পুরুষ। যেমন ছিলেন তাঁর আদর্শ-পুরুষ রামমোহন।

রামমোহনের সাহেব-ধরা সবাই জানেন, আর পাঁচজনের মতো নয়। সাহেব-ধরা তাঁর কাছে ছিল পশ্চিমের যুক্তিবাদকে ধরা, জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রসর ইউরোপের ধ্যান-ধারণাকে আত্মস্থ করা। মানে

মর্যাদায় সাহেবদের সমান হওয়া। দ্বারকানাথ সে পথে আরও কয়েক পা এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সত্য অধিকাংশ বেনিয়ান দেওয়ানরাই এক ধরনের সাহেবিয়ানা অর্জন করেছিলেন। পোশাকে, গৃহসজ্জায়, খাদ্যাভ্যাসে, ভাষায়, আইন আদালতের কেতায়, সাহেবি সংগঠনের নকশার অনুকরণে। হয়তো বা টুকিটাকি আরও নানা বিষয়ে। কিন্তু তাঁদের সব উদ্যোগ আয়োজন নিঃশেষিত হয়ে যায় ১৭৯৩ সালের প্রলোভনে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলছি। ব্যবসায়ীরা তার হাতছানিতে পড়ে অনেকেই রাতারাতি পরিণত জমিদারে। তাঁরা নিশ্চিত আয়ের মখমলমোড়া শয্যায় তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে। জমিদারী দ্বারকানাথও কিনেছেন দু-হাতে। কিন্তু একই সঙ্গে দশভুজের মতো হাত লাগিয়েছেন নানা কর্মকাণ্ডে। তাঁর এক লক্ষ ছিল ওই বৈশ্য যুগে সাহেবদের সঙ্গে সহযোগিতাকে তার যুক্তিসম্মত পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া, ভারতে শিল্প বিপ্লবের আবাহন। ভারতে শিল্পযুগের উদ্বোধন। সাহেব-ধরা বলতে রামমোহনের মতো তিনিও চাইছিলেন ইউরোপের প্রগতিবাদকে ধরা।

সবাই জানেন এদেশের আর্থিক জীবনে দ্বারকানাথ অনেক অঙ্গনেই অগ্রণীর ভূমিকায়। তিনিই প্রথম কয়লার কোম্পানি গড়ে তোলেন। প্রথম স্টিম-টাগও তাঁরই কীর্তি। নদীতে প্রথম স্টিমার চালিয়েছেন তিনি। রেলকোম্পানি পত্তনেও ছিল তাঁর বিশেষ ভূমিকা। এই সব কোম্পানি পরিচালনার জন্য তিনি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গড়েছেন, ইনসিওরেন্স কোম্পানির পত্তন করেছেন, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বাণিজ্যিক বিষয়ে নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য খবরের কাগজ পরিচালনা করেছেন। তিনি সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়েছেন। পাল তোলা এবং বাষ্পীয় পোত দুই-ই। চা বাগানে, নুন এবং চিনি তৈরি—সর্বত্র তিনি। এবং সব উদ্যোগেই দেখা যায় তাঁর সঙ্গে রয়েছে সাহেবরা। তিনি তাঁদের সমান সমান। কখনও মনে হয় দ্বারকানাথ সাহেব ধরছেন না, সাহেবরাই তাঁর নজরে পড়ার জন্য ব্যস্ত।

জীবনীকার ক্লিং লিখেছেন—উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে মনে হচ্ছিল বুঝিবা ভারতে শিল্প-বিপ্লব আসন্ন। কিন্তু পাঁচের দশকেই দেখা গেল সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ। রামমোহন দ্বারকানাথের কালে সাহেব-বাঙালির সহযোগিতা চলছিল নানা ক্ষেত্রে। কলকাতার হাওয়ায় তখন আলোর ফুলকির মতো, ভেসে বেড়াচ্ছে ইউটিলিটারিয়ানিজম ইউনিটারিয়ানিজম, ফ্রী ট্রেড, সিভিল লিবারটি, কলোনিয়ালাইজেশন, ফ্রি প্রেস—ইত্যাদি নতুন নতুন শব্দ, নতুন নতুন ধ্যান। সমাজ সংস্কারের বিবিধ উদ্যোগ। দ্বারকানাথ সব কিছুতে। সেই সঙ্গে বাষ্পীয় ইঞ্জিনেও নিবিড় মনোযোগ তাঁর। কিন্তু দেখতে দেখতে যেন হারিয়ে গেল সে-আশ্চর্য উত্তরাধিকার।

কেন, সেকথা বিশদ করে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। ক্লিং মনে করেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির পেছনে একমাত্র কারণ নয়। অন্য কারণও ছিল। হরেক কার্য-কারণ। তাঁরই মধ্যে কিছু বাঙালি অবশ্য শিল্পে বাণিজ্যে, টিঁকে ছিলেন বিশ শতক অবধি। তবে সাহেবদের সমান সমান হয়ে নয়, তাঁদের ছায়ায়। ১৮৫৫ সালে সগৌরবে এজেন্সি হাউস চালিয়েছেন রামগোপাল ঘোষ আর আশুতোষ দে। তাঁরা স্বাধীন ব্যবসায়ী। রামগোপালের সাহেবি নামও ছিল একটা। বন্ধুরা বলতেন—রবার্ট। অন্যরা কিন্তু তখনও নিছক বেনিয়ান। ক্লিং বলছেন—১৮৫৫ সালের কলকাতার বাণিজ্যিক নির্দেশিকার বেনিয়ানের সংখ্যা ৫০, বাঙালি কমার্শিয়াল ট্রেডার ১৫০। ১৮৬৩ সালে এজেন্সি হাউসের সংখ্যা অবশ্য ৭ হয়েছে, কিন্তু বেনিয়ানের সংখ্যা কমে হয়েছে ৩৫। অবশ্য সে বছর 'জাহাজের বেনিয়ান' ছিলেন আরও ৩১ জন। দিন বদলের অন্য খরচও আছে। ১৮৫৫ সালে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স যখন গঠিত হয় তখন বাঙালি সদস্য ছিলেন পাঁচ জন, ১৮৬০-এ দেখা গেল তালিকায় একজন বাঙালিও নেই।

কোথায় দ্বারকানাথ? বাঙালি তখন চাকুরি খুঁজছে। সই সুপারিশ সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সৃজনশীলতা বাধ্য হয়েই মুক্তির পথ খুঁজছে শিল্পে সাহিত্যে, রাজনীতিতে। ক্লিং লিখেছেন সাহেবরা বাঙালিকে খারিজ করে দিয়েছিল, বাঙালিও তেমনই খারিজ করে দিল সাহেবদের উদারনৈতিক ভাবাদর্শ। রামমোহন-দ্বারকানাথের আন্তর্জাতিকতাবাদের বদলে বাংলা পরিবর্তে হল জাতীয়তাবাদের পীঠস্থানে। বাঙালির সাধনা তখন সাহেব-ধরা নয়, সাহেব-মারা। সাহেবের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ানোয় তার আর আস্থা নেই। তার ধ্যান ইংরাজবর্জিত ভারত।

* * *

উপসংহারে সংক্ষেপে মেম-ধরার কাহিনী। মেম-ধরা আজ অতি সহজ কর্ম। বাঙালি তরুণ একালে কথায় কথায় মেম ধরে। কেউ কেউ খেলাচ্ছলে। কেউ কেউ এমনকী ঘরে বসেই। এজন্য তাদের মেমদের দেশে ছুটে যেতে হয় না। অভিযাত্রী মেমরাই বরং ধরে বেঁধে তাদের নিয়ে যায় নিজেদের দেশে। কিন্তু সেকালে? "বিবাহ করিব সুখে ইংরেজ ললনা"—এধরনের সুখস্বপ্নে বিভোর বাঙালি কি সত্যই সাহেব-ধরার মতো সমান হাতযশ দেখাতে পেরেছে মেম-ধরার? মনে হয় না। উদ্যোগের অবশ্য অভাব ছিল না। নবকৃষ্ণের কথাই ধরা যায়। তাঁর ছয় বিয়ে। তবু জীবনীকার লিখছেন—দোষের মধ্যে ইন্দ্রিয়দোষই অধিক ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। কী ধরনের দোষ তিনি তা বিশদ করেননি। তবে সাহেবদের মতো মেম সাহেবদেরও যে তিনি বিশেষ খাতির দেখাতে চাইতেন সে-খবর আছে হিকির গেজেটে। ১৭৮১ সালের আগস্টে নবকৃষ্ণ নিজের বাড়িতে এক মহতী প্রমোদ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উপলক্ষ্য মিস কুমারী র‍্যাংহাম নামে এক কলকাতা-সুন্দরীর জন্মদিন উদযাপন। খানাপিনা ছাড়াও বল নাচের আয়োজন ছিল। মিস র‍্যাংহামও নেচেছিলেন। অবশ্য একজন সাহেবের সঙ্গে। নবকৃষ্ণ তাতেই কৃতার্থ। নাচের শেষে তিনি সুন্দরীকে গাড়িতে তুলে দিতে দিতে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন উজ্জ্বল উপস্থিতিতে তাঁর বাড়িটি আলোকিত করার জন্য। নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন—এই শতকের দ্বিতীয় দশকেও বাঙালি বাবুরা নাকি মনে করতেন 'কড়েয়ার বিবিরা' তাদের নাগালের বাইরে। সেকালের সত্যকারের মেম সাহেবরাও সম্ভবত তা-ই। তবে দ্বারকানাথের কথা স্বতন্ত্র। বলা হয়—মেম-ধরায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। রামমোহনের পোষ্যপুত্র রাজারাম লিখেছেন—অর্থ এবং প্রতিপত্তির বলে পছন্দের যে কোনও লেডিকে তিনি কাছে টানতে সমর্থ। বিখ্যাত অভিনেত্রী ইসথার লিচ-এর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্বের কাহিনী নাকি সবাই জানতেন। তিনি এবং তাঁর ষোড়শী কন্যাকে দ্বারকানাথ কেমন করে নিজের নাগালে রেখেছিলেন সে-কাহিনীও নাকি সর্বজনবিদিত। ক্লিং আরও একজন রূপসী বিদেশিনীর সঙ্গে দ্বারকানাথের গভীর বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সে মেয়েটির নাম ছিল মিস শার্লেট ই হার্ভে। দ্বারকানাথকে নাকি পিয়ানো বাজানো শেখাতেন । তাঁর বিয়ের সময় মেয়েটি দ্বারকানাথকে যে আমন্ত্রণপত্রটি পাঠিয়েছিলেন সেটি রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক। মিস হার্ভে লিখছেন—বিয়ে হয়ে যাওয়ার আগে একবার তোমার সঙ্গে বসে খেতে চাই। চিঠির শেষ বাক্য—'বিলিভ মি অলওয়েজ অ্যান্ড এভার টু বি ইওর সিনসিয়ার অ্যান্ড আই ডেয়ার সে নট ফারদার'—দ্বারকানাথ যখন বিলাতে তখনও নাকি তাঁর অনেক ইংরাজ বান্ধবী। তাদের মধ্যে অন্যতম সুরসিকা কবি এবং রূপসী ক্যারোলিন নর্টন। সবে স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে তাঁর। তাঁকে নিয়ে শহরে নানা গুঞ্জন। দ্বারকানাথের হয়ে তিনি আয়োজন করেছিলেন কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে স্মরণীয় নৌ-পার্টির। সে আসরে হাজির ছিলেন চার্লস ডিকেন্স।

ব্লেয়ার বি ক্লিং লিখছেন—দ্বারকানাথ এসব ব্যাপারে ঢাকাঢাকি পছন্দ করতেন না। নিজের

অজ্ঞাতেই হয়তো তিনি ইংরাজদের জানিয়ে দিচ্ছিলেন—ভারত এবং ব্রিটেনের সহযোগিতা বলতে তিনি কী মনে করেন। পার্টনারশিপ কী সর্ব ব্যাপারেই কাম্য নয়? জীবনীকার বলছেন—ব্রিটিশ পুরুষ এবং নারীর সঙ্গে যে-ধরনের আন্তরিক সম্পর্ক তিনি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষ দিকে তা ভাবাও যায় না।

তবে অষ্টাদশ শতকে কিন্তু মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য কাণ্ডও ঘটত। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংরক্ষিত জাস্টিস হাইডের নোটবইগুলোর পাতা ওল্টালে যেমন সেই সাহেব-ধরার যুগেও সাহেব বনাম বাঙালির মধ্যে অগণিত বিবাদ বিসম্বাদের কাহিনী দেখা যায়, তেমনই শোনা যায় কিছু কিছু অবিশ্বাস্য উপাখ্যান। বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট জানুয়ারি—জুন (১৯৭৮) নোট বই-এ পাতার পর পাতা জুড়ে বাঙালি বনাম সাহেবদের মামলা মোকদ্দমার বিবরণ। তারই মধ্যে এক ফাঁকে সারা নামে এক মেম সাহেবের গল্প। তার বিরুদ্ধে স্বামী এডোয়ার্ড ম্যাকনামারা সাহেবের অভিযোগ তিনি নিজের খানসামার সঙ্গে নষ্ট। তারপর স্বামী-স্ত্রী মিলে দেশি বিদেশি সকলের সামনে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পারিবারিক নোংরা কাপড় কাচা!

খাঁটি মেমসাহেবরা অবশ্য খুব বেশি এ ধরনের স্ক্যান্ডালে জড়াননি। তবে সাহেবদের কথা অন্য। তাদের পক্ষে দিশি বিবি নিয়ে ঘর করা সেদিন মোটেই কলঙ্কজনক ব্যাপার নয়। উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথার পাঠকরা জানেন তিনি প্রথমে ঘরে তুলে নিয়েছিলেন কিরণ নামে একটি মেয়েকে। তারপর জমাদারনীকে। তিনি সবিস্তারে লিখে গেছেন তাঁর সেই গৃহস্থালির কাহিনী। দুটি মেয়েকেই পেয়েছিলেন তিনি বন্ধুদের কাছ থেকে। অনেকটা উপঢৌকন হিসাবে। কিন্তু কে সংগ্রহ করেছিল তাদের? সাহেবরা নিজেরাই কি? নাকি কোনও সরকার বেনিয়ানের ডালিতে ভেট হয়ে এসেছিল তারা? এমনও তো হতে পারে, এদেশের বিস্তর মানুষ যখন সাহেব-ধরার জন্য ব্যস্ত কিছু কিছু এদেশি মেয়েও তখন ফিকির খুঁজছে সাহেব-ধরার। অন্তত পার্ক সার্কাসের স্কটিশ গোরস্থানের একটি কবরের সামনে দাঁড়ালে তা-ই মনে হয়। কবরটি শার্লট নামে একটি মেয়ের। ১৮৩৮ সালে মাত্র তিন বছর বয়সে সে মারা যায়। কে সে? পাথরের টুকরোটিতে লেখা রয়েছে—মোস্ট লাভলি অ্যানড বিলাভেড চাইল্ড অব চার্লস রিড অ্যান্ড বিবিজান!"

এই রচনায় ব্যবহৃত বইয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ

Memoirs of Maharaja Nubkisen Bahadur, Nagendra Nath Ghosh, Calcutta, 1901.

Mutty Lall Seal, Kishory Chund Mitter, Calcutta, 1869. New Edition, Ed. Shyamal Das, Calcutta, 1993.

Partner in Empire : Dwarakanath Tagore and the age of Enterprise in Eastern India, Blair B. Kling, Calcutta, 1981.

Dwarakanath Tagore : A Forgotten Pioneer : A Life, Krishna Kripalani, New Delhi, 1981.

Ramdoolal Dey, The Bengalee Millionaire, Grish Chunder Ghose, (In Selections from the writings of Grish Chunder Ghose), Calcutta, 1912.

Life and Times of Cantoo Baboo. The Banian of Warren Hastings (1742-1804), vol-1, 1978, vol-2, 1981.

Dutt Family of Wellington Square, Haradhan Dutt, Calcutta, 1995.

House of Jagatseth, J. H. Little, Intro, Prof N. K. Sinha, Calcutta, 1967.

Sahib and Munshis, An Account of the College of Fort William, Sisir Kumar Das, Calcutta, 1978.
Calcutta: Myths and History, S. N. Mukherjee , Calcutta, 1982.
Calcutta, Essays in Urban History, S. N. Mukherjee, Calcutta, 1993.
Calcutta in Urban History, Pradip Sinha, Calcutta, 1978.
Nineteenth Century Bengal, Aspects of Social History, Pradip Sinha, 1965.
Calcutta in the 19th Century, P. Thankappan Nair, Calcutta, 1989.
সুবর্ণবণিক কীর্তি ও কথা, নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৩ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪০-৪২।
জন কোম্পানীর বাঙালি কর্মচারী, নারায়ণ দত্ত, কলকাতা, ১৯৭৬।
কলিকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ১৯৮১।
ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৩৯৬।
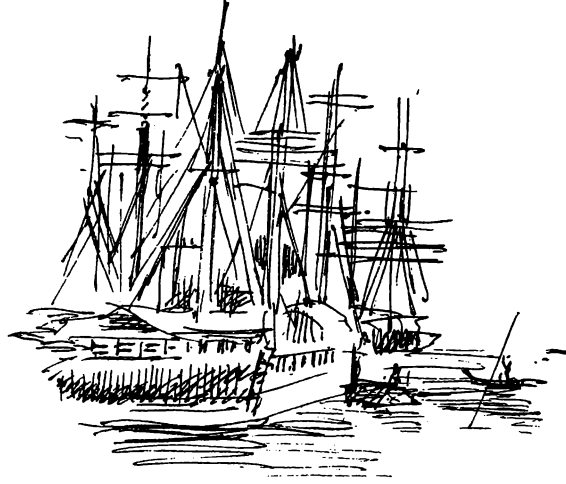
পোশাকি ঔপনিবেশিকতা

"ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপী মাথায়েতে কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরূচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত য়বতার
মুখেতে বলেন দম্ভদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দতে পরিলা ইজার ॥

রামাই পণ্ডিত লিখেছেন তাঁর 'শূন্যপুরাণ'-এ। শূন্যপুরাণ, বলা হয় একাদশ শতকের রচনা। সুতরাং ক্রমে একদিন রামমোহন রায় বা দ্বারকানাথ ঠাকুর যে মুঘলাই পোশাকে সেজেগুজে প্রতিকৃতি-আঁকিদেয়ের সামনে এসে দাঁড়াবেন তাতে আর বিস্ময় কী। উনিশ শতকে খানদানি বাঙালির বেশভূষা বলতে মুসলমানি বেশ। শুধু বাঙালি কেন ভারতের অনেক এলাকাতেই, বিশেষ করে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে সেদিন দরবারি পোশাকের জয়জয়কার। 'শূন্যপুরাণ'-এর কালে

"বিষ্ণু হল্যা পয়গম্বর ব্রহ্মা হল্যা পাকাম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম।
কার্ত্তিক হইলা কাজি গণেশ হইল গাজি
ফকির হইল মুনিগন ॥

কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এক জীবনীকারের (কুমুদনাথ মল্লিক) মতে বাংলা মুলুকে মুসলমানি পোশাক চালু হয় তাঁরই আমলে। তখন 'চাপকান মচকান চুড়ীদার পায়জামা, পায়ের লক্কাদার জুতো সৌখীনতার পরিচয় দিত' এই পোশাকে বাঙালির কতখানি মন ধরেছিল তা বোঝা যায় 'সমাচার দর্পণ'-এ এক পত্র লেখকের বক্তব্যে। ইংরেজি পোশাকের বিরুদ্ধে মত দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"আমি মনে করি হিন্দুস্থানী পোশাকাপেক্ষা ইংরেজি পোশাক বাঙালির নিমিত্ত তখন উত্তম কোনমতে নহে।" সম্পন্নের ঘরে ঘরে তখন আলনায় গোছানো "জামা নিমা কাবা কোরতা।"

উল্লেখ প্রয়োজন সেই প্লাবনের মুখে বাঙালি মেয়েদের পোশাকে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। তাঁরা

তখনও শাড়িখানাই আঁকড়ে ছিলেন। “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তঃপুরবাসিনীরা সক্‌ করিয়া পেশোয়াজ ইত্যাদি পরিতেন।” সেটা নিতান্তই ব্যতিক্রম।

> “শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়। আমি প্রতি দিন প্রাতঃস্নানে গিয়া থাকি গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তায় প্রত্যহ দেখিতে পাই যে কতকগুলিন বালক রাস্তায় বেড়ায় কেহ ২ ছোট ২ ঘোটকারোহণ কএক জন শকটারোহণ কএক জন অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে এই বালকগুলিন কোন ২ বড় মানুষ ইংরাজের হইবেক ইহাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম।... ... বালকেরদিগের নিকটে গিয়া আমি কহিলাম বাবু তোমার নাম কি একটী বালক কহিল আমার নাম শ্রী আধাঅমন বাবু। তোমার বাপের নাম কি শ্রী—ইহাতে নিশ্চয় জানিলাম সে বাঙ্গালি বালক বটে। ইংরাজী পোশাক পরিধান করিবার কারণ কি কিছু বুঝিতে পারি না যদি বল উত্তম পোশাক এই নিমিত্তে বালককে দিয়াছেন। আমি মনে করি হিন্দুস্থানি পোশাকাপেক্ষা ইংরাজী পোশাক বাঙ্গালির নিমিত্ত উত্তম কোন মতে নহে। সে যাহা হউক যদি এ পোশাক বাল্যাবধি পরিধান করিতে লাগিল তবে তাহাকে সে পোশাক চিরকাল ভাল ও সুখজনক বোধ হইবেক তবে সে বরাবরি পরিবেক। যখন মস্ত যোয়ান হইয়া ঐ পোশাক পরিয়া বাটীর মধ্যে যাইবেক তখন তাহাকে দেখিয়া যদি পরিবারেরা ভয়যুক্ত না হউক কেননা ঘরের নকল সাহেব জানেন যদি ভিন্ন লোক দেখে তবে অন্য লোকের সাক্ষাৎ কহিবেক যে অমুকেরদিগের বাটীর ভিতর এক জন সাহেবকে যাইতে দেখিলাম ইত্যাদি কলঙ্ক হইতে পারে।

অতএব বলি ইঙ্গরাজী পোশাক পরাইয়া বালকেরদিগের অভ্যাস করণের ফল কি দোষ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না যদি তাঁহারদিগের মতে কিছু গুণ থাকে তাহা লিখিয়া আমার থোথা মুখ ভোথা করিয়া দিবেন।”

চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৫ সনে। লক্ষণীয়, ইংরেজি পোশাকের সঙ্গে তখন সামাজিক অপবাদ জুড়বার চেষ্টা চলছে। ‘ঘটককারিকা’য় ছিল যবন-দোষের কথা। নতুনকালে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে ফিরিঙ্গি দোষের। ১৮৩১ সনে আরো একটি প্রতিবেদনে একই তির্যক মন্তব্য,

> “এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে যাহারা ভাল শিক্ষা করিয়াছে তাহারা প্রায় পরস্পর ইঙ্গরেজী ভাষা ভিন্ন পত্রাদি লেখে না এবং ইঙ্গরেজী কথা কহিতে পাইলে বাঙ্গলা বাক্য ব্যবহার করে না ইহারদিগের বাঞ্ছা এমনি হইয়াছে যে ঐ প্রকার পোসাক পরে তাহা পারে না ইহার কারণ আমি বিবেচনা করি সুন্দর দেখায় না অর্থাৎ ইউরোপীয় লোকেরদিগের শ্বেত বর্ণ ইহারা মলিন তাঁহারদিগের ন্যায় পোসাক পরিলে চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গি দেখায় দ্বিতীয় সেই পোসাক সহিত নিজ বাটীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে অন্য লোক দেখিয়া মনে করিবেক যে এক জন মেটে ফিরিঙ্গি ইহারদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল...”

যদিও এমিলি ইডেন-এর আঁকা হিন্দু কলেজের ছাত্রের ছবিতে রীতিমতো মুসলমানি প্রভাব, তবু বলা যায় বাঙ্গালিটোলা ইংরেজি পড়ুয়াদের পোশাকে সাহেবিয়ানার চল শুরু হয়ে গেছে তার আগেই। ১৮৩০ সনে সমাচার চন্দ্রিকায় এক পত্রলেখক লিখেছেন ছেলেকে ইংরেজি পড়াতে গিয়ে তাঁর কী বিপত্তি ঘটেছে। তিনি লিখেছেন

> “সংপ্রতি ঐ সন্তানকে দেশানুসারে পোষাক দিলে কহে আমি জগঝম্পওয়ালা বা কীর্তনের পাইল নহি যে এমত পোষাক পরিব বলে আমি মোজা ওয়াকিংশুজ ও ইজার আদি চাহি তাহা কোথা পাইবে সুতরাং এজন্য কোথাও যায় না মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার মত হইল ভাল অন্য ২ বালকের কি রীতি ইহা জানা উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার রীতি অন্য হইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে।”

এই সাহেবিয়ানা স্পষ্ট হয়ে ওঠে মাঝামাঝি। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতের অন্যান্য বড় শহরেও, বিশেষত বোম্বাইএ। বোম্বাইএ সাহেবি পোশাক চালু করেন পার্শীরা। অবশ্য স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন হিসাবে তাঁরা মাথায় নিজেদের টুপি পরতেন। কলকাতায় ইংরেজি পোশাক চালু করেন সেই বাঙালি বাবুরাই যারা একসময় হাঁক দিতেন—"আমার জামা জোড়া পাগ ইত্যাদি পোশাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার যাইব।" এবং যারা "বাক্যবিন্যাস যেখানে বলিতে হইবেক অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে কহেন বা কি হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে লিএজা চুঁচুড়া চুঁড়া ফরাশডাঙ্গা ফড্ডাঙ্গা কামড়িয়াছে কোম্‌ড়েছে টাকার নাম ট্যাকা মুখের নাম ব্যাঁৎ করো নাম কড়ো।" অর্থাৎ মুসলমান আমলে যারা কথাবার্তায় চালেচলনে এবং পোশাকে-আশাকে মুসলিম রীতি রপ্ত করার চেষ্টা করছিলেন তাঁরাই এবার সাহেবিয়ানায় দীক্ষা নিলেন। কেউ কেউ অবশ্য তারই মধ্যে পুরানো কেতা বাঁচিয়ে রাখেন। মাথায় পাগড়িটি তাঁরা চট্ করে খুললেন না। নতুন যুগের ঢেউ কতখানি উত্তাল হয়ে উঠেছিল তা বোঝা যায় বিদ্যাসাগরের একটি উপাখ্যানে। সেযুগে, বাঙ্গালিয়ানার জুড়ি নেই, 'শাদা ধুতি ও শাদা চাদর'কে যিনি গৌরবের আসনে বসিয়ে গিয়েছেন সেই বিদ্যাসাগরও কিন্তু একসময় অঙ্গে ধারণ করেছিলেন সাহেবি পোশাক। সেটা ১৮৫৭ সনের কথা। বাঙলার ছোট লাট তখন হ্যালিডে সাহেব। তাঁরই অনুরোধে বিদ্যাসাগরের সেই বেশ। ধুতি চাদরের বদলে পেণ্টুলুন, চোগা চাপকান পাগড়ি। অবশ্য মাত্র বার তিনেকের জন্য। তারপরই অবশ্য তিনি ত্যাগ করেন সেই সঙে-র বেশ।

চার ডজন খাপি সুতির সার্ট। চারটি প্যান্টুলুন। সুতির আন্ডারওয়্যার। ছয় ডজন মোজা। চার ডজন ঘাড়ের রুমাল। চার ডজন অন্য রুমাল। দু'তিনটি পশ্‌মি ওয়েস্টকোট। দুই ডজন সাদা সুতির ওয়েস্টকোট। একটি গরম গ্রেট কোট। দু'তিনটি অন্য কোট। কয়েকজোড়া বুট এবং সাধারণ জুতো....এইসব নিয়েই উনিশ শতকের প্রথম দিকে জাহাজে চড়তেন ইংরেজ অভিযাত্রী। জলপথে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে মাদ্রাজা বা কলকাতা তখন আট মাসের পথ। চল্লিশের দশকে সময়টা অবশ্য কিছুটা কমে যায়, একশো থেকে একশো কুড়ি দিন। ১৮৬৭ সনে সুয়েজ খাল খুলে যায়। তারপর যাকে বলে বাষ্পীয় পোত। ফলে যাতায়াতের সময়ও কমে যায়। একমাস থেকে ছ'সপ্তাহ। ছ'সপ্তাহই যথেষ্ট। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তা আরও কমে গিয়ে দাঁড়ায় তিন সপ্তাহ। ভারতযাত্রী ইংরেজের পোশাকের যে সংক্ষিপ্ত তালিকাটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ক্যাপ্টেন উইলিয়মসন-এর বই-এ। বইটির প্রকাশকাল ১৮১০। অর্থাৎ পথ যখন অতি দীর্ঘ।

ক্যাপ্টেন উইলিয়মসন-এর বই-এ মেয়েদের পোশাকের কোনও বিবরণ নেই। ঔপনিবেশিক ইংরেজকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন তীরে পৌঁছে কোনও সুন্দরী এবং গৃহকর্মে নিপুণা ভারতীয় রমণী সংগ্রহ করে নিতে। তাদের মাসে চল্লিশ টাকা দিলেই গোল মিটে যাবে। ঘরকন্নার কোনও ভাবনা থাকবে না। তাঁর পরামর্শ থেকে জানা যায়, যে সব ভারতীয় মেয়ে সাহেবদের সঙ্গে ঘর করে তাদের দশ জনের মধ্যে নয়জনই মুসলমান। তা ছাড়া পর্তুগিজ মেয়েরাও আসে। ওইসব মেয়েদের গয়নাগাটিরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তিনি।

উইলিয়মসনের ভেদমেকাম-এর (Vade-Me-cum) একটি সংশোধিত সংস্করণ বের হয়েছিল পনেরো বছর পরে। সেটির সম্পাদনা করেছিলেন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ জে বি গিলক্রিস্ট। ভারতীয় ভাষার একাধিক ব্যাকরণ অভিধান ইত্যাদি লিখে কুড়ি বছর এদেশে কাটিয়ে ১৮০৩ সনে তিনি দেশে ফিরে যান। লন্ডনে ভারতীয় ভাষা শেখাবার জন্য একটি স্কুল খোলেন। যাত্রীদের জন্য লেখা তাঁর বিবিধ পরামর্শের মধ্যে ভারতীয় রমণী সংগ্রহের কথা ছিল না । তার বদলে ছিল জাহাজযাত্রী মহিলাদের জন্য পোশাকের তালিকা। এটিও দেখবার মতো।

শেমিজ বাহাত্তরখানা। নাইট গাউন ছত্রিশখানা। নাইট ক্যাপ ছত্রিশখানা। ফ্লানেল পেটিকোট তিনখানা। ওই বডিস্ ছাড়া বারোখানা। স্লিপ বারোখানা। সুতির মোজা ছত্রিশ জোড়া। সিল্কের মোজা চল্লিশ জোড়া। সিল্কের কালো মোজা দুই জোড়া। সাদা পোশাক আঠারোখানা। ওই রঙিন ছ'খানা, ওই সান্ধ্য ছ'খানা। পকেট রুমাল ষাটখানা। বনেট তিন খানা। মর্নিং ক্যাপ বারোখানা। লম্বা গ্লাভস্ চব্বিশ জোড়া। ওই খাটো চব্বিশ জোড়া। করসেট চারখানা।

এইসব পোশাক নিয়ে ভারতে নামার পর প্রথম সমস্যা ছিল ভারতীয় গ্রীষ্মকে মোকাবিলা করা। কী ভাবে ভারতীয় সূর্যকে সহনশীল করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলেছে তৎকালে। গবেষণা কাপড় নিয়ে। গবেষণা কাপড়ের রং নিয়ে। পোশাকের ছাঁট নিয়ে। শারীরিক, শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া, রক্ত চলাচল ইত্যাদি নিয়েও চলেছে রকমারি 'বৈজ্ঞানিক' আলোচনা। এইসব আলোচনার ফলেই উদ্ভাবিত হয়েছিল দু'টি নতুন জিনিস। (১) শোলার টুপি, (২) কলেরা বেল্ট। শোলা টুপির আবিষ্কর্তা ডক্টর জুলিয়াস জেফারিস নামে একজন। ভারতীয়রা শোলার বলতে আগাছা শোলাকেই বুঝতেন। সাহেবদের কাছে সেই শোলাই আবার ছিল সূর্য-সম্পর্কিত। শোলার টুপি = সান হ্যাট।

শোলার টুপির প্রথম আবির্ভাব উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল তা ঔপনিবেশিকদের মাথায় মাথায়। এই টুপি শাসকদের বিশেষ চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। বাবালোগ, মেমসাহেব সকলের মাথায়ই তখন শোলার টুপি।

'কলেরা বেল্ট' মানে ফ্লানেলের কোমরবন্ধ। আট থেকে বারো ইঞ্চি চওড়া ঘাড়ের ওপর দিয়ে দু'টি ফিতে চালিয়ে দিয়ে কোমর এবং পেটের ওপর বাঁধা। ভারতীয় গ্রীষ্মে শরীরের সঙ্গে সরাসরি ফ্লানেলের আঁটোসাঁটো পোশাক রাখা সঙ্গত কিনা তাই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সেদিনের বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন অন্যত্র অহিতকারী হলেও ফ্লানেলের কোমরবন্ধটি অত্যাবশ্যক। সেটি পরলে কলেরার ভয় নাকি কম। সে কারণেই তার আর এক নাম কলেরাবেল্ট।

এসব পরেই সাহেবরা সেদিন পাগলা কুকুরের মতো। রোদ্দুরে বের হতে তাদের ডর ভয় নেই।

আঁটোসাঁটো প্যান্টুলুন পরা ইউরোপিয়ানদের দেখে চীনারা তাদের গ্রহণ করেছিলেন 'পশ্চিমী বর্বর' বলে। অন্যদের ভাষায়—'বিদেশী শয়তান।' একজন নাকি মন্তব্য করেছিলেন ওদের ভেতরে ক্রোধ আর হিংসাকে আটকে রাখার জন্যই এই পোশাকের বন্দোবস্ত। ঔপনিবেশিকতার সাফল্যের মূলেও কিন্তু অনেকাংশে এই পোশাক। সাহেবদের গায়ের রং আলাদা। ভাষা আলাদা। রীতিনীতি আলাদা। পোশাকও আলাদা। সুতরাং প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে তারা স্বতন্ত্র। তারা শাসকের জাত। প্রথমদিকে অবশ্য সাহেবরা ভারতীয় প্রকৃতিকে মেনে নিয়েছিলেন। একজন 'ওল্ড কান্ট্রি ক্যাপ্টেন' ১৭৮১ সনে কলকাতার 'ইন্ডিয়া গেজেট'-এ লিখেছিলেন তিনি ১৭৩৬ সন থেকে এ দেশে বাস করছেন। তখন ইউরোপীয় আগন্তুকরা ফ্যাশানের বদলে স্বাচ্ছন্দ্যকেই কাম্য বলে মনে করতেন। কাউন্সিলের সদস্যরা তখন বেনিয়ান সার্ট, ঢিলে পাজামা এবং কোঞ্জি টুপি পরে আরকের গ্লাস হাতে নিয়ে বৈঠকে বসতেন। প্রথম দিকে আগন্তুকদের পোশাকে এবং চালচলনে ছিল মুঘলাই হাওয়ার ছোঁয়া। তখন মসলিনের ঢিলে জামা, হিন্দুস্তানী বান্ধবী, আলবোলায় তামাক খাওয়া—কিছুতেই আপত্তি ছিল না। কিন্তু ক্ষমতা এবং প্রভাব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চালচলনেও পরিবর্তন দেখা দেয়। আধা-মুঘল সাহেবরা বাড়িতে ভারতীয় পোশাক পরলেও বাইরে বেরোতেন ফিটফাট ইংরেজটি সেজে। কেননা উচ্চতর ভারতীয়, সমমর্যাদার ভারতীয় এবং নিম্নবর্গের ভারতীয় সকলকে বোঝানো চাই তারা স্বতন্ত্র। তারা শাসক। এখনও পুরো শাসক যদিবা নন, হবু তো বটেই।

কেউ কেউ অবশ্য ব্যতিক্রম ছিলেন। আদ্যিকালের সাহেবদের মতো উনিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকেও তাঁরা ভারতীয় পোশাকে হঠাৎ হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে পড়তেন। ১৮৩০ সনে ফ্রেডারিক জন শোর নামে উত্তর ভারতের একজন বিচারপতি নিয়মিত আদালতে যাতায়াত শুরু

করেন ভারতীয় পোশাক পরে। তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্যই তখন প্রকাশিত হয় কঠোর সরকারী নিষেধাজ্ঞা—কোনও সরকারী কর্মচারী প্রকাশ্যে ভারতীয় পোশাক পরতে পারবে না।

এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল এমন কথা বোধহয় হলপ করে বলা যায় না। কেননা শোনা যায় ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহের পর এদেশের দায়িত্ব যখন সরাসরি ব্রিটিশরাজ গ্রহণ করেন তখন ভিক্টোরিয়া নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন ভারতে রাজসরকারের অসামরিক কর্মচারীদের জন্য ইউনিফর্ম চালু করতে। কলোনিয়াল অফিসের কর্মচারীদের ইউনিফর্ম ছিল। ভারত শাসন চলত কলোনিয়াল অফিস থেকে নয় ইন্ডিয়া অফিস থেকে। সেখানকার কর্তৃপক্ষ বারবার ইউনিফর্মের প্রশ্নটি তুলেছেন কিন্তু ভারত থেকে বিশেষ সাড়া মেলেনি। কারণ, ইউনিফর্ম মানে বাড়তি সরকারী খরচ।

লর্ড লিটন ভাইসরয় ছিলেন ১৭৭৬ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত। তিনি রাজ্য শাসনের আনুষ্ঠানিকতার একজন প্রবক্তা ছিলেন। রানীর কাছে তিনি অভিযোগ জানিয়েছিলেন এখানকার সরকারি অনুষ্ঠানগুলি দেখলে মনে হয় যেন 'ফ্যান্সি ড্রেস বল্‌স'। কেননা সরকারি আমলারা পোশাকে-আশাকে যদৃচ্ছ, যার যেমন ইচ্ছে তেমন সাজছেন। বিশ শতকের প্রথম দিকের আগে কোনও বেসরকারি আমলারই কোনও সরকারি ইউনিফর্ম ছিল না। কিছু কিছু অফিসার অবশ্য স্বদেশের তৃতীয় এবং পঞ্চম শ্রেণীর কর্মচারীদের মতো পোশাক পরতেন। তাদের দায়িত্ব ছিল রাজনৈতিক চরিত্রের। প্রতিনিয়ত তাদের ভারতীয় রাজন্যবর্গের সংস্পর্শে আসতে হত। নির্দেশ ছিল কোনও ভারতীয় নরপতির দরবারে গেলে ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট পোশাক পরতে হবে। সেই ইউনিফর্ম ছিল সোনালি এমব্রয়ডারি করা নীল কোট, ভেলভেট লাইনিং কলার কাফ। ট্রাউজারসও হবে নীল রং-এর। তাতে দু'ইঞ্চি চওড়া সোনালি লেসের কাজ। মাথায় বিভার কক্‌ড হ্যাট। টুপিতে উট পাখির পালক। কোমরে খাপে ঢাকা তলোয়ার।

সাহেব মেমরা এদেশে পৌঁছাবার পর গৃহস্থালি কাজে নিযুক্ত ভারতীয়দের দেখে স্বভাবতই চম্‌কে উঠতেন। চমক শুরু হত ডায়মন্ডহারবার থেকে কলকাতার পথে নৌকোর মাঝিমাল্লাদের আদুড় গা দেখে। ওদের চোখে মাঝিরা বলতে গেলে প্রায় উলঙ্গ। কোমরে জড়ান খাটো ধুতিখানা ডুমুর-পত্র বিশেষ। কলকাতায় পৌঁছে বাড়িতেও একই দৃশ্য। অসংখ্য ভৃত্য ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িময়। তাদের গায়ে কোন জামা নেই। কখনও কখনও খালি গায়ে খালি পায়ে নিঃশব্দে তারা মেমসাহেবের শোওয়ার ঘরেও ঢুকে পড়ে। যেন তারা পুরুষমানুষ নয়। ক্রমে অবশ্য সাহেব মেমরা ওদের দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। মনে হত, বুঝিবা কালো চামড়াই ওদের পোশাক। অন্তত একজন সাহেব তাই লিখেছেন। ধীরে ধীরে সাহেব-মেমরা তাদের বাড়ির কর্মীদের জন্য পোশাকের বন্দোবস্ত করেন। এক এক পদের জন্যে এক এক ধরনের পোশাক। দেখলেই বোঝা যায় কার কী কাজ, ভৃত্যকূলে কার কেমন মর্যাদা। সমসাময়িক চিত্রকরদের আঁকা ছবিতে দেখা যায় মুনশি বা বেনিয়ানদের পায়ে চটি রয়েছে, কিন্তু হুঁকো বরদারের পা খালি।

বাড়ির কাজের লোকেদের জন্যে ছিল দিশি পোশাক। প্রথম দিকে স্থানীয় কর্মচারীদের জন্য ছিল একই বন্দোবস্ত। বিচার বিভাগে এবং নানা অসামরিক দপ্তরে যারা সাধারণ কাজ করত, সাহেবরা তাদের মুঘল আমলের মতোই পোশাক করতে দিতেন। নীরদ সি. চৌধুরী লিখেছেন (কালচার ইন দি ভ্যানিটি ব্যাগ)—সাহেবরা ভারতীয়দের মুখে ইংরেজি শুনে যেমন বিরক্ত হতেন তেমনই ভারতীয়দের অঙ্গে ইংরেজি পোশাক দেখেও। কে জানে সমাচার দর্পণ-এর পত্রলেখকদের মতো ইংরেজি পোশাকে ভারতীয় হয়তো ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক! এখানে বলা দরকার সেলাই করা মুসলমানি পোশাকই হোক, আর ইউরোপীয় পোশাকই হোক বাঙালি বাবুরা কেউ সেসব পোশাক পরে বাড়ির

ভেতরে যেতেন না। সেখানে তৎকালে আনুষ্ঠানিক পোশাক ছাড়া বাদবাকি সব নিষিদ্ধ। ম্লেচ্ছ বলে বর্জিত। হিন্দু পুরুষের আনুষ্ঠানিক পোশাক বলতে তিন প্রস্ত বস্ত্র খণ্ড। এক টুকরো পরেন তাঁরা নিম্নাঙ্গে। সেটি ধুতি। উনিশ শতকের বাবুর ধুতি যেন বাহারে বিবির শাড়ি। তখন তারা "কালা প্যেড়ে রাঙ্গা প্যেড়ে শাল প্যেড়ে কাঁকড়া প্যেড়ে লিখক কহে ইচ্ছা হয় ছাই প্যেড়ে ধুতি পরিধান করেন।" সে লেখকই লিখেছেন—"এসকল স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে।" দ্বিতীয় উত্তমাঙ্গে সুতির চাদর বা শাল। তৃতীয় মাথায় পাগড়ি বা টুপি। এ পোশাক সাধারণত সুতির। তবে রেশমিও হতে পারে। নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডে উনিশ শতকেও হিন্দুরা এ পোশাকই পরতেন। সম্ভবত এখনও তাই পরেন। বিয়ের আসরে বরকেও সেলাই ছাড়া পোশাক পরতে হয়, তাই না? উনিশ শতকে বাবুরা মুসলমানি বা সাহেবি পোশাক পরে কাজ সেরে বাড়িতে ফিরে এসেই সেসব ধরাচুড়া বৈঠকখানা সংলগ্ন সাজঘরে খুলে ফেলে অভ্যস্ত পোশাক পরে হাঁপ ছাড়তেন। তারপর পা বাড়াতেন অন্দরমহলের দিকে।

সরকারি এবং সওদাগরি অফিসে সেসময় দেশি-বিদেশি মিলিয়ে এক জগাখিচুরি পোশাকেরও চল হয়। বোম্বাই-এ তা চালু করেন পার্শী 'প্রভুরা', কলকাতায় বাঙালি বাবুরা। বড়বাবু সাহেব হৌসে কাজ করতে চলেছেন। পায়ে ব্রাউন গ্লেস কিডের পাম্পশু, উরুর সঙ্গে গার্টার দিয়ে টানা হাফ মোজা। ন'গজ চুয়াল্লিশ ইঞ্চি মিহি ধুতি। কোঁচাটি জুতো থেকে আধ হাত ওপরে। গায়ে গলাবন্ধ সাদা কোট। বড় বড় পকেট, বড় বড় পেতলের বোতাম। মেজবাবু বলতে গেলে জীবন্ত হবসন-জবসন। ইতিহাসের একটি আস্ত অধ্যায়। পায়ে তার মোজাহীন শু। ফিতেগুলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৌশলে গোছানো। জুতো পরতে বা খুলতে কোনও ঝামেলা নেই। মেজোবাবুর ইংলিশ কফ সার্টের আধখানা ধুতির নীচে নির্বাসিত। গলার শেষ বোতামখানা টাই-এর কাজ করছে। হয়তো মাফলারও আছে তার। কিন্তু আপাতত সেটি কোটের পকেটে। পরের দিকে তারই ওপর কেউ কেউ মাথায় একখানা টুপি চাপিয়ে নিতেন। উনিশ শতকে সওদাগরি অফিসে তখন এই ইঙ্গভারতীয় পোশাকের ঠিক ততখানি চল হয়নি, তখন কাবাকুর্তার ওপর বাবুরা মাথায় তুলে নিতেন তাজ বা পাগড়ি। আর যত ঝামেলা ওই জুতো এবং পাগড়ি নিয়ে।

অষ্টাদশ শতকেই সাহেবরা জেনে গিয়েছিলেন ভারতীয়রা কোথায় জুতো পরতে পারেন এবং কোথায় নয়। জুতো নিয়ে তাদেরও বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হয়েছে একসময়। ১৮০৪ সনে লর্ড ভ্যালেনসিয়া গিয়েছিলেন মারাঠা অধিনায়ক পেশোয়ার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে ছিলেন রেসিডেন্ট কর্নেল ক্লোজ। লর্ড প্রাসাদ প্রাঙ্গণে পৌঁছান পালকিতে চড়ে। বাকি পথটুকু তাকে হাঁটতে হল। দরবার কক্ষের চৌকাঠে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। গোটা মেঝে সাদা কাপড়ে মোড়া। সেখানে জুতো পায়ে ঢুকবেন কেমন করে? বাধ্য হয়েই জুতো খুলে ফেলতে হল তাঁকে। তারপর আনুষ্ঠানিক সৌজন্য বিনিময়। সেসব শেষ হওয়ার পর পেশোয়া সিংহাসনে বসলেন। ঘরটিতে দ্বিতীয় কোন বসার আসন নেই। সুতরাং লর্ডকে এবার হাঁটু মুড়ে বসতে হল। লর্ড ভ্যালেনসিয়া লিখেছেন এভাবে বসে থাকার ফলে তিনি যারপরনাই ক্লান্ত বোধ করছিলেন। অনেক কষ্টে নাকি তিনি উঠে দাঁড়ান।

এদিকে কোনও কোনও ভারতীয় নাকি জুতো পায়ে সাহেবদের ঘরে দিব্যি ঢুকে পড়ছিলেন। ১৮৩০ সনে সেই বিচারপতি শোর সাহেব লিখেছেন—অনেক গণ্যমান্য ভারতীয় জুতো পায়ে ঢুকে পড়েন সাহেবদের ঘরে। এই অভব্যতা বেশি দেখা যায় কলকাতায়। অনেক সাহেবও জানেন না প্রাচ্য দেশীয় রীতিনীতি কী। আসলে কোনও ভারতীয়কেই জুতো পায়ে সাহেবদের সামনে আসতে দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ জুতো মোজা পায়ে ঢুকে পড়েন তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য—এক এক জাতির এক এক রীতি। ইউরোপীয়দের রীতি টুপি খোলা, ভারতীয়দের জুতো। সেটাই সম্মান জানাবার পদ্ধতি। তোমরা কি জুতো পায়ে কোনও স্বজাতিয়ের শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়? তা

হলে আমাদের প্রতিই বা অসম্মান দেখাচ্ছ কেন? আমার কোনও কুসংস্কার নেই। তোমরা কী রীতি পালন করবে সেটা তোমাদের ব্যাপার! হয় জুতো খুলবে, না হয় পাগড়ি।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে বিদ্যাসাগর মশাই-এর তালতলার চটি নিয়ে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে। তার আগেও বারবার উঠেছে 'শু কোশ্চেন'—পাদুকা প্রসঙ্গ। ১৮৩৬ সনে ভারতীয়দের পীড়াপীড়িতে পড়ে লর্ড অকল্যান্ড রাজভবনে জুতোকে ছাড়পত্র দেন। তাঁর বোন লিখেছেন ভারতীয়রা যেদিন ইংরাজি কেতায় জুতো পরে রাজভবনে হাজির হন সেদিন নাকি সে এক দৃশ্য। এমিলি লিখেছেন—নতুন আঁটোসাঁটো জুতোয় পা কেটে গেছে। তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে লাট বাহাদুরকে সেলাম জানাতে আসছেন একের পর এক জেণ্টু।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পৌঁছে দেখা গেল কলকাতার অনেক বাঙালি ইউরোপীয় স্টাইলে জুতো মোজা পরছেন। বাধ্য হয়েই গভর্নর জেনারেলকে কাউন্সিলে এক প্রস্তাব নিয়ে বলতে হল সরকারি বা আধা সরকারি কাজে যে সব ভারতীয় রাজসরকারের প্রতিনিধিদের কাছে আসবেন অতঃপর তাঁরা জুতো মোজা পরতে পারবেন। কুড়ি বছর পরে সারা ভারতেই চালু হল এই আইন। জুতো মোজা স্বাধীনতা পেল। তখন থেকেই অফিসে আদালতে জুতো পরার চল হয়। ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র আদালতের জজ সাহেবদের কক্ষ। কেননা, সে ঘর 'প্রাইভেট'। একান্ত ব্যক্তিগত। সেখানে তিনি যে নির্দেশ দেবেন সেটাই আইন।

জুতোর লড়াই-এ জেতবার পর শুরু হল বাঙালির পাগের লড়াই। ১৮৭০ নাগাদ কলকাতার একদল বাবু ছোটলাটের কাছে এক দরখাস্ত পাঠান। বক্তব্য সাহেবদের মতোই রাজদরবারে বা আদালতে মাথার পাগড়ি বা টুপি খুলে সম্মান জানাবার অধিকার চাই। তাঁরা বললেন পাগড়ি বাঙালির জাতীয় পোশাক নয়। পাগড়ি রোদ বা তাপ থেকে মাথাকে রক্ষা করতে পারে না। পাগড়ির জন্য কাজকর্মে অসুবিধা হয়। সুতরাং বাঙালির মাথা থেকে এই মোটের বোঝা নামিয়ে রাখবার অনুমতি দেওয়া হোক। তাঁরা বললেন সরকারি অফিসে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের দুটি শিরস্ত্রাণ রাখতে হয়। একটি হচ্ছে পাগড়ি। সেটি তাঁরা নিত্য বাক্স করে অফিসে নিয়ে যান কিংবা অফিসে রেখে আসেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে হালকা একটি টুপি। সেটিই আসলে তাঁরা পরেন। অফিসে কাজের সময় কোনও সাহেব ঢুকে পড়লে টুপি সরিয়ে রেখে পাগড়ি পরতে হয়। তাতে খুবই অসুবিধা। সুতরাং পাগড়ির বদলে টুপিকে চালু রাখলে তাঁরা খুশি হবেন। আবেদনকারীরা অবশ্য, তাদের কথাও ভোলেননি যাঁরা 'মাগের কাছে পেগের বড়াই' করতে চান। তারা বললেন যাঁরা পাগড়ি পরতে চান তাঁরা পরুন, আপত্তি নেই, আমরা চাই টুপি পরা এবং খোলার স্বাধীনতা। স্যার অ্যাসলি ইডেন বললেন তা হয় না। ব্যক্তিগতভাবে বাবুরা যাঁর যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু অফিসে ওই টুপি চলতে পারে না। কারণ, এই টুপি ওয়েস্টার্ন নয়, ওরিয়েন্টাল। সাহেবি নয়, দিশি।

প্রশ্ন ছিল পুরুষের পোশাক কী হওয়া বাঞ্ছনীয়? স্বভাবতই সেদিন এ-বিষয়েও নানা মুনির নানা মত। স্বদেশি না বিদেশি, মূল প্রশ্ন সেটাই। দুই মিলিয়ে কি নতুন কিছু করা যায় না? ভাবতে বসেন স্বদেশি-যুগের সেই অক্লান্ত সাধক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার ফলাফল কী হল তা জানিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। "জীবনস্মৃতি"তে তিনি লিখেছেন,—

> "ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া

এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে বারবার ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃজন-প্রতিভা বাঙালি ভদ্রলোকের স্বীকৃতি পায়নি বটে, কিন্তু তাঁরা নিজেরা সেদিন যে মূর্তিতে পথে ঘাটে, অফিসে আদালতে নিজেদের জাহির করছিলেন তাও কিন্তু কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়,—

"কারো এক ছুট;
কারো ধুতি উড়োণি, আর পায়ে দীর্ঘ 'বুট';
কারো ধুতির উপর ঝোলে একটি পিরান মোটে,
কারো সেটি অর্দ্ধ ঢাকা দীর্ঘ চায় না কোটে;
বিলাতী পিরাণ-কোট কারো চারু অঙ্গে,
কারো আবার 'নেকটাই' কাপড়ের সঙ্গে।"

কোন্ পোশাক বাঙালির পক্ষে ভাল, কোন পোশাক বেমানান তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন তিনি। ("ইংরাজী ও বাঙ্গালা পোষাক।") তিনি লিখেছেন

"বঙ্গদেশে নানা মুনির নানা মত সত্ত্বেও, এবং চাদর-নিবারিণী ইত্যাদি সভাসত্ত্বেও সাধারণতঃ মূল পোষাকের বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ধুতি চাদরের উপর বিলাতী সার্ট বা গলা আঁটা কোট এবং পায়ে জুতা-মোজা যোগ হইয়াছে মাত্র। ইহাই এখন জাতীয় পোষাক হইয়া দাঁড়াইতেছে। আর এই যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অবস্থা প্রভেদে বাঞ্ছনীয়।"

তাঁর মতে ধুতির সঙ্গে ইংরেজি ক্যফ ও প্লেটওয়ালা সার্ট পিরাণ মানায় না। ধুতি চাদরের সঙ্গে চাই মোলায়েম প্লেটের সার্ট। তা ছাড়া তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন খড়মের চেয়ে জুতো চলাফেরার পক্ষে সুবিধাজনক হলেও ধুতির সঙ্গে বুট জুতো চলবে না, চাই মোলায়েম "শু।"

তবে দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু ইংরেজি পোশাককে পুরোপুরি বাতিল করে দেননি। তিনি লিখেছেন,—

"ধরিতে গেলে সুবিধা অসুবিধা উভয়বিধ পরিচ্ছদেই আছে। তথাপি আমার বিশ্বাস যে, তুলনায় চলিবার পক্ষে প্যান্ট্-কোট ধুতি-চাদরের চেয়ে সুবিধা। কোন প্রকার শারীরিক পরিচালনা যাহাতে দরকার, তাহার পক্ষে ইংরাজী পোষাক সুবিধার—যেমন হাঁটা, দৌড়াদৌড়ি, অশ্বারোহণ।"

তবু প্রশ্ন থেকে যায় কার্যোপোযোগী পোশাক হিসাবে তবে কোন্‌টি গ্রহণ করা সঙ্গত? এ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন,—

"সর্ব্বনিম্নপদস্থ কর্মচারী ভিন্ন সকলেই ধুতি-চাদর পরিহার করিয়াছেন। তিন প্রকার পোষাক সাধারণতঃ পরিহিত হয়। বিলেত-ফেরতগণ সম্পূর্ণ ইংরাজী পোষাক পরেন (কতিপয় উচ্চপদস্থ বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অনেক 'নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান'ও উক্ত পোষাক পরেন)। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের দল (বিলেত-ফেরত বা ক্রিশ্চিয়ান না হইলে) সাধারণতঃ চায়না-কোট ও প্যান্ট পরেন এবং অপর সকলেই প্যান্ট-চাপকান ও চোগা বা পাক দেওয়া চাদরের দড়ি পরেন। মাথার পোষাক—প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের বিলাতী টুপি, দ্বিতীয়োক্তের বিলাতী ক্যাপ্, এবং শেষোক্তের মোগলাই পাগড়ি বা সাম্‌লা, কেহ কেহ বা ক্যাপ্‌ও পরেন।"

তিনি বলেন—"এ তিন রকম পোষাকের মধ্যে আমার মতে সুবিধা ও সৌন্দর্য্য হিসাবে ইংরাজী পোষাকই শ্রেষ্ঠ!" তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল চোগা চাপকান নিয়ে। কারণ,

> "নকল করিতে হয় ত মুসলমানের নকল ছাড়িয়া ইংরাজের নকল করাতে আমি কোন হীনত্ব দেখি না। কারণ, প্রথমতঃ এ মুসলমানী রাজত্ব নয়—ইংরাজী রাজত্ব; দ্বিতীয়তঃ এ মুসলমানী রাজত্ব হইলেও অনুকরণ করিতে হয় ও মুসলমান জাতির অনুকরণ করার চেয়ে নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত সভ্য ইংরাজের অনুকরণ কেন না করি; তৃতীয়ত: উপরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুবিধা হিসাবে ইংরাজী পোষাক মুসলমানী পোষাক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথাপি এই মুসলমানী পোষাক ধরিয়া থাকা স্বদেশ-হিতৈষিতা নহে, ইহা ইংরাজী-বিদ্বেষিতার গোঁ।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মুসলমানী পোশাক সম্পর্কে এই শুচিবাই একালেও দেখা গেছে। মনে পড়ে নীরদচন্দ্র চৌধুরী আধুনিক বাঙালি মেয়েদের সালোয়ার-কামিজ পড়ার বিরুদ্ধে এ-ধরনের যুক্তি বা অপযুক্তিই দেখিয়েছিলেন তাঁর এক প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু এ-ব্যাপারে অনেক বেশি ইতিহাস সম্মত এবং রুচি ও যুক্তির পরিচায়ক। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে লেখা তাঁর "কোট বা চাপকান" রচনায় তিনি সরাসরি চাপকানকেই বরণ করে নিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

> "আজকাল একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দেশে দেখা যায়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাতী পোশাক পরেন, স্ত্রীগণকে তাঁহারা শাড়ি পরাইয়া বাহির করিতে কুণ্ঠিত হন না। একাসনে গাড়ির দক্ষিণভাগে হ্যাট কোট, বামভাগে বোম্বাই শাড়ি। নব্য বাংলার আদর্শে হরগৌরীরূপ যদি কোনো চিত্রকর চিত্রিত করেন, তবে তাহা যদিবা 'সাল্লাইম' না হয়, অন্তত সাল্লাইমের অদূরবর্তী আর একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইবে।"

বাঙালির পক্ষে প্যান্ট কোটের অসুবিধা কী, সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে কোট প্যান্টের বদলে আচকান-চাপকানকেই শ্রেয় বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

> "কারণ যদি চাপকান ও কোট দুটোই তাঁহার নিকট সমান নূতন হইত, যদি তাঁহাকে অফিসে প্রবেশ ও রেলগাড়িতে পদার্পণ করিবার দিন দুটোর মধ্যে একটা প্রথম বাছিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে এ-সকল তর্কের উত্থাপন হইতে পারিত। চাপকান তাঁহার গায়েই ছিল, তিনি সেটা তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাহা ত্যাগ করিয়া যেদিন কালো কুর্তির মধ্যে প্রবেশপূর্বক গলায় টাই বাঁধিলেন, সেদিন আনন্দে ও গৌরবে এ-তর্ক তোলেন নাই যে, পিতা ও-চাপকানটা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন।
>
> তোলাও সহজ নহে, কারণ চাপকানের ইতিবৃত্ত ঠিক তিনিও জানেন না, আমিও জানি না। কেননা মুসলমানদের সহিত বসনভূষণ শিল্পসাহিত্যে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান হইয়া গেছে যে, উহার মধ্যে কতটা কার, তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন।...
>
> ... ...যেমন আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয়জাতীয় গুণীরই হাত আছে; যেমন মুসলমান রাজ্যপ্রণালীতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল।"

এই রচনায় ভারতীয়-ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে আরও বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছেন,—

> "...মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই; এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল

আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতু-দ্রব্য নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্য, গীত, এবং রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে। তখন ভারতবর্ষের যে একটি বাহ্যাবরণ নির্মিত হইতেছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের ডান হাত ও বাম হাত হইয়া টানা ও পোড়েন বুনিতেছিল।... ...

...যদি সত্য হয়, চাপকান পায়জামা একমাত্র মুসলমানদেরই উদ্ভাবিত সজ্জা, তথাপি এ-কথা যখন স্মরণ করি, রাজপুতবীরগণ, শিখসর্দারবর্গ এই বেশ পরিধান করিয়াছেন, রাণাপ্রতাপ রণজিৎসিংহ এই চাপকান পায়জামা ব্যবহার করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তথন মিস্টার ঘোষ-বোস-মিত্র, চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে-মুখুয্যের এ-বেশ পরিতে লজ্জার কারণ কিছুই দেখি না।"

খেদ এই, একালের হিন্দুত্ববাদীরা ভারত-ইতিহাসে লেনদেনের এই গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা আজ যেন পুরোপুরি বিস্মৃত। উল্লেখ করা প্রয়োজন স্বাধীনতার পরে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার কিন্তু চাপকান, আচকানকে বলতে গেলে প্রায় সরকারি পোশাকের মর্যাদা দিয়েছিলেন। বিকল্প হিসাবে ছিল প্যান্টের সঙ্গে গলাবন্ধ কোটের ব্যবস্থাপত্র। জাতীয় নেতা থেকে শুরু করে সর্বস্তরে অবশ্য ধুতি সগৌরবে বহাল ছিল। ধুতির সঙ্গে পঞ্জাবি বা কোর্তার উপর ছোটমাপের কোট, সাধারণের কাছে নাম ছিল যার "জওহর কোট,"—তাও দিব্যি চলছিল।

ধুতির জয়যাত্রা অবশ্য শুরু হয়েছিল বলতে গেলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। সেটা স্বদেশি আন্দোলনের, বিলাতি-বর্জনের যুগ। ১৯০৫ সালে শুরু হয় বিলাতি কাপড় পোড়াবার ধুম। স্বভাবতই তার আগের মুহূর্তে যাঁদের সামনে প্রশ্ন ছিল বিলাতি পোশাক, না দেশি পোশাক, তাঁরা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে মাথায় তুলে নেন মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়। সুতরাং, ১৯০৫ সালে দেখি মতিলাল নেহরু পুত্র জওহরলালকে এক চিঠিতে লিখছেন—

"ইংরেজরা হয়তো ধুতিকে অশোভন পোশাক বলে মনে করেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে ধুতির কোনও বিকল্প নেই। বাংলায়, এখন বলতে গেলে ধুতিরই রাজত্ব। বাঙালিরা খালি পায়ে ধুতি চাদর পরে অফিসে যাচ্ছেন। চাকুরি হারাতে হয় তো ঠিক আছে, কিন্তু তাঁরা ধুতি ছাড়তে রাজি নন। নিয়োগকর্তাদের উপায় কী তাঁদের ইচ্ছাকে মেনে না নিয়ে? বাংলায় হাইকোর্টের বিচারপতি, ব্যারিস্টার, সলিসিটার থেকে শুরু করে সব ভদ্রলোক এবং ব্যবসায়ীরা ইংরেজি পোশাক ত্যাগ করেছেন।"

জওহরলালও অতএব দীর্ঘকাল ছিলেন ধুতির বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম।

কথায় আছে—যখন রোমে থাকবে তখন রোমানদের মতো আচরণ করবে। ভারতে ইংরেজরাও অতএব মুঘল বাদশা হতে চাইলেন। পনেরো শতক, হয়তো তার আগে থেকেই।

ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে রাজা-রাজড়ারা শুধু তাঁদের দণ্ডমুণ্ডের নয়, বলতে গেলে আধ্যাত্মিক জীবনেরও নিয়ামক। রাজদর্শন, আলিঙ্গন, কিংবা রাজার হাত থেকে পাওয়া উপঢৌকন প্রজার কাছে তখন পরম প্রাপ্তি। মুঘলরা ভারতে আসেন ষোড়শ শতকে। তাঁদের কাছে পোশাক শুধু শরীরের আবরণ বা আভরণ নয়, পোশাক প্রভুত্ব বা ক্ষমতার প্রতীকও নয়, বলতে গেলে পোশাকই রাজকীয় ক্ষমতা স্বরূপ। সুতরাং মুঘল বাদশা যখন কাউকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও পোশাক দান করেন তখন তিনি শুধু অনুগতকে পুরস্কৃত করেন না, যেন তাঁর প্রভুত্বের অংশও ভাগ করে দেন। মুঘল দরবারে বাদশার দেয় এবং প্রাপ্য দুই-ই ছিল। বাদশাকে দিতে হত স্বর্ণমুদ্রা। সেটা প্রণামী বা নজরানা। আর বাদশা অনুগতকে দেন খিলাত। খিলাত অনেক কিছুই হতে পারে: পোশাক, অস্ত্র, ঘোড়া, হাতি। বাদশা যখন নিজের গা থেকে খুলে কোনও অনুগতকে কোনও পোশাক দেন তখন তাঁর শারীরিক স্পর্শবশত সে পোশাক বলতে গেলে মন্ত্রঃপূত হয়ে যায়। রাজা প্রজা এই পোশাকের

মাধ্যমে তখন একান্ত আপন, একে অপরের অংশ যেন।

পোশাকি খিলাত তিন প্রস্ত হতে পারে, আবার পাঁচ কিংবা সাত প্রস্তও হতে পারে। সাত প্রস্ত হলে তাতে থাকবে পাগড়ি, জামা বা পুরো দৈর্ঘ্যের একটি কোট, কাবা বা লম্বা একটি গাউন, আলখালিক বা আঁটোসাঁটো আর একটি কোট, একাধিক বাহারি কোমরবন্ধ, ট্রাউজারস, শার্ট এবং একটি স্কার্ফ। খিলাতের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানজনক ছিল বাদশার নিজের মাথা থেকে খুলে দেওয়া পাগড়ি। পাগড়ি খুলে পায়ে রাখার অর্থ সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার। অধীন অমাত্য বা অনুগত বাদশাকে সম্মান জানাতেন তিনভাবে সেলাম জানিয়ে—কুর্নিশ, তশলিম এবং শিজদা। পাগড়ি খুলে পায়ে রাখাও সম্মান জ্ঞাপন। তবে মূলত তা চরম বশ্যতার প্রকাশ। যিনি রাখলেন তিনি বাদশার হাতে নিজের মুণ্ডুটিই যেন তুলে দিলেন। মধ্যযুগের ইউরোপের রাজমুকুটের মতোই মুঘল যুগের পাগড়ি। উনিশ শতকে কর্তৃপক্ষ বারবার ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন তাঁরা যেন কোনও অবস্থাতেই হিন্দু বা মুসলমানের পাগড়িতে হাত না দেন।

জাহাঙ্গীরের দরবারে রাজা জেমস-এর দূত হিসাবে স্যার টমাসরো'র আগমনের পর (১৬১৫) থেকেই ইংরেজরা ধীরে ধীরে মুঘলদের এইসব রীতিনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। রো বাদশার জন্যে নিয়ে এসেছিলেন কিছু লাল কাপড়। মুঘল দরবারের বৈভব বিলাসিতা এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দেখে অভিভূত রো সেই বস্ত্র খণ্ড আর বাদশার হাতে তুলে দিতে পারেননি। তার বদলে তিনি জাহাঙ্গীরকে উপহার দেন নিজের কোমরবন্ধ এবং তলোয়ার। জাহাঙ্গীর রো-কে খিলাত দিয়ে সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রো সুকৌশলে সে প্রস্তাব এড়িয়ে যান। একজন গবেষক লিখেছেন—সম্ভবত রো বুঝতে পেরেছিলেন মুঘল দরবারে খিলাত গ্রহণের তাৎপর্য কী।

১৮২৭-২৮ সনে ক্যাপ্টেন মান্ডি যখন দিল্লির দরবারে গিয়ে বাদশাকে নজর দেন তখন বিনিময়ে অবশ্য তাঁকে খিলাত গ্রহণ করতে হয়।

নিজেদের ক্ষমতার এলাকা বেড়ে যাওয়ার পর আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই কোম্পানির প্রতিনিধিরা যেমন মুঘলদের কাছ থেকে উপাধি গ্রহণ করতে শুরু করেন তেমনি নিজেরাও অনুগতদের মধ্যে বিলি বিতরণ আরম্ভ করেন নানা ধরনের খিলাত। তবে দৃশ্যত এক হলেও মুঘল আর কোম্পানির দানের মধ্যে অনেক ফারাক। কোম্পানি যা দেয় তা 'উপঢৌকন'। কোম্পানির কর্মচারীরা ভারতীয়দের কাছ থেকে কোনও উপঢৌকন পেলে তার সমমূল্যের জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া হত দাতাকে। ভারতে রাজা-বাদশারা অধীনদের কাছ থেকে নজরানা হিসেবে যা পেতেন বিনিময়ে সবসময়ই দিতেন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। সওদাগর ইংরেজ সেখানে পৌঁছাবে কেমন করে? তারা উনিশ শতকের ইউরোপে যাকে বলে 'অর্থনৈতিক মানুষ'।

মহাবিদ্রোহের পর ভিক্টোরিয়া শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে। ১৮৬১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ইংরেজের দেওয়া খিলাত—'স্টার অব ইন্ডিয়া'। তারপর ১৮৭৭ সালে ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষিত হন। সেই উপলক্ষে ভারতেশ্বরী হিসাবে রানির নতুন পদবি হয়—'কাইজার-ই-হিন্দ'। অতঃপর শুরু হয় রাজকীয় অনুগ্রহ বিতরণের মহোৎসব। রায়বাদাদুর, খানবাহাদুর এসব ছিটেফোঁটা মাত্র। তবু তাই নিয়ে সে কী কাড়াকাড়ি। বাংলা সাহিত্যে তা নিয়ে, সবাই জানে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও কম হয়নি। স্টার অব ইন্ডিয়া প্রথম বিতরণ করা হয় পঁচিশজন ব্রিটিশ এবং ভারতীয়ের মধ্যে। চার বছর পরে সেটিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: নাইট গ্র্যান্ড কমান্ডার, নাইট কমান্ডার এবং কম্পেনিয়ন। ইংরেজের দেওয়া এই খিলাতেও প্রধান ছিল পোশাক। একটি জোব্বা। গোটা শরীরে ঢেকে যায়। রং নীল। ধারে সাদা সিল্কের বর্ডার। কোমরে বাঁধা হত

সাদা সিল্কের কর্ড দিয়ে। কর্ডের মাথায় নীল এবং রূপালি ট্যাসেল। আলখাল্লাটির বাঁদিকে হৃৎপিণ্ডের ওপরে সোনালি সুতোয় সূর্যের কিরণ ছটা। মাঝখানে হিরে-খচিত একটি বাক্য—হেভেনস লাইট আওয়ার গাইড'। তৎসহ একটি তারকা। অনেক কিছুই ছিল অলঙ্কার হিসেবে। এমনকী রানির একটি প্রতিকৃতি পর্যন্ত।

নিয়ম ছিল প্রাপক মারা গেলে আলখাল্লাটি রাজসরকারকে ফেরত দিতে হবে। অর্থাৎ এই খিলাত ব্যক্তিগত, পরিবারের কোনও অধিকার নেই তাতে। বলা বাহুল্য ভারতীয়দের এই রীতি মোটেই পছন্দ হয়নি। জোব্বাটিই কি সকলের পছন্দ হয়েছিল? অন্তত একজনের না। তিনি হায়দরাবাদের নিজাম। নিজামের দরবারের তরফ থেকে বলা হয় তাঁর পরিবারে নিজস্ব ঐতিহ্য সম্মত পোশাক ছাড়া অন্য কিছু পরার রেওয়াজ নেই। ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁদের পূর্বপুরুষদের পোশাক পরতেই অভ্যস্ত। সুতরাং প্রজারা রঙ্গব্যঙ্গ করবে। মুসলমানী প্রথা অনুসারে বুকে প্রতিকৃতি ধারণও নিষিদ্ধ। ইত্যাদি। নিজাম পোশাকটি গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু গায়ে তোলেননি। তা নিয়ে নাকি ইংরেজেরা তখন বিশেষ পীড়াপীড়িও করেননি। উনিশ শতকের শেষদিক থেকে অবশ্য নিজামসহ সব রাজন্যবর্গই সানন্দে এই খিলাত অঙ্গে ধারণ করেছেন। বশ্যতা তখন প্রশ্নাতীত।

কাইজার-ই-হিন্দ ভিক্টোরিয়ার এই নতুন পদবীকে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের আরবি এবং উর্দু অধ্যাপক মীর আউলাদআলি বলেছিলেন যেন কিছুটা আরবি কিছুটা পার্শী পোশাক পরা একজন ইউরোপীয় মহিলা যাঁর মাথায় রয়েছে ভারতীয় তাজ। ১৮৬৯ সালে ডিউক অব এডিনবরা ভারত দর্শনে আসেন। প্রিন্স-অব-ওয়েলস আসেন ১৮৭৫-৭৬ সালে। তারপর রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের ভারত সম্রাট হিসাবে গ্রহণ উপলক্ষে ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন আয়োজিত দিল্লির দরবার। ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন। ডিউক অব এডিনবরা ভারত পরিদর্শনে (১৮৬৯) যখন আসেন, তাঁর পার্শ্চরদের অঙ্গে ছিল তখন সতেরো শতকের বিলিতি পোশাক। ১৮৭৭-এর দরবারে শাসকদের পোশাক ছিল ভিক্টোরিয়া আমলের সামন্তদের পোশাক। ভারতীয়দেরও স্বভাবতই হাজির হতে হত ইংরেজের দেওয়া খিলাত গায়ে চাপিয়ে। শাসক ইংরেজরা তখন স্বদেশে নতুন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবর্গের মানুষদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি দেখে উদ্বিগ্ন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে তারা পুরানো মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য রকমারি প্রাচীন অনুষ্ঠান নতুন করে চালু করছিল। কিছু কিছু প্রাচীন প্রতীক এবং পার্বণ আবিষ্কৃত হচ্ছিল। ভারতেও তাঁরা আশ্রিত রাজন্যবর্গ এবং অনুগতদের নিয়ে সেধরনেরই একটি মায়ালোক তৈরির চেষ্টা করছিলেন। দ্রুত পরিবর্তিত সামাজিক এবং আর্থিক পরিবেশে যদি প্রাচীন স্থিতিশীলতা এবং ঐতিহ্যকে ধরে রাখা যায় তারই চেষ্টা। দেখা গেল 'স্টার অব ইন্ডিয়া' বা খিলাত দিয়ে সেটা সম্ভব নয়। সুতরাং অতঃপর শুরু হয় ভারতের প্রাচীকরণ-'ওরিয়েন্টালাইজিং ইন ইন্ডিয়া'। অর্থাৎ ভারতীয়দের পোশাকে অন্তত ইংরেজ নাবা নিয়ে ভারতীয় করেই রেখে দেওয়া। কারণ তাতে শুধু যে ঐতিহ্য বাঁচে তাই নয়, ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে পোশাকে অসম প্রতিযোগিতারও অবসান ঘটে। এই নতুন তত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৮৭৬ সালে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত দর্শনের সময়। ভারতীয়দের পোশাকে সে কী রং-এর বাহার!

১৮৮০ সালের আগে ভারতে সেনাবাহিনীর পোশাক ছিল ইউরোপীয়। এবার তারও ভারতীয়করণ শুরু হয়। শিখরা পাগড়ি পান এবং গোর্খারা পছন্দের টুপি ও খুকরি। অনেক ব্রিটিশ অফিসাররাও পোশাকে ভারতীয় স্পর্শ বরণ করে নিলেন। ভারতীয় বাহিনী যেন এতদিনে সত্যকারের ভারতীয় হল। তার অফিসাররা যেন এক-একজন মুঘল অধিনায়ক। মজার কথা, এই সেনাবাহিনীতে পাগড়ি সম্মান পেলেও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আজ শিখের মাথার পাগড়ি নিয়ে থেকে থেকেই কোলাহল। বোঝা যায়, ভারত সাম্রাজ্য ইংরেজদের হাতে নেই।

মহাভারতে দ্রৌপদী-বস্ত্র হরণের কথা আছে। কিন্তু তাঁর পরনে কি কোনও শাড়ি ছিল সেদিন?

সম্ভবত নয়। অন্তত চার্লস ফ্যাব্রির (ইন্ডিয়ান ড্রেস) তাই ধারণা। কেননা, আজ আমরা যাকে শাড়ি বলি সেদিনের ভারতে সে বস্তু ছিল না। "চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি"—এই ছবিতে যে রূপ কল্পনা স্বভাবতই তাও ছিল না। চলমান শাড়ি যেন বহমান নদী। দু'টি পাড় নদীর দুই কূল। জলধারা ঢেউ খেলে এঁকে বেঁকে চলে গেছে কোনদিকে। আঁচলখানি যেন নদীর মোহানা। চার্লস ফ্যাব্রি মনে করেন শাড়ি নয় দ্রৌপদী সেদিন পরেছিলেন একটি ধুতি। বড়জোর বলা যায় ছোট শাড়ি। সে বস্ত্রখণ্ড তার কোমরে জড়ানো ছিল মাত্র। শরীর পেঁচিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠে ছড়িয়ে পড়েনি। টানাটানিতে তবু যে খোলা যাচ্ছিল না তার কারণ কি নারী কি পুরুষ ভারতীয় পোশাকে সেদিন কোমরবন্ধ ছিল অত্যাবশ্যক গহনার মতো। চার্লস ফ্যাব্রি মনে করেন আধুনিক শাড়ি নিতান্তই অর্বাচীন। তার আবির্ভাব অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে। এবং শাড়ি, নিম্নাঙ্গের পুরানো বস্ত্রখণ্ডটি সম্প্রসারিত হয়ে শাড়ির চেহারা পায়নি পেয়েছে উত্তরভারতের উত্তমাঙ্গের পোশাক দোপাট্টা বা ওড়নি রূপান্তরিত হয়ে। আর আদি শাড়ি ক্রমে চলে যায় ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে অন্তরালে। ফ্যাব্রির মতে সে শাড়ি পেটিকোট। তিনি কাংড়া চিত্রকলায় শাড়ির এই রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন। ১৮০০ সাল নাগাদ সম্প্রসারিত ওড়নি ছড়িয়ে পড়ে রাজস্থান এবং পঞ্জাবে। ১৮২০ নাগাদ সমগ্র উত্তর ভারতে। তারপর বোম্বাই থেকে বাংলা, সর্বত্র। এই শাড়ির সঙ্গে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বোধহয় কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। বরং মুসলমানদের প্রভাব থাকার সম্ভাবনা বিলক্ষণ। কেননা শরীর খোলা রাখা মুসলমানরা পছন্দ করেন না। তাঁদের রুচি নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে ভারতীয় জনরুচিতেও। উল্লেখ করা প্রয়োজন, উত্তমাঙ্গে কিছু না পরাই ছিল দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতীয় ঐতিহ্য। মুসলমানদের আবির্ভাবের পর সে ঐতিহ্যে ছেদ পড়ে। ইংরেজের আবির্ভাব নতুন অভ্যাসকে আরও ব্যপ্ত এবং ত্বরান্বিত করে,—এই যা।

ফেনি পার্কস ১৮২৩-২৮ সালে এদেশে ঘুরে বেরিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার দীর্ঘ এক কাহিনী লিখেছিলেন । কলকাতায় এক অভিজাত বাঙালি বাবুর অন্দরের মেয়েদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। ফিরে এসে জার্নালে লিখেছিলেন—এদের অন্দরমহলে স্বামী ছাড়া আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই, কেন সেটা বোঝা যায়। মেয়েদের পরনে মিহি বেনারসি। সোনালি পাড়। দু' প্যাঁচ দিয়ে পরা বাড়তি অংশটুকু কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠে ফেলে রাখা হয়েছে। বলতে গেলে বেশ স্বচ্ছ পোশাক, আবরণ হিসেবে একেবারেই অর্থহীন। বটতলার সচিত্র প্রেমপত্রে যখন নায়িকা লিখছেন—

"বাজারে গুজব ভারি
মল্লিক নেফিউর বাড়ি
অপূর্ব জ্যাকেট এক হয়েছে নির্মাণ।
...কিনে দাও সে জ্যাকেট
শূন্য হবে না পকেট
অধীনীর এই আশ অচিরে পূরাও হে!"

তখন ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ১৮৬০-এর পর থেকে প্রবল হয়ে উঠেছে ব্রাহ্ম আন্দোলন। ইংরেজের সংসর্গে এবং নতুন ধ্যানধারণার ফলে পোশাকে রুচিবোধ অনেক পালটে গেছে। মেয়েরা সায়া শেমিজ চোলি ব্লাউজ ইত্যাদিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। তার আগে, ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে কিন্তু বাংলায় অন্তত চলছে অনঙ্গ মঞ্জরীর যুগ। মেয়েরা তখন একান্ত ভাবেই শাড়ি-সর্বস্ব। ১৮৩৫ সালে সমাচার দর্পণে এক পত্রলেখক লিখছেন—

"এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য্য ইহা অনেক দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়। যেহেতুক পুরাণ

কাব্যাদি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়রা উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কদর্য্য নব্য ব্যবহার কেন গ্রহণ করিয়াছেন।

যেহেতুক বর্ত্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম সম্ভবে না যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্ব্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয়রা এতদবস্থা বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত্যনুসারে নানাভরণে স্ত্রীলোকদিগকে সুশোভিতা করিবার প্রযত্ন রাখেন। অথচ যে স্থলে স্বর্ণ মাণিক্য মুক্তাদি বহুমূল্যাভরণ দিতেছেন সেস্থলে একখানি সূক্ষ্ম শাটী হদ্দ পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের কি সুশোভিতা হয়। যদি বলেন শাটী বস্ত্র কী বহুমূল্যের হয় না। উত্তর যদ্যপিও হইয়া থাকে তথাপি এতদ্দেশীয় সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি চন্দ্রিকা সম্পাদককৃত দূতীবিলাসে অনঙ্গমঞ্জরীর উত্তম বেশবর্ণনে। সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণানুযায়ি বসনের সুদৃশ্যতা হইয়াছিল। অতএব বিজ্ঞ মহাশয়রা এই ঘৃণিত ব্যবহার পরিবর্ত্তনে মনোযোগ করুন।"

পত্রলেখক বাঙালি মেয়েদের জন্য এমনকী হিন্দুস্থানী পোশাক চালু করার পক্ষেও সওয়াল করেন। তিনি লিখেছিলেন—

"এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেস্তাদার ও উকীল ইত্যাদি মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা কোরতা অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সম্ভ্রমার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব২ কুলাঙ্গনাদিগকে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার করাইলে কদাচ দুষ্য হইতে পারে না। বরং সুদৃশ্যা ও সলজ্জিতা দৃষ্ট হইতে পারে।"

কিন্তু বাঙালি মেয়েরা বা তাদের কর্তারা শাড়ির মায়া ছাড়তে রাজি হলেন না। বস্তুত এদেশের মেয়েদের মধ্যে ইউরোপীয় মেয়েদের পোশাকের চল যদিও কিছু কিছু দেখা যায় তবে সেটা নিতান্তই একালের ঘটনা। ইউরোপীয় পোশাকভাবে গৃহীত হয়েছে একমাত্র শিশু এবং কিশোরী কন্যাদের ক্ষেত্রে। বলতে গেলে ফ্রক আজ দেশের সর্বত্রই কম বয়সী মেয়েদের একমাত্র পোশাক। উনিশ শতকে কিন্তু তেমনটি ছিল না। বয়স্ক মেয়েরাই ব্লাউজ পেটিকোট পরেছেন অনেক পরে। নীরদ সি চৌধুরী লিখেছেন মেয়েরা তখন পেটিকোটের বদলে নিতম্বে আলতা মাখাতেন। আভা দেখে নাকি মনে হত লাল পেটিকোট!

শুধু একজন পত্রলেখক নয়, এই অশালীনতার বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে ১৮৫১ সালে বর্ধমানের রাজা মিহিধুতি শাড়ির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সেই সুসংবাদ জানিয়ে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় লিখছে

"...কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সরু কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণা, শান্তিপুরাদি স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণারম্ভ হয় ঐ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গ দেশীয় পুরুষ পুরুষীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরেন তাঁহারদিগের কি না দেখা যায়, বিশেষতঃ স্নান করিয়া উঠিলে শরীরের সর্ব্বাঙ্গের সূক্ষ্মরোম পর্য্যন্ত অন্য লোকের দৃষ্ট হয়, ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্যবর মহাশয়গণ আপনারদিগের পরিবারাদির মধ্যে এই কুব্যবহার রাখিয়াছেন ইহাতে আমরা পূর্ব্বাপর আক্ষেপ করিয়া আসিতেছি এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম বর্দ্ধমানাধিশ্বর মহারাজা তাঁহার অধিকার হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার অধিকারে কেহ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন না, যদি করেন তবে দণ্ডযোগ্য হইবেন।..."

এই আইনের ফল কী হয়েছিল কে জানে। তবে রুচিবদলের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পোশাকও যে বদলে যাচ্ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নয়তো গাঁয়ের মেয়েই বা কেন বায়না ধরবেন মল্লিক বাড়ির জ্যাকেটের জন্য।

বাঙালি মেয়েরা তবু শাড়ি পরতেন। দশ হাত কাপড়ে তারা শালীনতার কতখানি রক্ষা করতে পারতেন তা ওইসব লেখালেখি থেকেই অনুমান করা যায়। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে কেউ কেউ আঙ্গিয়া পরতেন। আঙ্গিয়া মানে বডিস। কিন্তু একজন লিখেছেন তাদের অন্তর্বাস ছিল যাচ্ছেতাই। অর্থাৎ ছিল না। রুচিবোধ এবং নৈতিকতার স্বার্থে উচিৎ কিছু পরা। আর একজন লিখেছেন বাঙালি মহিলাদের লাজলজ্জা শুধু মুখখানা ঘিরে। হঠাৎ কোনও পুরুষ অন্দরে ঢুকে পড়লে মেয়েরা ত্রস্ত হাতে শাড়িতে মুখ ঢাকতেন। অন্যদিকে তাদের বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই।

কী করে কোন্ পোশাকে শালীনতা রক্ষা করা যায় তা নিয়ে তৎকালে বিস্তর লেখা লেখি এবং তর্ক বিতর্ক হয়েছে! মেয়েরাও তা নিয়ে আলোচনা কম করেননি। 'সূক্ষ্মবস্ত্র' পরা নিয়ে ১২৭৫ সালে 'বামাবোধিনী পত্রিকায়' একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃতি যোগ্য।

"...সভ্য জাতি আছে যত, সবাকার এক মত,
সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধেয় নয়।
সভ্যদেশ সাধারণ, করিয়াছে নির্বাচন,
যাহা, তাহা অকারণ নয়;
কর সবে দরশন, বসনের প্রয়োজন,
সূক্ষ্মতার সিদ্ধ নাহি হয়।
শীত বাত নিবারণ, সভ্যতার সম্পাদন,
আর লজ্জা করা নিবারণ;
এই কয় প্রয়োজন, প্রধানতঃ সুসাধন,
করিবারে বসন ধারণ।"

অথচ কবি দেখিয়েছেন শান্তিপুর, চন্দ্রকোণা, সুরপুর, ঢাকা, সিমুলিয়ার তাঁতীরা "সূক্ষ্মবস্ত্র বোনে অতিশয়।" আর বাঙালি যুবক-যুবতীরা "হয়ে সবে হৃষ্ট মন, পরি তাই, ভাবে অনুপম।"

"দেখ দেখি বালাগণ, এত সূক্ষ্ম যে বসন,
করে কি সে অঙ্গ আবরণ?
বসনে উলঙ্গ হায়! সভ্যতা কি থাকে তায়?
নহে সে কি লজ্জার কারণ?
হায়! একি লজ্জাকর, যে বসন লজ্জাহর,
তাই এবে লজ্জার কারণ!"

কবি মনে করেন এই সূক্ষ্মবস্ত্র পরার জন্যই মেয়েরা আজ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ। ("হেন দেশে বামাগণ, অবরোধে রুদ্ধ রন, ইহা কভু নহে অনুচিত)"। তবু ভাল। না-হয় সূক্ষ্মবস্ত্র পরে তাঁরা ঘরেই রইলেন।

"কিন্তু যবে নিমন্ত্রণে, কিম্বা কোন প্রয়োজনে,
স্থানান্তর যাইবারে হয়;
সরু বস্ত্র সে সময়, কখনই যোগ্য নয়,
নিশ্চয় দূষিত অতিশয়।"

কেন তিনি এসব কথা বলছেন, তাও ব্যাখ্যা করেছেন কবি। তাঁর মতে

"সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান, অশেষ দোষের স্থান,
বিশেষ কহিতে লজ্জা হয়;
অতএব সবিস্তর, বর্ণনা অতুষ্টিকর,
সংক্ষেপে বুঝহ সমুদয়।

অসৎ পুরুষগণ,		করি নারী দরশন
তাঁর দিকে একদৃষ্টে রয়;
কভু মন্দ গান গায়,		সরমেতে মরে যায়,
সাধু শীলা রমণী নিচয়।
কিন্তু কুলোকের মন,		কে করে আকরষণ?
'সূক্ষ্মবস্ত্র' উত্তর তাহার।"

সুতরাং,

"শুন গো ভগিনীগণ! করিতেছি নিবেদন,
স্থানান্তর করিতে গমন;
হও কিছু সাবধান; পট্টবস্ত্র পরিধান,
করি সবে করিয়া যতন।
থাকিবে পিরান গায়, দূষ্য না ভাবিও তায়,
তাহে অঙ্গ করে আবরণ;
আর শুন যে বসন, করে শীত নিবারণ,
শীতে তাহা করিবে ধারণ।"

যাঁদের "পট্টবস্ত্র" কেনার ক্ষমতা নেই, তাঁদের উদ্দেশে কবির বক্তব্য:

"মোটা বস্ত্র সূত্রময়, পরিবেন সে সময়,
পিরান থাকিবে কিন্তু গায়
গাত্রেতে পিরান দান, নহে রীতি বর্তমান
সত্য বটে, বঙ্গে অঙ্গনার;
কিন্তু যাহে বহু হিত, দূর হয় মন্দ রীত,
গ্রহণীয় তাহাই সবার।"

বাঙালি মেয়েদের এই সূক্ষ্ম শাড়ি পরা সম্পর্কে ফেনি পার্কস-এর বক্তব্য আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একথাও বলতে ভোলেননি যে, সেসব শাড়ি এতই মিহি যে, আবরণ হিসাবে তার কোনও মূল্য নেই। কারণ, তা ছাপিয়ে স্পষ্ট ধরা দেয় নারীদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গড়ন। এমনকী চামড়ার রং পর্যন্ত। ১৮৬৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একই মন্তব্য করেছিলেন বাঙালি মেয়েদের পোশাক সম্পর্কে,—এ পোশাক পরা আর কিছু না-পরা সমান।

একে মিহি শাড়ি, তার উপর সে-শাড়ি পরে পুরুষদের সঙ্গে পুকুর কিংবা নদীর ঘাটে স্নান করা। সচেতন মহিলারা তা নিয়েও সেদিন সমালোচনায় মুখর। ১২৭৬ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় "স্ত্রীলোকদের স্নান প্রণালী" সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় "সহর বা তাহার নিকটবর্তী দুই একখান পল্লীতে ভদ্র বংশজ স্ত্রীলোকদিগের স্নানের এরূপ জঘন্য প্রণালী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।" কিন্তু খাস কলিকাতায় গঙ্গার ঘাটেও স্ত্রীলোকদের জন্য তৎকালে সংরক্ষিত স্বতন্ত্র ঘাট বিশেষ ছিল না। এমনকী স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনীন ঘাটেও মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে কোনও বাঁধা সময় ছিল না। এই রচনায় অবশ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে পল্লীচিত্র।

> "পল্লীগ্রামবাসী কি ভদ্র, কি অভদ্র, সকল স্ত্রীলোকই প্রকাশ্য জলাশয়ে পুরুষদিগের সহিত একত্র অবগাহনপূর্বক অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্নান করেন। এটি কম জঘন্য ব্যাপার নহে। স্ত্রীলোকেরা লজ্জার মাথাটি খাইয়া পুরুষদিগের অপরপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অতি জঘন্য প্রণালীক্রমে গাত্র মার্জন ও বস্ত্র ধৌত করেন এটি দেখিয়া কোন ভদ্রলোক ইহার প্রতিবিধান না করিয়া থাকিতে পারেন। আবার তাঁহারা যেরূপ সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করেন তাহা পরিধান করিয়া তো লোকসমাজে

বাহির হইবারই যোগ্য নহে, যখন আবার সেই বস্ত্র জলে আর্দ্র হইয়া সকল গাত্রে আবৃত থাকে তখন বিবস্ত্রা ও বস্ত্রপরিধানে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। অনেক সময় সাধু পুরুষেরা এইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া জলাশয় হইতে উঠিতে আপনাকে কুণ্ঠিত মনে করেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে জলাশয় হইতে উঠিয়া আর্দ্র বসনে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।"

লেখকের বক্তব্য,—

"দেশীয় ভদ্রলোকেরা আপন আপন স্ত্রীকন্যাদিগকে অনাবৃত পালকীতে গমনাগমন করা এবং অন্যের সহিত রেলের গাড়িতে গমনাগমন করা অবমাননা মনে করেন; তখনই তাহাদিগের সভ্যতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু স্নানের সময় স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য জলাশয়ে যে কি জঘন্য প্রণালীর অনুসরণ করেন তাহাতে একবারও মনোযোগ করেন না, সভ্যতারও ভয় যাকে না, এমন লজ্জাতেও ধিক্, এমন সভ্যতাতেও ধিক্!"

ঘরে বাইরে সমালোচনার অন্ত ছিল না। তবু উনিশ শতকের সত্তরের দশক অবধি সাধারণ ভদ্রঘরের বাঙালি মেয়েদের পোশাক ছিল প্রায় অপিরবর্তিত। পুরুষদের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই মেয়েদের বেলায়ও মুষ্টিমেয় বাঙালি মেয়ে সরাসরি মেমদের পোশাক গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে যাঁদের স্বামীরা শুধু ইংরেজি-জানা নন, বিলাতের জল হাওয়াও অঙ্গে মাখার সুযোগ পেয়েছিলেন—তাঁদের স্ত্রীরা। ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ তাঁর স্ত্রীকে সাজিয়ে ছিলেন পুরোপুরি পশ্চিমিপোশাকে। স্ত্রী স্বর্ণলতা শাড়ির বদলে অঙ্গে বরণ করে নিয়েছিলেন লম্বা গাউন। স্কার্ট পরলে পায়ের অনেকখানি অনাবৃত থাকবে বলেই গাউনের ব্যবস্থা।

ইংরেজি-পোশাকে বাঙালি মহিলার সমালোচকেরও অভাব ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন,

"কোন কোন বাঙ্গালী রমণী ইংরাজী পোষাক পরেন। ইংরাজী পোষাক আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী মহিলাকে মানাইতে দেখি নাই। অন্ততঃ সাড়ীতে তাহা অপেক্ষা তাঁকে শতগুণ সুন্দর দেখায়। সাড়ীর নীচে প্রায় সব ইংরাজী 'আন্ডার ড্রেস'ই পরা ভালো। জ্যাকেটের (cut) অবশ্য দরজীর উপর নির্ভর করে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বক্ষেত্রে শাড়ির সমর্থক ছিলেন না। "আনন্দমঠ"-এ শান্তির ঘোড়া-চড়া নিয়ে তাঁর রসিকতা অনেকেরই জানা। ধুতি-পরা বাঙালি পুরুষের ঘোড়ায় চড়াকে তিনি বলেছেন হাস্যকর। তাঁহার ভাষায়,—

"তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার অপেক্ষাও হাস্যকর ব্যাপার 'শান্তি' নাম্নী বীর বঙ্গনারীর সাড়ী পরিয়া অশ্বারোহণ ও মলের গুঁতা দিয়া অশ্ব পরিচালনার কিন্তুতত্ব বঙ্কিমবাবুর ন্যায় এক জন সুনিপুণ সৌন্দর্য্যতত্ত্বজ্ঞ 'আর্টিস্টের' হৃদয়ঙ্গম হইল না। মলের গুঁতায় অশ্ব চলিতে পারে বটে, কিন্তু বাঙ্গালী রমণীর মত (বেসেলাই) সাড়ী পরিয়া পুরুষের মত করিয়া দুই দিকে পা ঝোলাইয়া ঘোড়ায় চড়া যে সাড়ী পরিধানের সার্থকতা রাখিয়া কিরূপে সম্ভব, তাহা আমার চক্ষুর ও মনের অগোচর।"

শাড়ির সঙ্গে কী মানায়, কী মানায় না সে-সম্পর্কেও বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন,

"এখন অনেকে সাড়ীর সহিত পাগড়ি পড়িয়া থাকেন।...আমার মতে রমণীর পাগড়ি সাড়ীর সহিত ভাল দেখায় না। মস্তকের বেশও সাড়ীর মত বিলম্বিত করিতে হইবে। সাধারণতঃ সাড়ীর সহিত সাড়ীর একাংশ ঘোমটা বেশ মানায়। 'নেটিভ' ক্রিশ্চিয়ানদের মাথার জালও সাড়ীর সহিত বেশ মানায়।"

ওই প্রবন্ধে ("ইংরাজী ও বাঙ্গালা পোশাক ১৩০২,") তিনি অবশ্য লক্ষ্য করেছেন যে, মেয়েদের পোশাকে—

"আবশ্যকীয় সংস্কার আপনিই হইতেছে। জ্যাকেট গায় দেওয়া অবস্থাপন্ন কৃষকদেরও অন্তরপুরে প্রবেশ করিয়াছে; যদিও অতি অল্প কৃষক-বধূ তাহা করিয়া থাকে। প্রতি নগরে প্রায় প্রতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে রমণীগণ কামিজ ও জ্যাকেট পরিয়া থাকেন। জুতা মোজা কেবল জনকতক বিলেত-ফেরত রমণী ও ব্রাহ্মরমণীরা পরিয়া থাকেন। মহিলাদের জুতা মোজা পরার বিশেষ আবশ্যক দেখি না; কারণ তাঁহাদের হাঁটিয়া চলিবার এত দরকার হয় না। হাঁটিয়া বাহির হইতে হইলে জুতা মোজা পরা শ্রেয়ঃ। নহিলে পায়ে আঘাত লাগিবার সম্ভব ও চরণতল চলিয়া চলিয়া শক্ত হইয়া যায়।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন বটে,—"আবশ্যকীয় সংস্কার আপনিই হইতেছে," কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন কোনও পরিবর্তনই রাতারাতি হয়নি, এবং বিনা বাধায়ও হয়নি। তার জন্য শিক্ষিত বাঙালি পুরুষ মহিলাদের এগোতে হয়েছে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। মনোমোহন ঘোষ যদি স্ত্রী স্বর্ণলতাকে মেমসাহেবদের পোশাকে সাজিয়ে থাকেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর জন্য ফরাসি দরজিকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন পূর্ব-পশ্চিম মিলিয়ে এক অভিনব "প্রাচ্য" পোশাক, যা শুধু জটিল নয়, অন্যের সাহায্য ছাড়া সে পোশাক পরাও রীতিমতো কষ্টকর। বাঙালি মেয়েদের পোশাকে একটা শৃঙ্খলা আনতে এই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই কিন্তু পরে গ্রহণ করেছিলেন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা। সে কথা পরে।

আগেই বলা হয়েছে বাঙালি মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনে বিশেষ করে উপযোগী হয়েছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ-নেতারা এবং ব্রাহ্ম মহিলারা। এ-ব্যাপারে সমসাময়িক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' পরিণত হয় বলতে গেলে বিতর্ক সভায়। অবশ্য বাইরের চাপও ছিল। প্রথমত, সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তন ঘটছিল। উচ্চবর্গের পুরুষ ও মহিলারা কখনও ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে, কখনও সমপর্যায়ের স্বদেশি পরিবারের সঙ্গে সামাজিক ভাবে মেলামেশায় বাধ্য হচ্ছিলেন। মহিলারা স্বভাবতই বেরিয়ে আসছিলেন অন্তঃপুর থেকে। চাকুরি সূত্রে অনেক বাঙালি রাজকর্মচারী ছড়িয়ে পড়ছিলেন দেশের নানা দিকে। ফলে রেলভ্রমণ সহ ভ্রমণের প্রয়োজনও বেড়ে চলে। এমতাবস্থায় শুধু "উলঙ্গবাহার" শাড়ি নিয়ে চলবে কেমন করে? ফলে অনেক রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের মেয়েরাও ক্রমেই ব্রাহ্মমহিলাদের মতোই ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছিলেন শেমিজ, ব্লাউজ, পেটিকোট এবং জুতা-মোজার দিকে। বাঙালি সমাজে সে-পোশাককে তখন বলা হত "সংস্কৃত পোশাক।"

১৩০৮ সালে "দ" ছদ্মনামে "বামাবোধিনী পত্রিকা"য় একজন মহিলা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর বক্তব্য,

"আজকাল মধুপুর বৈদ্যনাথ অঞ্চলে বেড়াইতে যাওয়া বাঙালী বাবুদের একটা ঢং হইয়াছে। শরীরের জন্যই হউক বা বাবুয়ানার জন্যই হউক, পূজার সময় অবস্থায় কুলাক আর নাই কুলাক, অনেকে আর দেশে থাকেন না বা বাড়ি যান না। যাঁহারা হাওয়া খাইতে যান তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে একলা না যাইয়া পরিবার সঙ্গে করিয়া গিয়া থাকেন। আমিও এই রঙ্গের একজন রঙ্গী।"

তিনি লিখছেন মধুপুর গিরিডিতে অনেক বাঙালি পরিবারকে সকালে বিকালে পথে পথে দেখা যায়। মেয়েরা বলতে গেলে সবাই হিন্দু—

"ইহাদের মধ্যে মেমসাহেব বা ব্রাহ্মিকার আমেজমাত্র নাই। ইহাদিগকে বেড়াইতে দেখিয়া দুঃখ হয়, সুখও হয়। দুঃখ হয় 'হিন্দুর পরদা ফাঁক' দেখিয়া। হিন্দু মহিলা আর নিছক অন্তঃপুরচারিণী নন, তাঁর ঘোমটারও আর সে জাঁক নাই। সুখ হয়—বস্তুত কি তবে হিন্দু সমাজেরও ক্রমে পরবির্তন হইতেছে এই ভাবিয়া; 'না দেখিতে দাও অবনী আকাশ' এ ভাব কি সত্য-সত্যই তিরোহিত হইতে চলিল, ইংরাজী শিক্ষার ফল কি সত্য সত্যই ফলিতে চলিল এই ভাবিয়া।"

ভূমিকা শেষে তিনি তাঁর আসল বক্তব্য, ভ্রমণকারী মেয়েদের পোশাকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এই সব মহিলা, তাঁহার কথায়—

> "তাঁহারা পরিষ্কার শাটী, সেমিজ ও জ্যাকেট বা বডিজ পরিধান করেন এবং অল্প শীত বোধ হইলে আলোয়ান বা র‍্যাপারও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্ম বা দেশীয় খ্রীস্টান মহিলার পোশাকে যেরূপ পরিপাট্য ও শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় হিন্দু স্ত্রীলোকের পোশাকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।
>
> ...শাটী ও র‍্যাপার লইয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। এ দিকে এই ব্যাপার, তাহার উপর অবগুণ্ঠন ত আছেই। আমার বিবেচনায় বেড়াইতে হইলে ঘোমটার পরিবর্তে ওড়না ব্যবহার করা উচিত এবং শাটী কতকটা ব্রাহ্মিকাদের ধরনে পরাও দরকার। তাহা হইলে কোমরবন্ধ ব্যবহার করা চলে ও কাপড় লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয় না।"

রচনাটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে জুতা প্রসঙ্গও।

> "... ...ভ্রমণ পরিচ্ছদের যে পরিবর্তনের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ছাড়া আরও একটি পরিবর্তন আবশ্যক—তাহা হইতেছে জুতা ও মোজা। স্বাস্থ্যের দিক্ হইতেই দেখ, সৌন্দর্যের দিক্ হইতেই দেখ বা সভ্যতার দিক্ হইতেই দেখ, ভ্রমণ করিতে হইলে স্ত্রীলোকদের জুতা মোজা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়।"

১৩০২ আর ১৩০৮ সন, স্পষ্টতই দ্বিজেন্দ্রলালের কাল যেন ক'বছরের মধ্যেই পরিণত হয়েছে অতীতে। হিন্দু ভদ্রমহিলার অঙ্গে শুধু "সংস্কৃত পোশাক" শোভা পাচ্ছে না, তাঁরা মধুপুর গিরিডিতে দিব্যি হাওয়া খেতে যাচ্ছেন। এবং বলছেন—জুতা চাই! জুতা!

আগেই বলা হয়েছে এই পরিণতিতে পৌঁছাবার আগে বিস্তর আলাপ আলোচনা এবং তর্ক বিতর্ক হয়েছে বাঙালি সমাজে। ১২৭৮ সনে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় মেয়েদের পোশাক নিয়ে যে আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে হাওয়ার গতি কোন দিকে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সৌদামিনী কাস্তগিরী তাঁর প্রবন্ধে বলেন—

> "এখানে এ রূপ সূক্ষ্মবস্ত্র প্রচলিত আছে যাহা পরিধান করত কোন ক্রমেই ভদ্রসমাজে গমনাগমন করা যায় না।... ... কোন বঙ্গাঙ্গনা সকল বিষয়ে উন্নতা হইয়াও যদি পরিচ্ছদের নিমিত্ত জঘন্যরূপে নিন্দিতা হন, তবে তাঁহার মনে এরূপে বিশ্বাসও হইতে পারে যে যখন আমি এরূপে নিন্দিতা হইতেছি, তখন আমি অবনত এবং পরিণামে এই বিশ্বাস তাঁহার উন্নতি পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়।"

ইংরাজ মেয়েদের পোশাক সম্পর্কে তাঁর অভিমত

> "ইংরাজ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত ভাল বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণে মন্দ। সুতরাং তাহাদিগকে পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতে গেলে কয়েকটি দোষ পরিত্যাগ করিতে গিয়া অপর কয়েকটি দোষ গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষত ইংরাজদিগের পরিচ্ছদের অনুকরণ করা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় আবশ্যক। আমাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই নিঃস্ব... ..."

সুতরাং, লেখিকার মতে পরিত্যজ্য। তা ছাড়া, "... ...যদি কোন বাঙালী ইংরাজের কিম্বা অন্য দেশীয় লোকের পরিচ্ছদ পরিধান করেন, লোকে তাঁহাকে তদ্দেশীয় জ্ঞানে তদনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকে।" তখন হয়তো বাঙালি হয়েও তাঁদের মুখে বাঙালির নিন্দা শুনতে হবে। অর্থাৎ, প্রশ্ন নিজেদের বৈশিষ্ট কোন পোশাকে রক্ষা করা সম্ভব, সেটাই। "শ্রীমতী সৌদামিনী কাস্তগিরী", কোনও বিশেষ পোশাকের পক্ষে সওয়াল করেননি। তাঁর দাবি ছিল—"চাই এমন পোশাক যাহাতে সভ্যতা রক্ষা হয় এবং

লোকের নিকট যথার্থভাবে পরিচিত হওয়া যায় এরূপ পরিচ্ছদ... ...।"

এই আলোচনায় যোগ দিয়ে রাজলক্ষ্মী সেনও বলেন,

> "ইউরোপিয়ান পোশাক ভাল বটে, কিন্তু সত্য-সত্যই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই দরিদ্রের দেশের পক্ষে তাহা গ্রহণযোগ্য নয়।...প্রত্যেক দেশের লোকেরই পরিচ্ছদে, কি আচার ব্যবহারে স্বীয় দেশের চিহ্ন রাখা কর্তব্য। এই জন্য সম্পূর্ণরূপে অন্য দেশের অনুকরণ করা উচিত নহে, তাহাতে হীনতা প্রকাশ পায়।"

বাঙালি মেয়েদের পোশাকের লড়াই এক অর্থে জাতীয়তার লড়াইও বটে। রাজলক্ষ্মী সেন আরও বলেন,—

> "কি উত্তরপশ্চিমবাসী, কি মুসলমান, কি চীনদেশীয়, ইহাদিগের পরিচ্ছদ সুন্দর ও উত্তম হইলেও বঙ্গদেশীয়া স্ত্রীলোকদিগের সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত নহে। যাহাতে দেশীয় ভাব থাকে, সকলে জিজ্ঞাসা না করিয়া বস্ত্র দেখিয়াই বঙ্গীয়া কুলকামিনী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং সম্যকরূপে শরীর আবৃত হয় এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্তব্য।"

অর্থাৎ, তাঁহার সঙ্গে সৌদামিনী দেবীর বক্তব্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। প্রসঙ্গত তিনি জানাচ্ছেন,—

> "এক্ষণে কেহ কেহ যেরূপ কামিজ, জ্যাকেট, সাটী ও জুতা পরিধান করিয়া থাকেন তাহা উত্তম। কিন্তু এদেশে অনেক মন্দ স্ত্রীলোকেরাও ঐরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে এই জন্য এই সকল পরিধান করিয়া তাহার উপরিভাগে এইরূপে একখানি আপাদমস্তক লম্বিত চাদর ব্যবহার করা উচিত যদ্দারা অপর লোকে ভদ্রকুলবালা বলিয়া বুঝিতে পারে।..."

লক্ষণীয় আরও কিছু কিছু নব্য সাংস্কৃতিক অভিধার মতো কুলবালাদের আগে নিজেদের অঙ্গে "সাংস্কৃতিক পোশাক" তুলে নিয়েছিলেন বারবিলাসিনীরা।

"বামাবোধিনী পত্রিকা" তরফে এই আলোচনাকে স্বাগত জানিয়ে বাঙালি মহিলাদের জন্য পোশাকের একটি খসড়া তালিকা সুপারিশ করা হয়। তাতে বলা হয়:

> "বাটীতে—ইজার, পিরাণ ও সাটী; অথবা লম্বা পিরাণ ও সাটী।
>
> বাহিরে গমন করিতে হইলে—ইজার, পিরাণ, সাটী, চাদর, পাজামা ও জুতা। জুতা যাঁহারা পছন্দ না করেন, না করিতে পারেন।
>
> পরিচ্ছদ দ্বারা সধবা ও বিধবা ও কুমারী যাহাতে প্রভেদ করা যায় এরূপ নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে চিরকালের জন্য অথবা বিশেষ করিয়া কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। সাধারণভাবে এবং আপাততঃ প্রয়োজন সাধনের জন্য এই উপায় নির্দ্দেশ করিলাম, যাঁহারা আবশ্যক বোধ করেন গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা এ বিষয়ে উৎকৃষ্টতর রীতি প্রদর্শন করিবেন, তাহাদিগের প্রস্তাব আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।..."

এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে অচিরেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সিংহগড় পাহাড় থেকে নামহীন "শ্রী...দেবী," পাঠালেন পোশাক সম্পর্কে তাঁর নিজের প্রস্তাব। "বামাবোধিনী পত্রিকা"য় ১২৭৮ সনে প্রস্তাবিত এই রচনাটি সম্পর্কে সম্পাদক মন্তব্য করেন, "ইঁহার সুন্দর হস্তাক্ষর, বিশুদ্ধ লিখন প্রণালী, ভাবগ্রাহিতা এবং সহৃদয়তা সকল নিতান্ত প্রশংসনীয়।" লেখিকা বলেন,—

> "আমাদের বাটীর লোকেরা এক্ষণে যে প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করেন তাহাতে (দেশীয় ভাব, কুলকামিনী পরিচয় ইত্যাদি) এই সকল অভিপ্রায় অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইতে পারে। ইহা যে কেবল শরীরাচ্ছাদনের কার্য করে এমত নহে, দেখিতেও সুশ্রী আর শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেরই সম্যক

উপযোগী!... পৃথক পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে বাঙ্গালী, মুসলমান, ইংরাজ এ সকল জাতির পরিচ্ছদের সহিত যদিও ইহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু উহা কোন জাতিরই সম্পূর্ণরূপ অনুকরণ নহে। বঙ্গদেশে সর্বসাধারণের মধ্যে এই পরিচ্ছদ প্রচলিত হইলে বঙ্গাঙ্গনাগণকে স্বদেশীয়া রমণী বলিয়া কোন বিদেশীর ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ কলিকাতার অনেক ভদ্রলোকের বাটীর স্ত্রীলোকেরা অন্য কাহারও বাটীতে যাইবার কালে যে সকল বস্ত্র পরিধান করেন তাহার কিম্বা বামাবোধিনীতে আপনারা পরিচ্ছদের যে প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহার সহিত উল্লিখিত পরিচ্ছদের অধিক বিভিন্নতা না থাকিয়াও উহা দেখিতে অপেক্ষাকৃত অনেক উত্তম হয়। আমরা বাটীতে জুতা, মোজা, আঙ্গিয়া, কাঁচলি, জামা এবং ইজার কিম্বা ঘাঘরা পরিয়া তাহার উপর সাড়ি পরিধান করি আর বাহিরে যাইতে হইলে উপরি উক্ত প্রকার চাদর মাথায় দিই।...আমরা দেখিয়াছি ঐ সকল বস্ত্রগুলির পরিমাণের ন্যূনাধিক্য এবং ব্যবহারের রীতির বিভিন্নতা বশতঃ ঐ পরিচ্ছদের সৌন্দর্য প্রভৃতি অনেকগুণ হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আপনারা জুতা এবং মোজা ব্যবহার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা বড় ভাল বোধ হয় না। কারণ মোজা না পারিলে তত হানি নাই কিন্তু পরিষ্কারের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলে বোধ হয় জুতা ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।”

বামাবোধিনী সম্পাদকও অতঃপর জানিয়ে দেন,—

“আমরা জুতা পরিধানের বিরোধী নহি। তবে কিনা পরিচ্ছদের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা চর্মপাদুকার প্রতি অনেক স্ত্রীলোকের অরুচি ও বিতৃষ্ণা দেখা যায়। ক্রমশঃ তাহা দূর হইবে এবং অবলাগণকে বলপূর্ব্বক কোন আচার অবলম্বনে ধাবিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে... ...।”

সমকালের পাঠক-পাঠিকাদের কারও বুঝতে নিশ্চয় অসুবিধা হয়নি এই রচনার লেখক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। বোম্বাইতে তিনি কিছুকাল এক পারসি পরিবারে বাস করেছিলেন। সেখানে তিনি পারসি কায়দায় শাড়ি পরতে শুরু করেন। শাড়ির নীচে তিনি পেটিকোট পরতেও শুরু করেন। তাঁকে দেখেই বাঙালি মেয়েরা সেদিন শাড়ি পরার নব্য কৌশল আয়ত্ত করতে শুরু করেন। তিনি শাড়ি পরার যে রীতি চালু করেছিলেন তার সঙ্গে আজকের রীতির অবশ্য কিছুটা পার্থক্য আছে। তিনি আঁচলটি বাঁ কাঁধের উপর ঝুলিয়ে না-দিয়ে ডান কাঁধের উপর ঝুলাতেন। এই কায়দা নাকি শেষ পর্যন্ত বদলে দেন কেশব সেনের কন্যা সুচারু দেবী।

এত কাণ্ডের পরও ১৮৮১ সালে শুনি কলকাতায় বাঙালি মেয়েদের পোশাকে নৈরাজ্য চলেছে। একজনের পোশাকের সঙ্গে অন্য জনের পোশাকের বিশেষ মিল নেই। সে এক ইঙ্গ-ভারতীয় জগাখিচুরি। মনে পড়ে “ছেলেবেলা”-য় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ,—

“উমেশ ছিল চালাক লোক। বিলিতি দর্জির দোকান থেকে যত-সব ছাঁটা-কাটা নানা রঙের রেশমের ফালি জলের দরে কিনে আনত, তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হত। কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে মেলে ধরত মেয়েদের চোখে; বলত—এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন। ওই মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না। আমাকে কী দুঃখ দিত বলতে পারিনে। বার বার অস্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি। জবাবে শুনেছি—জ্যাঠামি করতে হবে না। আমি বউঠাকরুনকে জানিয়েছি, এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভদ্র, সেকেলে সাদা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই।—আমি ভাবি, আজকালকার জর্জেট-জড়ানো বউদিদিদের রঙ-করা পুতুল-গড়া রূপ দেখে দেওরদের মুখে কি কোনো কথা সরছে না। উমেশদার-সেলাই-করা ঢাকনি-পরা বউ ঠাকরুন যে ছিলেন ভালো। চেহারার উপর এত বেশি জালিয়াতি তখন ছিল না।”

এই সব তর্ক বিতর্ক এবং আন্দোলনের ফলে অবশেষে, ঊনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালি মেয়েদের পোশাকে মোটামুটি একটা স্থিতি এসেছিল। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, এমনকী নিম্নবিত্ত শহরে

বাঙালি শিশু এবং কিশোরিদের জন্য বরাদ্দ হয় ইজার আর ফ্রক। যারা স্কুলে পড়ত তাদের জন্য জুতাও ছিল আবশ্যিক। ভদ্রমহিলারা শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন শাড়ি। কি ঘরে, কি বাইরে, শাড়ি তাঁদের অপরিহার্য পোশাক। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় অন্তর্বাস হিসাবে পেটিকোট বা সায়া, উর্ধ্বাঙ্গে ব্লাউজ। বয়স্ক মহিলারা অনেকে পরতেন শেমিজ। বডিজ ও কাঁচুলি অঙ্গে তুলে নেন অনেকে।

স্বাধীনতার পর ক্রমে বাঙালি মেয়েদের পোশাকে দেখা দেয় বৈচিত্র। শাড়ি বহাল থাকে। বিশেষ করে বয়স্ক মহিলাদের পোশাকে। অন্যদের ক্ষেত্রে তা পরিণত হয় বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক পোশাক হিসেবে। আমরা দেখেছি, উনিশ শতকে কেউ কেউ যেমন বাঙালি মেয়েদের ইউরোপীয় পোশাকে সাজতে চেয়েছিলেন, কেউ আবার সওয়াল করেছেন মুসলমানি পোশাকের স্বপক্ষে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার কিছু কিছু নমুনাও চোখের সামনে বা আড়ালে ছিল। মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী যদি ইংরেজি পোশাক পরতেন, তবে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় বলেছেন কৃষ্ণনগরের রাজার অন্তঃপুরের মেয়েরা পেশোয়ারি পোশাকও পরতেন। সেসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। আর সব পোশাককে পেছনে ফেলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল শাড়ি। সেই শাড়িই আজ কিছুটা কোণঠাসা। অন্যদিকে আসরে জাঁকিয়ে বসছে ইংরেজ এবং তথাকথিত মুসলমানি পোশাক। তরুণী এবং যুবতীদের মধ্যে দিব্যি সচল হয়ে গেছে স্কার্ট আর ব্লাউজ তো বটেই, ট্রাউজার্স, প্যান্ট শার্ট, গেঞ্জি, জিন্‌স ইত্যাদি। পাশাপাশি তাদের মধ্যে প্রায় সর্বজনীন হয়ে উঠেছে শালোয়ার-কামিজ এবং ওড়না। বাঙালি মেয়েরা এখন রকমারি পোশাকে ফ্যাশন-শোতে যোগ দিচ্ছেন। কেউ কেউ এমনকী বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায়। পোশাক সম্পর্কে যাবতীয় শুচিবাই আজ অন্তর্হিত। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস কাছারি, কিংবা হাটে বাজারে উঁকি দিলে মনে হবে যেন এক বিশাল ফ্যান্সি-প্যারেড। এই প্রদর্শনীর সার কথা,—"গো অ্যাজ ইউ লাইক," যার যেমন ইচ্ছা! অন্তর্বাসও আজ বলতে গেলে আন্তর্জাতিক। রকমারি কাঁচুলি বা ব্রেসিয়ার ছাড়াও নাইটি, প্যান্টি, লিঙ্গারি—কিছুই আর অচ্ছুৎ নয়। উল্লেখ্য, কাঁচুলির ব্যবহারে বয়স বা সামাজিক মর্যাদাভেদ নেই, উত্তমাঙ্গ সম্পর্কে সকলেই সচেতন!

প্রসঙ্গত, কাঁচুলি সম্পর্কে কিছু কথা। মঙ্গলকাব্যে আমরা দেখি মেয়েরা কাঁচুলি ব্যবহার করেন। দ্বিজবংশীদাসের পদ্মপুরাণে আছে,—

> "কাঁচুলি পরিল তাহে ঢাকিয়া কুমকুমে।
> কনক কুঠরী যেন ঢাকিয়াছে হিমে।"

মুকুন্দরাম লিখেছেন—

> "বসনে তুলিয়া বামা বান্ধে পায়োধর।
> বিনোদ কাচলি পরে তাহার উপর।"

কাঁচুলি কখনও কখনও অলঙ্কৃতও হত। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণর প্রেমলীলা, পাখি, ফুল পাতা লতা—চিত্রিত। তপন রায়চৌধুরী লিখেছেন, ("বেঙ্গল আন্ডার আকবর অ্যান্ড জাহাঙ্গীর") মুঘলযুগে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে কাঁচুলির ব্যবহার ছিল। ধনী পরিবারের মেয়েরা অন্তর্বাস হিসাবে ইজারও পরতেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, কাঁচুলী ছাড়া বাঙালি মেয়েরা প্রায়ই ঘরের বাইরে যেতেন না। সেকালে কাঁচুলীর দাম ছিল। দুই টাকার পর এক জোড়া কাঁচুলী হত না। পঞ্চাশ টাকার বেশিও কাঁচুলীর মূল্য নির্ণীত ছিল, হাজার টাকা মূল্যের কাঁচুলীও ব্যবহৃত হত।...একটা ঠাট্টার কথা প্রচলিত আছে যে বাঙলায় পীনোন্নত পয়োধরা দেখে এবং কাঁচুলীর অপূর্ব নির্মাণ কৌশল দেখে রাজা মানসিংহ মেয়েদের কাঁচুলী কেড়ে নিয়েছিলেন! সেই কাঁচুলির, সবাই জানেন, জয় জয়কার।

দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও পরিস্থিতি ছিল আরও গোলমেলে। যথা ত্রিবাঙ্কুর। ঔপনিবেশিক সাহেবরা ভারতীয় মেয়েদের পোশাক নিয়ে কোথাও কোনও ফতোয়া জারি করেছিলেন বলে শোনা যায় না। তবু ত্রিবাঙ্কুরে তাদের একবার নড়েচড়ে বসতে হয়েছিল। সে

আন্দোলনে পুরোভাগে ছিলেন অবশ্য বিদেশি প্রোটেস্টান্ট মিশনারীরা। আলোড়নের উপলক্ষ্য— বুকের কাপড়।

ত্রিবাঙ্কুর উত্তর পশ্চিম উপকূলের একটি রাজ্য। সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছেন মুসলমান, মোপলা, সিরিয়ান খ্রীস্টান আর ইহুদিরা। তা ছাড়া হিন্দুরা তো আছেনই। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কথা। জাতিভেদ প্রথার খুবই কড়াকড়ি তখন ত্রিবাঙ্কুরে। নাদাররা নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের কাছে ঘেঁষতে পারে না। ব্রাহ্মণদের থেকে তাদের অন্তত ছত্রিশ পা দূরে থাকতে হয়। তারা ছাতা জুতো বা সোনার গয়না পরার অধিকারী নয়। তাদের বাড়ি কখনও একতলার বেশি উঁচু হতে পারবে না এবং তারা গোরু দুইতে পারবে না। নাদারদের জীবিকার কেন্দ্র ছিল তাড়ি। নাদার মেয়েরা কোমরে করে জলের কলসি বইতে পারত না। তাদের উত্তমাঙ্গে কোনও পোশাক পরারও অধিকার ছিল না। কাঁধে তারা একটা হালকা স্কার্ফ রাখতে পারত। কখনও কখনও তা দিয়ে বুকও ঢাকতে পারত, কিন্তু কখনই ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণ কারুর সামনে নয়। মান্যদের সম্মান দেখাবার রীতি ছিল বুকের কাপড় সরিয়ে ফেলা। মিশনারীরা বললেন তা চলতে পারে না। তাঁরা নাদারদের খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন। মিশনারীদের নির্দেশে নাদার মেয়েরা লম্বা কাপড় পরতে আরম্ভ করে। তাঁরা মেয়েদের গায়ে জামা পরতেও উৎসাহিত করতে লাগলেন। ত্রিবাঙ্কুরের দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট তখন কর্নেল জন মনরো। তিনি মিশনারীদের সমর্থনে এক ফতোয়া দিলেন। বললেন, অন্যান্য দেশের খ্রীস্টান মেয়েদের মতোই ত্রিবাঙ্কুরের নাদার মেয়েরাও গায়ে জামা পরতে পারে। তিনি আরও বললেন, সিরিয়ান খ্রীস্টান এবং মোপলা মেয়েরা যা পরেন নাদার মেয়েদেরও তা পরতে কোনও বাধা নেই। ওঁরা 'কুপ্পায়ম' নামে উত্তমাঙ্গে একটা ব্লাউজের মতো জিনিস পরতেন। নাদার মেয়েরা মিশনারীদের উৎসাহে এবং ইংরেজ রাজপুরুষদের সমর্থনে তাই পরতে লাগলেন। কেউ কেউ এমনকী নায়ারদের পোশাকও ধরলেন।

এসব শুরু হয় ১৮১৩ সনে। ১৮২০ তে দেখা যায় ব্লাউজ পরা নাদার মেয়েদের ওপর হাটে বাজারে আক্রমণ চলছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলছেন, নানাভাবে তাদের নিগ্রহ করছেন। নাদারদের স্কুল এবং গির্জা জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাধ্য হয়েই ১৮২৮ সনে ত্রিবাঙ্কুর সরকার নির্দেশ দিলেন, নাদার মেয়েরা বুকে জামা পরতে পারে বটে কিন্তু কিছুতেই নায়ার মেয়েদের উত্তমাঙ্গের পোশাক নয়। তা ছাড়া তারা যাই করুক না কেন প্রচলিত বর্ণাশ্রমের আর সব নিয়ম মেনে চলতে হবে। দীর্ঘকাল পরে ১৮৫৯ সালে ত্রিবাঙ্কুরে আবার শুরু হয় নাদার মেয়েদের বুকের কাপড়ের জন্যে এই লড়াই। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষকে জানালেন, নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা উচ্চশ্রেণীর পোশাক পরছেন, তাই নিয়েই হাঙ্গামা। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু মিশনারীদের পক্ষে রায় দিলেন। বললেন, নাদার বা অন্য নিম্নবর্ণের মেয়েরা গায়ে জামা না পরলে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাবে। বাধ্য হয়েই ত্রিবাঙ্কুর রাজকে রফা করতে হল। তিনি বললেন, নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা ব্লাউজ পরুক আপত্তি নেই, কিন্তু তা মোটা কাপড়ের হওয়া চাই। মিশনারীরা বললেন—কুপ্পায়ম নয়, চাই সত্যিকারের ব্লাউজ। কেননা এ জামায় তাদের বুক ঢাকা থাকলেও কাঁধ খোলা থাকে কারণ তথাকথিত জামাটি বাঁধা হয় পেছন দিকে। বিতর্ক চলতে লাগল। নাদার মেয়েরা কিন্তু তারপর আর কোনও বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করেনি।

ত্রিবাঙ্কুরে নাদার মেয়েদের বুকের কাপড়ের জন্য এ লড়াই একদিকে যেমন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তেমনই বোধ হয় উচ্চবর্ণের লোভী কদাচারী, বিকৃত-রুচি সামন্তদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। এখানে উল্লেখযোগ্য ত্রিবাঙ্কুরের এই আন্দোলনের সময়, রুচি এবং শালীনতার জন্য সওয়ালের সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সাহেবদের মুখে অন্য যুক্তিও শোনা গেছে। একজন লিখেছেন—

মেয়েরা সভ্য শালীন পোশাক পরলে শুধু যে সভ্যতা সংস্কৃতিরই অগ্রগতি তা নয়, ব্রিটিশ শিল্পপতিদেরও অগ্রগতি। কেননা তাদের বাজার বাড়বে। এই যুক্তি কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে ঘুরে ফিরেই শোনা গেছে। উনিশ শতকের শেষ দশকে ভারতে মিহি বস্ত্রশিল্পের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। ঢাকাই মসলিন, কাশ্মীরি শাল, দক্ষিণ ভারতের ছাপা কাপড়, বলতে গেলে প্রায় উঠেই গেছে। দেশি শিল্প মৃতপ্রায় অথচ দেখা গেল বিলাতি কাপড়ের আমদানি ক্রমেই বাড়ছে। ব্রিটিশ শিল্পের এই সাফল্যের সঙ্গে, বলা বাহুল্য ভারতীয়দের পোশাকে রুচি বদলের যোগ নিবিড়। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন—ভারতে কাপড়ের চাহিদা বেড়ে গেছে, কারণ মেয়েরা এখন সেখানে অন্তর্বাস পরতে শুরু করেছেন! এমনকী সামরিক বাহিনীর উর্দি নিয়ে রকমারি উদ্যোগের পিছনেও ছিল স্বদেশের বস্ত্র শিল্পের সুস্বাস্থ্যের ভাবনা। পলাশির পর মাদ্রাজ কাউন্সিল বিলেতের কর্তাদের আনন্দের সঙ্গে লিখেছিলেন—আমরা সিপাহীদের ইউরোপীয় কাপড়ে তৈরি ইউনিফর্ম পরতে রাজি করতে পেরেছি। তাতে যে শুধু তাদের সামরিক চেহারাই ফুটে উঠবে তা নয়, গুদামে জমিয়ে রাখা পশমি কাপড়গুলোর সদ্গতি হবে।

ভারতের স্বদেশী আন্দোলন যে বিলেতি কাপড় পুড়িয়ে শুরু হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

চরকা আর হাতে কাটা সুতোর তৈরি পোশাকের ধারণা পেয়েছিলেন গান্ধীজি স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮) থেকে। তিনি লিখেছেন—১৯০৮ সালে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায়, তখন চরকা চোখেও দেখেননি। চরকার ধারণা জন্মে তাঁর ১৯১৬ সালে, ভারতে আসার পর। গঙ্গাবেনে মজুমদার নামে এক শিষ্য ১৯১৭ কি ১৮ সালে বরোদায় একটি চরকা খুঁজে পান এবং তাঁতীদের উৎসাহিত করে আশ্রমের জন্য কাপড় বোনান। তারপর শুরু হয় আশ্রমে কাপড় বোনা। প্রথম কাপড়টি বহরে ছিল ৩০ ইঞ্চি। ধুতির পক্ষে ছোট। খরচও পড়ে খুব বেশি। সতেরো আনা গজ। গঙ্গাবেনে ক্রমে পয়তাল্লিশ ইঞ্চি বহরের ধুতি তৈরি করেন। গান্ধীজির আর খাটো ধুতি পরতে হল না। কংগ্রেস কর্মীর পোশাক মোটামুটি সাব্যস্ত হয়ে যায় ১৯১০ থেকে ১৯২০-র মধ্যে। অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধী টুপি পরিণত স্বদেশিয়ানার প্রতীকে। ১৯২০-তে গান্ধীজি লেখেন—কিছু ইউরোপীয় তাঁদের অফিসে সাদা টুপি নিষিদ্ধ করেছেন। রাবণের রাজত্বে কারও ঘরে বিষ্ণুর ছবি রাখা অপরাধ ছিল। সুতরাং এই রাবণ রাজত্বে সাদা টুপি পরা, বিদেশি কাপড় না পরা বা চরকা-কাটা অপরাধ হতেই পারে। একমাস পরেই এলাহাবাদের কালেক্টর নির্দেশ দেন—সরকারি কর্মচারীরা গান্ধীটুপি পরতে পারবেন না। কয়েকমাস পরে সিমলায় ভারতীয়দের জানিয়ে দেওয়া হয়, খাদি পোশাক বা গান্ধীটুপি পরলে সরকারি চাকরি যেতে পারে। গুজরাটে একজন আইনজীবিকে গান্ধীটুপি পরার অপরাধে আদালত থেকে বের করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে দু'শো টাকা জরিমানা। একঘণ্টা পর তিনি আবার টুপি মাথায় ফিরে এলেন। শুরু হল নতুন যুগের লড়াই।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে গাঁধী-টুপি আজ বিরল দর্শন। কালে-ভদ্রে তা চোখে পড়ে। এমনকী তথাকথিত গাঁধীবাদীদের মাথায়। যদিও সরকারি পৃষ্ঠপোষণা অব্যাহত, গাঁধীশিষ্যদের মধ্যেও তা কার্যত পরিণত হয়েছে "মিটিংকা কাপড়ায়।" নিয়মরক্ষার্থে কেউ কেউ খাদির ট্রাউজার্স পরেন বটে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ভারতীয়দের মধ্যে মেয়েদের মতোই চলছে ফ্যাশন-প্যারেড। পাজামা এবং কোর্তার চল যত না তার চেয়ে বেশি প্যান্ট এবং শার্ট-বুশ শার্ট। প্যান্ট এমনকী নিম্নবর্গেও চালু হয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে বয়স্করা যদি এখনও আঁকড়ে থাকেন ধুতি ফতোয়া, কিংবা ধুতি কোর্তা চাদর, শহরে প্রধানত পশ্চিমি কেতাই যেন পছন্দ। বিদেশ থেকে আমদানি করা "ভাল" ছাঁদের ট্রাউজার্স, জিন্স, শার্ট, কোট জুতার জন্য সম্পন্ন তরুণরা ব্যাকুল। তাঁরা এমনকী সুবেশী হওয়ার স্বপ্নে টাইও পরছেন। পরিস্থিতি বোঝা যায় বোম্বাইয়ের একটি মিল-এর বিজ্ঞাপনে ওঁরা বলছেন,

"Not two persons can quite agree to what Indian culture is. But all agree it's unfathombly rich....has always been respecting the richness of Indian culture."

সংস্কৃতির অতল গভীরতা থেকে যা আজ উঠে আসছে তার সঙ্গে ভারতীয়তার যোগ কতখানি সে অবশ্য এক প্রশ্ন। এখানে তার উত্তর সন্ধানের সুযোগ নেই। বোধ হয় প্রয়োজনও নেই। কেননা, চলমান শোভাযাত্রা সর্বজনের চোখের সামনে।

আজকের নবীন ভারতীয়কে দেখে মনে পড়ে রাজ কাপুরের সেই গান—

"মেরা জুতা হ্যায় জাপানি,
ইয়ে পাতলুন ইংলিশস্তানি
শর পে লাল টোপি রুশি
ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি।"

হৃদয় সত্যিই হিন্দুস্থানী কিনা সেও আজ এক বৃহৎ প্রশ্ন বটে।

এই রচনায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত কিছু বই :

Clothing Matters/ Dress and Indentity in India, Emma Tarlo, London, 1996.
Cloth, Clothes and Colonialism in 19th Century, Bernard S. Cohn, Newyork, 1983.
Costumes of India and Pakistan, Historial and Cultural Study, S.N. Das, New Delhi, 1969.
Indian Costume, G.S. Ghurye, Bombay, 1951.
Indian Dress, Charles, Fabri, New Delhi, 1960.
Culture in the Vanity Bag, Nirod C. Chaudhury, Bombay, 1976.
Raj: A Scrapbook of British India Charles Allen, London, 1977.
The Changing Role of Women in Bengal (1849-1905), Meredith Brothwick, Princeton, 1984.
পুরাতনী, সম্পাদনা ইন্দিরা দেবী, কলকাতা, ১৯৫৭।
সংকোচের বিহ্বলতা, গোলাম মুরশিদ, ঢাকা, ১৯৮৫।
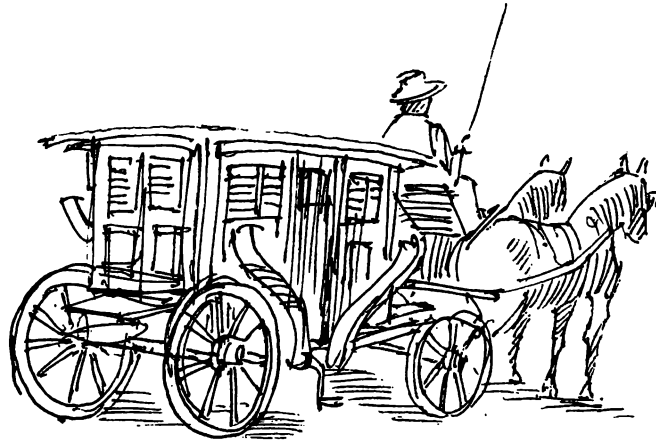
এবার মলে সাহেব হব

"মা এবার মলে সাহেব হব—
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব!
সাদা হাতে হাত দিয়ে, মা, বাগানে বেড়াতে যাব
আবার কালো বদন দেখলে পরে 'ডার্কি' বলে মুখ ফেরাব।"

*

সাহেব হতে কার না সাধ হয়। বিশেষ করে ইংরেজ আমলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইংরাজস্তোত্র'-র কথা কে না জানেন? তাঁর কলমে সেদিনের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বাঙালির প্রার্থনা,

> "হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট পান্টলুন পরিব, নাকে চস্‌মা দিব, কাঁটা চাম্‌চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

শুধু তা-ই নয়, সাহেব হওয়ার জন্য তাঁরা আরও অনেক কিছু করতেই তৈরি। সুতরাং,—

> "হে সুভোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাঁউরুটি খাই; নিষিদ্ধ মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না; কুক্কুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

বলাবাহুল্য, শুধু এসব প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট নয়। পুরো "ইংরাজস্তোত্র" অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও সাহেবরা বাঙালি বাবুদের দলে নেবেন কি না সন্দেহ। তাঁদের শর্ত অনেক বেশি কড়া, এবং চাহিদার ফর্দটিও অনেক বেশি লম্বা চওড়া। শুনলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙালি বাবুর স্বপ্ন ভঙ্গ নিশ্চিত।

হতে চাইলেই কি সাহেব হওয়া যায়? হবু সাহেবদের অনেকেই সেদিন রণে ভঙ্গ দিয়েছেন দু' চার কদম এগিয়ে যাবার পর-ই। —বাব্বা, এত কি আর পারা যায়? পারতেই হবে। না হলে সাহেব হওয়া আর হল না। মনে রাখা চাই, সাহেব হওয়া সহজ নয়। তার জন্য চাই রীতিমতো সাধনা।

প্রাথমিক শর্তগুলোর কথাই আগে বলি। সাহেব হতে গেলে পান চিবানো চলবে না। ইংরেজ সমাজে পান সুপারি চিবানো রীতিমতো অভব্যতা। অতএব তাম্বুল চর্বন বন্ধ। ইংরেজ কেন, কোনও ইউরোপিয়ান ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার সামনে তাম্বুল রাগে ঠোঁট মুখ বা দাঁত রঞ্জিত করা নিষিদ্ধ।

চিবোতে হয় তো, সাহেব-মেম সন্দর্শনে আসার আগে। তারপর মুখ ভাল করে ধুয়ে হাজির হতে হবে। লক্ষ করে দেখবেন, ইউরোপিয়ানরাও কখনও ভারতীয় ভদ্রমহোদয়দের সামনে চুরুট ধরিয়ে নাকে মুখে ধূম উদ্গীরণ করেন না। বিশেষত, যদি তাঁরা জানেন ভারতীয়দের তা না-পছন্দ।

গলা খাকরি দেবেন না। সশব্দে তো নিশ্চয়ই না। যদি একান্ত দরকার বোধ করেন সাময়িক ছুটি নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে তা সেরে আসুন। দরকার হয়, 'টয়লেটে'। ভদ্রমহিলাদের সামনে সশব্দে গলা পরিষ্কার করা চরম অসভ্যতা। দূরে গিয়ে যখন তা সারবেন, তখনও যেন শব্দ তাঁদের কানে না পৌঁছায়। জোরে কাশি বা নাকঝাড়াও নিষিদ্ধ। নাক খোঁটাও। সাহেব-মেমদের অপছন্দ, সুতরাং বর্জনীয়। পকেটে সব সময় রুমাল রাখবেন। মৃদুমন্দ কাশি সামাল দিতে তা কাজে দেবে।

চেয়ারে স্থিত হওয়ার পর উঠ-বস করবেন না। পা আড়াআড়ি করে বসবেন না। ডাইনে বাঁয়ে হেলে শরীর দোলাবেন না। হঠাৎ উরু চাপড়ানো, শরীরের কোনও অংশ মটকানো বেয়াদপি। এসব অভ্যাসের ব্যাপার। সুতরাং, চেষ্টা করতে হবে ইত্যাকার বদ অভ্যাস ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠার। না হলে নিজের অজান্তেই কখন যে অপকর্মটি করে ফেলবেন, তা বলা যায় না। তখন লজ্জায় মরমে মরতে হবে। নট-নড়ন-চড়ন হয়ে চেয়ারে বসাও অভ্যাস করতে হবে। চেয়ারে বসে পা বাড়িয়ে দেওয়া, কিংবা পা বেশি ফাঁক করে বসা অসৌজন্য। আর চেয়ার বা টেবিলে পা তোলা তো চরম অসভ্যতা। বর্বরতাও বলা চলে। সোজা হয়ে হাঁটবেন, কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে নয়। চলার সময় হাত আন্দোলিত হবে শরীরের তালে তালে, ছন্দ রেখে। হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলা ঠিক নয়। তা ছাড়া চলতে হবে বুক চিতিয়ে, কাঁধ পেছনের দিকে ঠেলে।

ঘরে ঢোকার পর আরও কিছু কিছু আচরণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সাহেব মেমদের সামনে কানাকানি করা, শিস দেওয়া, কিংবা উচ্চস্বরে হেসে ওঠা বারণ। হাসতেই যদি হয়, তবে মৃদু অনুচ্চ হাসিই শ্রেয়। তাই বলে হাতে মুখ চেপে নয়। আঙ্গুল মটকাবেন-না,—চেয়ারের হাতলে কিংবা টেবিলে আঙ্গুলে তবলা বাজাবেন না। হাই তুলবেন না, যদি তুলতেই হয় তবে হাতে মুখ আড়াল করে। দাঁতে নখ কাটবেন না, গা চুলকাবেন না। প্রকাশ্যে নখ পরিষ্কার করা, চুল আঁচড়ানো, কান বা নাক খোঁটা বারণ। খবরের কাগজ বা বই শব্দ করে পড়বেন না। পড়লেও এমন ভাবে পড়বেন, যে দ্বিতীয় কেউ শুনতে না পান। আপনি তো আর পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছেন না। সুতরাং, নিঃশব্দে পড়া অভ্যাস করুন। আপনার পাঠাভ্যাস যেন অন্য কারও বিরক্তির কারণ না-হয়।

নিজের কথাবার্তা কিংবা লেখালেখিতে কখনও ইংরেজি 'স্ল্যাং' বা অপভাষা ব্যবহার করবেন না। সব সময় শিষ্ট ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে। মনে রাখবেন ইংরেজি 'স্ল্যাং' সম্পর্কে আপনার সম্যক ধারণা নাও থাকতে পারে। সুতরাং, অপভাষা অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োগ যথার্থ হলেও, কোনও ইংরাজ বা ইউরোপিয়ান বিদেশির মুখে স্বদেশি 'স্ল্যাং' শোনা পছন্দ করেন না। কথায় কথায় হলপ-করা, দিব্যি দেওয়াও নিন্দনীয়। (সুতরাং, হোক মা মেরির নামে দিব্যি, কখনও বলবেন না,—মাইরি!) আসলে ইংরেজি 'ওথ', (oth) 'সোয়েরিং' (swearing) সম্পর্কে আপনার ধারণা অস্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কোনও ইংরেজ বা ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকের সামনে ভারতীয়দের উচিত নয় অন্য কোনও ইংরেজ বা ইউরোপিয়ান সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা। কোনও কারণে যদি কোনও সাহেবের নাম উল্লেখ করতে হয় তবে মর্যাদাসহ তা করতে হবে। কখনও বলা চলবে না, ব্রাউন আমাকে বলছিলেন... ('ব্রাউন টোল্ড মি সো-অ্যান্ড-সো'), বলতে হবে, 'স্যার রিচার্ড ব্রাউন', কিংবা 'লর্ড ব্রাউন' বলছিলেন, ইত্যাদি। ঠিক তেমনই 'মিঃ পি', 'মিসেস সি', 'মিস ডব্লিউ' বলা চলবে না, পুরো নাম বলতে হবে। এভাবে সংক্ষিপ্তকরণ অভব্যতা।

মনে রাখতে হবে, শিক্ষিত ও উচ্চস্তরের ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো আপনার যতই শিক্ষা

থাক না কেন, সামাজিক মর্যাদায় আপনি যতই উচ্চবর্গের হোন না কেন, আপনার সঙ্গে ইংরেজের পার্থক্য আছে। ইংরেজ সভ্য সমাবেশে কখনও মনুষ্য শরীরের কোনও কোনও অংশ নিয়ে কখনও কথা বলেন না। ভারতীয়রা কিন্তু সে-সম্পর্কে মোটে সচেতন নন। ইংরেজের কাছে বিশেষ বিশেষ শব্দ 'ট্যাবু', উচ্চারণ যোগ্য নয়। কারণ, ওই সব শব্দ এমন অনুষঙ্গ টেনে আনে যা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। ইংরেজ কখনও 'স্টমাক' বা পেটের কথা পাড়বেন না, 'বাওয়েলস' বা কোষ্ঠ উল্লেখ করবেন না। নিজের উদর হোক, বা আপনজন, বন্ধুজনের উদরই হোক, বৈঠকি আলোচনায় তার কোনও ঠাঁই নেই। ডাক্তারের কাছে হলে অবশ্য অন্য কথা। সেখানে সবই বলা চলে। পৈটিক ব্যাপার-স্যাপার মেমসাহেবদের সামনে বলা তো রীতিমতো অশ্লীলতা। সুতরাং, পেটের গোলমালের জন্য যদি কোনও সাহেবি নিমন্ত্রণের আসরে আপনি অনুপস্থিত থাকতে চান তবে সুযোগ থাকলে একবার দর্শন দিয়ে জানিয়ে দিয়ে যান আপনার শারীরিক অসুস্থতার কথা। কিংবা দু' ছত্র লিখে চিঠি পাঠান। কি মুখের কথায়, কি চিঠিতে অসুস্থতার কথা বললেও কিছুতেই বলবেন না, অসুবিধা ঠিক কোথায় বা কী ধরনের। আপনি কোনও মেডিক্যাল রিপোর্ট লিখছেন না, সুতরাং অসুখের বিস্তারিত ফিরিস্তি অবান্তর। মনে রাখবেন ইংরাজ সমাজে 'ডায়রিয়া', 'ডিসেন্ট্রি', এ শব্দ কেউ মুখে আনেন না। বিশেষ করে কোমল-হৃদয় মেমসাহেবদের উপস্থিতিতে। তাঁদের সামনে কক্ষনো 'বেলি' (belly) বা সরাসরি উদরের কথা পাড়বেন না। ওই সমাজে তবু বিকল্প হিসাবে 'অ্যাবডোমেন' (abdomen) চলতে পারে। তবে আপনার পক্ষে ওসব প্রসঙ্গ পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

মনে রাখবেন ওই সমাজে বৈঠিক কথাবার্তায় আরও কিছু কিছু শব্দ নিষিদ্ধ। যথা: 'অ্যাডালটারি' (adultery) বা পরদারগমন, 'ফোর্নিক্যাসান' (fornication) বা ব্যভিচার, 'চাইল্ডবার্থ' (childbirth) বা সন্তান-জন্ম কিংবা 'মিসক্যারেজ' (miscarriage) বা গর্ভপাত। এমন নয় যে, ইংরেজ সমাজে এসব সাধারণ, স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা নয়, তবু আলোচনায় এসব শব্দ উল্লেখ করা অশিষ্টতা। কারণ, এই সব শব্দ কল্পনাকে এমন মোড় নিতে উদ্দীপিত করতে পারে যা অভদ্র, অসংস্কৃত বা স্থূল। সুতরাং, এ ধরনের শব্দ সর্বথা বর্জনীয়। ভারতীয় ভদ্রলোকের পক্ষে উচিত হবে এসব শব্দ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন।

হলঘর, বারান্দা, গার্ডেন পার্টি বা অন্য যেখানেই হোক, কোনও সমাবেশ আয়োজিত হলে বন্ধুদের নিয়ে চলাফেরার পথে আড্ডা জমাবেন না। ইংরেজ ভদ্রলোক, কিংবা ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। তাঁদের সম্পর্কে বন্ধুদের কাছে কোনও মন্তব্য করবেন না। তাঁদের কানে যেন কোনও মন্তব্য না পৌঁছায়। আপনার মনে হতে পারে ওঁরা এসব গায়ে মাখছেন না। কিন্তু আপনি জানবেন, ওঁরা সবই লক্ষ করছেন। মনে মনে এ ধরনের আচরণকে ওঁরা অশিষ্টতা বলেই গণ্য করছেন। তাঁদের কাছে এসব অসৌজন্য প্রকাশও বটে। আপনি বন্ধুদের নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান দিয়ে কেউ যেতে চাইলে একপাশে সরে গিয়ে তিনি যাতে স্বচ্ছন্দে চলতে পারেন সেভাবে পথ করে দিন। মনে হয় না যেন, আপনারা অনিচ্ছাসত্ত্বে বিরক্তির সঙ্গে তা করছেন। আপনার পক্ষে এভাবে একপাশে সরে যাওয়া মোটেই মানহানি নয়, বরং পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকাটাই বেয়াদপি। ধরা যাক, পরিস্থিতি বিপরীত। অর্থাৎ, আপনার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন অন্য কেউ। সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ধাক্কা মেরে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজের পথ করতে পারেন না। আপনাকে তখন ভদ্রভাবে বলতে হবে,— "উইল ইউ অ্যালাউ মি টু পাস!" কিংবা—'এক্সকিউজ মি'।

বেশিমাত্রায় স্পর্শকাতর হবেন না। অন্যের সমালোচনা সহ্য করতে শিখুন। কেউ যদি আপনার দোষ ত্রুটির কথা বলেন, তবে তা মন দিয়ে শুনুন, শুধরাবার চেষ্টা করুন। আপনাকে কিছু বললে, কিংবা বিশেষ কিছু বলা হলে শোনামাত্র অপমানিত বোধ করবেন না। আপনাকে অপমান করাই উদ্দেশ্য ছিল, এমন কথা প্রথমেই ভাববেন কেন? অনেক সময় অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়।

ভারতীয় ভদ্রলোক মনে মনে ভাবেন ইংরাজ ভদ্রলোকটি তাঁকে গায়ে পড়ে অপমান করেছেন। অনেক সময়ই দেখা যায় এই ভুল বোঝাবুঝির কারণ ইংরাজের উচ্চারিত শব্দ বা বিশেষ কোনও আচরণকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা। মিছিমিছি সন্দেহপ্রবণ হবেন না। বন্ধুভাবে কথা বলে বুঝে নিন, তিনি আপনাকে ঠিক কী বলতে চাইছিলেন। বন্ধুবৎসল সাহেব অবশ্যই আপনার ভ্রান্তি নিরসন করবেন।

বেশি স্পর্শকাতর হওয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনই বেশি মাত্রায় কৌতূহলি হওয়াও অনুচিত। সাহেব হয়তো কোনও বই বা পত্রপত্রিকা পড়ছেন। তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে যাবেন না, তিনি ঠিক কী পড়ছেন। এভাবে তাঁর হাতের বই বা কাগজ পড়ার চেষ্টা করাও গর্হিত। আপনি সাহেবের অপেক্ষায় তাঁর বৈঠকখানায় বসে আছেন। তিনি একটি বই নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সেটা কী বই তা জানবার জন্য আপনি উকিঝুঁকি দেবেন না। সে বইটি হয়তো তিনি টেবিলে রেখে আপনার সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর বিনা অনুমতিতে কক্ষনো আপনি সে-বই নিজের হাতে তুলে নেবেন না বা পাতা খুলে পড়ার চেষ্টা করবেন না। ওই ইংরাজ বা ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকের পোশাকের কোনও বৈশিষ্ট্য যদি আপনার চোখে পড়ে থাকে, তবে হাঁ করে বারবার সেদিকে তাকাবেন না। আপনার আচরণ যেন অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও জানবেন সাহেব আপনার এই শিশুসুলভ কৌতূহল দেখে মনে মনে অতিশয় বিরক্ত। আপনি হয়তো ভাবছেন এসব তুচ্ছ ব্যাপার, কে আর এসব নিয়ে মাথা ঘামান। আপাততুচ্ছ বিষয়ে সজাগ এবং সতর্ক থাকাই কিন্তু প্রকৃত ভদ্রজনের চরিত্র, তাঁর যোগ্য আচরণ।

> "হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

"ইংরাজস্তোত্র"-এ লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। খবরদার, এ কাজটি করবেন না। করজোরে সাহেবের কাছে কখনও কিছু প্রার্থনা করবেন না। এমনকী আপনার অনুগত কারও জন্যও কোনও কিছুর জন্য আবেদন জানাবেন না। তবে হাঁ, যদি কোনও সাহেবের সঙ্গে আপনার বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকে তবে অন্য কথা। তিনি নিশ্চয় জীবনে আপনার সাফল্য দেখতে চাইবেন, প্রয়োজনে সম্ভব হলে সাহায্যও করবেন। কিন্তু কক্ষনো ভাববেন না, ইউরোপিয়ান মানে সবাই দয়ার অবতার। সুতরাং, নিজের পায়ের উপর নির্ভর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করাই শ্রেয়। কথায় কথায় পরিচিত বলেই সাহেবের কাছে কিছু যাজ্ঞা করা ঠিক নয়। পড়াশুনার খরচের জন্য সাহায্য চাওয়া, বিনা পয়সার কাগজের জন্য সম্পাদক সাহেবের কাছে চিঠি লেখা, কিংবা লেখকের কাছে বিনামূল্যে তাঁর লেখা বই প্রার্থনা করা আদৌ সঙ্গত নয়। আপনার দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য, এসব নিয়ে সাহেবের কাছে মায়াকান্না অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ওঁরা বিচার করবেন তোমার যোগ্যতা, তোমার বুদ্ধিমত্তা, তোমার প্রতিভা। অনেকে চাকরির দরখাস্তে পরিবারে পোষ্য কতজন ইনিয়ে বিনিয়ে তার বিবরণ দেন, কেউ কেউ পরীক্ষার খাতায়ও কেঁদে-কেটে বলেন, এটাই তার শেষ সুযোগ, সুতরাং পরীক্ষক যদি দয়াপরবশ হয়ে কিছু নম্বর বাড়িয়ে দেন তবে তিনি বেঁচে যান। এসব সওয়াল অর্থহীন, অবান্তর। এতে চিঁড়ে ভিজবে না। সুতরাং, মিছিমিছি অন্যের করুণাপ্রার্থী হবেন না।

ধার করা চলবে না। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' নীতি অচল। ভিক্ষার মতোই তা সর্বপ্রযত্নে পরিত্যাজ্য। ধার করলেও পরিচিত সাহেবের কাছে নয়, ধার চাইবেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে। অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিতের কাছে ধার চাওয়া গর্হিত। পরিচিত কেউ যদি ধার দেন, তবে সময়ে তা শোধ করে দেবেন। দেব, দিচ্ছি, বলে কালহরণ করবেন না। সাহেব সংসর্গ লাভ করতে হলে চরিত্রে এসব গুণ থাকা বিশেষ জরুরি।

বই ধার করবেন না। যাঁরা বই প্রেমিক তাঁরা নিজেদের বই অন্যদের ধার দেওয়া পছন্দ করেন না। সুতরাং, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া কারও কাছে বই চাইবেন না। অন্য কারও কাছে তাঁর বই চাওয়ার স্বাধীনতা বা অধিকার আপনার নেই, এই কথাটা মনে রাখবেন। অন্যর কাছে না চেয়ে লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ুন। তেমন দরকার হলে কিনে নিন। একান্ত যদি কোনও বন্ধু তাঁর বই আপনাকে ধার দেন, সময়ে ফেরত দিতে ভুলবেন না। বই ব্যবহারের সময় সতর্কভাবে ব্যবহার করবেন, সেলাইয়ে যেন টান না পড়ে, মার্জিনে কিছু নোট করবেন না, দাগ দেবেন না। যেমনটি এনেছেন, তেমনটিই ফেরত দেওয়া চাই। তাঁকে যেন চাইতে না-হয়।

> "হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত তাহাই আমি করিব। আমি বুট পান্টলুন পরিব, নাকে চস্‌মা দিব, কাঁটা চাম্‌চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

শুধু ইংরেজি কেতা: পান্টলুন পরলেই চলবে না। মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রলালের "ডেপুটি কাহিনী"—

"পরিয়া ইংরাজি প্যান্ট গলা আঁটা কোটে,
—চাপকান অঙ্গে আর রোচে না ক মোটে,
অথচ ইংরাজি সজ্জা, পরিতেও হয় লজ্জা,
ভয়েতেও কতকটা বটে,
বাবুদের সাহেবিতে সাহেবেরা চটে:"

পোশাকের চেয়ে সাহেবরা কিছু বেশি নজর রাখেন পরিচ্ছন্নতার প্রতি। সুতরাং, যে পোশাকই পরুন না কেন, সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। নখ কাটতে হবে। জামা বা চাপকান সাফ রাখতে হবে, প্রতিটি বোতাম যেন যথাস্থানে থাকে। মাথার টুপি, তা "স্কাল ক্যাপ" বা "ব্রিমলেস ক্যাপ", যাই হোক না কেন, তা যেন তেল চিটচিটে বা ধুলোময় না হয়। তবে ইউরোপিয়ান সমাজে মিশতে হলে "শামলা" বা "মুঘলাই পাগড়ি" পরাই ভাল। সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হলে আগে ভাল করে পড়ে নেবেন সরকারি নির্দেশিকা বা বিধিনিষেধ। দ্রষ্টব্য : "Government of Bengal Resolution (Political), dated 30th January, 1880." সেখানে কিন্তু স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে সরকারি অনুষ্ঠানে ভারতীয়দের "ব্রিমলেস হ্যাট" বা ঘেরহীন টুপি পরা নিষিদ্ধ।

জুতোর বেলায় চাই "পেটেন্ট লেদার" বা "ব্ল্যাক" বা কালো চামড়ার "শু"। অর্থাৎ, ইউরোপিয়ানদের মতো জুতো। এ ধরনের জুতোর মধ্যে যেগুলোতে পাশে "ইলাসটিক" থাকে, ভারতীয়দের পক্ষে সেগুলো বিশেষ করে সুবিধাজনক। কারণ তাতে ফিতে বাঁধা খোলার ঝামেলা নেই। অল্পায়াসে সে-জুতো পরে সরকারি অনুষ্ঠান সহ সব ধরনের সমাবেশে যোগ দেওয়া চলে। তবে হ্যাঁ, জুতোয় কালি লাগাতে এবং বুরুশ করতে ভুলবেন না। ভারতীয়দের সে অভ্যাস বলতে গেলে নেই, তাই মনে করিয়ে দেওয়া। মনে রাখবেন, ইউরোপিয়ান সমাবেশে ঢিলেঢালা ভারতীয় জুতো (যথা—চটি) পরা অভব্যতা। সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে চটি, খড়ম, এসব বাড়িতে রেখে সাহেবি 'শু' পরে নেবেন। এ সম্পর্কেও রয়েছে সুস্পষ্ট সরকারি নির্দেশাবলী। দ্রষ্টব্য : "Govt of India Resolution No. 514, dated 19th March, 1868."

এই সব সরকারি কেতা-কানুন, নির্দেশ-আদেশ পড়লে বোঝা যায় তৎকালে সাহেব হওয়া মোটেই কথার-কথা ছিল না। কেননা, সাহেবরা কিছুতেই ভুলতে রাজি ছিলেন না যে, তাঁরা রাজার জাত। ভারতীয়রা তাঁদের পদানত, বশংবদ প্রজা মাত্র। সুতরাং, তাঁদের সমাজে প্রবেশপথে সৃষ্টি করা হয়েছিল একের পর এক বাধা। ঔপনিবেশিকতা সেই চেহারার নানা স্মারক ছড়িয়ে রয়েছে সেদিনের নানা আপাত-সূক্ষ্ম চিত্রমালায়,—সেগুলি ওই সব লিখিত সরকারি নির্দেশাবলী। তবু একশ্রেণীর ভারতীয়ের, বিশেষ করে বাঙালি বাবুদের সাহেব হওয়ার জন্য সে কী ব্যাকুলতা! সাহেব বলছেন,

ঠিক আছে, তা-ই হবে। আপত্তি নেই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে। তবে তার আগে দীক্ষা মনে প্রাণে গ্রহণ করা চাই।

প্রথমত, আপন পোশাক পরার অভ্যাস কমাও। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'বিলাতফের্ত্তা' কবিতায় লিখেছিলেন—

"আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর:"

মিছিমিছি নিজেকে বাঁদর ভাবতে যাবেন কেন। বরং, নিজেকে ভেবে নিন স্বদেশি সাহেব। সুতরাং ইউরোপিয়ান সমাজে মিশতে হলে, ধুতি ত্যাগ করে ট্রাউজার্স ধরুন। ধুতি পরলেও যেন কিছুতেই পায়ের কোনও অংশ বেআব্রু থাকে না। খাটো মোজায় হবে না, যাকে সাহেবরা বলেন "স্টকিং", তা-ই চাই। আর ধুতি যেন কিছুতেই লটরপটর না করে। সরকারি নির্দেশের ৩ নম্বর ধারায় বলে দেওয়া হয়েছে—

"If you wear the dhoti, you should be the more chary of lolling and lounging, since display of bare legs that may be caused by such attitudes, is particularly ungraceful."

সুতরাং, ঝুটঝামেলার মধ্যে না গিয়ে ট্রাউজার্স-এ পা গলিয়ে দেওয়াই ভাল। তবে সাহেবি পোশাক পরলেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চকচকে ঝকঝকে, বা চমকে দেওয়ার মতো সাহেবি পোশাক পরবেন না। নিজের সামাজিক অবস্থান, পদমর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সভ্যভব্য পোশাক পরবেন। সাজগোজের কোথাও যেন দেখলেপনা ভাব না থাকে। ইংরেজ ভদ্রলোকেরা, কোটের বোতাম, কাফ-লিঙ্ক, সরু ঘড়ির চেন, টাইপিন, বা কনিষ্ঠ আঙুলে একটি আংটি ছাড়া কোনও গহনা পরেন না। সুতরাং, লোক-দেখানো কোনও গহনা পরবেন না। হাতে অসংখ্য আংটি পরবেন না। ঘড়ির চেন যেন বেশি মোটা না-হয়। সেটা রুচিবিরুদ্ধ। ঝুটা গহনা কক্ষনো পরবেন না। চশমা পরলে হালকা-চশমা পরবেন। ফ্রেম সোনার কিংবা নীলাভ-ইস্পাতের হবে। রেশমি ফিতেয় সেটি গলায় ঝোলাবার ব্যবস্থা রাখবেন। হাঁ, পকেটে সব সময় রুমাল রাখা চাই। রুমাল হবে হয় সাদা কেম্বিসের, কিংবা সাদা অথবা লাল সিল্কের। রুমালে লাল বর্ডার চলতে পারে।

এই গেল, সাহেব হওয়ার প্রথম শর্ত।

সবে প্রথম পাঠ শেষ হল। অর্থাৎ, অ আ ক খ পর্ব শেষ। এবার অন্য পাঠ। সাহেব বা মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হলে একটা কিছু উপলক্ষ্য থাকা চাই, তা-ই না? এক উপলক্ষ্য যাকে বাংলায় বলে নমস্কার জানাতে যাওয়া, অর্থাৎ, "টু পে ওয়ান্স রেসপেক্টস!" তা ছাড়া রয়েছে আধা-আনুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক নানা উপলক্ষ। প্রথমে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের কথাই বলা যাক।

ভারতে নবাগত কোনও ইংরাজ রাজকর্মচারী কোনও শহরে এলে নিজেই উদ্যোগী হয়ে বিশিষ্ট দেশীয় লোকেদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা পরিবর্তে নিজেরা গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে নমস্কার জানান। সেক্ষেত্রে মেমসাহেবকেও সম্মান জানানো রীতিসম্মত। তবে মেমসাহেবের কাছে কোনও কাজের কথা পাড়া ঠিক হবে না। যে সব কথা সাহেবকে বলতে চান, তা তাঁর কাছেই নিবেদন করতে হবে। কলকাতার মতো বড় শহরে কোনও সাহেবের পক্ষে বেশি মানুষের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ ভদ্রলোক, নিজের বিশিষ্ট ভারতীয় সহকর্মী, কিংবা যাঁরা সাহেবের পূর্বপরিচিত, তিনি তাঁদের সঙ্গেই দেখা করার চেষ্টা করেন। তার বাইরে সাহেবরা চট করে কোনও ভারতীয়ের বাড়িতে পদধূলি দেন না, তা তিনি যত ধনী বা মানীই হোন না কেন। সাহেব সাধারণত সেসব বাঙালিবাবুর বাড়িতেই যান যাঁদের ঘরবাড়ি সাহেবি ধরনে সাজানো, এবং জীবনযাত্রায়

ইউরোপিয়ান হওয়ার চেষ্টায় আছেন। এমনকী তাঁদের গৃহিণীরাও চালচলনে মেমসাহেবদের মতো। অর্থাৎ, সাহেব এসেছেন শোনামাত্র তাঁরা বুক অবধি ঘোমটা টেনে অন্দরে পালিয়ে যান না। সাহেবরা সাধারণত এসব বাড়ি এড়িয়ে চলেন। সুতরাং, সাহেব সন্দর্শনে গেলে সবাই একথা ধরে নেবেন না যে, সাহেব তাঁর বাড়িতে আসবেন। সাহেবকে নেমন্তন্ন করার আগে অতএব সব দিক ভেবেচিন্তে তা করবেন। সাহেবিয়ানার সাধনায় আপনি কতদূর অগ্রসর হয়েছেন মনে মনে তা ভেবে দেখবেন। বাড়িঘর কতখানি সাহেবিয়ানার সাজে সজ্জিত, তাও ভেবে দেখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ঈশ্বর গুপ্ত যাঁদের বলেছেন, "শাড়িপরা এলোচুল আমাদের মেম", আপনার অন্দরের সেই গৃহলক্ষ্মীরা "এ, বি শিখে বিবি সেজে" "বিলাতি বোল" বলতে অভ্যস্ত হয়েছেন কি না।

"বসন্তক" পত্রে দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাঙালি বড়মানুষের স্বপ্ন ও সাধের কথা শোনানো হয়েছিল ১২৮০/৮১ সালে। সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে আনা সেই স্বপ্নের এক টুকরো :

"বাসন্তিকা প্রেয়সীরে বিবী সাজাইয়ে।
দিব তাঁহাদের ইন্ট্রোডিউস করিয়ে ॥
সেক্‌হ্যান্ড করিবে প্রিয়া সাহেবের সনে।
আর নানা বাক্যালাপ করিবে যতনে ॥
হাব ভাব রসোল্লাস প্রকাশিয়ে প্রিয়ে
তাঁহাদের মনঃপ্রাণ লইবে হরিয়ে ॥"

বলতে গেলে হাতেনাতে সে-কাজটাই করেছিলেন একদিন হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। সেটা ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বরের কথা। প্রিন্স অব ওয়েলস ভারত-দর্শন উপলক্ষে কলকাতায় এসেছেন। তিনি নাকি ইচ্ছাপ্রকাশ করেন এই শহরে বহুশ্রুত বাঙালি বড়মানুষের অন্তঃপুরে একবার উঁকি দিতে। অনেক বাঙালিবাবুই সেদিন সে-সৌভাগ্য লাভের জন্য আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। নগরে আলোড়ন তুলে প্রিন্স সদলবলে তাঁর ভবানীপুরের বকুলতলার বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। সেই উপলক্ষে হেমচন্দ্রের বিখ্যাত কবিতা "বাজিমাৎ"। তিনি লিখেছিলেন—

"বেঁচে থাকো মুখুজ্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে ॥
"ফিব্রু" দানে, এক তাড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ কাতুরে, ভেকো হলো—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ ॥"
"সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়!
দেখালে অদ্ভুত কীর্তি বকুলতলায়!
পুণ্য দিনে বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পৰ্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে ॥"

... ...

"বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন।
বাঙ্গালী-কুল-কামিনী হইল স্বাধীন ॥"

স্বভাবতই শহরে হুলুস্থুলু কাণ্ড। তা উপলক্ষ্য করে "গজদানন্দ ও যুবরাজ" নাটক (ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬), নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন, আরও কত না কাণ্ড। তাতে কিছু আসে যায় না। জগদানন্দ পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এমনকী পুরস্কৃত হয়েছিল কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সাহেবরা ভক্তদের কখনও নিরাশ করেন না। সাহসিকতার সঙ্গে যিনি নিজের অন্তঃপুরের দরজা তাঁর সামনে খুলে দিতে পারেন, তিনি তারিফ

পাবেন বই কি! ফলে তৎকালে আরও কেউ কেউ সাহেবভজনায় রমণীরত্নকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের কথা পরে হবে। আপাতত আপনার পক্ষে জরুরি এটাই, যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়া সাহেবকে হঠাৎ বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বসবেন না।

এবার কাজের কথায় ফেরা যাক। সাহেব আপনার ইয়ার বন্ধু নন, সুতরাং, তাঁর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করার চেষ্টা করবেন না। ছয় মাসে একবার, কিংবা একবারই যথেষ্ট। সেটাও করা যায় কোনও বিশেষ উপলক্ষে। ধরা যাক, সাহেব দীর্ঘদিনের জন্য অন্য কোথাও চলে যাচ্ছেন, কিংবা দেশে ফিরে যাচ্ছেন, তখন দেখা করলে দোষের নয়। সাহেব যদি অন্যত্র দীর্ঘদিন কাটিয়ে শহরে ফিরে এসে থাকেন, তবে তাঁকে স্বাগত জানাতেও সাহেবকুঠিতে হানা দিতে পারেন।

সাহেব-মেম যদি কখনও আপনাকে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করে থাকেন, তবে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আপনার সৌভাগ্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সেটা করা চাই। আপনি যদি কোনও কারণে সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পেরে থাকেন, তবু আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো আপনার কর্তব্য।

আপনার পরিচিত কোনও ইউরোপিয়ান অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকেন, কিংবা তাঁর পরিবারের অন্য কেউ গুরুতর অসুস্থ বলে খবর পান, তবে বাড়ি গিয়ে উৎপাত করবেন না। নিঃশব্দে আপনার 'কার্ড' রেখে চলে আসবেন। ওই পরিবার শোকগ্রস্ত হলেও আপনার 'কার্ড'খানাই হবে আপনার উৎকণ্ঠা ও সমবেদনার প্রতীক। কার্ডটির বাঁদিকে এক কোণে হাতে শুধু লিখে দেবেন—"টু ইনকোয়ার" ("To inquire") আপনি নিশ্চিত জানবেন, বিপদ কেটে গেলে সাহেব তার উত্তর দেবেন তাঁর নিজের কার্ড পাঠিয়ে। তাতে লেখা থাকবে—"উইথ থ্যাঙ্কস ফর কাইন্ড ইনকোয়ারিজ" ("with thanks for kind inquiries")।

আপনি যদি নিজের বিশেষ পরিচিতির জন্য সাহেবকেও লিখিত পরিচয়পত্র পাঠাতে চান তবে নিজের "কার্ড"-টির সঙ্গে সাহেবকুঠির পিয়নের হাতে সেটি সমর্পণ করুন। সাহেব ওই পরিচয়পত্র দেখে বুঝতে পারবেন আপনি কে। অতঃপর তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন কি না সেটা তিনি নিজেই স্থির করবেন। ইচ্ছা করলে আপনার ওই পরিচয়পত্র নিজে হাতে করে না নিয়ে গিয়ে ডাকেও পাঠিয়ে দিতে পারেন। ভাইসরয়, গভর্নর, বা লেঃ গভর্নরকে পরিচয়পত্র পাঠাতে হলে তাঁদের পার্শ্বচর (ADC) কিংবা একান্ত সচিবকে পাঠাতে হবে।

যদি আপনি এমন কোনও সাহেব বা মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান যিনি বা যাঁরা তখন অন্য কোনও সাহেব-মেমের বাড়িতে অতিথি, সেক্ষেত্রে আপনাকে একটির বদলে দুটি 'কার্ড' খরচ করতে হবে। একটি গৃহস্বামীর নামে, অন্যটি তাঁর অতিথি তথা আপনার পরিচিত সাহেব বা মেমের নামে দরোয়ান বা পিয়নের হাতে দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। যে কার্ডটি আপনি অতিথি বা আপনার পরিচিত সাহেব বা মেমকে পাঠাতে চান তার কোণে পেন্সিল অথবা কলমে লিখে দিতে হবে—"ফর মিঃ/ অর মিসেস ব্রাউন।" ("For Mr. or Mrs. Brown")। অন্য কার্ডটির কোণে লিখে দিতে হবে গৃহপতি দম্পতির নাম। যেহেতু দ্বিতীয় যুগল আপনার অপরিচিত, সুতরাং ধরে নিতে হবে ওঁদের সঙ্গে আপনার দেখা হবে না। হলেও হবে ক্ষণিকের জন্য। যদি অতিথি সাহেব ও তাঁর স্ত্রী দু'জনের সঙ্গেই আপনি দেখা করতে চান, তবে দু'জনের জন্য আলাদা ভাবে দুটি কার্ড পাঠাতে হবে। তার মানে এই যে, এই অভিযানে আপনার কার্ড লেগে যাবে তিনটি। সুতরাং, সাহেব-মেমদের সঙ্গে সামাজিকতা করতে হলে একসঙ্গে বেশি কার্ড ছাপিয়ে নেওয়াই ভাল।

বিশেষত, কার্ডের রকমারি ব্যবহার রয়েছে সাহেবি সমাজে। ধরা যাক, আপনার পরিচিত কোনও সাহেব দীর্ঘদিনের জন্য আপনার শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, কিংবা ফিরে যাচ্ছেন স্বদেশে, সেক্ষেত্রে নিজে হাজির হয়ে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানানো ভদ্রতা। কিন্তু কেউ যদি স্বল্পকালের জন্য আপনার শহর ছেড়ে যান, সেক্ষেত্রে সশরীরে হাজির হওয়ার দরকার নেই, পিয়নের হাতে কার্ড তুলে দিলেই

চলবে। তবে কার্ডের ডান দিকের কোণে লিখে দিতে হবে,—"পি পি সি", ("PPC"), এই তিনটি রোমান হরফ আসলে তিনটি ফরাসি শব্দের বদলে ব্যবহার করা হয়। ফরাসিতে বললে এই তিনটি শব্দের মানে, "Pour prendre conge."। ইংরেজিতে তার অর্থ—'টু টেক লিভ"। ("To take leave") এই কার্ড ডাকে পাঠালেও একই ফল।

অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়ম কিন্তু কার্ড ডাকে বা পিয়ন দিয়ে না পাঠিয়ে সাহেবের কাছে নিজেই পেশ করা। ভারতে সাহেবরা সাধারণত দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন বেলা ১২টা থেকে ২টার মধ্যে। কোনও মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হলে এই সময়ের মধ্যেই তা করা আবশ্যিক। সাহেবের সঙ্গে অফিসে দেখা করতে হলে বেলা ১১টা থেকে ১-৩০ মিনিট অমৃতযোগ। অথবা ৩টা থেকে ৪-৩০ মিনিট। বাড়িতে দেখা করতে হলে অফিসের আগে অথবা পরে। ৪টা বা ৫টার সময় দেখা করতে গেলে সাহেব-মেমের বিশ্রাম বা অবকাশ যাপনে বিঘ্ন হতে পারে। মফঃস্বলে অফিস শুরু হয় সকাল সকাল। তার কথা মনে রেখে সেখানে দেখাসাক্ষাতের সময় স্থির করতে হবে। কলকাতা এবং মফঃস্বলে ইউরোপিয়ানরা সাধারণ অন্য ইউরোপিয়ান মেমসাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে যান ছুটির দিনে বেলা ১২টা থেকে ২টার মধ্যে। সুতরাং, কোনও মেমসাহেবকে নমস্কার জানাতে হলে ভারতীয়দের উচিত ওই সময়টুকু বাদ দেওয়া। কারণ, ধরে নিতে পারেন লেডি তখন অন্যদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকবেন, আপনাকে তিনি সময় দেবেন কেমন করে। ছুটির দিনে সাহেব হয়তো ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকবেন। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে অধিকাংশ ইংরেজ সেদিন কোনও আনুষ্ঠানিক বা সরকারি কাজে মাথা ঘামাতে চান না। দিনটা তাঁরা নিজেদের মতো করে উপভোগ করতে চান। সুতরাং, সেদিন অহেতুক ওঁদের বিরক্ত করবেন না।

কোনও মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হলে দুটি কার্ড চাই। মনে রাখবেন, এক্ষেত্রে তাঁর স্বামীকেও একটি কার্ড পাঠাতে হবে। সাহেবের সঙ্গে হয়তো মোটে দেখা হবে না। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তবু তাঁর নামে কার্ড পেশ করতে হবে। শুধু সাহেবের দর্শনার্থী হলে অবশ্য একটি কার্ডেই কাজ চলে যাবে।

কার্ড ছাপাবেন আধুনিক ইংরেজ ভদ্রলোকের রুচির কথা মনে রেখে। কার্ড হবে সাদাসিধে, অলঙ্কৃত বা জবরজঙ্গ নয়। কাগজ হবে সাদা, তবে বার্নিশ করা চকচকে কাগজ নয়। শক্ত কার্ডবোর্ডও অচল। তাতে নাম ছাপা হবে কালো কালিতে, সোনার জলে নয়। কপার-প্লেট বা তামার প্লেটে ছাপানো কার্ড ভাল। বাজে ছাপা কার্ডের বদলে হাতে লেখা কার্ডও ভাল। কার্ডে পুরো নাম ও পদবি দিতে হবে। যথা : Raja Ramnath Tagore, Moulvie Muhammed Sultan Alum, Babu Dwarka Nath Mitter. এসব কার্ডে কক্ষনো "অনারেবল" কথাটা দেওয়া চলবে না। যেসব ভারতীয় নামের আগে "মিঃ" লিখতে চান, লিখতে পারেন। সরকারি পদ বা অন্য পরিচিতি থাকলে তাও যোগ করতে দোষ নেই। সাহেব সহজে বুঝতে পারবেন আপনি কে বা কী। ভিজিটিং কার্ডে "বি.এ", "এম.এ", "এম.ডি", এসব দেবেন না। কিন্তু পেশাগত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। যথা : "Dr. Kalinath Gupta". বোঝা যাবে আপনি একজন চিকিৎসক। কার্ডের বাঁ পাশে নীচের দিকে নিজের ঠিকানা দেওয়া দরকার। মনে রাখবেন, সাহেব-মেমদের সঙ্গে সামাজিকতার ক্ষেত্রে আপনার কার্ড আপনার পক্ষে একটি গেটপাশ বিশেষ।

কোনও সাহেবের সঙ্গে আগে কথা হয়ে থাকলে কার্ডের উপরের দিকে মার্জিনে লিখে দেবেন "বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট"। কোনও সাহেব অনেক সময় হয়তো আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কী তা জানতে চান। তাঁরা দর্শনার্থীর জন্য শ্লেট পেন্সিল রেখে দেন। কার্ডের সঙ্গে পিয়নের হাতে তা দিয়ে দেবেন। শ্লেট পেন্সিলের ব্যবস্থা না থাকলে আপনি কার্ডের পিছনেও সংক্ষেপে তা লিখে দিতে পারেন। একান্তই যদি আপনার কোনও ছাপানো কার্ড না থাকে তবে পরিষ্কার কাগজে পরিচ্ছন্নভাবে

নিজের নামধাম লিখে তা-ই পেশ করুন। তাতেও কাজ হবে।

নিজের আগমনবার্তা আগে না-জানিয়ে কখনও সাহেবের বাড়ির চৌকাঠ ডিঙ্গাবার চেষ্টা করবেন না! সাহেব আপনার সুপরিচিত এবং বন্ধুতুল্য হলেও আগে ভেতরে খবর পাঠাতে হবে। ওঁরা আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন জানার পর ঘরে ঢোকার আগে দরজায় ঠোকা দিতে হবে। ওঁরা যদি অন্য কোনও ব্যাপারে ব্যস্ত থাকেন, কিংবা অসুস্থ, অথবা অনুপস্থিত, তবে কার্ড রেখে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে যান, তীর্থের কাকের মতো সেখানে বসে থাকবেন না। একান্তই যদি ওঁদের সঙ্গে দেখা করা আপনার মানস, তবে কার্ডটি পকেটে রেখেও ফিরে আসতে পারেন। না হয় আর এক দিন চেষ্টা করবেন।

সাহেব-মেম দর্শন উপলক্ষে আরও কিছু কিছু কথা মনে রাখা দরকার। ধরুন, আপনি কোনও মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। তিনি যে কোনও কারণেই হোক সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে অক্ষম। সেক্ষেত্রে দরোয়ান এসে আপনাকে হয়তো বলবে, "দরওয়াজা বন্ধ।" আপনাকে বুঝে নিতে হবে, সেদিন আর দেখা হল না।

সাক্ষাৎ-পর্বে সাহেব-মেমরা সাধারণত এক দর্শনার্থীর সঙ্গে অন্য দর্শনার্থীর পরিচয় করিয়ে দেন না। সুতরাং, সাহেবের ঘরে ঢুকে আপনি যদি দেখেন সেখানে অন্য কোনও ভারতীয় উপস্থিত রয়েছেন, তবে আশা করবেন না সাহেব তাঁর সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তাতে অপমানিত বোধ করার কোনও কারণ নেই। কথা প্রসঙ্গে হয়তো একসময় উপস্থিত অন্য কারও সঙ্গে আপনার দু'চার কথা আদান প্রদান হয়ে গেল, তার মানে এই নয় যে, সেই ক্ষীণ সূত্র ধরে পরে দু'জনের মধ্যে আলাপ পরিচয় হবে। আপনি আপনার কাজে এসেছেন, অন্যজন এসেছেন তাঁর কাজে, এই দেখাসাক্ষাৎ নিতান্তই আকস্মিক। সুতরাং, ভুলে যান।

সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যেন দীর্ঘ না হয়। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে বড়জোর সময় নেবেন আপনি দশ মিনিট। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় আলোচ্য হলে অবশ্য আরও কয়েক মিনিট আপনি নিতে পারেন। কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করাই শ্রেয়। মনে রাখতে হবে ভারতে ইংরাজরা খুবই ব্যস্ত। সব শ্রেণীর সাহেবদের কাছেই সময় অমূল্য ধন। সুতরাং, দ্রুততার সঙ্গে সংক্ষেপে কাজের কথা সারুন। দীর্ঘ ভূমিকার দরকার নেই। অলঙ্কৃত দীর্ঘ কাব্যিক আবেদনও অর্থহীন। অহেতুক ডাইনে বাঁয়ে ঝোপ-ঝাড় পিটিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। কোনও গালগল্প জুড়বেন না। সাহেব কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তিনি অল্পেই বুঝে নেবেন আপনি কেন এসেছেন, কী চান। সুতরাং, খুব সাবধান। দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা কিন্তু আপনার মূল বক্তব্য ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে!

সাহেব-মেমদের একটা প্রধান দাবি—নিয়মানুবর্তিতা। ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে চলবেন। কোনও উপলক্ষে কখনও যেন "লেট" না হতে হয়। কোনও মেম সন্দর্শনে যেতে হলে পোশাক পরিচ্ছদের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। ধুতি নয়, পরনে চাই ট্রাউজার্স, কোট। আর চাই ইংলিশ "শু-জ" আর মোজা। মাথায় থাকবে "শামলা" অথবা মুঘল পাগড়ি। আপনি মুসলিম হলে পরিচ্ছন্ন কাজ করা "ক্যাপ" বা তাজ পরতে পারেন। আপনার ক্ষেত্রে চোগা চাপকান চলতে পারে। মোট কথা, কোনও অবস্থাতেই ক্যাজুয়াল নয়, মেমসাহেবের সামনে হাজির হতে হবে যাকে বলে—"ফরম্যাল ড্রেসে।"

উনিশ শতকে সাহেবিভাবাপন্ন বাঙালিবাবুদের পোশাক নিয়ে ভাবনার অন্ত ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "রিফর্মড হিন্দুজ"-এর কথা নিশ্চয় অনেকের মনে আছে। তিনি লিখেছিলেন—"আমাদের dress হবে English কি Greek/ তা এখনো কর্ত্তে পারি নি ঠিক;/"। অন্য এক কবিতায় ("ডেপুটি-কাহিনী"), তিনি লিখেছিলেন,

"এদিকে অন্তরে জাগে ইচ্ছা অবিরত
সাহেবিটা বাইরেতে পোষাকে অন্তততঃ

কেরাণীর চাপকান পরিতেও অপমান,
এই বেশ তাই পরিবর্তে;
ত্রিশঙ্কুর মত, স্থিতি না স্বর্গে না মর্ত্যে,
তদুপরি, শোভে শিরে 'ধূম্রপানসেবী';
সাহেবের ক্যাপ—নয় অথচ সাহেবি—
কিনারা উল্‌টানো তার,
কি রকম বোঝা ভার,
অনেকটা বহুরূপী;
চিৎপুরে উদ্ভাবিত অত্যদ্ভুত টুপি।"

সাহেবরা কিন্তু এসব "অত্যদ্ভুত" পোশাকে অভিভূত হবেন না। তাঁদের ফরমাশ সাহেবি কেতামাফিক। ওঁরা বলছেন, যেসব ভারতীয় সাহেবি পোশাকে সাহেবি সমাজে আসতে চান তাঁদের পরতে হবে সাদা লিনেনের শার্ট ও কলার, সিল্কের নেকটাই, কালো কোট, অথবা ফর্ক কোট, সাদা অথবা কালো ওয়েস্টকোট, রঙিন ট্রাউজার্স (টুইড নয়)। তা ছাড়া চাই, কালো বুট বা শু'জ। কলকাতার মতো প্রেসিডেন্সি শহরে মাথায় থাকা চাই লম্বা সিল্ক-হ্যাট। মফঃস্বলে গোল ফেল্ট-হ্যাট হলেই চলবে। গ্লাভস বা দস্তানা ভারতে সাধারণত পরা হয় না। (যদি পরা হয় তবে অবশ্যই কিড্‌স-গ্লাভস পরতে হবে)। গ্লাভস পরা থাকলে করমর্দনের আগে ডান হাতের গ্লাভস খুলে নিতে হবে। সাহেবের বাড়িতে ঢুকে মাথার টুপিও খুলে ফেলতে হবে। মনে রাখবেন মেমসাহেবও কিন্তু আপনার পোশাক মনে মনে খুঁটিয়ে দেখবেন। আপনার পরিচিতির মতোই গুরুত্বপূর্ণ এই সমাজে আপনার পোশাক।

সাধারণ দেখা-সাক্ষাতে ভেলভেট ক্যাপ চলতে পারে। তবে টুপির মতো লাঠি ও ছাতা নিয়ে বৈঠকখানায় ঢোকাও নিষিদ্ধ। এনট্রান্স হল বা বাইরের ঘরে এসব রেখে ভেতরে ঢুকুন। ডোর-ম্যাট বা পাপোষে জুতোর তলা ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। যদি ভারতীয় জুতো (যথা : চটি) পরে এসে থাকেন তবে তা বাইরের সিঁড়িতে কিংবা বারান্দায় রেখে ভেতরে ঢুকুন। ঠিক যেমনভাবে ভক্ত মন্দিরে ঢোকেন, সেভাবে। মাথায় টুপির বদলে পাগড়ি থাকলে সাক্ষাৎকারের আগে বা সাক্ষাৎকারের সময় তা খুলবেন না। সেটা অভব্যতা।

সাহেব কুঠির প্রাঙ্গণে পৌঁছে শান্তভাবে গাড়িতে বসে থাকুন। দরোয়ান বা পিয়নের কাছে আপনার কার্ড দিন। সে যখন ফিরে এসে বলবে "সাহেব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন," তখন ধীর পায়ে নেবে ভেতরে ঢুকবেন। মেমসাহেবের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। যদি পায়ে হেঁটে গিয়ে থাকেন, তবে গাড়িবারান্দার নীচে অপেক্ষা করুন।। যদি দেখেন ধারে কাছে কেউ নেই, তবে "দরোয়ান! দরোয়ান" বলে হাঁক দিন। পিয়নকেও ডাকতে পারেন। কিন্তু চিৎকার করে পাড়া মাথায় করবেন না। ডাক পেলে ধীরে সুস্থে ঢুকুন। বেশি তাড়াহুড়ো করবেন না। তা হলে যদি দোতলায় উঠতে হয় দেখবেন হাঁপ ধরে গেছে। ঢোকার পর দেখবেন সাহেব অথবা মেম, অথবা দু'জনই চেয়ার ছেড়ে উঠে মাথা ঝুঁকিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করছেন। ওঁরা করমর্দনের জন্য হাত বাড়াবেন। আপনি কিন্তু প্রথম করমর্দন করবেন মেমসাহেবের সঙ্গে। অপেক্ষা করুন, তাঁকে আগে হাত বাড়াতে দিন। হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাত প্রসারিত করুন। শুধু আঙুল ধরবেন না, পুরো করতল হাতে নিতে হবে। মৃদু চাপ দিতে হবে। পরক্ষণেই কিন্তু তা ছেড়ে দিতে হবে। করমর্দনের সময় হাত উপরে তুলবেন না, ঝুপ করে ঝুলিয়েও দেবেন না। অবশ-হাতে যেমন করমর্দন করতে নেই, তেমনই অতি-বলপ্রয়োগও নিষিদ্ধ। হাত একেবারে হাতে পেলে তা ক্রমাগত ঝাঁকাবেন না।—'অলওয়েজ লুক অ্যাট দ্য পারসন উইথ হুম ইউ আর শেকিং হ্যান্ড।' যাঁর করমর্দন করছেন তাঁর ওপর চোখ রেখে তা করুন। বসার

পর একেবারে চেয়ারের শেষ সীমানায় যেমন ঠেস দিয়ে বসা ঠিক নয়, তেমনই চেয়ারের সামনের দিকে কোনও মতে আড়ষ্ট ভাবে বসাও সঠিক উপবেশন নয়। আগেই বলা হয়েছে চেয়ারে বসে উঠ-বোস করা চলবে না। হেল-দোলও নিষিদ্ধ। পা আড়াআড়ি করবেন না। সহজ স্বচ্ছন্দ্যভাবেই বসা সঙ্গত।

খুব জোরে, কিংবা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলবেন না। ধীরভাবে, খোলা মনে ও মর্যাদার সঙ্গে কথা বলা রপ্ত করুন। আমুদে হওয়ার চেষ্টা করবেন না। ভঙ্গিতে দেখিয়ে দিন আপনি সভ্যভব্য এবং নম্র। কথায় ইংরেজি ফ্রেজ ব্যবহার না করাই শ্রেয়, সাহেবের মন জয় করার জন্য কথায় কথায় তাঁর প্রশংসা করবেন না। মনে রাখবেন, অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সনরা খোলাখুলি তোষামোদি বরদাস্ত করেন না। তাঁদের কাছে সেটা খুবই বিরক্তকর।

সাহেব সম্পর্কে বেশি কৌতূহলি হবেন না। কক্ষনো তাঁর বয়স বা মাইনে জিজ্ঞাসা করবেন না। তাঁর পারিবারিক বিষয়েও কোনও প্রশ্ন করবেন না। যা বলার ওঁকেই বলতে দিন। সাহেব যদি কখনও আপনাকে একটি ঘড়ি উপহার দেন, জিজ্ঞাসা করবেন না তার দাম কত। তিনি নিজে উপযাচক হয়ে কিছু না বললে আপনি কিছু বলবেন না। প্রথমে দেখা হওয়ার পর বলবেন—"হাউ ডু ইউ ডু।"। (প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের "নিউ ইয়ার্স ডে" রচনায় রামবাবু আর শ্যামবাবুর কথোপকথনের প্রসঙ্গ স্মরণযোগ্য।) "শ্যামবাবু। গুড্ মর্ণিং রামবাবু—হা ডু ডু? রামবাবু—গুড্ মর্ণিং শ্যামবাবু—হা ডু ডু।..." তাই শুনে রামবাবুর স্ত্রী বলেছিলেন—তুমি ত কৈ তার উত্তর দিলে না,—তুমি সেই কথাই পালটিয়া বলিলে। স্বামীর উত্তর—সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীতি।" আপনাকে সেই সভ্য রীতির কথা মনে রাখতে হবে। "হাউ ডু ইউ ডু" না বলে বলবেন না যেন, আপনাকে কেন জানি না রোগা এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কিংবা, কেমন যেন বিবর্ণ। সাক্ষাৎকারে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য বেশি জ্ঞানের কথা কিংবা টেকনিক্যাল শব্দ আওড়াবেন না। সেটা বক্তৃতা মঞ্চ নয়, বিতর্ক সভাও নয়। সাহেব যখন কথা বলবেন তখন ফোড়ন কাটবেন না, বা তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নিজের মতামত দেবেন না। আগে ওঁকে ওঁর বক্তব্য শেষ করতে দিন। নিজের কিছু বলার কথা থাকলে তারপর বলুন। কথার মধ্যে কোনও উপকথা বা গল্পকথা প্রাসঙ্গিকভাবে এলে সংক্ষেপে বলুন। প্রয়োজনে ছোট্ট ভূমিকা করে নিতে দোষ নেই। যেমন—"আই থিঙ্ক ইওর এক্সেলেন্সি ওয়াজ অবজার্ভিং", অথবা—"অ্যাজ আই ওয়াজ জাস্ট টেলিং ইওর অনার।" কথোপকথনের সময় আরও কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। কর্নেল জোন্সের সঙ্গে দেখা করার সময় বলতে হবে—"হাউ ডু ইউ ডু কর্নেল জোন্স!" বলবেন না,—"হাউ ডু ইউ ডু কর্নেল।" ডাক্তার বাউন হলে বলতে হবে—"আই হোপ ইউ আর ওয়েল, ডক্টর বাউন।" বলবেন না,—"আই হোপ ইউ আর ওয়েল, ডক্টর।" সাধারণ কথাবার্তায় ঘনিষ্ঠদের মধ্যে শুধু "সার", "মাডাম", "মিস" চলতে পারে না। শিক্ষককে "ইয়েস" বা "নো" বলা চলবে না। বলতে হবে—"ইয়েস সার", "নো সার"। রানিকে বলতে হবে—"ইওর মাজেস্টি"। রাজকুমার রাজকুমারীকে "ইওর রয়াল হাইনেস"। ডিউককে "ইওর গ্রেস।" জার্কিজ, আর্ল, ভাইকাউন্ট, ব্যারনকে বলতে হবে "মি লর্ড", কিংবা "ইওর গ্রেস"। ঠিক আছে? মুখস্ত করে নিন।

সাক্ষাৎকার শেষে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পড়বেন না। কথা শেষ হয়ে এলে বিরতি বা সুযোগ নিয়ে ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ান। বলুন—"আই ফিয়ার আই অ্যাম ট্রেসপাসিং আপন ইওর টাইম।" মেমসাহেব উপস্থিত থাকলে তিনি কিন্তু আসন ছাড়বেন না। সাহেবের সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকলে তিনি আপনাকে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেন। আবার কিন্তু করমর্দনের চেষ্টা করবেন না। মাথা ঝুকিয়ে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে আসুন। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। সাক্ষাৎকারের আগে সাহেব যদি বাইরের ঘরে আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেন তবে চুপচাপ বসে থাকবেন। ঘরময় পায়চারি করবেন না, গৃহসজ্জার এটা

সেটা দেখে ঘুরে বেড়াবেন না। (কথায় আছে সবুরে মেওয়া ফলে। একটু ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে আপত্তি কীসের?)

এ পর্যন্ত যা বলা হল তাকে বলা যায়—উপক্রমণিকা। এবার সরাসরি সামাজিকতার প্রসঙ্গে আসা যাক। কারণ, ধরে নেওয়া যায় এতদিনে আপনি সাহেবিয়ানায় বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছেন।

ধরা যাক, আপনি সাহেব-মেমদের কোনও বল নাচের আসরে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। (সেটা আপনার সৌভাগ্য বটে। সন্দেহ কী, নিমন্ত্রণ কর্তা সাহেব বা যিনি আপনার আচরণে অতিশয় প্রসন্ন।) সব ভারতীয় কিন্তু ইউরোপিয়ানদের ওই নাচের আসরে আমন্ত্রণ পান না। বাঙালি বা ভারতীয় সমাজের কেষ্ট-বিষ্টুরা অনেকেই বাদ পড়ে যান। নিমন্ত্রণ পান একমাত্র তাঁরাই যাঁরা সাহেবিয়ানায় ষোল আনা দীক্ষিত, এবং ওই লক্ষে রীতিমতো শিক্ষিত। এক্ষেত্রে প্রথম শর্ত—ইউরোপীয় নাচ সম্পর্কে আপনার স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। নাচ শুরু হয় রাত ৯টা ৯-৩০ মিনিট নাগাদ। আগে কখনও শুরুতেই নাচের আসরে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলে অন্য কথা। নয়তো আসরে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা পরে এলেও ক্ষতি নেই। সুতরাং, দৌড় ঝাঁপের প্রয়োজন নেই। সেজেগুজে ধীরে সুস্থে বাড়ি থেকে বের হোন।

নাচে অভ্যস্ত না হলেও যোগ দিতে হবে কেউ এমন মাথার দিব্যি দেননি। না-ই বা জানলেন নাচতে, দরজার কাছাকাছি, কিংবা একপাশে কোনও সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে নাচ দেখুন। কেউ আপনাকে বাধা দেবেন না। ইচ্ছা করলে একপাশে চেয়ারে বসে অন্যদের সঙ্গে অনুচ্চ স্বরে কথা বলুন, তাতেও অসুবিধা নেই। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই আপনার আচরণ যেন নাচে কোনও বাধা সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। সাহেব-মেমরা জোড়ায় জোড়ায় সুর ও ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে পাক খাবেন। বুঝতেই পারছেন, এই নাচের জন্যই নাচের আসর। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য নয়।

আপনি যদি নিজে সাহেব-মেমদের জন্য কোনও নাচের আসরের আয়োজন করেন তবে কর্তব্য হবে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক আমন্ত্রিতকে অভ্যর্থনা জানানো। এই কাজটা করার রীতি বাড়ির গৃহিণীর। তিনি প্রত্যেক অভ্যাগতের সঙ্গে করমর্দন করবেন। কেউ বেশি দেরি করে এলে হয়তো তিনি ততক্ষণে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সেক্ষেত্রে আগন্তুকের দায় তাঁকে খুঁজে বের করে সম্মান জানানো। সাহেব-কুঠিতেও একই নিয়ম। প্রয়োজনে আপনাকেও খুঁজে নিতে হবে গৃহস্বামিনী মেমসাহেবকে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তবে আপনার মুক্তি।

নাচের আসরে, তা ইউরোপীয় হোক, আর ভারতীয় হোক, পুরোপুরি সান্ধ্য পোশাক চাই। ইউরোপীয় পোশাক মানে—ট্রাউজার্স, সামনের দিকে খোলা ওয়েস্ট কোট, টেইলড কোট (অবশ্য ডিনার জ্যাকেটও চলতে পারে।) ইউরোপিয়ান পোশাকের সঙ্গে বল-এ সাদা, ফিকে হলুদ, কিংবা হাল্কা ল্যাভেন্ডার-রঙের কিড গ্লাভস চাই। হ্যাঁ, কালোর বদলে সাদা ওয়েস্ট কোটও চলতে পারে। ভারতীয় পোশাকে গ্লাভস ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু কেউ সে-পোশাকে (তার মানে কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবি নয়) নাচতে চাইলে তাঁকেও পরতে হবে গ্লাভস।

কোনও প্রাইভেট বল-এ, অর্থাৎ বিশেষ কারও বাড়ির আসরে আমন্ত্রিত হলে আমন্ত্রণ পত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া জরুরি নয়। সরকারি কোনও আনন্দ-সমাবেশেও তা আবশ্যিক নয়। অবশ্য যদি কার্ডে তা নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ থাকে তবে অন্য কথা। যাকে বলে পাবলিক-বল সেখানে কিন্তু কার্ড সঙ্গে রাখাই সঙ্গত। নাচের হলঘরের পাশে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র দুটি বিশেষ ঘর থাকে। মেয়েদেরটি আয়না শোভিত। আপনার ওভারকোট ইত্যাদি সেখানে রেখে নাচের আসরে ঢুকুন। সেখানে ওসব চলবে না।

এবার ধরা যাক, আপনি নিমন্ত্রণকর্তার ভূমিকায়। কাউকে 'বল', 'ইভিনিং পার্টি', 'অ্যাট হোম'

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে হলে অন্তত তিন সপ্তাহ আগে তা পাঠাতে হবে। নিমন্ত্রণের কার্ড ঈষৎ বড় আকারের হবে। ছাপা হবে কালো কালিতে, কিংবা সোনার জলে। কার্ডের মাথায় থাকবে আপনার বা পরিবারের প্রতীক মনোগ্রাম বা ক্রেস্ট। কার্ডের চারপাশে সোনালি রঙের ছোপ থাকা ভাল। বয়ান হবে এরকম :

The Maharaja of Dinapore requests the honour of Mr. & Mrs. Brown's Company at a Ball on Monday, January 4th at half-past nine of clock.

Rajabati RSVP

December 18, 1880

"RSVP" মানে ফরাসিতে "Respondes S'il Vous Plait", ইংরেজিতে যার অর্থ— "Answer, if you please." টাউন হলে বল-নাচ আয়োজিত হলে নিমন্ত্রণের কার্ডে বলে দিতে হবে—" At the Town Hall."

বিশেষ কোনও অতিথির সম্মানে নাচ আয়োজিত হলে কার্ডে লিখে তা দেওয়া দরকার। যথা : "To have the honour of meeting H.R.H. The Duke of Connaught." এই কথাগুলো ছাপানো থাকবে কার্ডের মাথায়।

"অ্যাট হোম" ("At Home") বা অপেক্ষাকৃত ছোটখাটো অনুষ্ঠান হলে কার্ডও হবে অপেক্ষাকৃত ছোট। তাতে লেখা থাকবে :

"Mr A.M. Robinson
Babu Chandra Charan Ghosh
At Home,
Tuesday, December 21st
at 9 o'clock

120 Chowringhee Dancing, Music
Private Theatricals

December 12, 1886 RSVP

এই কার্ডে আমন্ত্রিতের নাম কার্ডে হাতে লিখে দিতে হয়। তবে লক্ষ রাখতে হবে ছাপানো অংশে কোনও ভুল যেন না থাকে। ছাপাখানার ভুল বা আপনার নিজের ভুল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে এই ছোট্ট কার্ডটি। সাহেবের চোখে ভুল অনেক সময় শুধু অমনোযোগ নয়, অভব্যতারও লক্ষণ। "ইওরস"-এর ("yours") বদলে সংক্ষেপে "ওয়াই আর এস" ("yrs") চলবে না। "রিকুয়েস্টস" ("Requests") নয়, হবে "রিকুয়েস্ট" ("Request")।

নাচের আসরে কে কার সঙ্গে নাচবেন সেটা জেনে রাখা ভাল। রাজপরিবারের কারও সম্মানে আসর বসালে তিনি না আসা পর্যন্ত নাচ শুরু করা চলবে না। তিনি রীতি অনুযায়ী গৃহস্বামিনীর সঙ্গে নাচ শুরু করবেন। ভদ্রমহিলা যদি নাচ না জানেন বা কোনও কারণে সেই সন্ধ্যায় তাঁর পক্ষে নাচা সম্ভব না হয় তবে মান্য অতিথি নাচবেন উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানের পাত্রী যিনি তার সঙ্গে। ("দ্য লেডি অব দ্য হাইয়েস্ট র‍্যাঙ্ক"।) প্রধান অতিথি যদি হন রাজপরিবারের কোনও প্রিন্সেস বা রাজকন্যা বা কন্যাতুল্য তবে তিনি নাচ শুরু করবেন নিমন্ত্রণকর্তা ভদ্রলোকের সঙ্গে। অবশ্য যদি তিনি নাচতে না জানেন তবে অন্য কথা। ফের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সম্মানে উচ্চতম ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজকুমারী কিন্তু নাচঘরে প্রবেশ করবেন আমন্ত্রণকর্তার হাত ধরে। নাচঘরে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। একমাত্র বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে বিশিষ্ট অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিলেই চলবে। কোনও আসরে নিজে আমন্ত্রিত হয়ে গেলেও আশা

করবেন না আপনাকে অন্য সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। যদি বিশেষ কারও সঙ্গে আপনি পরিচিত হতে চান তবে আমন্ত্রণকর্তা বা বাড়ির গৃহিণীকে আপনার ইচ্ছা জানান, ওঁরা নিশ্চয়ই আপনাকে আলাপ করিয়ে দেবেন।

নাচতে জানলেই কোনও আসরে যার তার সঙ্গে নাচার জন্য তাঁকে জড়িয়ে ধরবেন না। জানবেন, নৃত্যসভায় একজন পরিচালক বা "স্টুয়ার্ড" আছেন। প্রথমে তাঁকে বলুন। তিনি অপরপক্ষের অনুমতি নিলে তবেই আসরে নেমে আসুন। কোনও অচেনা মেমসাহেবের কাছে কখনও সরাসরি নাচের প্রস্তাব পেশ করবেন না। তিনি বিনীতভাবে তাঁর সেই "সৌভাগ্য" প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। একবার কোনও মেমসাহেবের সঙ্গে নেচেছেন বলে ধরে নেবেন না তাঁর সঙ্গে আপনার পাকাপাকি ভাবে পরিচয় হয়ে গেছে।

এসব আসরে কাউকে অন্য কারও সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হলে তার একটা বিশেষ কেতা আছে। ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বলতে হবে, "Sir John (or Lady) Brown, allow me to introduce to you Babu Kali Mohun Roy." তারপর বাবুকে বলতে হবে—"Babu Kali Mohun Roy-Sir John Brown." মহিলা হলে বলতে হবে, "The Maharaja of Rampore-Mrs. Brown," বলবেন না,— "Mrs. Brown-The Maharaja of Rampore."

খাওয়ার সময় হলে আমন্ত্রণকর্তা প্রধান অতিথি মহিলা হলে তাঁর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দেবেন। তিনি তা ভর দিয়ে খাবারের ঘরে প্রবেশ করবেন। ওঁদের পিছু পিছু ঢুকবেন জনাকয় উঁচু মর্যাদার অতিথি। তারপর অন্যরা। কিন্তু আমন্ত্রণকর্তা প্রধান অতিথিকে নিয়ে না ঢোকা পর্যন্ত কেউ ঢুকবেন না। ভাইসরয়, গভর্নর, কিংবা রাজপরিবারের কেউ হাজির থাকলে তাঁরা আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্য অতিথিরা দাঁড়িয়ে থাকবেন। খাওয়া শেষ হওয়ার পর ওঁরা উঠে দাঁড়ালে সবাই উঠে দাঁড়াবেন। তারা চলে যাওয়ার পর আবার যে যাঁর নিজের আসনে ফিরে আসবেন। খাওয়ার টেবিলে শাল, পশমি কম্ফোর্টার, গ্লাভস পরা চলবে না।

আরও কিছু কিছু কেতা শিখে নেওয়া ভাল। ঘরে কোনও মেমসাহেবের হাত থেকে হঠাৎ পাখা, রুমাল বা অন্য কিছু পড়ে গেলে তিনি আপনার অপরিচিত হলেও কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া ভদ্রতা। তিনি কোনও টুল বা চেয়ার টানতে চাইছেন দেখলে আপনি এগিয়ে গিয়ে সে কাজটা করে দিন। তবে হাত লাগাবার আগে বলে নিতে হবে—"অ্যালাউ মি—" ("Allow me")। প্রধান অতিথি চলে যাওয়া পর্যন্ত আসর বা খাবারঘর ছাড়বেন না। বেরিয়ে আসার সময় আমন্ত্রণকর্তা বা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করবেন। বিদায় নেবেন—"গুড নাইট" বলে। করমর্দন সকলের সঙ্গেই করতে হবে। "গুড নাইট" বলে বিদায় নিতে হবে। বাইরে পা বাড়াবার সময় কাছাকাছি যাঁরা আছেন শুধু তাঁদের সঙ্গে। অন্যদের দিকে শুধু মাথা ঈষৎ নিচু করে বিদায় জানানোই যথেষ্ট। আরও একটা কথা। নিমন্ত্রণকর্তা দুয়ারে দাঁড়িয়ে সবাইকে বিদায় জানাবেন। আপনি তখন অবশ্যই বলবেন—"উই হ্যাভ হ্যাড আ ডিলাইটফুল ইভিনিং" ("we have had a delightful evening.")।

এবার আসা যাক ডিনার-পার্টির কথায়। ডিনার দিতে হলে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। চিঠি লিখবেন গৃহকর্ত্রী। চিঠির উত্তরও দেবেন আমন্ত্রিতের তরফে গৃহকর্ত্রী। এমনকী যদি আমন্ত্রণ জানান গৃহকর্তা নিজে, তা হলেও তার উত্তর দিতে হবে আমন্ত্রিতের স্ত্রীকে। নমুনা :

"Dear Mrs. Brown,

will you and your husband give us the pleasure of your company at dinner on Thursday, March 3rd, at 8 o'clock?

Yours sincerely,
Mary Jones"

3 Parish Lane

উত্তর :

"Dear Mrs. Jones,

My husband and I have much pleasure in accepting your kind invitation to dinner on Thursday, March 3rd.

Yours sincerely
Louisa M. Brown.

2 Grant Street,
Wednesday

যদি কোনও কারণে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করতে পারেন তবে লিখতে হবে :

"My husband and I much regret that a previous engagement prevents us from accepting your kind invitation to dinner on Thursday.

Yours sincerely..."

যদিও মেমসাহেবদের নামে চিঠিগুলো নমুনা হিসাবে পেশ করা হল, ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই নিয়ম। ডিনারের ছাপানো কার্ড পাওয়া যায়। তাতে হাতে প্রয়োজনীয় নামধাম লিখে দিতে পারেন। ভারতীয়রা বা বাঙালিরা যখন নিজেদের মতো করে নিজেদের ডিনারের নেমন্তন্ন করেন তখন অবশ্য এসব বাধ্যবাধ্যকতা নেই। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথকে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের একটি ডিনারের নিমন্ত্রণপত্রের কথা। পত্রটি একটি সনেট। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন,—

"কল্য রবিবার রাত্রে; সাড়ে সাতটায়;
১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে; ভারতীয় 'ক্লবে';
'ডিনার';—ব্যাপার সবই পূর্ব্ববৎ প্রায়;
ইচ্ছা গোলযোগ করা মাত্র মিলে সবে।
কদিনেরই বা জীবন, তাও অনিশ্চিত।—
ঠিক্ নেই চলে' যায় কোথায় কে কবে!
আমোদটা যে এ ঘোর অর্থশূন্য ভবে
যত করে' নিতে পারে তত তার জিত।
কেহ পায় সে আমোদ দোল দুর্গোৎসবে;
কেহ নৃত্যগীতবাদ্যে; কেহ বন্ধুসহ
নম্র 'ডিনারে'র মৃদুতর কলরবে।
আমরা শেষোক্ত।—তবে ক'রে অনুগ্রহ
আমাদের এই অতি সাধু মতলবে
রবিবাবু— আপনার যোগ দিতে হবে।
ভবদীয়
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।"

সাহেব-মেমদের সঙ্গে কিন্তু এ-ধরনের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো চলবে না। না, ইংরেজিতেও না। আপনার চিঠি হবে কেজো চিঠি, যাকে বলে 'ফরম্যাল'।

সাহেব-মেমকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানালে আমন্ত্রণকর্তা নিজে কিছু খান বা না খান, তাঁকে কিন্তু সর্বক্ষণ সশরীরে হাজির থাকতে হবে।

ডিনার সাহেবি দৃষ্টিকোণ থেকে অতিশয় পবিত্র অনুষ্ঠান। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে সময়ে হাজির হতে হবে। অসুস্থতাবশত কিংবা অন্য কোনও আকস্মিক কারণে যদি আপনার পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব

না হয় তবে তৎক্ষণাৎ তা জানিয়ে দিতে হবে। ভারতে অনেকে ডিনারে নিজেদের পরিচারক বা পার্শ্বচরদের নিয়ে হাজির হন। সেক্ষেত্রে আগেভাগে তাদের জানিয়ে দিতে হবে কবে, কখন, কোথায় তাদের হাজির থাকতে হবে। তারা যেন ঠিকঠাক তৈরি হয়ে আসে। অনেক বাড়িতে নিজেদের লোকেরাই টেবিলে হাজিরা দেয়। সেখানে স্বভাবতই আপনার নিজের লোকের উপস্থিতি অপ্রয়োজনীয়। তাদের বলে দিলে সন্ধান নিয়ে নিজেরাই জানতে পারবে কর্তার সঙ্গে তাদের উপস্থিতির আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কি না।

উনিশ শতকের বাংলা নাটক নভেল নকশা বা পদ্য পড়লে মনে হয় সেদিনের বাঙালি বাবুরা বুঝিবা ইংরাজি-খানায় শুধু আসক্ত নন, বেশ সড়গড়। পুজো উপলক্ষে বাঙালি বড়মানুষের বাড়িতে সাহেবদের জন্য আয়োজিত খানার প্রসঙ্গে বটতলার কবির মানস-ভোজনের কথাই ধরা যাক। কবি লিখছেন—

"অমৃত সমান বীপষ্টিক রলিপুলি।
পোর্ক চপ সসেজেস, তাকি কভু ভুলি ৷৷
ফৌল কটলেট আর লেগ মটন রোস্ট।
দো পেয়াজা কাপজেলি খেলে হয় বোস্ট ৷৷
ভিন কটলেট হ্যাম টর্কি এন হ্যাম
পান কি না পান কভু গবরনরের ম্যাম ৷৷
এমন, সুস্বাদু খাদ্য ত্রিভুবনে নাই।
দেবের দুর্লভ ইহা কি কহিব ভাই ৷৷
অকসং টর্টেল সুপ সকলিং পিগ রোস্ট।
যা দেখিলে সেইক্ষণে চুলকায় মুখ ওষ্ঠ ৷৷
এই সব খানা পেটে পড়িয়াছে যার।
ভাগ্যের কি সীমা আমি দিব হে তাহার ৷৷
যে খেয়েছে সে মজেছে কিবা তার তার।
স্বর্গ থেকে নেচে ওঠে চৌদ্দ পুরুষ তার!"

(উদ্ধৃত "উপহাসের কলকাতা," সুনীল দাস, কলকাতা, ২০০১)

এ ধরনের অনেক বিবরণই রয়েছে সাহিত্যের পাতায়। তবে নামতার মতো নাম না-আউড়ে, সাহেব-মেমদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করার সময় ভাল কোনও সাহেবি হোটেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আপ্যায়নের দায়িত্ব পুরোপুরি তাঁদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া। দুর্গোৎসবে কিংবা অন্য কোনও উপলক্ষে সাহেব-ভজনার সময় ধনী বাঙালিবাবুরা কিন্তু তা-ই করতেন। বিবরণে প্রায়শই বলে দেওয়া হত খাদ্য-পানীয় সরবরাহ করেছেন কোন হোটেল পরিচালকরা। একালে যেমন বিশেষ বিশেষ ক্যাটারার-এর বিশেষ খ্যাতি, সেকালেও তেমনই এ ব্যাপারে খ্যাতি ছিল বিশেষ বিশেষ সাহেবি হোটেল রেস্তোঁরায়। প্রবাদপ্রতিম উইলসন হোটেল (আজকের গ্রেট ইস্টার্ন) সে-তালিকায় একটি নামমাত্র, একমাত্র অবশ্যই নয়। বাড়িতে রান্না করে যে সাহেব-মেমদের ডিনারে ডাকা যায় না সে বিষয়ে অবশ্য টনটনে জ্ঞান ছিল এমনকী আমুদে পদ্যকারদেরও। "বসন্তক" পত্রের দুর্গোৎসব পদ্য থেকে আগে ক'টি ছত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে কবি বলছেন,—

"হোটেল হইতে খানা আনিয়ে ভবনে।
খাওয়াই প্রাণের বন্ধুগণে সযতনে ৷৷
কি জানে রাঁধিতে যত দেশী রাঁধুনিতে।
জানে থোড় কচু ঘেচু কেবল রাঁধিতে ৷৷

অমৃত সমান বীপষ্টিক রলিপুলি।
নামে মুখে লাল পড়ে কি বলিব আর।
মণ্ডা মনোহরা এর কাছে কোন্ ছার ॥”

সুতরাং, সাহেব-মেমদের আপ্যায়ন করতে হলে সাহেবিখানার বন্দোবস্ত আবশ্যিক বই কি! আর, সাহেবের পদধূলি না-পড়লে ভাগ্যোদয় হবে কেমন করে! বিশেষত,

“রাজবংশ তারা ঠিক ঠাকুর সমান।
এতে গৃহস্থের কিছু নাহি অপমান ॥
এতে তার বহু মান ভেবে দেখ মনে।
এসেছে সাহেব বিবী যাহার ভবনে ॥
সবে বলে তাহার কত না ভাগ্যোদয়।
আসে যার ভবনে সাহেব মহোদয় ॥...”

হ্যাঁ, খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের, এমনকী পরিবেশনের দায়িত্বও হোটেল রেস্তোঁরাকে দেওয়া চাই। তবে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া চাই—বন্দোবস্ত যেন একই সঙ্গে সহজ, সুন্দর ও উচ্চমার্গের হয়। পানীয় যেন হয় সর্বোত্তম, “অব দ্য বেস্ট ডেসক্রিপশান।”

ফের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার ডিনারে অতিথিদের সময়ে হাজির হওয়া কর্তব্য। বড়জোর বাড়তি পনের মিনিট দেরি মঞ্জুর করা যেতে পারে। খুব উঁচু তরফের সাহেব-বিবি হলে না হয় আধ ঘণ্টাই অপেক্ষা করা যেতে পারে, তার বেশি নয়। ডিনারে সাহেবরা ওভারকোট, হ্যাট ইত্যাদি খুলে বাইরের ঘরে রেখে যান। ভারতীয়রা কিন্তু শামলা বা পাগড়ি খুলতে পারবেন না। খাবার টেবিলে বসার আগে আঙ্গুল এবং হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরিচিত অন্যদের সঙ্গে অল্পস্বল্প কথাবার্তার পর আসনে বসতে হবে। কোনও মেমসাহেবের সঙ্গে আগে থাকতে পরিচয় থাকলে তাঁর পাশে বসতে পারেন। হলে অন্য কোনও অতিথি এলে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াতে হবে। এটা ভদ্রতা। কোন অতিথি সম্পূর্ণ নতুন হলে নিমন্ত্রণকর্তা অন্যদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে থাকেন। ধরে নেবেন, আপাতত এক টেবিলে বসছেন, সেটাই পরিচয়। সুতরাং, পাশের ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার সঙ্গে শিষ্টালাপ জুড়লে সেটা দূষণীয় নয়। আমন্ত্রণকর্তা নিমন্ত্রিত প্রধান মেমসাহেবকে হাতে ধরে এনে আসনে বসাবেন। তিনি নিজে তাঁর পাশে বসবেন। পদমর্যাদায় দ্বিতীয় যিনি তিনি বসবেন অন্য পাশে। প্রধান মেমসাহেবের বসতে হবে বাড়ির কর্তার ডান দিকে। দ্বিতীয় মেম বাঁ-দিকে। বাড়ির কর্ত্রী বসবেন ওঁদের বিপরীত দিকে। সঙ্গে থাকবেন সাহেব যিনি হাত ধরে তাঁকে আসনে বসিয়েছেন। তিনি বসবেন তাঁর বাঁ দিকে। স্বামী-স্ত্রী কখনও পাশাপাশি বসবেন না। সরাসরি পরস্পরের উল্টো দিকে বসাও নিষিদ্ধ। এই ডান-বাঁ বিষয়ে জ্ঞান থাকা ডিনারে জরুরি। অনেক আসরে প্রতিটি চেয়ারের সামনে নাম লেখা কার্ড সাজিয়ে রাখা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে সেটা সহায়ক বটে। প্রসঙ্গত বলা দরকার ডিনারের টেবিলে আলো, পুষ্পসজ্জা—এসবও ঠিকমতো হওয়া চাই।

খাবারের কথা বিস্তারিত বলা বোধহয় খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। এসব আসরে “মেনু” বা খাদ্য তালিকায় প্রায়শ ফরাসি ভাষায় ডিশগুলির নাম লেখা থাকে। সব সাহেবও চট করে সেগুলি চিনতে পারেন বলে মনে হয় না। ভারতীয় বা বাঙালিকেও তা রপ্ত করতে হলে অনেক সময় দিতে হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলেও ভাল। ইংরাজি রীতি অনুযায়ী ডিশগুলি খানসামা বা বাটলার ও তার সহযোগিরা পেশ করবে। সুতরাং, কোনটি আগে বা কোনটি পরে তা নিয়ে আপনার ভাবনা নেই। আপনি বরং রপ্ত করুন খাওয়ার রীতি পদ্ধতি, যাকে বলে ‘দ্য গ্রেট আর্ট অব ইটিং প্রপারলি।” ভোজন একটি কলা বিশেষ, ডিনারের টেবিলে বসে তা ভুলে যাওয়া চলবে না। নাকে মুখে গুঁজে হাম হাম করে খাবেন না। ধীরে সুস্থে শান্তভাবে অল্প অল্প করে খান। কাঁটা মুখের সামনে এনে তবেই মুখ খুলবেন, আগে

থেকে হাঁ করে থাকবেন না। কাঁটা-চামচ-ছুরিতে যেন ঝনঝন আওয়াজ না হয়। প্লেটে বাদ্য বাজাবেন না। খাওয়ার সময় মুখে কোনও শব্দ করবেন না। মুখে খাদ্য থাকলে তখন কথা বলবেন না। কিছু পান করবেন না।

খাবার প্লেটে দেওয়ার পর খেতে আরম্ভ করুন। অন্য কারও জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। চেটেপুটে খাবেন না। তা হলে মনে হতে পারে আমন্ত্রণকর্তা অতিথিদের জন্য পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা রাখেননি। কোনও খাবার দুই দফায় খাবেন না। এটা আপনার বাড়ি নয় যে বলবেন,—তরকারিটা ফের একবার দাও তো দেখি! যে-পদটি পছন্দ নয় সেটিও পত্রপাঠ বিদায় করে দেবেন না। না হয় অল্পস্বল্প চেখে দেখুন, ওরা ঠিক সময়ে প্লেট সরিয়ে নিয়ে যাবে।

খেতে বসে টেবিলে কনুই রাখবেন না। পাশের চেয়ারেও হাত রাখবার চেষ্টা করবেন না। বেশি নড়াচড়া করে অস্থিরতা প্রকাশ করবেন না। সোজা হয়ে শান্তভাবে বসে খান। হাই বা ঢেকুর তুলবেন না। যদি নিতান্তই তা ঠেকাতে না পারেন তবে হাত দিয়ে মুখ আড়াল করুন। পাশের লোকের কাছে তখন ক্ষমা চাইতে হবে। বলতে হবে—"আই বেগ ইওর পার্ডন।" এটাই শিষ্ট রীতি।

টেবিল-ন্যাপকিন আপনার হাঁটুতে পাতা থাকবে, সেটা গলায় কলারের নীচে গুঁজবেন না। খেয়াল রাখবেন স্যুপ খাওয়ার চামচ আর সাধারণ চামচের মধ্যে তারতম্য আছে। যার ব্যবহার যেমন হওয়া উচিত, তেমনটিই করবেন। রুটি ছুরিতে কাটবেন না। দাঁতেও না। রুটি হাতে টুকরো করতে হবে। মাছ খাওয়ার জন্য টেবিলে রুপোর ফিস-নাইফ আছে। সেটি ব্যবহার করুন। সঙ্গে আলাদা কাঁটা-চামচও থাকে। যদি কোনও বাড়িতে সে-ব্যবস্থা না থাকে তবে দুটো কাঁটা-চামচ ব্যবহার করুন। কিন্তু কিছুতেই ছুরি বা চামচ নয়। আগেকার দিনে একটি বড়সড়ো রুটির টুকরো দিয়ে কাঁটা-চামচে মাছ খাওয়া হত। এখন তা অচল। নুনের জন্য আছে সল্ট-স্পুন। সুতরাং, ছুরি দিয়ে নুন তুলবেন না। প্রয়োজন হলে কাঁটা-চামচের হাতলের প্রান্তটি ব্যবহার করুন ("দ্য হ্যান্ডল এন্ড অব ইওর ফর্ক।")

হরিণ, হাঁস-মুরগি কিংবা পাখির রোস্ট কাটবার জন্য যে ছুরি ("কার্ভিং নাইফ") ব্যবহার করতে হয় তা যেন কখনও মুখে তুলবেন না। মুরগি কিংবা কোনও পাখির হাড় হাতে তুলে মুখে দেবেন না। মাংস যেমন কাটতে হবে ছুরিতে, তেমনই খেতে হবে কাঁটা-চামচে। স্যালাড, অ্যাসপারাগাস, আঁটিওয়ালা ফল, পুডিং, কাস্টার্ড, আইসক্রিম—খাওয়ার সময়ও নিয়মমতো খেতে হবে। যেক্ষেত্রে যা নিয়ম তা-ই মানতে হবে। মনে রাখবেন সেদ্ধ কড়াইশুঁটি সব সময় কাঁটা চামচে খেতে হয়,—চামচে নয়। শুনে ঘাবড়ে যাবেন না। ক্রমে ক্রমে সবই রপ্ত হয়ে যায়।

খাওয়ার টেবিলে টুথ-পিক ব্যবহার করবেন না। বিশেষত, মহিলাদের উপস্থিতিতে। চা কফিও নিয়ম মেনে পান করুন। কখনও চা বা কফি পেয়ালায় ঢেলে পান করবেন না। আস্তে আস্তে চুক চুক শব্দ না-করে পান করতে হবে। চামচ পেয়ালায় রাখতে হবে, কাপে নয়।

খাওয়া শেষ হলে ধীরে সুস্থে উঠে পাশের ঘরে যেতে হবে। প্রথমে প্রধান-অতিথি ঘর ছাড়বেন। তারপর গৃহকর্তা। তারপর একে একে অন্য সবাই। ধাক্কাধাক্কি করে আগে বের হওয়ার চেষ্টা করবেন না। পাশের ঘরে অতিথিদের মধ্যে গল্পগুজব চলবে কিছুক্ষণ। কেউ কোনও গল্প ফাঁদলে বলবেন না—এটা আমি আগে শুনেছি। কেউ কথাচ্ছলে কোনও ভুল বকলে তাকে শুধরাতে যাবেন না। এভাবে পণ্ডিতি করা অভব্যতা। কোনও কথা বুঝতে অসুবিধা হলে বলবেন না,—"হোয়াট ডু ইউ সে?"—কী বললেন? বলবেন—"আই বেগ ইওর পার্ডন।" এই বৈঠকে কথাবার্তায় পেটের গোলমাল ("ডিসপেপসিয়া"), বদহজম ("ইনডাইজেশন") নিষিদ্ধ শব্দ। ভুলেও এসব শব্দ মুখে আনবেন না। নিমন্ত্রণকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হবার আগে বলতে হবে—"গুড নাইট!"

ডিনার-পার্টি থেকে আসা যাক গার্ডেন পার্টিতে। উনিশ শতকে কলকাতার বাঙালিবাবুদের বাবুয়ানার এক লক্ষণ ছিল শহরে বা শহরতলিতে একখানা বাগানবাড়ি। সেখানে ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে

আমোদ আহ্লাদ করা ছিল বাবুদের এক ব্যসন। অনেকে বাগানবাড়িতে সাহেব-মেমদেরও আপ্যায়ন করতেন। সেক্ষেত্রে নিয়ম কিন্তু কার্ড পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানানো। কার্ড হবে বড় আকারের এবং কালো কালিতে ছাপা। বয়ান হবে এই রকম :

"Nawab Abdul Rahaman requests the pleasure of Mr. & Mrs. G. Robinson's company at a garden party on Tuesday, December 20th, from 4 to 7 p.m.

Chatta Manzil RSVP"

Nov. 30, 1886.

সাহেবরা আমন্ত্রণ পাঠান মেমসাহেবের নামে। ভারতীয় বিবি যদি ইংরেজি কেতায় অভ্যস্ত এবং সাহেব-মেমদের সঙ্গে সামাজিকতায় সড়গড় হন তবে বাঙালিবাবুও স্ত্রীর নামে আমন্ত্রণ পাঠাতে পারেন। আমন্ত্রণপত্র পাঠাতে হবে তিন সপ্তাহ আগে। অনেক সময় বিকালেও নাচের আসর বসে। সেক্ষেত্রে চিঠির নীচে এক কোণে লিখে দিতে হবে—"ড্যান্সিং" ("Dancing").

অনুষ্ঠানের সূচনায় আমন্ত্রণকর্তা বা কর্ত্রী লন-এ দাঁড়িয়ে অতিথিদের স্বাগত জানাবেন। অতিথিরা কেউ আধ ঘণ্টা দেরিতে এলেও অসুবিধা নেই। অবশ্য এমনও হতে পারে আমন্ত্রণকর্তার পক্ষে তখন হয়তো দাঁড়িয়ে থেকে সরাসরি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে পারবেন না, এই যা।

রাজভবনে যখন গার্ডেন পার্টি আয়োজিত হয় তখন গভর্নর জেনারেলের স্ত্রী "হার এক্সেলেন্সি" লন-এ এক পাশে একটি শামিয়ানার নীচে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করেন। "এ ডি সি" বা তাঁর সরকারি পার্শ্বচর অতিথিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। তখন নম্রভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁকে সম্মান জানাতে হবে। তাঁকে সেলামও জানানো যেতে পারে। ব্যস, আপনার প্রাথমিক কৃত্য শেষ। করমর্দন করবেন না, কথা বলার চেষ্টাও করবেন না। যদি তিনি নিজে কিছু বলেন তবে অন্য কথা। মনে রাখবেন গার্ডেন পার্টিতে কথোপকথন চলে ঘুরে ঘুরে। সেখানে অনেক সময় লন টেনিস বা ব্যাডমিন্টনের মতো আউটডোর খেলারও ব্যবস্থা থাকে। তা ছাড়া বাজি পোড়ানো, বেলুন উড়ানোর মতো আমোদও থাকে। আর থাকে হাল্কা খাবারদাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা। পানীয়ের মধ্যে চা কফি ছাড়াও থাকে শ্যাম্পেন ক্ল্যারেট। খাদ্য বলতে মাখন-রুটির টুকরো, বিস্কুট, কেক, ইত্যাদি। একটি শামিয়ানার নীচে টেবিলে সেসব সাজানো থাকে। কাছাকাছি চেয়ারও থাকে। প্রয়োজনে মহিলারা সেখানে বসতে পারেন। গার্ডেন-পার্টিতে যা পরিবেশিত হচ্ছে তা ভরপেট খাবার নয়। বাংলায় যাকে বলে জলযোগ, নিছক তা-ই। সুতরাং, ভরপেট খাবার চেষ্টা করবেন না। বাড়ির বাচ্চাদের জন্যও কিন্তু সরাবার চেষ্টা করবেন না।

পার্টিতে নাচের ব্যবস্থা থাকলে সে আসর বসবে অন্য আর একটি শামিয়ানার তলায়। অনেক সময় মাঠের বদলে নাচের আসর বসানো হয় বাড়ির ভিতরে হলঘরে।

এবার বাঙালিবাবুর জন্য কিছু বাড়তি পরামর্শ। গার্ডেন পার্টিতে লাঠি হাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। তবে লাঠি দরোয়ানের ভারী লাঠি নয়, হতে হবে বেতের হাল্কা মসৃণ ছড়ি। লাঠি না থেকে হাতে ছাতা থাকলে তার কাপড় যেন হয় কালো সিল্ক। শাল চলতে পারে, কিন্তু রঙ যেন বেশি উজ্জ্বল না হয়। ঢোকার সময় পরিচিত কোনও মেমসাহেবকে দেখলে মাথার টুপি খুলে তাঁকে সম্মান জানাতে হবে। তিনি আপনার বাঁ দিক দিয়ে গেলে টুপি খুলতে হবে ডান হাতে, ডান পাশ দিয়ে গেলে বাঁ হাতে। অপরিচিত মেমসাহেব সামনে পড়ে গেলেও মাথা নিচু করে সম্মান দেখাতে হবে। মেমসাহেবের কর্তব্য অবশ্য আগে মাথা ঝুঁকিয়ে "বো"-করা, আপনার কর্তব্য একইভাবে প্রতি-নমস্কার করা। মাথায় পাগড়ি থাকলে হাত তুলে সেলাম জানালেই চলবে। পাগড়ি খোলার দরকার নেই।

হাঁটার সময় লাঠি খেলবেন না। লাঠি ঘুরাবেন না, বা বগলের তলায় রাখবেন না। সেসব অসভ্যতা। কোনও মেমসাহেব দেখলে তাঁকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াবেন। আপনি

রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে চলবেন। গাড়ি ঘোড়া দেখলে ডান দিক ধরবেন। আপনার নিজের গাড়িতে কোনও সাহেব মেম সওয়ার হলে তাঁদের বসতে দিতে হবে ঘোড়ার দিকে মুখ করে। গাড়ি থেকে নামার সময় ভদ্রলোক আগে নামবেন, তিনি হাত বাড়িয়ে ভদ্রমহিলাকে নামতে সাহায্য করবেন। হাঁটার সময় লেডি বাঁ পাশে থাকবেন। ভদ্রলোক তাঁর বাঁ হাত ধরে চলবেন। সোজা বাংলায় মেম চলবেন সাহেবের বাহুলগ্না হয়ে। দৈবাৎ ভাগ্যের জোরে কখনও যদি কোনও মেমসাহেব আপনার সঙ্গে বের হন তখনও একই নিয়ম। (অবশ্য এদেশে কোনও নেটিভের কপালে সেই সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা অতিশয় ক্ষীণ।)

(রাজসন্দর্শন, দরবার, রাজকীয় রিসেপশন, এসব সরকারি অনুষ্ঠানেও বিস্তর কেতা-কানুন রয়েছে। এখানে তার বিবরণ পেশ করা থেকে নিরস্ত থাকাই ভাল। কারণ, ইতিমধ্যে যে-পাঠ দেওয়া হয়েছে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে তা-ই বোধহয় যথেষ্ট। আজ রাজদর্শন বা দরবারে তো আমন্ত্রণ পান মুষ্টিমেয় ভারতীয়। আপনার ভাগ্যে যদি কখনও শিকে ছেঁড়ে, তখন দেখা যাবে। আমরা বরং সাধারণ সাহেব-মেমদের সঙ্গে সামাজিকতার পাঠেই আপাতত মনোনিবেশ করি।)

আপনার পরিচিত সাহেব বা মেম হয়তো আপনার এই শহরেই বিয়ে করতে চলেছেন। আপনার একটা সামাজিক মর্যাদা আছে, সাহেব সমাজেও আপনি সুপরিচিত, সুতরাং, আশা করা যায় বিয়েতে আপনি নেমন্তন্ন পাবেন। সাহেবটোলার নিয়ম নিমন্ত্রণ করতে হয় কার্ড পাঠিয়ে তিন সপ্তাহ আগে। চিঠি পাওয়ার পর অনুষ্ঠানের আগে উপহার পাঠিয়ে দিতে হবে। উপহার হিসাবে কী কী পাঠানো যেতে পারে তার একটি সম্ভাব্য তালিকা দেওয়া হচ্ছে। ভেবে চিন্তে স্থির করুন কী দেবেন।

কোনও বিশিষ্ট কারিগরের তৈরি কোনও আসবাব। কফি বা চায়ের সেট। কাজ-করা স্ক্রিন। ফোটো অ্যালবাম। রাইটিং কেস। ড্রেসিং কেস। ফুলদানি। প্রাতরাশের সেট। ইত্যাদি। ভারতীয় বা বাঙালিবাবুর পক্ষে সেরা উপহার হবে কোনও গহনা। ব্রেসলেট হলে খুবই ভাল। কত দামি সেটা বড় কথা নয়, ডিজাইন হয় যেন মেমসাহেবের মন-মাতানো। তা ছাড়া দুষ্প্রাপ্য কোনও অ্যান্টিকও দেওয়া চলে।

অনুষ্ঠানের দিন নির্দিষ্ট সময়ে চার্চে হাজির হতে হবে। সাহেব-মেমদের বিয়ে ছাদনাতলায় হয় না, হয় চার্চে। সুতরাং সেখানে চলে যান। সময়ে যেতে হবে বটে, তাই বলে আগেভাগে ছুটে গিয়ে প্রথম সারিতে বসে পড়বেন না। সেখানে বসবেন বর-কনের আত্মীয়স্বজনরা। অতিথিরা সব পেছনের সারিতে। গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে বর-কনে যখন মিছিল করে বেদীর দিকে এগিয়ে যাবেন তখন উপস্থিত সকলকে উঠে দাঁড়াতে হবে। বিয়ের মন্ত্রপাঠ অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী হিসাবে অঙ্গীকার গ্রহণের পর ওঁরা যাবেন অন্যত্র, খাতাপত্রে সইসাবুদ করতে। তখন আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। ইতিমধ্যে হয়তো অতিথিদের পোশাকে সাদা সিল্কের ফিতেয় তৈরি ফুল বা ব্যাজ লাগিয়ে দেওয়া হবে। সেটা অনুষ্ঠানের স্মারক।

বর-কনে চার্চ থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠবেন। তাঁদের পিছু পিছু উঠবেন কনের মা। এবং অন্যান্য আত্মীয়রা। ওঁদের গাড়িগুলো চলে যাওয়ার পর আপাতত নিমন্ত্রিতদের ছুটি। এবার নিজ নিজ গাড়িতে নিমন্ত্রিতরা যাবেন কনের বাপের বাড়িতে। কিংবা যেখানে ওঁদের ঠিকানা। কিছুতেই যেন ওঁদের আগে সেখানে পৌঁছে যাবেন না। তা হলে দেখবেন সেখানে আপনাকে অভ্যর্থনা জানানোর মতো কেউ নেই।

ওঁদের বাড়িতে পৌঁছে সোজা দোতলায় উঠে যান। দরজার পরেই বৈঠকখানা। দেখবেন, সেখানে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বর-কনে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁদের সঙ্গে করমর্দন করে বলুন,—"আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"—"একসেপ্ট মাই সিনসিয়ার কংগ্রেচুলেশন!" কিংবা শুভেচ্ছা জ্ঞাপক এ-ধরনের কোনও বাক্য। বলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, একপাশে সরে যান,

অন্যদের অভিনন্দন জানাবার সুযোগ দিন। এবার আপনাকে নমস্কার জানাতে হবে বাড়ির কর্ত্রীকে। তাঁকে বলবেন,—সুন্দর অনুষ্ঠান হল,—"আ প্রেটি সাইট"। সব ভালয় ভালয় হয়ে গেল, যাকে বলে সর্বাঙ্গসুন্দর। "—ইট ওয়েন্ট অফ ভেরি ওয়েল!" বিয়ের জন্য কনের মাকে কিন্তু অভিনন্দন জানাবেন না। যদি কিছু বলতেই হয় তবে সমবেদনাসূচক এক-আধটি বাক্য বলুন। যেমন,—এবার আপনি একা হয়ে গেলেন। মনে রাখবেন দিনটি মায়ের কাছে যেমন আনন্দের, তেমনই বিষাদের।

এবার আপনি অন্য অতিথিদের সঙ্গে গল্পগুজব করুন। বৈঠকখানাতেই একটি টেবিলে সব উপহার সাজানো রয়েছে। তা দেখতে পারেন। এতে কোনও অপরাধ হবে না। বিশেষ কোনও উপহার নিয়ে অন্যদের সঙ্গে কথাও বলতে পারেন। বৈঠকখানার বারান্দায় কিংবা পাশের ঘরে দেখবেন হাল্কা জলখাবার সাজানো রয়েছে। সাহেব-মেমদের বিয়েতে অতিথিদের পাত পেতে ভূরি ভোজন করানো হয় না। সুতরাং, আপনাকে ওয়েডিং কেক আর শ্যাম্পেন নিয়েই খুশি থাকতে হবে। তা-ই উপভোগ করুন। শ্যাম্পেন পান করার সময় বর-কনের স্বাস্থ্য পান করবেন না কিন্তু। তা রীতিবিরুদ্ধ। কোনও ভাষণ দেওয়াও নিষিদ্ধ।

কনে এবার ভেতরে ঢুকে বিয়ের পোশাক বদলাবেন। এবার তিনি পরবেন বাইরে বের হওয়ার মতো অন্য পোশাক। তারপর বরের সঙ্গে বাইরে বের হবেন। ওঁরা কোথায় যাচ্ছেন, তা নিয়ে আপনার ভাবনার কোনও কারণ নেই। ধরে নিন, নিরুদ্দেশ যাত্রা। আপনার কাজ ওঁরা গাড়িতে উঠলে বিদায় জানানো। কোথাও কোথাও ওঁদের গাড়িতে তখন চাল ছুঁড়ে দেওয়া হয়। কোথাও বা অমঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য পুরানো জুতো!

ব্যস, আপনার কাছে এখানেই এই সাহেবি অনুষ্ঠানের যবনিকাপাত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, কলকাতার সাহেব-মেমদের কোনও অনুষ্ঠান, যথা, বড়দিন কিংবা ইংরাজি নববর্ষ কিছু কিছু বাঙালি দর্শককে কেমন কৌতূহলী করে তুলত। কবি নিজেও বুঝিবা ব্যতিক্রম নয়। তাঁর পদ্যের কোনও কোনও ছত্র এখনও অনেক রসিক বাঙালি পাঠকের মুখস্ত। যেমন,

"ঢল ঢল ঢল ঢল বাঁকা ভাব ধ'রে।
বিবিজান চ'লে যান লবেজান করে ॥"

কিংবা

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে ॥"

কবি এইসব সুন্দরীদের দেখে এমনকী মাছি পর্যন্ত হতে চান। ইচ্ছা রূপসীদের বদন ঘিরে উড়ে বেড়ান, তাঁদের সঙ্গে চার্চে পৌঁছে যান, এমনকী খানার টেবিলে হানা দেন। সেই স্বপ্ন নববর্ষ উপলক্ষে। বড়দিনেও তাঁর বাসনা,—

"ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি রান্না ঘরে ঢুকে।
কুক্ হয়ে মুখ খানি লুক্ করি সুখে।"

কখনও বা ইচ্ছা সাহেব-বিবির গাড়িতে সহিস হতে। আপনার কাছে এসব অবান্তর। কেননা, আপনি সাহেবি সমাজে ছাড়পত্র পেয়েছেন বা পেতে চলেছেন। আপনার কাছে সাহেব-মেমরা স্বপ্নের দেবদূত কিংবা পরি নন, তাঁরা আপনার চারপাশ ঘিরে। বলতে গেলে আর দু'চারটা পাশ দিতে পারলে আপনি হয়তো উত্তীর্ণ হবেন সেই স্বর্গলোকে যাকে বলা হয় সাহেবি সমাজ। আর একটু ধৈর্য ধরুন।

এদেশে সাহেব এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রায়শ বিবাদ বাঁধে রেলভ্রমণ, স্টিমার ভ্রমণ, ডাকবাংলোয় পাশাপাশি বাস, কিংবা হোটেলের ডাইনিং-রুমে। সেকালের সংবাদপত্র, সাময়িকপত্রের পাতায় পাতায় সাহেব বনাম ভারতীয়ের বিদ্বেষ ও বিবাদের সংবাদ। বিবাদ কখনও কখনও হাতাহাতিতে

পর্যন্ত পরিণত হয়। ভারতীয়দের নালিশে উপরওয়ালাদের কান ঝালাপালা। কিন্তু প্রতিকার বড় একটা হয় না। কারণ জাতিবিদ্বেষ। সাদা-কালো দ্বন্দ্ব। বলা চলে রাজা প্রজা সম্পর্কের বাস্তব. অভিব্যক্তি। রেল শুধু মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী নয়, আরও অনেককেই নিশ্চয় সেদিন জাতীয়তায় দীক্ষিত করেছে। সেসব অন্য প্রসঙ্গ। এখানে তা অবান্তর, আপনাকে জানতে হবে রেল বা স্টিমারে চলার আচরণবিধি। বিশেষ করে সাহেব-মেমরা আপনার মতো সভ্য মানুষের কাছে যা প্রত্যাশা করেন।

রেলের আইন সম্পর্কে অবহিত হোন। রীতিনীতি মেনে গাড়িতে চড়ুন। নিজের সুবিধার জন্য অন্যের অসুবিধা করা চলবে না। গার্ড, স্টেশনমাস্টারদের পরামর্শ মেনে চলবেন। ওঁরা অন্যায় কিছু বললে বা করলে অবশ্যই তার প্রতিবাদ জানাবেন। প্রয়োজনে ওঁদের উপরওয়ালাদের কাছে নালিশ জানাবেন। তবে আপাতত ওঁরা যা বলবেন তখনকার মতো তা মেনে নেবেন। তখনই হল্লা করে কোনও গোল বাঁধাবেন না। ভদ্রজনের পক্ষে সেটা বেমানান।

অনেক রেলপথে ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের জন্য স্বতন্ত্র কামরার ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাটি ভাল। যেখানে তা নেই সেই দুই দলের ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের একসঙ্গে ভ্রমণ করতে হয়। স্বভাবতই পাস্পরিক সৌজন্য প্রকাশ তখন অত্যাবশ্যক। ভারতীয়দের অভ্যাস এবং রুচি ইউরোপীয়দের থেকে ভিন্ন বলেই সেটা জরুরি। ইউরোপিয়ানরা সাধারণ গাড়ির কামরায় খাওয়া দাওয়া করেন না। বিশেষ বিশেষ স্টেশনে তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু তাঁরা অনেকে গাড়িতে বসে ধূমপান করেন। তার আগে তাঁদের কর্তব্য ভারতীয় যাত্রীদের অনুমতি নেওয়া। ভারতীয়রা আবার পান চিবোন, হুক্কা টানেন। গাড়ির কামরায় তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। ধরে নেবেন, সাহেব এসব পছন্দ করেন না। যদি একান্ত নেশা করতেই হয় তবে সাহেবের অনুমতি চেয়ে তা করতে হবে।

ভারতীয়রা ট্রেনের কামরায় রাত্রে কদাচিৎ ঘুমোন। মধ্যরাত্রে অনেক সময় তাঁরা পান-তামাক নিয়ে বসেন। কেউ বা অন্যযাত্রীদের সঙ্গে গল্পগুজব করেন। সাহেবরা রেলের কামরায় ঘুমোতে অভ্যস্ত। স্বভাবতই এসব কারণে ঘুম ভেঙে গেলে তাঁরা বিরক্ত হতে পারেন। এটা স্বাভাবিক আপনাকে যদি জেগে রাত কাটাতে হয় তবে চুপচাপ বসে থাকুন। কিংবা চোখ মেলে নিঃশব্দে শুয়ে থাকুন। অন্যদের বিরক্ত করবেন না।

রেলভ্রমণের সময় পথে যত্রতত্র নেমে খাবার কিনে ঠোঙা হাতে কামরায় এসে মণ্ডামিঠাই নিয়ে বসবেন না। ট্রেন অনেক স্টেশনে বেশিক্ষণ থাকে। ইচ্ছা করে তো সেখানে নেমে খাওয়াজ পাট চুকিয়ে কামরায় ফিরে আসুন। গাড়িতে খাবার মজুত করারও কোনও দরকার নেই। গাড়ি নোংরা করবেন না। মোটকথা সহযাত্রীদের কথা ভুলে যাবেন না। তাঁরা কী চান, সেটাও খেয়াল রাখবেন।

আপনি যদি ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র কামরার যাত্রী হন, তবে অন্য কথা। মিশ্র কামরায়, অর্থাৎ যে কামরায় সাহেবরা রয়েছেন তাতে সওয়ার হলে কখনও সব পোশাক খুলবেন না। বড়জোর উত্তমাঙ্গের বাড়তি পোশাক, কোট টাই খুলতে পারেন, অন্য কিছু নয়। মনে রাখবেন এটা আপনার বাড়ি নয়, ট্রেনের কামরা। হাত বা কাঁধও এখানে খোলা রাখা চলবে না। দেশীয় পোশাক হলে শুধু গেঞ্জি ধুতি পরে বসে থাকবেন না। ধুতি হাঁটুর উপর তুলবেন না। মেয়েরা সঙ্গে থাকলে অবশ্যই নয়।

জানালার ধারে যাঁরা বসেছেন, জানালা খুলতে চাইলে তাঁদের অনুমতি চাইতে হবে। বন্ধ করার সময় তাঁদের মত নিয়ে নেবেন। মনে রাখতে হবে, রোদ বৃষ্টি ঝড় ঝাপটা তাঁদেরই বেশি সইতে হয়।

স্টিমার চলার সময়ও একই নিয়ম। পান-তামাক খেতে হলে এমন একটি কোণ খুঁজে নিতে হবে যেখানে কোনও ইউরোপিয়ান নেই। মেমসাহেবরা থাকলে আরও সতর্ক হয়ে চলবেন। কেবিনেও এসব চলবে না। কারণ, স্টিমারের কেবিনে উপরের দিকটি খোলা থাকে। রেলের কামরার মতো স্টিমারেও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ধুতি সামলে চলবেন। খাবার নিয়ে

ডেক-এ যাবেন না। সে-পর্ব কেবিনে সারাই ভাল। গ্রীষ্মকালে ইচ্ছা করলে ডেক-এ শুতে পারেন। কিন্তু ভদ্রভাবে, সভ্য রীতিনীতি মেনে।

স্টিমারের ক্যাপ্টেন বা সারেঙকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করবেন না। কিংবা নালিশের পর নালিশ জানিয়ে বিব্রত। শান্তিতে ওঁদের কাজ ওঁদের করতে দিন।

এবার হোটেল, ডাকবাংলো প্রসঙ্গে আসা যাক। যেখানে ইউরোপিয়ানরা অতিথি হন আপনিও হয়তো সেখানে অতিথি হয়েছেন। ওখানে নিয়ম-কানুন কী আছে প্রথমে তা জেনে নিন। সাধারণত সেসব ছাপানো অবস্থায় টাঙ্গানো থাকে। ভাল করে লক্ষ করুন অতিথিদের জন্য অন্য কোনও "নোটিশ"ও থাকতে পারে। নিয়ম মতো চলুন। এসব জায়গায় কখনও চেঁচিয়ে কথা বলতে নেই। হোটেলের সব শ্রেণীর কর্মীর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করুন। কথায় কথায় ওদের দোষ ধরবেন না। আপনার আচরণই যেন ওদের জানিয়ে দেয় আপনি একজন মান্য ভদ্রলোক।

আপনি যদি ইতিমধ্যে ইংরাজি-কেতায় মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই জেনে গেছেন ডাইনিংরুমে খেতে বসে কী করতে হয়, কী করতে নেই। এখানে শুধু মনে রাখতে হবে আপনি কারও অতিথি নন, নিজের পয়সায় নিজের রুচি অনুযায়ী খাচ্ছেন। সুতরাং, ডাইনিং-রুমের ঘণ্টা বাজলে কারও জন্য অপেক্ষা না করে সোজা চলে যান, তারপর একটি চেয়ার টেনে বসে পড়ুন। খাওয়া শেষ হলে ঠিক এভাবেই কারও জন্য অপেক্ষা না করে উঠে আসুন। যাঁরা বেশ কিছুদিন ধরে সেখানে বাস করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ সাধারণত প্রতিদিনই একটি বিশেষ আসনে বসতে ভালবাসেন। আপনি বরং খানসামার সাহায্য নিন। সে আপনাকে যে চেয়ারে বসিয়ে দেবে, সেখানেই বাকি দিনগুলো বসবেন। অসুবিধের কী আছে? কখনও কখনও দেখবেন দু'চারটি চেয়ার টেনে এনে টেবিলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সেগুলোতে বসবেন না। সেগুলো অন্যের জন্য সংরক্ষিত। সেই অতিথিরা এখনও আসেননি। তাই আপাতত খালি। এলে কিন্তু আপনাকে আসন ছেড়ে দিতে হবে। সুতরাং, আপনার সেই পুরানো আসনে বসাই ভাল।

আগে পরিচয় না-থাকলেও অন্য অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করা চলতে পারে। অবশ্য কোনও ভদ্রমহিলা আপনার পাশে এসে বসলে আগ বাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন না। প্রথমে ওঁকে মুখ খুলতে দিন। তারপর কথাবার্তা।

এবার চার্চ, থিয়েটার, পাবলিক মিটিং-এ কী করতে নেই এবং কী করতে হবে সে সম্পর্কে দু'চার কথা। দু'চার কথা, কারণ পাখি-পড়ার মতো সব পড়াতে হলে রাতের পর রাত কাবার হয়ে যাবে। সুতরাং এই অধ্যায় পাশ কাটিয়ে গিয়ে শুধু ইংরেজি-থিয়েটারে কী করতে হবে সংক্ষেপে বরং তা-ই শুনে নেওয়া ভাল। থিয়েটারে প্রবেশ প্রস্থান তো বটেই, এমনকী পোশাকও খুব জরুরি। না, অভিনেতার পোশাক নিয়ে কথা হচ্ছে না। দর্শকের পোশাকের কথাই বলা হচ্ছে। আপনাকে সেখানে যেতে হবে সান্ধ্যপোশাকে, যাকে বলে "ইভনিং ড্রেস।" নির্দিষ্ট আসনে বসে গলা বাড়িয়ে চেনাজানা দর্শকদের সঙ্গে গল্প জুড়বেন না। পাশের আসনে সঙ্গী যদি কেউ থাকে তবে দরকার হলে তার সঙ্গে ফিস ফিস করে দু'চার কথা বলতে পারেন। অন্যের আসনের ধারে বা হাতলে হাত রাখবেন না। ভুল জায়গায় না বুঝে হাততালি দেবেন না। প্রয়োজনে "এনকোর" ("Encore!") অবশ্য বলতে পারেন, কিন্তু যখন তখন নয়। শব্দটা আসলে ফরাসি। তার অর্থ—"আবার!" ("Repeat") সুতরাং ভেবেচিন্তে আওয়াজ দেবেন। "অপেরা গ্লাস"-এ নাচ বা অভিয়নই খুঁটিয়ে দেখবেন। ভিড়ের মধ্যে চেনা মুখ খুঁজে বেড়াবেন না। কেউ লক্ষ করলে বলবেন— অসভ্য! অবশ্য তা আপনার কানে পৌঁছাবে না। কারণ, সেটাই সভ্যতা।

এরপর শিখবার বিষয়ের মধ্যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লেখা, দরখাস্ত লেখা, ভাষণ লেখা, স্মারকপত্র লেখা, প্রশংসাপত্র লেখা ইত্যাদি। অর্থাৎ, আপনাকে রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মতো

ইংরাজি-নবিশ হলে চলবে না। "গাড ঈশ্বর লাভ ঈশ্বর,/কাম মানে এসো"—এভাবে রাজভাষা মুখস্থ করলে কাজ হবে না। আপনি কত ইংরেজি-শব্দ "ঘোষাতে" পারেন তা দিয়েও আপনার ইংরেজি বিদ্যার যাচাই করা হবে না। "আলালের ঘরের দুলাল" মতিলালের বা "নববাবুবিলাস"-এর নববাবুর মতো ইংরেজি-শিক্ষায় লেখালেখির এ পরীক্ষায় পাশ করা সম্ভব নয়। নববাবুর ইংরেজি শিক্ষার কথা মনে পড়ে?

> "কোন হিন্দুস্থানী বেশ্যা কিম্বা বাঙ্গালি বেশ্যা অথবা মেথরাণীগর্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠ কারণ নিযুক্ত করিলেন। সাহেবের মেজের সজ্জা এবং খানা ও টীফিন খাওয়া দেখিয়া বাবুদিগেরো প্রায় তদনুরূপ ব্যবহার হইল আর সাহেবের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথন দ্বারা গাডামী, রাসকেল বেরিগুড, হুট, ছোট, নানসেন্স, গোটে হেল এইরূপ কথকগুলিন কথা অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন এবং দুই একখান ইংরাজী চিঠি পাঠ করিতে পারেন এবং ইংরাজী ভাষাতে কোন লোক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সাহেবের মত শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক উত্তর করেন, যথা, তোমার পিতার নাম কি, টোটারাম ডট্ট, অর্থাৎ তোতারাম দত্ত, আর বাবুসকল যেরূপ ইংরাজী পত্রাদি লিখিয়া থাকেন তাহা আর কাহার সাধ্য নাই যে পাঠ করেন বা বুঝিতে পারেন, এই প্রকার বিদ্যা প্রচার হওয়াতে খোসামুদেরা কর্ত্তার নিকটে কহেন বাবুদিগের লেখা বিজ্ঞ বিজ্ঞ ইংরাজেও বুঝিতে পারেন না এ সকল আপন পুণ্য প্রকাশ,... ..."

বলা বাহুল্য, এ পর্যন্তই ছিল তৎকালের অধিকাংশ বাঙালিবাবুর ইংরেজি-বিদ্যার দৌড়। তবে কি ইংরাজি স্কুল কালেজ থেকে দু'তিনটে পাশ দিলেই সাহেবি-ইংলিশ আপনার রপ্ত হয়ে যাবে? হবেই, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। প্রথমত, তৎকালে "বাবু-ইংলিশ" নামে এক ধরনের ইংরেজি সাহেবদের হাসি-তামাশার উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শক্ত শক্ত শব্দ, ফ্রেজ, দীর্ঘ জটিল বাক্য—সব মিলিয়ে সে-ইংরেজি একদিকে যেমন উপভোগ্য, অন্যদিকে তেমনই হাস্যোদ্দীপক। সে-ইংরেজি চলবে না। সহজ, সুন্দর, অর্থবহ, বাক্যে বক্তব্য বুঝিয়ে বলার বিদ্যা শিখতে হবে না। তার জন্য শুধু ইংরেজি জানলেই হবে না। চাই নিয়মিত অনুশীলন। তার জন্য বই রয়েছে। রয়েছে নানা উপলক্ষে রকমারি প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র ও প্রাসঙ্গিক রচনার নমুনা। সাহেবদের কাছে লেখালেখি করতে হলে যত্ন করে এই বিদ্যা অধিগত করতে হবে।

তারপরও কিন্তু সাহেব হতে কিছু বাকি আছে। মনে রাখতে হবে সাহেবি-ভাবাপন্ন হওয়া আর সাহেব-হওয়া এক কথা নয়। তাঁর "বড়দিন" পদ্যে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন,—

> "যে সকল বাঙালীর ইংলিস ফ্যাসন।
> বড়দিনে তাঁহাদের সাহেব ধরণ ॥
> পরস্পর-নিমন্ত্রণে সুখের সঞ্চার।
> ইচ্ছাধীন বাগানেতে আহার-বিহার ॥
> বাবুগণ বাবু নন নাহি যায় ফ্যালা।
> চুপি চুপি বহুরূপী লুকাচুরি খ্যালা ॥
> দিশী সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা।
> কত শত আয়োজন ইয়ারের খানা ॥"

এ-ধরনের সাহেবি আমোদের আরও নানা বর্ণনা রয়েছে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে। প্রসঙ্গত, "আপনার মুখ আপুনি দেখ"-র বিবরণটির কথা মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আয়োজন যতই ব্যয়বহুল হোক, হুল্লোড় যদিই জমজমাট হোক, প্রকৃত সাহেবি উৎসব বা আমোদের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। সাহেবিয়ানা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এমনকী হুতোম যে-সব নমুনা পেশ করেছেন তাও সাহেবের চোখে পাশ মার্ক পাবে কি না সন্দেহ।

হুতোম লিখেছেন,—

> "আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্ট'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ।' প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রান্ডী, ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া,—হরকরা, ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলিটিক্স ও বেষ্ট নিউস অব দি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। ...এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত; কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা, একেবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এঁরাই ওল্ড ক্লাস!"

অন্যত্র দেশি সাহেবদের সম্পর্কে তাঁর সার কথা,

> "বল্‌তে কি, কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচ্‌মাত্র করে নিয়েচেন। যদি গবর্ণমেন্টের হুকুম হয়, তা হলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দ্যান—...।"

অবস্থা যখন এরকম তখন সাহেবিয়ানায় ওঁদের দীক্ষা সম্পূর্ণ এমন কথা কি বলা যায়?

সুতরাং নিয়মিত ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সাধনা হওয়া চাই আন্তরিক এবং সনিষ্ঠ। লক্ষে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কিন্তু বাবুর নবকলেবর এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে সাজাতে হবে আপনার ঘর বাড়ি। মনে রাখবেন মানুষের পরিচয়ের অনেকখানিই নির্ভর করে শুধু তাঁর ঠিকানার উপরে নয়, তাঁর ঘরবাড়ির উপরও। উপসংহারে সেই গৃহসজ্জার কথা।

সাহেব-মেমদের ভাল লাগে পরিচ্ছন্ন, রুচিসম্মত পরিবেশ। বেশি জাঁকজমক বা চাকচিক্য দেখাবার দরকার নেই, আপনার গৃহসজ্জায় যেন থাকে সুরুচির পরিচয়। দরকার হয় এ ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞ ইউরোপিয়ানের পরামর্শ নিন।

প্রথম বসবার ঘর বা বৈঠকখানার কথা বলা যাক। বসবার ঘরে থাকবে একাধিক ছোট টেবিল। সেগুলো ঢাকা থাকবে কাজ করা টেবিল ক্লথে। থাকবে সোফা এবং গোটা ছয় হালকা ইজিচেয়ার, যাকে আমরা বলি আরাম কেদারা। সোফার ঢাকনা হবে ভেলভেট বা সিল্কের। ঘরটি বেশ বড়-সর হতে হবে। কারণ, তাতে আরও গোটা দুয়েক হালকা নকশার চেয়ার বসাতে হবে। তা ছাড়া থাকবে উত্তম-বাঁধাই বই দিয়ে সাজানো বুক-কেস, এবং মিউজিক স্ট্যান্ড ও বসবার চেয়ার সহ একটি উচ্চশ্রেণীর পিয়ানো। ঘরের দরজার মাথায় থাকবে হরিণ বা অন্য কোনও বণ্যপ্রাণীর শিং, দেওয়ালে থাকবে প্রথম শ্রেণীর কিছু এচিং এনগ্রেভিং, বা ওয়েল পেইন্টিং। সেগুলো গিল্টি করা ফ্রেমে সুন্দর করে যেন বাঁধানো হয়। এ ঘরে নোংরা ("bawdy") জার্মান কালারপ্রিন্ট রাখা চলবে না। কৃত্রিম ফুল বা সেলাই-য়ের কলও বাতিল।

শোবার ঘরে খাটে থাকবে দুটি বালিশ, দুটি চাদর, একটি কম্বল। আর থাকবে একটি আলমারি ও একটি দেরাজওয়ালা ড্রয়ার এবং আয়নাসহ ড্রেসিং টেবিল। তা ছাড়া, হাত মুখ ধোয়ার জন্য একটি বেসিন থাকাও জরুরি। এই ঘরে বসবার জন্য একটি কোচ এবং তিন চারটি চেয়ার থাকা চাই। ছবিও থাকবে একটি-দুটি। তবে সেগুলি যথার্থ উচ্চমানের হওয়া চাই। নয়তো শূন্য দেওয়ালই ভাল।

ডাইনিং রুম বা খাবার ঘরও সাজাতে হবে একই ভাবে, যত্নের সঙ্গে। শেষ কথা, সাহেবি কেতা আপনি প্রায় রপ্ত করে ফেলেছেন। ঘরবাড়িও সাজিয়েছেন সাহেবদের রুচি মাফিক। আপনার গৃহলক্ষ্মীকে আপনার এই নতুন জীবনে দীক্ষিত করতে পেরেছেন তো? সাহেব-মেমদের সমাজে সেভাবে মিশতে গেলে সদরের সঙ্গে অন্দরের দিকেও নজর দেওয়া চাই। সময়ে আপনার সহধর্মিণীর ভূমিকাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। ("কোন

'স্পেশিয়ালের' পত্র।") সফররত বিলাতি সংবাদপত্রের প্রতিবেদক লিখছেন,—

> "...আমরা যেরূপ ফৌলিংপিস লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা পৌরাঙ্গনা লইয়াও সেরূপ করে; যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পক্ষিজাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বলিতে পারি না। আমি বাঙ্গালির কন্যার অঙ্গাভরণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও ফৌলিংপিসটিকে দুই একখানা সোণার গহনা পরাইব—দেখি, পাখী ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কি না।
>
> তবু নয়নবাণে কেন, শুনিয়াছি বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবাণ প্রয়োগেও বড় সুপটু।... ..."

সুতরাং,—।

এতক্ষণ ধরে যে পাঠক্রম অনুসারে পড়ানো হল, বলা নিষ্প্রয়োজন সেসব কোনও বাঙালি বা ভারতীয় গুরুমশাইয়ের বকবকানি নয়। ভারতীয় তথা বাঙালিকে ধরে ধরে এভাবে যিনি সাহেবিয়ানা শিখিয়াছেন তিনি একজন সত্যকারের শ্বেতাঙ্গ। তাঁর নাম—ডব্লিউ টি ওয়েব। গত শতকে এই কলকাতায় তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। ছাত্রদের জন্য তিনি লিখেছিলেন "ইন্ডিয়ান লিরিকস," "হাউ টু রাইট অ্যান এসে" জাতীয় কিছু বই। আর যেসব ভারতীয় তথা বঙ্গসন্তান সেদিন সাহেব হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের জন্য লিখেছিলেন সাহেবি-কেতার পাঠ সম্বলিত আস্ত একখানা বই, "ইংলিশ এটিকেট ফর ইন্ডিয়ান জেন্টলমেন।" (দ্রষ্টব্য: English Etiquette for Indian Gentlemen, W.T. Webb MA., S.K. Lahiri, Calcutta, 1880) উনিশ শতকের শেষ দিকে বইটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায়, সাহেব হওয়ার জন্য শহুরে বাঙালিদের মধ্যে সেদিন কী ব্যাকুলতা! মেকলের রূপরেখা ছাড়িয়ে সেদিন তাঁরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন আধা বা সিকি সাহেব নয়, ষোল আনা সাহেব হতে। পরিণতি হিসাবে অধিকাংশই ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকে পরিণত হয়েছিলেন কিনা সে অন্য কথা। আমরা এখানে ওয়েব সাহেবের প্রায় দেড়শো' পৃষ্ঠাব্যাপী পরামর্শকে হুবহু পেশ করতে পারিনি, মোটামুটি তার একটা সংক্ষিপ্তসার পরিবেশন করতে পেরেছি মাত্র। প্রসঙ্গত যে সব টীকা-টিপ্পনী করা হয়েছে তা অবশ্য একান্তভাবে আমাদের। লক্ষণীয়—টিপ্পনীগুলি সবই সমকালের রচনা থেকে উদ্ধৃতি। সেই সব রচনার লেখকেরাও ছিলেন সবাই বাঙালি। তাঁদের কলমে রঙ্গ ও ব্যাঙ্গের সুরটি কিন্তু গোপন নেই। সুতরাং, ধরে নিতে অসুবিধা নেই, একদল বাঙালি যখন সাহেব হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, অন্যদল তখন মেতে উঠেছেন তাঁদের নিয়ে রঙ্গ তামাশায়। সে সব কি তবে আধুনিকতা বনাম ঐতিহ্য-অনুরাগের লড়াইয়েরই আর এক দিক? মনে হয় না কি এই বিদ্রূপ বাণ নিক্ষিপ্ত কপট বা ছদ্ম আধুনিকতারই বিরুদ্ধে?

সেকালে বাঙালিকে সাহেব বানানোর জন্য এধরনের আরও কিছু কিছু বই বের হয়েছিল। যেমন—এলিস আন্ডারউড-এর "ইন্ডিয়ান ইংলিশ অ্যান্ড ক্যারেক্টার," ("Indian English and character", Ellis Underwood, Calcutta, 1897.) ; কিংবা ডব্লিউ নিউম্যান সাহেবের "ইন্ডিয়ান জেন্টলমেন প্রপোজিং টু স্টাডি ইন ইংল্যান্ড," (Indian Gentlemen proposing to study in England," W. Newman, Calcutta, 1879.) দ্বিতীয় বইটিকে বলা যায় সাহেব-হওয়ার যথার্থই দ্বিতীয় পাঠ। বিলেত না গিয়ে সাহেব, আর বিলেত ফেরত সাহেবের মধ্যে কে না জানে বিস্তর ফারাক। বিলেত-ফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য ফিরে এসে বলেছিলেন বিলেত দেশটা এ দেশেরই মতো। তাঁর কথায়,—

"তবে কি না, দেশটা বিলেত,
এবং জাতটা বিলিতি;

কাজেই,—একটু সাহেবী রকম
তাদের রীতিনীতি।
আর ঐ করে শুধু সাদা হাতে
চুরি ডাকাতি সে;
আর স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে
বিশুদ্ধ ইংলিশে;—
এই তফাৎ, এই তফাৎ
এই তফাৎ মাত্র, ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাদের
বিশেষ তফাৎ নাই।”

হয়তো। হয়তো নয়। তবে এটাও মনে রাখা দরকার কালাপানি পার হওয়া সহজ-কর্ম নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ‘একঘরে’ প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে।—

“বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
ছেড়ে দিলেন মুরগী গরু জাতের ঠেলায়;
মুড়িয়ে মাথা, ঢেলে ঘোল,
ধল্লেন আবার মাছের ঝোল,
কুমড়োসিদ্ধ, বেগুনপোড়া, আলুভাতে তায়;—
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়!”—ইত্যাদি।

তবু রেস্ত থাকলে ঝুঁকি নিয়ে একবার ঘুরে আসাই ভাল। কারণ, ঔপনিবেশিক আমলে কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বিলাত-ফেরত ভারতীয়ের সঙ্গে বাদবাকি ভারতীয়ের কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত। সেকালে তো অবশ্যই। একালেও কি নয়? বিলাতি-ডিগ্রি আর স্বদেশি ডিগ্রি কি তুল্যমূল্য? সুতরাং, ওই বইখানাও নিশ্চয় ভাল করে পড়ে নিতেন উচ্চাভিলাষী বিলাতযাত্রী পড়ুয়ারা সে দিন। এখন অনেকেই পশ্চিমযাত্রী। ঘরে ঘরে পরামর্শদাতা। বাড়ির অভিভাবক এবং পাড়াপড়শি হিতাকাঙ্ক্ষীরা ছাড়াও সুপরামর্শ বিতরণ করবার জন্য রয়েছে টি ভি, খবরের কাগজ, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, এমনকী বিদেশি ছেলেমেয়ে ধরার দলও। ফি বছর তাঁরা কলকাতা এবং বড় বড় শহরে নিজ নিজ দেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে স্বপ্ন ফিরি করেন, ছেলে মেয়েদের উচ্চিশিক্ষা দেওয়ার জন্য হাতছানি দিয়ে বিদেশে নিয়ে যান। আজ অতএব সেকালের ওই ‘ভেডে-মেকাম’ (Vede—Mecum) বা কী নিতে হবে, কী করতে হবে, কী পরতে হবে এসব পরামর্শ সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে গেছে। সুতরাং, তার উল্লেখ করেই সাহেবিয়ানার পাঠ-প্রসঙ্গে ইতি টানা যাক।

এবার মুদ্রার উলটো পিঠ। ঔপনিবেশিক আমলে একদিকে যেমন পশ্চিমি জীবনাচার ও সভ্যতাকে আদর্শ হিসাবে বেদিতে স্থাপন করে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করার চেষ্টা চলেছে বিজিত জাতিকে সেই আদর্শ জীবনের ধ্রুবতারা হিসাবে গ্রহণ করাবার, অন্যদিকে তেমনই নিঃশব্দে চেষ্টা চালানো হয়েছে মখমলে ঢাকা দস্তানা পরে শাসন দণ্ড ধারণ করে কীভাবে শাসন ও শোষণকে চালিয়ে যাওয়া যায় সাম্রাজ্য গড়ার কারিগরদের তার জারিজুরি। বিলাতের হেলিবারি, বা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কথা অনেকেরই জানা আছে। সেখানে শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের শেখানো হত দূর বিদেশে সাম্রাজ্যের রক্তাক্ত রথটিকে কীভাবে চালিয়ে নেওয়া যায় তার কারণ কৌশল। কাজটা খুব সহজ ছিল না। কারণ, ভারত এক বিশাল দেশ। এদেশে নানা ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি। একই

ধর্মাচারীদের মধ্যে আবার রকমারি বিভাগ, উপবিভাগ। নানা ধর্মের ও গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে আচার আচরণ ও রীতিনীতির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই বিচিত্র ও বিভ্রম-সৃষ্টিকারী পরিবেশে নবীন বিদেশি শাসক স্বভাবতই প্রতিদিন নানা সমস্যার মুখোমুখি হন। মনে প্রশ্ন,—কী তাঁর করা উচিত?—কী তাঁর কর্তব্য? বিশুদ্ধ আইন-শৃঙ্খলার সমস্যায় হলে না হয় সিপাই সান্ত্রী দিয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু অন্য সময়? এসব সমস্যা থেকে তরুণ বা নবীন শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ যাতে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে পারেন তার জন্য অভিজ্ঞ ওপরওয়ালা কিন্তু গোপনে চালু করেছিলেন অন্য আর এক পাঠক্রম। ভারতীয় বা বাঙালিকে সাহেব বানাবার জন্য যে বইটির কথা আলোচিত হয়েছে তার লেখক ছিলেন যদি একজন অসরকারি ইংরাজ, তবে সাহেবদের কেমন করে ভারতীয় বা বাঙালিদের মোকাবিলা করতে হবে, কী ধরনের ব্যবহার করতে হবে তাঁদের সঙ্গে, এসব নিয়ে লেখা পুস্তিকাটির লেখক-প্রকাশক কিন্তু স্বয়ং সরকার বাহাদুর। তবে এ-পুস্তিকা সর্বজনের জন্য নয়, একান্ত ভাবেই বিলাত থেকে আগত নবীন শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের জন্য। স্বভাবতই এটি ছিল গোপন প্রকাশনা, এবং গোপনে প্রচারিত ভারতীয়দের সাহেব বানানোর জন্য লেখা পুঁথিটির মতোই এই পুস্তিকাটিও রীতিমত উপভোগ্য। শুধু উপভোগ্য নয়, বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসকদের মানসিকতা বোঝার পক্ষেও বোধহয় সহায়ক। পুস্তিকাটির শিরোনাম—"Memorandam on the Subject of Social and official intercourse between European officers and Indian Gentlemen," Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1913)

প্রথমেই লক্ষণীয়, সাধারণ মানুষ নয়, এই পুস্তিকাটির লক্ষ এদেশের উচ্চবর্গের মানুষ, যাঁদের বলা হয় ভদ্রলোক। এদেশে নতুন এসেছেন এমন ইংরাজ রাজকর্মচারী, পুলিশ কর্তা, এবং অন্যান্য রাজপুরুষদের শেখানো হচ্ছে ভারতের বাসিন্দা এই ভদ্রজনদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। আস্যার্থ, তাঁরা যদি শাসকদের ব্যবহারে প্রীত থাকেন তবে আমজনতাকে নিয়ে তেমন ভাবনার কিছু নেই। একদিকে রাজকর্মচারীদের যেমন বলা হয়েছে তোমাদের ব্যবহারে তাঁরা যেন অপমানিত বোধ না করেন, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে তার জন্য বেশি মাখামাখি করার দরকার নেই। তুমি হয়তো ভাল মনে ওদের সঙ্গে মিশতে চাইছ, কিন্তু বেশি বেশি কিছু করতে গেলে ওঁরা পেয়ে বসতে পারে। অর্থাৎ, প্রজাদের খুশি রাখার চেষ্টা করতে হবে বটে কিন্তু, শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব রেখে।

মনে রাখবে হিন্দুদের মধ্যে বর্ণভেদ অতিশয় বাস্তব। সুতরাং, তোমাকে এই ভেদাভেদ বুঝতে হবে। হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে যাঁরা তাঁরা ব্রাহ্মণ। তারপর তাঁদের নীচে ধাপে ধাপে অন্যরা। নীচের দিকে যেসব জাত বা গোষ্ঠী রয়েছে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কার্যত তাঁদের হিন্দু বলে মনে করে না। (শাসকরা এই বিভেদ সময়ে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন, এটা অতএব স্বাভাবিক।)

মুসলমানদের ধর্মে কোনও জাতি ভেদ নেই। মদ, শূকরের মাংস, এবং হালাল করে কাটা হয়নি এমন যে কোনও মাংস তাদের কাছে নিষিদ্ধ। এসব বাদ দিলে ইংরেজদের সঙ্গে খানা খেতে মুসলমানদের কোনও আপত্তি নেই। তবে এখানকার মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বহিরাগত। দীর্ঘদিন ধরে এখানে (বাংলায়) বাস করলেও তাঁরা স্থানীয় মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র। তা ছাড়া অনেকে আবার মুসলমান হয়েছেন হিন্দু থেকে। তাঁদের অনেকের মধ্যে পুরানো আচার বিচার হয়ে গেছে। অন্যান্য এশিয়াটিক মানুষের মতো তাঁদের মধ্যে সাধারণ কুসংস্কার তো আছেই, তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে নিজেদের পুরানো সব কুসংস্কার।

ভারতীয়দের সঙ্গে ইউরোপিয়ানদের সরকারি ও সামাজিক স্তরে সম্পর্কের দুটি দিক আছে। এক, যা স্থানীয় বা দেশজ; দ্বিতীয়, যা গড়ে উঠেছে পশ্চিমি সভ্যতার সঙ্গে সংসর্গে।

একদল ভারতীয় আছেন যাঁরা সম্ভ্রান্ত। তাঁদের বলা হয় 'ভদ্রলোক' বা 'ভালোমানুষ'।

(“Bhadralok বা Bhalmanush.”) অন্যরা সবাই তাঁদের নীচে। (সৌভাগ্য, ভদ্রলোকের অনুকরণে সাহেবরা তাঁদের আখ্যা দেননি ‘ইতর লোক!’)

ভদ্রলোকেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। ১) অভিজাত ভূস্বামী, ২) উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, পেশাদার, সম্পন্ন ব্যবসায়ী এবং জোতদার বা জমির মালিক, ৩) কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ী, ৪) শ্রমিক, কুলি প্রভৃতি। তরুণ ইংরাজ অফিসার প্রথম দুই দলের সঙ্গে মিশতে পারেন। ওঁরা তাকে সম্মান জানাতে আসতে পারেন। বিশেষ কাজে তো বটেই, এমনকী অন্য উপলক্ষেও তাঁর দর্শনার্থী হতে পারেন। তুমি নিশ্চয়ই তাঁদের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু দেখা করবে কি সরকারি, কি সামাজিক, দুই পরিচয়েই উপরওয়ালা হিসাবে। (“he will deal definitely as a social and official superior.”) অবশ্য সকলের প্রতিই (বাইরে) দেখাতে হবে সমভাব। ওঁরা যেন বাড়িতে হোক, অফিসে হোক, ক্যাম্পে হোক,— তোমার কাছে পৌঁছাতে পারেন সে দিকে লক্ষ রাখবে।

প্রসঙ্গত, আরও একটা কথা বলা দরকার, মনে করি। আমার মতে প্রত্যেক নবাগত ইংরাজ অফিসারেরই কর্তব্য হবে মন দিয়ে স্যার জে ম্যালকম এর “মিনিট” পড়া। (“Sir J. Malcom's Minute”) সেটা নাকি প্রায় শতবর্ষ আগে লেখা। হয়তো বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর সব পরামর্শই কার্যকর করা সম্ভব নয়। তবু তাতে এমন অনেক মূল্যবান পরামর্শ রয়েছে যা তোমাদের পক্ষে এখনও মূল্যবান। (‘দুঃখের বিষয় আমি এখনও সেটা দেখবার সুযোগ পাইনি’ বলছেন বর্তমান পরামর্শদাতা উপরওয়ালা।) তোমরা যখন এদেশে এসেছ, এদেশের মানুষের মধ্যেই তোমাদের কাজ করতে হবে, তখন তাঁরা তোমাকে কীভাবে নিচ্ছেন, তোমার কর্মজীবনের পক্ষে সেটাও কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তুমি হয়তো দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই সকলের সঙ্গে কথা বলতে পার। কিন্তু সেটাই সব নয়। তবে হ্যাঁ, কথা বলাটা অবশ্যই জরুরি। তাতে তুমি অনেক কিছুই জানতে এবং বুঝতে পারবে। সুতরাং, ওঁদের বলতে দাও।

ভারতীয় রায়ত নিজের ভাষায় কথা বলার সুযোগ পেলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মনের কথা সবই খুলে দেবেন। নতুন অফিসার ট্যুরে গেলে গ্রামের মোড়লের সঙ্গে কথাবার্তার সুযোগ মেলে। তখন তাঁদের সমস্যা কী, কী তাঁরা চান—সবই জানতে পারবে। গ্রামের মানুষ কিন্তু সেই সব রাজকর্মচারীদেরই দীর্ঘকাল ধরে মনে রাখেন, শ্রদ্ধা করেন, যাঁরা আনুষ্ঠানিকতার তোয়াক্কা না রেখে সরাসরি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। হ্যাঁ, তাঁদের ভাষায়। এই আদানপ্রদান পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, শিকার-উপলক্ষে,—সব সময়ই চলতে পারে। সুতরাং, তোমরা মন দিয়ে স্থানীয় ভাষা শেখার চেষ্টা করো। যতদিন এদেশে থাকবে ততদিন সে চেষ্টায় যেন ছেদ না পড়ে। (ঔপনিবেশিকরা গোড়া থেকেই জানতেন স্থানীয় ভাষা এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা ছাড়া সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে রাজত্ব করা সম্ভব নয়।) দেখা যাচ্ছে, সেই কর্মসূচি বিশ শতকের সূচনায়ও অব্যাহত। রাজকর্মচারীদের হাত ধরে যেন শেখানো হচ্ছে গণসংযোগের কৌশল।

নবীন অফিসার যেন কখনও মেজাজ না হারান। তাঁকে বদরাগী হলে চলবে না। কথায় কথায় মেজাজ দেখানো খুবই খারাপ। হয়তো ইংল্যান্ডের মতো এদেশে তার জন্য শাস্তি পাবে না, কিন্তু তোমার বিলক্ষণ বদনাম হবে। (লক্ষণীয়, এ-ব্যাপারেও চিরকালের সেই দ্বিচারী নৈতিকতা। যে আচরণের জন্য স্বদেশে শাস্তি পেতে হয়, সেই একই আচরণের জন্য এদেশে সরকারি ভাবে কোনও শাস্তির ব্যবস্থা নেই!) মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করবে না। তোমার অফিসেও উপরওয়ালাদের চোখে তোমার যোগ্যতা হ্রাস পাবে। সুতরাং, সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ভারতীয়দের দেখা সাক্ষাতের সময় কয়েকটি বিষয় বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

এ দেশের ভাষায় সম্ভ্রান্ত লোককে সব সময় “আপনি” বলে সম্বোধন করা হয়। হিন্দিতে হলে— “আপ”, স্থানীয় ভাষা যখন ব্যবহার করবে তখন তুমিও তা-ই বলবে।

কথোপকথনে কখনও কোনও অবস্থাতেই "নেটিভ" শব্দটি মুখে আনবে না।

বাঁ হাত যথাসম্ভব কম ব্যবহার করবে। বাঁ হাতে কোনও কিছু দেওয়া বা নেওয়া নিষিদ্ধ। বাঁ হাতে 'সেলাম' করাও চলবে না। কেউ রাস্তায় 'সেলাম' জানালে ডান হাত তুলে প্রত্যুত্তর দেবে, আঙ্গুল দেখিয়ে নয়।

আদালতে বিচারকের আসনে বসে চুরুট ধরাবে না। সেটা আদালত অবমাননার শামিল। উপস্থিত লোকজনের পক্ষেও সেটা অপমানজনক। তা হলে আদালতে তুমি ভারতীয়দের পান চিবানো বা থুথু ফেলা বন্ধ করবে কেমন করে? নিজে যথযথ আচরণ না করলে অন্যদের শাসন করা সম্ভব নয়।

কোনও ভারতীয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলে তাকে কোনও জলখাবার পরিবেশন করতে বলবে না। ভারতীয় আগন্তুক তা গ্রহণ নাও করতে পারেন। সুতরাং, সাহেবের পরিবেশিত খাবার তিনি গ্রহণ করবেন এটা তোমার জানা থাকলেই তা করবে।

যদি কোনও ভারতীয়ের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতাও থাকে, তবু তিনি নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু না বললে কখনও তাঁর কাছে তাঁর বাড়ির মহিলাদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবে না। তবে হ্যাঁ, একটু ঘুরিয়ে অবশ্য বলতে পার, আশা করি আপনার পরিবারের সবাই কুশলে আছেন। ("I hope members of your family are well.") খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা তোমার অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের কাছে তাদের সন্তানদের খোঁজখবর নিতে পার। তাতে তাঁরা খুশিই হবেন।

ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রা এবং অভ্যাসের পার্থক্য আছে। তরুণ ইংরাজ অফিসাররা অনেকে তা জানেন না। ফলে প্রায়শ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ভ্রমণের সময় রেলের কামরায় এবং স্টিমারে। এটা দুঃখজনক। বিশেষ করে কোনও কোনও খবরের কাগজ এসব নিয়ে তিলকে তাল করে উত্তেজনা ছড়ায়। আসলে দু'তরফের ব্যক্তিগত অভ্যাসের ফলেই এসব ঘটে থাকে। একই কামরায় ইউরোপিয়ান এবং ভারতীয়ের পক্ষে বেশিক্ষণ বন্দি থাকা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। সুতরাং, ধৈর্য থাকা চাই। চাই সহনশীলতা। তোমাকে আত্মসংযম অনুশীলন করতে হবে। আসলে সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারলে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নিজে যথেষ্ট সহনশীলতার পরিচয় দিতে পারলে অন্যপক্ষও সংযত হয়ে ঠিক ঠাক আচরণ করেন। তোমার ভদ্র আচরণ তাঁদেরও ভদ্র আচরণে প্রাণিত করবে। একজন তরুণ ইংরাজ রাজকর্মচারী হিসাবে তুমি তোমার জাতির ("Race") এবং আপন পদের মর্যাদা যথাযথ গাম্ভীর্য সহকারে রক্ষা করবেন এটাই প্রত্যাশিত। কখনও কোনও অবস্থাতেই মাথা গরম করবে না। (লক্ষণীয়, উপরওয়ালারা কিন্তু বিলক্ষণ জানেন, তরুণ ইংরাজ রাজপুরুষ প্রায়শ সেটাই করেন, যাকে বলে—মাথা গরম।) মোট কথা, সর্ব প্রযত্নে, রূঢ়তা ও ক্ষুদ্রতা বর্জন করতে হবে। নয়তো বদনাম হবে মাত্র।

সরকারি কর্মচারী, বিশেষ করে জেলা শাসকদের কর্তব্য প্রজাবর্গের সঙ্গে যোগাযোগের পথ খোলা রাখা। কেউ যদি কোনও কাজে বা সাহেবকে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা করতে চান তবে যেন তোমার দরজা খোলা থাকে । কোনও অফিসার আদালতে কিংবা অফিসের কাজে যত যোগ্যতার প্রমাণই রাখুন না কেন, জনসংযোগ ব্যর্থ হলে তিনি ব্যর্থ কর্মচারী বলেই গণ্য হবেন। তাকে তার জেলার জনসাধারণকে জানতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় লোকদের সংস্পর্শে আসতে হবে। প্রাচ্যের মানুষ সাধারণত ব্যক্তিগত শাসন পছন্দ করেন। ফলে তাঁরা যখন দেখবেন সরকারি অফিস থেকে কোনও যান্ত্রিক নির্দেশ নয়, আদেশ নির্দেশের পিছনে রয়েছে একজন বিশেষ মানুষ, তখন তাঁরা আশ্বস্ত বোধ করেন। স্বভাবতই শাসকদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে পৌঁছাতে পারলে ভারতীয়রা খুশি হন। স্বয়ং সাহেবের কাছে নিজ মুখে নিজের আর্জি জানাতে পারার সুযোগের মূল্য তাঁদের কাছে অনেকখানি। আর্জি যদি নিষ্ফল হয় তবু তাঁকে তাঁর কথা বলতে দিতে হবে। মন দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনতে হবে।

না শুনলে সেটা তোমার তরফে ভুল হবে। তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া চলবে না। তাঁর যুক্তি মনোযোগ দিয়ে না শুনে তাঁকে বিদায় করে দেওয়াও ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো তোমাকে অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবু রাজকর্মচারী হিসাবে তোমার কর্তব্য ধৈর্য সহকারে অপরপক্ষের বক্তব্য শোনা। তাতে কিছু সময় অপচয় হলেও তা করতে হবে। ব্যক্তিবিশেষের আর্জি বা আবেদন হোক, আর ডেপুটেশনই হোক প্রজাদের তাঁদের কথা বলতে দিতে হবে।

গ্রামে হয়তো দেখবে গ্রামবাসীরা সবাই একসঙ্গে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। তখন তাঁদের বলতে হবে, সবাই একসঙ্গে নয়, আপনারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিন যিনি সকলের সুবিধা অসুবিধা, সুখ দুঃখ সম্পর্কে অবহিত। ওঁরা খুশি মনেই প্রতিনিধি ঠিক করবেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে তোমার কাজ হবে অন্য কোনও বয়স্ক লোককে বেছে নিয়ে তাঁর কথা শোনা। দরকার হয় একাধিক লোককে সুযোগ দিতে হবে।

সুযোগ পেলেই সৌজন্যমূলক দেখাসাক্ষাতের জন্য বের হতে হবে। বন্ধুর মতো পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের খোঁজ খবর নিতে হবে। রায়তদের বলতে হবে, তোমাদের কেমন কাটছে, অসুবিধা কী, নিঃসংকোচে আমাকে জানাতে পারো। সুযোগ পেলেই ওঁদের উৎসবে, বা মেলায় যোগ দেবে। ওঁদের কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের খবর পেলে ছুটির দিনে সেখানে গিয়ে হাজির হবে। (উপরওয়ালারা জানিয়ে দিচ্ছেন, তোমার এই কাজে নিছক জীবিকা নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শান্তিপূর্ণভাবে বিজিত দেশের সুশৃঙ্খল শাসন। সাম্রাজ্যের বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তরুণ রাজকর্মচারীর অতএব কঠিন দায়িত্ব। তাঁকে প্রজাবৎসল শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।)

সুযোগ পেলেই ভারতীয় দর্শনার্থীকে দর্শন দিতে হবে। অবশ্য যদি অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কারণে একান্ত যদি তা সম্ভব না হয় তবে অন্য কথা। তোমার পিয়ন বা চাপরাশি যেন কোনও দর্শনার্থীকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে, কিংবা সাহেবের নির্দেশ ছাড়া নিজের খুশি মতো কাউকে ফিরিয়ে না দেয়। তাদের হুকুম করতে হবে যিনিই দেখা করতে আসুন তাঁর "কার্ড" কিংবা অন্য কোনও পরিচয়লিপি তোমাকে অবশ্যই দেখাতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে দেখা করা বা না করা তোমার ব্যাপার। "সাহেব বাড়ি নেই" ("not at home") বললে ভারতীয়রা ঠিক বুঝতে পারেন না। ভাবেন, তাঁদের অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং, বারান্দায় কোনও আলাদা ঘরে, কিংবা অন্য কোথায়ও অভ্যাগতদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁরা সেখানে অপেক্ষা করবেন। আগে থেকে যদি বলে দেওয়া হয় কবে কখন তাঁর সঙ্গে দেখা করা প্রশস্ত তবে সেটা খুব ভাল হয়। এই ব্যবস্থায় ভারতীয় ভদ্রলোকেরা খুশিই হবেন। তার মানে এই নয় যে, কড়াকড়িভাবে এই ব্যবস্থাই অনুসরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে এই নিয়ম হয়তো সকলের জানা নেই। কিংবা কারও হয়তো দেখা করাটা খুবই জরুরি। তাঁদের অপেক্ষায় রেখে ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়রা, বিশেষ করে জমিদাররা সাক্ষাৎকারের জন্য চিঠি লিখে সময় চান, কবে কখন তাঁরা দেখা করতে চান তা জানিয়ে দেন। সুতরাং, "নট অ্যাট হোম" বলে তাঁদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

যাঁরা দেখা করতে আসবেন, তাঁদের বসবার জন্য ব্যবস্থা করতে পিয়ন বা অন্য কর্মীদের নির্দেশ দিতে হবে। ওয়েটিংরুমে যেন চেয়ার থাকে। যে সব ভারতীয় চেয়ারে বসবার মতো মর্যাদাসম্পন্ন তাঁরা সেখানে বসবেন। যদি কোনও কারণে সেদিন তাঁদের কারও সঙ্গে দেখা করা সম্ভব না হয় তবে সে খবরটা যেন কিছুতেই পিয়নকে দিয়ে বলে পাঠাবেন না। কার্ডের পিছনে নিজের হাতে কয়টি বাক্য লিখে, কিংবা অন্য কোনও কাগজে তোমার বক্তব্য ভদ্রভাবে জানিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে তাতে বলে দেওয়া ভাল পরে কবে এলে তোমার পক্ষে দেখা করার সুবিধা। তবে তুমি যদি একান্তই কোনও বিশেষ দর্শনার্থীর সঙ্গে আদৌ দেখা করতে না চাও তবে অন্য কথা।

বিশিষ্ট ভারতীয় দর্শনার্থীরা নিজেদের যানবাহন বাইরে রেখে পায়ে হেঁটে বাড়িতে ঢোকেন।

উচিত হবে তাঁদের গাড়ি বাড়ির দরজা পর্যন্ত আসতে দেওয়া। নিজে দরজায় এগিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবে। পদমর্যাদা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তিনি ঘরে ঢুকলে তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে।

অফিস ঘরে নয়, বিশিষ্ট অভ্যাগতদের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে, কথা বার্তা বললে তাঁরা খুশি হবেন। এটা মনে রাখবে। ইন্টারভিউ বা দর্শনার্থীর সঙ্গে কথা বলার সময় সাধারণ রায়ত, সাধারণ দোকানি বা ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যদের সব সময় চেয়ারে বসতে বলবে। উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ইনসপেক্টার, জেলার (কারারক্ষক), সাব ডেপুটি কালেক্টার, কমিশনড অফিসার, নেটিভ আর্মির অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, বা সমমর্যাদার সবাই চেয়ারে বসবেন। তবে সুবাদার, রসলদার, জমাদার, হাবিলদার, দফাদার, নায়েকরা কিন্তু চেয়ারে বসতে পারবেন না। সেরেস্তাদারের নীচে যেসব সরকারি কেরানি, (অফিসে) তাঁদেরও চেয়ারে বসার অধিকার নেই। কিন্তু হেড ক্লার্ক বা সম মর্যাদার যাঁরা, তাঁরা তোমার ঘরে ঢুকলে চেয়ারে বসা সঙ্গত। কোনও জমিদার এলে তো তাঁকে অবশ্যই চেয়ারে বসতে বলবে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনও পার্শ্বচর থাকলে তাঁদের কিন্তু বসতে বলতে নেই। তবে সেই ভদ্রলোক জমিদারের দেওয়ান বা এস্টেট ম্যানেজার হলে তবে অন্য কথা। সেক্ষেত্রে তিনিও অবশ্যই চেয়ারে বসবেন। অন্য পার্শ্বচরদের তাঁর সামনে বসতে বললে জমিদার নিজেও কিন্তু অসন্তুষ্ট হতে পারেন। (লক্ষণীয়, ইংরেজ শাসকদের শ্রেণী সচেতনতা। ভারতীয় বর্ণাশ্রমের মতো বিদেশি শাসকরাও অফিসে আদালতে নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। কে চেয়ারে বসার অধিকারী, কে নয়,—তা নিয়ে কত না ভাবনা ও দুর্ভাবনা। চেয়ার যেন সাম্রাজ্যের প্রতীক! অবশ্য উচ্চবর্ণের ভারতীয়রাও এই বিশেষ কাষ্ঠাসনটিকে বিশেষ মর্যাদার প্রতীক হিসাবে ব্যবহারেই অভ্যস্ত। সাহেবরা সেই রীতিকে কার্যত সুশৃঙ্খলিত আইনে(!) পরিণত করেছেন মাত্র!)

করমর্দন ভারতীয় রীতি নয়। কিন্তু ভারতীয়দের সঙ্গে করমর্দন করলে তাঁরা সম্মানিত বোধ করেন। যেন তাঁরা সাহেবদের সঙ্গে সমান সামাজিক মর্যাদা উপভোগ করছেন। সুতরাং, কোনও সম্ভ্রান্ত ভারতীয় করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালে কখনও তা প্রত্যাখান করবে না। তবে সাব ডেপুটি কালেক্টার বা তাঁর সম মর্যাদার অফিসার বা অধীনস্থ সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে উপরওয়ালার পক্ষে করমর্দন রেওয়াজ নয়। তবে হ্যাঁ, কোনও ইংরাজ রাজকর্মচারী যখন জেলা ছেড়ে চলে যাবেন তখন সহকর্মীদের সহযোগিতা এবং তাঁদের কাজের স্বীকৃতি হিসাবে হেডক্লার্ক, পুলিশ সাব ইনসপেক্টার, সাবজজ, জেলা মুনসেফ এবং অন্যান্য গেজেটেড অফিসারদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় করমর্দন করতে পারেন। তুমিও সমপর্যায়ের ইউরোপিয়ান অফিসারদের সঙ্গে বিদায়কালে যেমন করমর্দন করবে এদের সঙ্গে সেভাবে করমর্দন করতে পার।

কোনও ভারতীয় দর্শনার্থী ঘরে ঢোকার সময় তোমার হাতে যদি জ্বলন্ত চুরুট থাকে তবে তা সরিয়ে রাখতে হবে। হাতে চায়ের পেয়ালা থাকলেও তা সরিয়ে দেবে। যদি তুমি মনে কর আগন্তুক অতিশয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ তবে তাঁকে সিগারেট বা চুরুট দিতে পার। চা পরিবেশন করতেও আপত্তি নেই। কেউ দেখা করতে এলে তোমার কুকুর যেন ঘেউ ঘেউ না করে, আগন্তুককে ভয় না দেখায় বা তাঁকে চাটতে শুরু না করে। কুকুর থাকলে তাকে সামলে রাখবে। কারও সঙ্গে দেখা করার সময় যথাযথ পোশাক পরে তা করবে। শুধু শার্ট পরে, বা শিকারের কোট গায়ে চাপিয়ে কারও সঙ্গে দেখা করবে না। কোট খুলে রেখে তুমি যদি তখন অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত থাক, তবে দেখা করার সময় আবার কোট পরে নেবে।

কার সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলা শ্রেয় সেটা নির্ভর করবে, কে কী কাজে এসেছেন তার উপর। আগন্তুক যদি নিছক সাহেবকে সম্মান জানাতে এসে থাকেন, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার যদি হয় শুধুই সৌজন্যমূলক তবে দশ মিনিট যথেষ্ট। মনে রাখবে, অনেক সময় ভারতীয়দের কথা যেন আর ফুরাতে

চায় না, তাঁদের বিদায় না করলে সহসা তাঁরা উঠতে চান না। বিদায় জানাবার এক কৌশল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রভাবে বলা,—আপনার সঙ্গে কথা বলে খুবই আনন্দিত হলাম। আশা করি আবার দেখা হবে। কিংবা বলতে হবে, বেলা বেড়ে যাচ্ছে, দুঃখিত, হাতে কিছু জরুরি কাজ রয়েছে। ভারতীয় আগন্তুকের কোনও বিশেষ প্রার্থনা থাকলে দেখা যায় সেটা তিনি বলেন একেবারে শেষ সময়। সুতরাং, প্রয়োজনে উঠে দাঁড়াবার পর, হয়তো তোমাকে আর একবার বসতে হবে, এবং মন দিয়ে ওঁর কথা শুনতে হবে। আগন্তুক কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হলে বিদায় দেওয়ার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে। পিয়নকে বলবে তাঁর গাড়ি ডেকে দিতে। ভদ্রলোককে নিজেকে যেন এই কাজটি না করতে হয়।

সম্ভ্রান্ত ভারতীয়রা তোমার সঙ্গে দেখা করেন বলেই যে তোমাকে তাঁদের বাড়ি গিয়ে হাজির হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। যদি মনে কর তিনি সামাজিক মর্যাদায়, কিংবা সরকারি পদাধিকারী হিসাবে অতি উঁচু স্তরে রয়েছেন, তবে "রিটার্নকল" বা ফিরতি-দর্শন চলতে পারে। তবে তার আগে জানতে হবে ওই ভারতীয় তা কীভাবে নেবেন সেটা। তিনি সাহেবের অভ্যর্থনায় অভ্যস্ত কিনা। ("if known to be acceptable.") দ্বিতীয়ত, এটাও জানতে হবে তাঁর বাড়িতে ইউরোপিয়ানদের অর্ভ্যথনা করার মতো ব্যবস্থা আছে কিনা সেটাও। প্রত্যেক জেলায় এমন কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত ভারতীয় আছেন উঁচুস্তরের ইউরোপিয়ান অফিসাররা যাঁদের বাড়ি গিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করেন। এই রীতি মেনে নিতে হবে। তবে কোনও সম্ভ্রান্ত ভারতীয়ের বাড়ি যাওয়ার আগে খবর দিয়ে যাওয়া ভাল। নয়তো তিনি অপ্রস্তুত থাকতে পারেন। চিঠি লিখে তাঁকে দিনক্ষণ জানিয়ে দেবে। চিঠির উত্তরের জন্য অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই। দেখা করে সৌজন্য প্রকাশের পর তুমি তোমার নিজের ইচ্ছা মতো বিদায় নেবে।

ভারতীয় অভিজাতদের কাছ থেকে ইংরাজ অফিসারদের কোনও উপহার নেওয়ার নিয়ম নেই। তবে সামান্য ফুল ফলের ডালি গ্রহণ করতে কোনও দোষ নেই। কিন্তু দাতাদের উপহার দিতে নিরুৎসাহ দেওয়াই কর্তব্য।

কেউ তোমাকে ফুলের মালা দিলে নম্রভাবে তা গ্রহণ করবে। তাঁকেই সেটা তোমার গলায় পরিয়ে দিতে বলবে। যতক্ষণ তিনি উপস্থিত থাকবেন ততক্ষণ মালা তোমার গলায় থাকবে। আগন্তুক চলে যাওয়ার পর তা খুলে ফেলবে।

চাকরি বা অন্য কিছু প্রার্থনা করলে ভারতীয়রা সাধারণত সাহেবের বাড়িতে গিয়ে দরখাস্ত পেশ করতে চান। তাঁদের বুঝিয়ে বলে দিতে হবে, বাড়িতে নয়, এসব দিতে হবে অফিসে। সেখানে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে কোনও অসুবিধা নেই।

ভারতীয়দের কাছে চিঠি লেখার সময় "Dear Sir" না লিখে লেখা ভাল—"Dear Ramchandra Babu," "Dear Abdul Majid", ইত্যাদি। খুব সম্মানিত কোনও ভারতীয় হলে লিখবে, "My dear Nawab Bahadur," "Raja Bahadur...", "Rai Bahadur..."। ইত্যাদি। পদবিতে যদি "বাহাদুর" না থাকে তবে লিখবে,—"My dear Raja Saheb," "Nawab Saheb," ইত্যাদি। চলবে "My dear Maulavi Saheb"-ও। "Babu" শব্দটা যত্রতত্র ব্যবহার করবে না। না চিঠিতে, না কথোপকথনে। সাধারণ সম্বোধন হিসাবে অপরিচিতদের বা তোমার অধস্তন রাজকর্মচারীদের চিঠিতে চলে বরং "Dear Sir", তলায় লিখবে—"ইওরস ট্রুলি" ("yours truly") বা "ইওরস ফেথফুলি" ("yours faithfully") কোনও রাজসম্মান প্রাপ্তি, পুত্রসন্তান লাভ, বা পরিবারের পক্ষে শুভ কোনও ঘটনা উপলক্ষে ইউরোপিয়ানদের যেভাবে শুভেচ্ছা জানিয়ে থাক, উঁচু মর্যাদার ভারতীয়দেরও সেভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে শুভেচ্ছা জানাবে। ঠিক তেমনই কোনও শোকাবহ ঘটনায়ও একইভাবে পাঠাতে হবে শোকবার্তা।

এবার জমিদার প্রসঙ্গ।

জমিদার, বিশেষ করে প্রাচীন পরিবারগুলোর উত্তরাধিকারীদের যথাযথ গুরুত্বসহকারে ব্যবহার করবে। তাঁরা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে অতিশয় স্পর্শকাতর। তাঁদের অনুভূতিকে সম্মান জানিয়ে চলতে হবে। তবে হ্যাঁ, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় কিংবা পত্রালাপে সরকারের স্বীকৃত উপাধি উল্লেখ করাই যথেষ্ট, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

জমিদারের এলাকায় ক্যাম্প করলে রাজকর্মচারী হিসাবে তোমার কর্তব্য অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করা। তিনিও নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া বাঞ্ছনীয়। জমিদার ইউরোপিয়ান অতিথিদের জন্য কোনও বাংলো নির্দিষ্ট করে রাখলে তা ব্যবহারে কোনও দোষ নেই। তুমি নিজেও তা ব্যবহারের জন্য চাইতে পার। কিন্তু বিনা অনুমতিতে কক্ষনো তা করবে না। দেশের অনেক অঞ্চলেই রাজকর্মচারী কিংবা কোনও ইউরোপিয়ান অভ্যাগত এলে জমিদার সাধারণত নিজেই লোক পাঠিয়ে তাদের ভালমন্দ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। ভদ্র এবং নম্রভাবে তাঁকে উত্তর দেবে। আগন্তুকদের কাছে তাঁর খোঁজখবরও নেবে।

জমিদার তোমাকে নিমন্ত্রণ করলে বা অ্যাপ্যায়ন করতে চাইলে তাতে সাড়া দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু নিজে উপযাচক হয়ে কখনও নিমন্ত্রণ আদায় করবে না। জমিদার তোমাকে তোমার কাজের জন্য গাড়ি দিতে চাইলেও তা নিতে পার। তবে দূরদূরান্তে ভ্রমণের জন্য তা ব্যবহার করবে না। কাছাকাছি কোথায়ও যাতায়াতের জন্যই তাঁর গাড়ি ব্যবহার করবে। গাড়ি ব্যবহার করবে যত্নের সঙ্গে। যেন নিজেরই গাড়ি ঘোড়া। গাড়ির সঙ্গে জমিদারের যে লোকজন থাকবে অর্থ দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করবে। জমিদারের এলাকায় তোমার যে সব জিনিসপত্রের প্রয়োজন হবে সেসব জোগাড় করতে হবে নগদ অর্থের বিনিময়ে। অর্থাৎ, অন্যত্র যা করতে হয় এখানেও তা-ই করবে। জমিদারের কর্মচারীরা অনেক সময় সাহেবের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের জন্য দাম নিতে চায় না। তোমাকে ভদ্রভাবে তাদের প্রতিহত করতে হবে।

তোমার অধীনে যারা কাজ করে তাদের জন্য তোমার ঘরের দরজা যেন সব সময় খোলা থাকে। যত বেশি সংখ্যক অধীনস্থ কর্মীদের তুমি ব্যক্তিগতভাবে জানতে পার ততই ভাল। ধৈর্য ধরে তাদের বক্তব্য শুনবে, সহানুভূতির সঙ্গে তাদের আর্জি বিবেচনা করবে। কারও প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাবার দরকার নেই। অন্যরা যেন তা ভাবার সুযোগ না পায়। কাউকে বিশেষ খাতির দেখালে সে তার সুযোগ নিতে পারে। এজন্য কোনও রাজকর্মচারীর উচিত নয়, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলির সময় তার বংশধর কর্মীদের বদলির জন্য তদবির করা।

অধীনস্থ কর্মীদের যে কোনও অনুরোধের তুমি সরাসরি স্পষ্ট উত্তর দেবে। যদি কোনও কারণে তক্ষুনি উত্তর না দিতে পার তবে বলবে,—আমি বিবেচনা করে দেখব। কিন্তু সেটা করতে হবে দ্রুততার সঙ্গে। প্রয়োজনে অবশ্যই "না" বলতে ইতস্তত করবে না, তবে তা করতে হবে ভদ্রভাবে। কখনও কাউকে কোনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবে না। প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করবে।

কোনও লোক নিয়োগের সময় অন্যদের জানিয়ে দিতে হবে, কারও যদি পৃষ্ঠপোষণা করা হয়ে থাকে তবে সে দায় তোমার, অন্য কারও নয়। প্রয়োজনে এসব ব্যাপারে অন্যদের পরামর্শ নিতে পার, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র তোমারই।

জুনিয়ার অফিসারদের উচিত নয় অধীনস্থ কাউকে কোনও লিখিত সার্টিফিকেট দেওয়া। অনেকেই কিন্তু তা চাইবে। একবার তা হাতে পেয়ে গেলে দীর্ঘদিন ধরে তা নানাভাবে ব্যবহার করবে।

তোমার অধীনস্থ কর্মচারীরা তাদের পদের বদলে নাম ধরে ডাকলেই খুশি হবেন। সুতরাং, "গুড মর্নিং তহসিলদার" ("Good Morning Tahashildar") না বলে "গুড মর্নিং রামচন্দ্রবাবু" ("Good Morning Ram Chandra Babu") বললেই ঠিক কাজ হবে। এই রীতি উচ্চনীচ নির্বিশেষে সব

কর্মচারীরাই পছন্দ করেন। সুতরাং, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাতে অভ্যস্ত হওয়া ভাল।

ইউরোপিয়ানরা এদেশে ভারতীয়দের কাছ থেকে কী ধরনের ব্যবহার আশা করতে পারেন, উপসংহারে সে-সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ভারতীয় ভদ্রলোকরা সকলেই ভদ্র বা স্বভাব নম্র, তাদের ব্যবহারও সৌজন্যমূলক। কিন্তু সবাই তো আর ভদ্রলোক নন। সুতরাং, দৈবাৎ কখনও হয়তো অসৌজন্যমূলক আচরণের মুখোমুখি হতে হবে। অনেক সময় এমনও হয়, তুমি যে আচরণকে রূঢ়তা বলে মনে করছ সেটা আসলে অনিচ্ছাকৃত, অপরপক্ষের অজ্ঞতার ফল। তবু তোমার নিজের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য কিছু কেতা-কানুন অনুসরণ করতে হবে। দেখতে হবে ভারতীয়রা তোমার সঙ্গে দেখা করার সময় যথাযথভাবে পোশাক পরে এসেছেন কিনা। যে সব ভারতীয় ইউরোপিয়ান পোশাক পরে থাকেন তাঁদেরও পরামর্শ দিতে হবে কোন উপলক্ষে কোন পোশাক শ্রেয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় "টেনিস ফ্ল্যানেল" ("tennis flannels") সাহেব সন্দর্শনের উপযুক্ত পোশাক নয়। তবে অজ্ঞতার জন্য ওঁদের কিছুটা ক্ষমা ঘেন্না করে নিতে হবে ("but allowences must be made for ignorance")। হ্যাঁ, তাঁদের মাথায় পাগড়ি থাকলে বলে দিতে হবে সাহেবের সঙ্গে দেখা করার সময় পাগড়ি খোলা চলবে না। আর, মাথায় সাহেবি টুপি থাকলে সাহেবের সামনে অবশ্যই তা খুলে ফেলতে হবে।

যে ইংরাজ রাজকর্মচারী ডাইনে বাঁয়ে সব সময় অন্যায় আচরণ ("offence") দেখেন এবং মনে করেন তিনি অপমানিত, জনচক্ষে তিনি নিজেকে হাস্যকর করে তোলেন মাত্র। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তোমার সঙ্গে অপমানসূচক ব্যবহার করলে, কিংবা আপত্তিজনকভাবে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলে তাঁকে অবশ্যই দৃঢ়তা ও মর্যাদার সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে হবে এমন আচরণ চলবে না। এসব ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করে ছেদ টেনে দিতে হবে এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে ভবিষ্যতে তিনি যেন আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা না করেন।

ভারতীয়রা অনেক সময় ইংরাজি আদব কায়দা ("Etiquette") জানেন না, ইংরাজ মহিলাদের সামনে কী করা উচিত, কী নয়, সে-সে সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা নেই। সুতরাং, (আচরণে) কখনও অজ্ঞতা প্রকাশ পেলে তাকে ইচ্ছাকৃত অভদ্রতা বলে গণ্য করা ঠিক হবে না। আড়ালে বন্ধুভাবে বরং বুঝিয়ে দেওয়া ভাল কোন্ আচরণ সঠিক, কোনটি ঠিক নয়।

রচনার সূচনায় যে ছদ্ম রামপ্রসাদী গানটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার রচয়িতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই ব্যঙ্গাত্মক ছত্র কয়টির পটভূমি হিসাবে কবি লিখেছেন—

> "প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দঙ্গল ইস্কুলের ছোকরা চিৎকার করতে করতে ছুটেছিল...এক-এক জন চেঁচাতে থাকে—'Jack, look at the blackies!...'

(তাই শুনে) এখানকার একজন বাঙ্গালী একটা গান তৈরি করেছিল।—'এবার মোলে সাহেব হব/কালো চামড়া দেখলে পরে ডার্কি (darkies) বলে মুখ ফেরাব।" উদ্ধৃতির সঙ্গে ঈষৎ পার্থক্য থাকলেও বক্তব্য কিন্তু একই রয়ে গেল। বলাবাহুল্য, গানটি ব্যঙ্গাত্মক। যে সব কালো মানুষ সাহেব হওয়ার জন্য ব্যগ্র, তাঁদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। হবু সাহেব-মেমদের প্রতি স্বদেশীয়দের বাক্যবাণ আরও কেউ কেউ নিক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু উচ্চাভিলাষীদের সাহেব হওয়ার সাধনায় তবু ভাটা পড়েনি। আর, তাঁদের সেই স্বপ্নকে লক্ষের দিকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই রচিত হয়েছিল সাহেব 'এটিকেট' বা আদব-কায়দা এবং রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ওই সব বই, যার মধ্যে একটি নিয়ে আমরা এখানে বিশদ আলোচনা করেছি। ইংরেজি শিক্ষা থেকে শুরু করে ইংরেজি আদব-কায়দা শিক্ষা, ওঁদের তরফে উদ্যোগের অভাব ছিল না। উচ্চ ও মধ্যবর্গের ভারতীয় তথা বাঙালিকে দীক্ষিত

করার চেষ্টার পাশাপাশি আমরা দেখি সাহেবদেরও উপরওয়ালারা শেখাচ্ছেন ভারতীয়দের সঙ্গে পালনীয় আচরণ বিধি। পড়লে মনে হয় শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষরা বুঝিবা সেদিন প্রত্যেক মূর্তিমান সভ্যতা ও সৌজন্যের বিগ্রহ। মনে পড়ে মহারানি ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে লেখা ঈশ্বরগুপ্তের সেই পদ্য,

"মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস ৷৷
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,—
ঘুসি খেলে বাঁচ্‌ব না।"

সবাই জানেন, কেতাবে বর্ণিত সভ্যতা, ভদ্রতা ও সৌজন্যের ওই পরিবেশ ঔপনিবেশিক আমলে তছনছ হয়ে যেত সামান্য ছল ছুঁতোয় যখন তখন। জাতিদ্বেষ, বর্ণ বিদ্বেষ তথাকথিত উচ্চতর সভ্যতার গর্ব রাজা আর প্রজা, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলত পদেপদে। হাতের মখমলের দস্তানা খুলে তখন বেরিয়ে আসত নিষ্ঠুর ক্রুর নখ। দেশিয় সাহেবরা পর্যন্ত কখনও কখনও শিউরে উঠতেন সভ্যতাভিমানী প্রজাপালকদের সেই মূর্তি দেখে। সুতরাং, যত অমায়িকই হোন না কেন, সাহেব 'এটিকেট'-শিক্ষক, এবং প্রজাবৎসল শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী, বাস্তব ইতিহাস বোধ হয় হাস্যচ্ছলে শুনিয়ে গিয়েছেন অমৃতলাল বসু। "গ্রামবিভ্রাট" প্রহসনে তিনি গুরুমশাইয়ের জবানিতে বলছেন,—

"সাহেবশ্চ বাঙ্গালিশ্চ নৈব তুল্য কদাচনঃ।
সাহেব দদাতি থাপ্পড়, বাঙ্গালী হর্ষে খাদতিঃ ৷৷
শ্বেত-চর্ম্ম-বর্ম্ম সাহেবশ্চ রক্ষতে সর্ব্ব বিপদে।
কৃষ্ণ চর্ম্মাবৃত প্লীহা ফাটান্তি চ পদে পদে ৷৷"

এই প্রবন্ধে প্রধানত যে বই আলোচিত ও ব্যবহৃত:

English Etiquette for Indian Gentlemen, W.T. Webb, Calcutta, 1880;
Memorandum on the Subject of Social and Official Intercourse between European Officers and Indian Gentlemen, Bengal Secretariat Press, 1913; *সরস্বতীর ইতর সন্তান,* সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০০১

নির্ঘণ্ট

———

এই লেখকের অন্যান্য বই

কলকাতা
কেয়াবাৎ মেয়ে
ক্রীতদাস
পাড়ার বইয়ের বাইরে পড়া
বটতলা
মেটিয়াবুরুজের নবাব
মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ
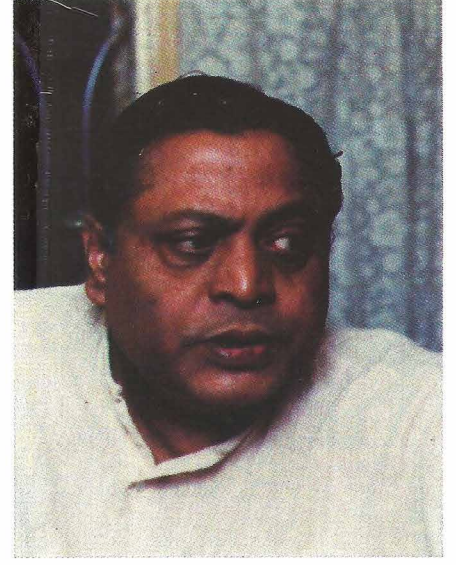
শ্রীপান্থ পাঠকের কাছে সুপরিচিত নাম। তাঁর জন্ম ময়মনসিংহের গৌরীপুরে। জন্মসাল: ১৯৩২। লেখাপড়া ময়মনসিংহ এবং কলকাতায়। শ্রীপান্থ তরুণ বয়স থেকেই পেশায় সাংবাদিক। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। সাংবাদিকতার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণামূলক রচনাদি লিখে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর চর্চার বিষয় সামাজিক ইতিহাস। বিশেষত কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতি। তিনি সতীদাহ, দেবদাসী, ঠগী, হারেম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যেমন লিখেছেন, তেমনই কলকাতার পটভূমিতে লিখেছেন একাধিক রচনা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: আজব নগরী, শ্রীপান্থের কলকাতা, যখন ছাপাখানা এলো, মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ, কেয়াবাৎ মেয়ে, মেটিয়াবুরুজের নবাব, দায়, বটতলা ইত্যাদি। 'কলকাতা' তাঁর সর্বশেষ বই। কলকাতার শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ ইংরেজিতেও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা মুলুকে প্রথম ধাতব হরফে ছাপা বই হালেদের 'আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ'-এর দীর্ঘ ভূমিকা তার মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের দিনগুলোতে বাংলার শিল্পী সাহিত্যিক কবিদের মধ্যে নব সৃষ্টির যে-অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ ঘটে তা নিয়ে লেখা তাঁর 'দায়' বইটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

শ্বেতাঙ্গ 'রাজা'। শ্বেতাঙ্গ 'নবাব'। ওঁদের প্রিয় পানীয় 'আরক', প্রিয় ডিশ—কারি। আলবোলার নল হাতে ঢুলু ঢুলু চোখে ওঁরা লাস্যময়ী ভারতীয় বাইজির নাচ দেখেন। সে এক আশ্চর্য কাল। অন্য জন্মে আমাদের এই স্বদেশ। সেখানে নতুন এক বর্ণাঢ্য জনগোষ্ঠী,—অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান। নতুন ভাষা—ইংরেজি। সেখানে রেল, স্টিমার, টরেটক্কা, কুইনিন! বাঙালি বাবুর খেলা তখন—সাহেব ধরা। স্বপ্ন তাঁর—সাহেব-হওয়া। রামপ্রসাদী সুরে মনে মনে তিনি গুনগুন করেন—'এবার মলে সাহেব হব!'

9 788177 562330